ভূত ভগবান শয়তান
বনাম
ডঃ কোভুর

ভবানী প্রসাদ সাহু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূত-ভগবান-শয়তান

বনাম

ডঃ কোভুর

ডাঃ ভবানী প্রসাদ সাহু

দীপ প্রকাশন, ২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা-৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Bhoot-Bhagaban-Saitan Banam Dr. Kovoor.

by

Dr. Bhabani Prasad Sahoo

প্রকাশক :

শংকর মণ্ডল

২০৯এ, বিধান সরণি

কলকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ-১৯৮২

দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৮৩

তৃতীয় সংস্করণ-১৯৮৪

চতুর্থ সংস্করণ-১৯৮৫

পঞ্চম সংস্করণ-১৯৮৭

ষষ্ঠ সংস্করণ-১৯৮৯

সপ্তম সংস্করণ-১৯৯২

অষ্টম সংস্করণ-১৯৯৪

নবম সংস্করণ-১৯৯৭

দশম সংস্করণ-২০০০

একাদশ সংস্করণ-২০০১

দ্বাদশ সংস্করণ-২০০৪

ত্রয়োদশ সংস্করণ-২০০৮

পুনর্মুদ্রণ-২০১০

পরিমার্জিত সংস্করণ : জানুয়ারি, ২০১৩

ISBN : 81-85800-01-4

মূল্য — ১২০.০০ টাকা

প্রচ্ছদ—তরুণ চক্রবর্তী

মুদ্রক :

গ্যালাক্সি প্রিন্টার্স

কলকাতা-৬৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচীপত্র

ত্রয়োদশ সংস্করণের ভূমিকা	৫
দশম সংস্করণের ভূমিকা	৫
দ্বিতীয় দীপ সংস্করণ (অষ্টম সংস্করণ)-এর ভূমিকা	৫
প্রথম দীপ সংস্করণ (সপ্তম সংস্করণ)-এর ভূমিকা	৫
তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা	৬
পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা	৬
কিছু কথা (প্রথম সংস্করণের ভূমিকা)	৭
মুখবন্ধ (ডঃ আব্রাহাম কোভুর)	১৯
১। **কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী এক জীবন**	২১
২। **ভূত-ভগবান-শয়তান ও ডঃ কোভুরের চ্যালেঞ্জগুলি**	৩২
৩। **অবতারগণের কাণ্ডকারখানা**	৪৬
৪। **অস্তিত্বহীন ঈশ্বর ও 'চরিত্রহীন' দেব-দেবীরা**	৭৩
৫। **ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা**	৯৪
৬। **কিছু অলৌকিক ক্ষমতা ও ঘটনা—সীমিত জ্ঞান, বদমায়েসি বা মানসিক রোগের লক্ষণমাত্র**	১০৭
৭। **গঙ্গাজল ইত্যাদির তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতা**	১৪৭
৮। **জ্যোতিষের জালিয়াতি**	১৫৪
৯। **আত্মা, পুনর্জন্ম ও জন্মান্তরবাদ**	১৬৮
১০। **ভূত-পেত্নী-দত্যি-দানো**	১৮৩
১১। **সাম্প্রদায়িকতা—একটি তৈরী করা সমস্যা**	২২৬
১২। **কুসংস্কার—প্রগতির অন্যতম অন্তরায়**	২৩৪
পরিশিষ্ট	২৪২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই লেখকের অন্যান্য বই-

সংস্কার-কুসংস্কার
কোন্ ওষুধ কেন খাবেন না
বৈজ্ঞানিক কুসংস্কার
এখনো সংস্কার এখনো কুসংস্কার
শরীর ঘিরে সংস্কার
সুরা শরীর সর্বনাশ (১৯৮৯ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত)
বিষয় : ড্রাগ
অলৌকিকতা বনাম বিজ্ঞান
ধর্মের উৎস সন্ধানে (নিয়ানডার্থাল থেকে নাস্তিক)
মৌলবাদের উৎস সন্ধানে
কুসংস্কারের উৎস সন্ধানে
অধার্মিকের ধর্মকথা
বিজ্ঞানের চোখে ভগবান
মানুষের জন্য বিজ্ঞান না বিজ্ঞানের জন্য মানুষ
নারী : অস্তিত্ব ও সংস্কার
জানতে চাই (প্রসঙ্গঃ বিশ্বাস ও সংস্কার)
হিন্দু মৌলবাদ
ধর্ম সাম্প্রদায়িকতা মৌলবাদ
বিজ্ঞানের আলোয় সংস্কারমুক্ত যৌনতা
খাদ্য অখাদ্য সংস্কার কুসংস্কার
এইডস—ঘৃণা নয়, চাই সতর্কতা
স্বাস্থ্য ও সংস্কার
প্রকৃতি ও সংস্কার
ভূত বলে কিছু নেই (পুস্তিকা)
ডাইনি বলে কিছু নেই (পুস্তিকা)
শত্রু যখন কুসংস্কার (পুস্তিকা)
কোন্টা মানবো কোন্টা মানবো না (পুস্তিকা)
কোন্টা করবো কোন্টা করবো না (পুস্তিকা)
টম্যাটো ভগবান ও হাইরোডেশ্বর
শরীর স্বাস্থ্যের টুকিটাকি
ওষুধ খেয়ে অসুখ
আস্তিক নাস্তিক
দুই বাংলা, হায় ধর্ম!
মানব সন্তান ঈশ্বর ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
দুই বাংলার কুসংস্কারবিরোধী বিজ্ঞান চিন্তা (সম্পাদিত)
আকুপাংচার
Hand Book of Recent Acupuncture Treatment & Research

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রয়োদশ সংস্করণের ভূমিকা

বিজ্ঞানমনস্কতা অর্জনের লক্ষ্যে ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এই ধরনের বই-এর ত্রয়োদশ সংস্করণের প্রকাশ অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। ধর্ম, ঈশ্বর, অলৌকিক ক্ষমতা ও নানা অবৈজ্ঞানিক চিন্তাকে ভাঙ্গিয়ে যে সব বাবাজি, গুরুজি, জ্যোতিষী, বুজরুক ও ধান্দাবাজরা মানুষকে প্রতারণা করে চলেছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ইচ্ছার অন্যতম বহিঃপ্রকাশও এটি। চারপাশে এই ধরনের শয়তানেরা এখনো সক্রিয়।

এই কয়েক সপ্তাহ আগেই কলকাতার বুকে যুক্তিবোধহীন, মূর্খ বা কুশিক্ষিত কিছু ধর্মান্ধ মানুষ তসলিমা নাসরিনকে কলকাতা থেকে বিতাড়নের দাবীতে হিংস্র তাণ্ডব শুরু করে। আরো বেদনার ও লজ্জার বিষয় হল এই হিংস্রতার কাছে সরকারকেও পিছু হঠতে হয়েছে। তসলিমাকে কলকাতা ছেড়ে যেতেই হয়েছে। তসলিমার কোনো বক্তব্য যদি অনৈতিহাসিক ও বিকৃত হয়, তবে তার বিরুদ্ধে বিতর্ক ও আলোচনা অবশ্যই চালানো যেতে পারে। লেখার বিরুদ্ধে লেখা দিয়ে লড়াই করাই সুস্থ উপায়। কিন্তু মূলত যে ইসলামী মৌলবাদীদের উস্কানিতে এই তাণ্ডব ঘটেছিল, তারা এই ধরনের সুস্থ মানবিক কাজের ধার ধারে না। হিন্দু বা খৃস্টান—সব ধরনের মৌলবাদীরাই চরিত্রে একই। লেখার বিরুদ্ধে মৃত্যুর ফতোয়া দিতে তাদের বাধে না। এমনকি বর্তমান লেখককেও অন্য একটি বইয়ের সূত্রে এই ধরনের হত্যার ও নিগ্রহের হুমকি পেতে হচ্ছে।

অলীক ঈশ্বরকে সামনে রেখে প্রেতের নৃত্য করা এই সব শয়তানদের দূর করে সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যেই আমাদের লড়াই।

১লা ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাহু

একাদশ সংস্করণের ভূমিকা

সামান্য পরিমার্জনা করে একাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হল। বর্তমানে দেশে-বিদেশে যেভাবে মৌলবাদী জনবিরোধী শক্তি হিংস্র ধর্মান্ধতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে তা সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানবতাবাদী ব্যক্তিকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। আফগানিস্থানে তালিবানরা ধর্মের নামে বুদ্ধ ও কণিষ্কের মূর্তি ধ্বংস করছে। অনেক মুসলিমই এর নিন্দা করেছেন। এদেশেও হিন্দু তালিবানিরা বাইবেল-কোরান পোড়াচ্ছে ধর্মের নামেই। অধিকাংশ হিন্দুই এই অপকর্মের সামিল নন। ধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার এই ধরনের ঘৃণ্য অপচেষ্টার এবং সামগ্রিকভাবে সমস্ত অবিজ্ঞান, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা মানুষ হিসেবে আমাদের সামাজিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এই ধরনের নানা বই, লেখাপত্র ও আলোচনা সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করে চলেছে।

এপ্রিল, ২০০১ ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাহু

দশম সংস্করণের ভূমিকা

সামান্য কিছু সংযোজন ও পরিমার্জনা সহ বইটির দশম সংস্করণ প্রকাশিত হল। ধর্মবাদী রাজনৈতিক কিছু নেতা এখন ভারতবর্ষে যেভাবে ধর্মীয় নানা সংস্কার-কুসংস্কারকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে এবং সামাজিকভাবে বৈজ্ঞানিক মানসিকতার কণ্ঠরোধ করার নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করছে, তখন এ ধরনের বইয়ের দশম সংস্করণের প্রকাশ অবশ্যই আশাব্যঞ্জক। অন্তত বাংলাভাষী মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রতি আগ্রহের পরিচায়কও সেটি। এরি পাশাপাশি ইতিমধ্যে ডঃ কোভুরের জন্ম শতবর্ষ পেরিয়ে গেল। কলকাতায় বাংলা একাডেমি সভাগৃহে ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে 'অনীশ সংস্কৃতি পরিষদ' এই উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলেন এবং ডঃ কোভুর জন্মশতবার্ষিকী স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়াও কিছু কিছু বিজ্ঞান সংগঠন ও পত্র পত্রিকাও কিছু অনুষ্ঠান করেছেন এবং লেখা প্রকাশ করেছেন। সবার সম্মিলিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্যোগে এইভাবেই বিজ্ঞান চেতনার সপক্ষে সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বইটির এই দশম সংস্করণটিও তার যথাযথ ভূমিকা রাখার চেষ্টা করবে।

১লা ডিসেম্বর, ১৯৯৯

ডা: ভবানী প্রসাদ সাহু

৭ম সংস্করণ (দীপ প্রকাশন প্রথম সংস্করণ)-এর ভূমিকা

'পরিশিষ্ট' হিসেবে একটি নতুন অংশ যোগ করে এবং অল্প কিছু সংযোজন ও পরিমার্জন করে, ৭ম সংস্করণ প্রকাশিত হল। প্রকাশনা সংস্থা পাল্টাল,-তাই নতুন এই সংস্থার পক্ষ থেকে এটি প্রথম সংস্করণ। তবে সংস্থা পাল্টালেও মূল প্রকাশক পাল্টায় নি। যে সুহৃদ শ্রী শঙ্কর মণ্ডলের আন্তরিক উৎসাহ ও উদ্যোগে বইটি প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল এবং প্রথম সংস্করণেরও যে ছিল আদি প্রকাশক, তারই প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে, নব কলেবরে বইটির সপ্তম আত্মপ্রকাশ।

বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী ও কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনে বইটি একটি ভূমিকা রাখতে পারছে। কিন্তু অন্যদিকে, কি আমাদের দেশে, কি বহির্বিশ্বে, ধর্মীয় মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী চিন্তা মাথা চাড়া দিচ্ছে বা সচেতনভাবে তার উত্থান ঘটানো হচ্ছে। প্রতিটি সৎ মানবতাবাদী পৃথিবীবাসীর উচিত এই সর্বনাশা-সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। এ ক্ষেত্রে বইটি সামান্য হলেও কিছু ভূমিকা রাখতে পারলে বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার পরিশ্রমের সার্থকতা।

১লা মার্চ, ১৯৯২ ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাহু

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

দ্বিতীয় সংস্করণেরই বেশ কিছু পরিমার্জন ও সংযোজন করা হয়েছিল। এ সংস্করণেও কিছু করা হল। বইটি ব্যাপক মানুষের সমাদর পেয়েছে যা এ ধরনের আন্দোলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে নির্দেশ করে। কিন্তু চারপাশের প্রচলিত প্রচারযন্ত্র-এর মাধ্যমে স্বার্থান্বেষীগোষ্ঠী তার নিজের স্বার্থকে সুরক্ষিত করার জন্য আধ্যাত্মিকতা আলৌকিকত্ব ও কুসংস্কারের মাধ্যমে অবৈজ্ঞানিক চিন্তার স্বপক্ষে প্রচার চালিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করে চলেছে। নিজেদের স্বার্থেই আমাদের উচিত সচেতনভাবে একে প্রতিরোধ করা।

মে, ১৯৮৪ ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাহু

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

অল্প কিছু পরিমার্জন ও সংযোজনসহ পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হল। কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মানুষের আকাঙ্খার অন্যতম বহিঃপ্রকাশ এ ধরনের বই-এর চাহিদা। এটি লক্ষ্য করে সম্প্রতি দু' একটি বই ও পত্রিকাও প্রকাশিত হচ্ছে। এটি অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপার। তবু দুঃখের বিষয় এঁদের কারো কারোর মধ্যে নিছক আত্মপ্রচার ও ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গীই চোখে পড়ে। আরো দুঃখের হল, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামজিক অর্থনৈতিক দিকগুলিকে গুরুত্ব না দেওয়া— যা প্রকৃতপক্ষে অবৈজ্ঞানিক ধারণারই বহিঃপ্রকাশ। তবু আশার কথা বিভিন্ন এলাকায় মানুষ কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ও অবৈজ্ঞানিক ভাববাদী মানসিকতায় অচলায়তন ভেঙে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন ; সচেতন নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও চেষ্টা করছেন বস্তুবাদী দর্শনকে জানতে, যুক্তিবোধ ও সমাজ সচেতনতা অর্জন করতে।

মার্চ, ১৯৮৭ ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাহু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু কথা—প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

কয়েকদিন আগে গ্রামে আমাদের বাড়ীর লাগোয়া একটি নারকেলগাছে বাজ পড়ে। অন্ধকার নির্জন রাত্রে প্রচণ্ড ঝড় ও প্রবল বৃষ্টির মধ্যে চোখ ঝলসানো তীব্র আলো, অব্যবহিত পরেই বাজ পড়ার ভীষণ গর্জন এবং নারকেল গাছে দাউ দাউ আগুন। বেশ কয়েক মিনিট ধরে চল্লো আগুনের এই ভয়ংকর খেলা। মাত্র কয়েক হাত দূরে বাড়ীর ভেতর আমার মা আর ছোট্ট বোনটি বসে। সামান্য দূরত্বের জন্য মা ও বোনের প্রাণ যেভাবে রক্ষা পেল, তাতে মা ও প্রতিবেশী সকলেই একে মহামহিম পরমেশ্বরের অসীম-কৃপা বলেই বলেছেন এবং ঘটনাটি যে দৈব-দুর্ঘটনা এতে তাঁদের সন্দেহ নেই।

আসলে প্রকৃতি বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট নিয়মেই মেঘাচ্ছন্ন আকাশের বিশেষ অঞ্চলে প্রচণ্ড শক্তিশালী বিদ্যুৎ বিভবের সৃষ্টি হয়। ঠিক নীচে পৃথিবীর সঙ্গে বিদ্যুৎ প্রবাহ যুক্ত হয় যে প্রক্রিয়ায় সেটিই বাজ পড়ার ঘটনা। কোন উঁচু গাছ, ল্যাম্পপোস্ট বা কৃত্রিমভাবে বসান বজ্রনিরোধক (lightening arrester) থাকলে সাধারণতঃ তার মাধ্যমেই এই বিদ্যুৎ পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত হয়। বাড়ীর পাশে বাড়ীর চেয়ে উঁচু গাছ থাকলে (বিশেষতঃ নারকেল গাছ, যার সূচলো ডগা বজ্র নিরোধকের কাজ করে) বাড়ীতে বাজ পড়ার সম্ভবনা প্রায় থাকে না। এইভাবে আমার মা-বোনের প্রাণরক্ষার পেছনে সুনির্দিষ্ট বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক কারণই ছিল—অস্তিত্বহীন কোন ঈশ্বর বা অলৌকিক শক্তির ইচ্ছা নয়। কিন্তু ঈশ্বর-অলৌকিকত্ব সম্পর্কে আজন্মলালিত দ্বিধাহীন অন্ধ বিশ্বাস যেখানে মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, রয়েছে প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতা, ভীতি ও অসহায়তা, সেখানে ঝড়ের ঐ ভয়াবহ পরিবেশে সামান্য দূরত্বের জন্য প্রাণরক্ষা পাওয়ার জন্য যেন অতি স্বাভাবিকভাবেই পরমকরুণাময় ঈশ্বরের সামনে কৃতজ্ঞতায় মাথা নুয়ে এসেছে। এখানে যুক্তির চেয়ে মিথ্যে বিশ্বাসই বড়। কিন্তু এর ফলস্বরূপ বাজপড়ার মত প্রাকৃতিক ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সঠিক প্রচেষ্টা আর করা হয় না এবং সমস্যাটি থেকেই যায়। অন্যদিকে যদি প্রকৃত সত্যটি জানা থাকত তবে গ্রামবাসীরা মিলে চেষ্টা করতেন প্রতিটি বাড়ীতে বজ্র নিরোধকের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা অবলম্বন করে এই ধরনের প্রাকৃতিক ঘটনা থেকে স্থায়ীভাবে পরিত্রাণ পাবার জন্য।

এইভাবে অসম্পূর্ণ জ্ঞান, কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধ বিশ্বাস, অস্তিত্বহীন অলৌকিক তথা ঐশ্বরিক শক্তির উপর নির্ভরতা ইত্যাদি ব্যাপক জনগণের মানসিকতাকে অথর্ব ও নিষ্ক্রিয় করে রাখে, দৈনন্দিন জীবনের হাজারো সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধানের সঠিক পথ খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের বিপথগামী করে—স্বার্থপুষ্ট হয় মুষ্টিমেয় শাসক গোষ্ঠীর ও যারা এই সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসকে ভাঙ্গিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের।

ব্যাপক ও সামগ্রিক এই ক্ষতি ছাড়া সরাসরিভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন নানা বিশ্বাসের জন্য বিপুল পরিমাণ সম্পদ, শ্রম ও উদ্যোগ উৎপাদকহীন, অর্থহীন কাজে ব্যয়িত হয়, যেমন পূজা, যজ্ঞ, প্রার্থনা, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি হাজারো আগড়মবাগড়মে। ভূতের ভর ভেবে হিস্টেরিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোগীর উপর শারীরিক অত্যাচার কিংবা সালংকারা কন্যাদান শাস্ত্রানুমোদিত—তাই সংগতি থাকুক বা না থাকুক বিয়ের গয়না কেনা ইত্যাদি থেকে শুরু করে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ভ্রান্ত বিশ্বাসকে আঁকড়ে রেখে সর্বনাশা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অথবা বিধর্মীদের ছলে বলে কৌশলে ধর্মান্তরকরণের প্রচেষ্টা ইত্যাদি বহুতর অসুস্থ অসামাজিক প্রবণতারও সৃষ্টি হয় এ সব থেকে।

কিন্তু আত্মা-প্রেতাত্মা, দেব-দেবী-ঈশ্বর, মন্ত্র-পূজা, আশীর্বাদ-অভিশাপ, জ্যোতিষবিদ্যা- হস্তরেখাবিদ্যা, পবিত্র তিথি, শুভ-অশুভ ইত্যাদি হাজারো মিথ্যা বিশ্বাস আচমকা সৃষ্টি হয় নি। অজ্ঞতা ও প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি ভীতি ও অসহায়তা আদিম মানুষের মনে ধীরে ধীরে এসব নানা কল্পনার সৃষ্টি করেছে—অসহায়ভাবে মানুষ চেষ্টা করেছে এগুলির সাহায্যে নিজেদের জীবনকে উন্নত করার; হাজার হাজার বছর ধরে সমাজ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এসবও বিকশিত হয়েছে, পেয়েছে সামাজিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব। পরে সামাজিক প্রতিকূল শক্তিগুলিও এতে প্রতিফলিত হয়েছে। মূলতঃ ভ্রান্ত হলেও এই ধরনের নানা মিথ্যা বিশ্বাসগুলি কিন্তু বিভিন্ন সময়ে সমাজকে সুশৃঙ্খল করেছে এবং চিত্তাকর্ষক অসংখ্য গল্প, লোককাহিনী ও নানা বিধিনিষেধ ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক মানুষকে নৈতিকতায় শিক্ষিত করতে সাহায্য করেছে।

তাই নানা মিথ্যা ও ক্ষতিকর সংস্কার ও বিশ্বাসের ভ্রান্ত ও ক্ষতিকারক দিকগুলিকে তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামাজিক গুরুত্বকেও মর্যাদা দেওয়া প্রয়োজন, প্রয়োজন সঠিক বিশ্লেষণ ও ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে সেগুলির কার্যকরী, মানবিক ও যুগোপযোগী দিকগুলিকে খোলামনে গ্রহণ করা। বিজ্ঞানমনস্কতা ও সংস্কারহীন, সংকীর্ণতামুক্ত মানসিকতা ছাড়া এটি সম্ভব নয়।

বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার, বিশেষতঃ ঈশ্বর-দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় বিশ্বাস, পৃথিবীর ব্যাপক সংখ্যক জনগণ দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বাস করে আসছেন, অসহায়ের মত এ থেকে সান্ত্বনা ও মানসিক সাহস পাওয়ার চেষ্টা করছেন। রাতারাতি এ বিশ্বাস দূর করা বিজ্ঞানসম্মত কারণেই সম্ভব নয় এবং এই প্রচেষ্টা মানুষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি করতে পারে। তাই একান্তই মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হলেও, এখনো বেশ কিছুকাল, বিশেষতঃ বিশেষ কোন ধর্মকে সরাসরি আঘাত করা মুস্কিল। কিন্তু অবশ্যই পাশাপাশি, বৈজ্ঞানিক চিন্তাটিকেও জনগণের সামনে রাখা উচিত, যাতে তাঁরা বৈজ্ঞানিকভাবে যাচাই করে, ধর্মীয় বা ঈশ্বর বিশ্বাস ও অন্যান্য নানা সংস্কারকে গ্রহণ-বর্জন করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারেন, —নিজের শরীর, সমাজ ও প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে নিজেদের জীবনকে সত্যিকারের উন্নত করতে পারেন।

অনেকে বলতে পারেন, ধর্ম-ঈশ্বর-অলৌকিকত্বে বিশ্বাস ইত্যাদি দূর হলে মানুষের পাপপুণ্যবোধ তথা নৈতিকতা ভেঙ্গে পড়বে। ব্যাপারটি প্রকৃতপক্ষে আদৌ তা নয়। বাস্তবতঃ মানুষের এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের ফলে সাধারণ মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশী, মুষ্টিমেয় শাসকশ্রেণী ও ধর্মব্যবসায়ীরা কিন্তু সুকৌশলে সরলবিশ্বাসী মানুষকে প্রতারণা ও শোষণ ক'রে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ পুষ্ট করে চলে। মানবিক দিকগুলিকে ঈশ্বর বা ধর্মের নাম না করে, সেগুলির সামাজিক উপযোগিতা বিচার করেই অনুসরণ করার কথা বলা যায়। যেমন 'চুরি করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাপাপ'। মানুষের সমাজ ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তরে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব ছিল না —তাই এ ধরনের নীতিবাক্যেরও প্রয়োজন ছিল না। সমাজবিকাশের নির্দিষ্ট পর্যায়ে ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি হল—তাকে রক্ষা করার জন্য এ ধরনের নীতিবাক্যও সৃষ্টি হল এবং যতদিন মানুষের সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব থাকবে ততদিন এই নীতিবাক্যের সামাজিক গুরুত্বও। কিন্তু এই প্রকৃত ব্যাপারটি এড়িয়ে গিয়ে পাপপুণ্যের ব্যাপারটা ঢোকানোর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ভ্রান্ত বিশ্বাসই মানুষের সমাজ ও ইতিহাসের ঊর্দ্ধে স্থান পেল এবং মূলতঃ মুষ্টিমেয় বিত্তশালীদের স্বার্থ রক্ষিত হল। একদা মানুষেরই তৈরী সামাজিক বৈষম্যগুলি জনগণই যখন ভবিষ্যতে একদিন দূর করবে এবং গড়ে তুলবে বৈষম্যহীন ও শোষণমুক্ত মানবসমাজ, তখন সেই সমাজে চুরির ব্যাপারটাই চলে যাবে—এই ধরনের নীতিবাক্যেরও প্রয়োজন থাকবে না। মানুষকে এই লক্ষ্যে শিক্ষিত করাটাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। একই ভাবে, জীবে সেবা যে করে সে ঈশ্বরের সেবা করে—এ ধরনের নীতিবাক্য, ঈশ্বরে অন্ধবিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাশীল মানুষকে সেবার মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার একটি সুন্দর পদ্ধতি সন্দেহ নেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেটি অস্তিত্বহীন ঈশ্বরের উপর আস্থা ও নির্ভরতার জড়ত্ব এবং অবৈজ্ঞানিক মানসিকতাকেও প্রশ্রয় দেয়। সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে পারস্পরিক সহযোগিতা সামাজিক একটি দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং যেহেতু সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির স্বার্থই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাই এটি নিজেদের সুস্থ সমাজজীবনের পক্ষেও প্রয়োজনীয়—অস্তিত্বহীন ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়। যখন ভ্রান্ত ঈশ্বর বিশ্বাস মানুষের চেতনায় সংপৃক্ত ছিল তখন হয়তো এসব ভাবাও যেত না; কিন্তু সঠিক পদ্ধতি হল, এদের শিক্ষণীয় দিকটি নিয়ে কাল্পনিক দিকটিকে বিসর্জন দেওয়া, যেমন ঈশপের গল্পের শিক্ষণীয় দিকটি গ্রহণ করে পশুপাখির কথা বলা বা এই জাতীয় ঘটনাকে অবাস্তব বলেই গণ্য করা হয়।

একইভাবে বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসারে দয়ামায়া, প্রেমপ্রীতি, শ্রদ্ধা, সৌন্দর্যবোধ ইত্যাদি মানবিক সুকুমার দিকগুলি মানুষের মধ্য থেকে চলে যাবে বলেও অনেকে ভয় করেন। এটিও সম্পূর্ণ ভুল। বরং মানুষের এই সব মানবিক গুণাবলীর সার্থক ও বাস্তব বিকাশের জন্য ভাববাদী চিন্তা দূর করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা ও এই অনুযায়ী আমূল সামাজিক পরিবর্তন করা উচিত। ঐ ধরনের সুকুমার বৃত্তিগুলি পৃথিবীতে উন্নততম প্রাণী মানুষের মস্তিষ্কের বিশেষ ক্রিয়ারই ফল—তাই মানুষের মস্তিষ্কের আমূল গুণগত পরিবর্তন না হলে এই সব গুণাবলী থাকবে। কিন্তু ভাববাদী অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তা ও প্রচলিত সমাজব্যবস্থা এই সব গুণাবলীর বিকাশের বাধাস্বরূপ। দারিদ্র্য, অপুষ্টি, অচিকিৎসা ইত্যাদি নিতান্তই বাস্তব নানা সামাজিক অব্যবস্থার ফলস্বরূপ পুত্রের অকালমৃত্যুর জন্য স্নেহময় পিতা যখন ভাগ্যকে দোষ দেন, বা ঈশ্বর তাকে কোলে টেনে নিল বলে ভাবেন, তখন প্রকৃতপক্ষে তাঁর মানসিকতায় এসবের সামাজিক কারণগুলিকে খুঁজে ও সেগুলিকে দূর করে নিজের ও তাঁর উত্তরসূরীদের স্নেহ-প্রেম-প্রীতি ইত্যাদি মানবিক গুণাবলীকে সার্থক করার প্রচেষ্টা থাকে না অথবা অসহায়ভাবে নিষ্ক্রিয় থাকতে বাধ্য হন। একইভাবে হত দরিদ্র মানুষের সৌন্দর্য প্রীতি বা সূক্ষ্ম রসবোধ বিলাসিতার পর্যায়েই পড়ে এবং এগুলি তার কপালে নেই ইত্যাকার ধারণা হয়।

অশিক্ষা, দারিদ্র্য, সামাজিক বৈষম্য ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধিগুলি যুক্তিবোধহীন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অবৈজ্ঞানিক মানসিকতার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে টিকে আছে। বৈজ্ঞানিক চিন্তার স্বপক্ষে এবং অতিপ্রাকৃতিক অলৌকিক, অতীন্দ্রিয়বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এই সব সামাজিক সমস্যা ও ব্যাধিগুলি দূর করার প্রচেষ্টার অন্যতম শর্ত এবং জনগণের স্বার্থবাহী।

ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই অনেকে এই মানবিক দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে আসছেন। ডঃ আব্রাহাম থোম্মা কোভুর-ও এঁদের একজন। তিনি সারাজীবন ধরে একনিষ্ঠ গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন, তথাকথিত ঐশ্বরিক বা অলৌকিক শক্তির কোন অস্তিত্ব নেই, অস্তিত্ব নেই আত্মা-প্রেতাত্মা-ভূত-ভগবানের। তিনি স্বরূপ উদঘাটন করেছেন সেই সব শয়তানদের যারা সরলবিশ্বাসী মানুষের ভ্রান্ত বিশ্বাসের সুযোগ নেয় ও নিজেদের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে প্রচার করে তাঁদের ঠকায়। এইভাবে তিনি জনগণকে বলিষ্ঠ, বৈজ্ঞানিক মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন, যেটি তাঁদের জীবনকে উন্নত ও সুখী করে তুলতে সাহায্য করবে। তাঁর এই মহৎ প্রচেষ্টার জন্যই বোম্বাই-এর ফ্রি প্রেস জার্নাল-এর সহকারী সম্পাদক শ্রীহরিহরণ পূঞ্জার ডঃ কোভুর-এর Gods, Demons & Spirits বইটির ভূমিকায় ডঃ কোভুরকে বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদী (Scientific humanist) বলে আখ্যা দিয়েছেন! প্রাসঙ্গিকভাবে Webster's Third New International Dictionary থেকে humanism-এর সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন —"মানবতাবাদ: একটি মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গী বা জীবনের পদ্ধতি যা মানবিক স্বার্থ ও মূল্যবোধের উপর কেন্দ্রীভূত; একটি দর্শন যা অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপারকে বর্জন করে, মানুষকে প্রাকৃতিক বস্তু হিসেবে গণ্য করে এবং যুক্তিবোধ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে আত্মোপলব্ধি অর্জনের জন্য মানুষের ক্ষমতা, মর্যাদা ও যোগ্যতার উপর জোর দেয়"। (অনূদিত)

ডঃ কোভুরের এই মানবতাবাদী চেতনারই প্রকাশ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্বপক্ষে তাঁর কাজ। কিন্তু তিনি তাঁর এই মহৎ কাজকে মূলতঃ যান্ত্রিকভাবেই সম্পন্ন করেছেন। ধর্ম তথা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলির সৃষ্টি ও টিকে থাকার পিছনের সমাজ অর্থনৈতিক, সামাজিক ঐতিহাসিক দিকটিকে তিনি সচেতন বা অসচেতনভাবে এড়িয়ে গেছেন। তাই ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ ডঃ কোভুর-এর Gods, Demons & Spirits বই-এর মুখবন্ধে মন্তব্য করেছেন, অন্যান্য যুক্তিবাদীর মত, ডঃ কোভুরও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস, ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানাদির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার বেশী কিছু করেন নি—এগুলি এখন মানব সমাজকে, বিশেষতঃ এশিয়া মহাদেশের সমাজকে কুরে কুরে খাচ্ছে; কিভাবে এইসব বিশ্বাস ও অভ্যাসগুলির সৃষ্টি হল এবং বহুশত বছরের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সত্ত্বেও মানবজাতির যৌথ চিন্তা ভাবনাকে কেন এগুলি এখনো নিয়ন্ত্রণ করছে—তার খুব বেশী উত্তর তিনি দেন নি। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর অভাব থাকায়, তিনি ধর্ম ও বিভিন্ন কুসংস্কারের মতাদর্শগত ভিত্তিকে খুঁজে পাননি; সমাজচেতনাকে সমাজের অধিবাসীদের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেন নি—এবং তাই ধর্মবিশ্বাস ও কুসংস্কারের পাশাপাশি টিকে থাকা বিজ্ঞান চিন্তার অগ্রগতির সঙ্গে প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের প্রাথমিক সমস্যাটিকেই যুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন—এই সংগ্রামেরই ধারাবাহিকতায় মানুষ শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ও শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম দিয়েছে। মার্কসবাদীরা ধর্মবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে শ্রেণী সংগ্রামের সামাজিক দিকটির সঙ্গে যুক্ত করেন। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও বিজ্ঞানীদের নিঃস্বার্থ ত্যাগের হাজারো কাজও জনগণের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতার জন্ম দেবে না, যদি জনগণকে শিক্ষিত করার এই প্রক্রিয়াকে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত না করা হয়। এখানেই যুক্তিবাদীরা ব্যর্থ হয়েছেন। ডঃ কোভুর এঁদের একজন—যদিও তিনি নিঃস্বার্থভাবে চূড়ান্ত ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং অন্যতম জ্ঞানী যুক্তিবাদী। মার্কসবাদীদের পক্ষে এটি অনুধাবন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, সংকীর্ণ অর্থে শ্রেণী সংগ্রাম অর্থাৎ অর্থনৈতিক সংগ্রাম, অথবা এমন কি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যুগ্ম সংগ্রামও মেহনতী জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি করবে না। শ্রেণী সচেতনতা সৃষ্টির অন্যতম প্রাথমিক দিকনির্দেশ হিসেবে লেনিন বলেছিলেন, তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে একটি লাগাতার আপোষহীন সংগ্রাম চালান প্রয়োজন ; কেবলমাত্র এটিই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে মেহনতী জনগণকে তার ভূমিকা পালন করতে সমর্থ করবে।"

শ্রীহরিহরণ পৃঞ্জার অবশ্য ডঃ কোভুর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "তাঁর (ডঃ কোভুরের) নীরবতা মার্কসবাদী দর্শনকে স্বীকার করে নেওয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার সময়, মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মতৈক্যের ব্যাপারে তিনি মনোভাব প্রকাশ করেছেন"।

ইনি অন্যত্র বলেছেন, "ঈশ্বর বিশ্বাসের বিপরীতে নাস্তিকতা একটি নেতিবাচক শব্দ। তার কারণ ঈশ্বর বিশ্বাস গত কয়েক শতাব্দী ধরে আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে। মানুষের দুর্দশা ও অসহায়তার প্রাসঙ্গিকতায় সৃষ্টি হওয়া ধর্ম মনোরোগীসুলভ ঈশ্বর চিন্তার সৃষ্টি করেছে। প্রাচীন গ্রীক ও ভারতীয় বস্তুবাদী দর্শনে প্রকাশিত প্রাচীন মানুষের প্রকৃতিতত্ত্বের চিন্তা এই তৈরী হওয়া ঈশ্বরবাদকে জায়গা করে দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু, শ্রম ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি অবশেষে বিজ্ঞানের বিকাশের ফলে আরো উন্নতরূপে বস্তুবাদী দর্শন পুনরাবিষ্কার করেছে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ ঘটিয়ে উৎপাদনশীল কাজের মধ্যদিয়ে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি উন্নত হয়ে উঠেছে; এই পদ্ধতিই আধুনিককালে বস্তুবাদ ও ভাববাদের ঐতিহাসিক সংগ্রামের উজ্জ্বল সূচনা করেছে। মার্কস-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী, বস্তুবাদী দর্শনের সংপৃক্ত সামাজিক ভিত্তি রয়েছে এবং মতাদর্শগত সংগ্রাম একটি জটিল সমাজ-ঐতিহাসিক পদ্ধতি, একে সহস্র টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে এগোতে হবে। কিন্তু ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি এই সংগ্রামের একটিই যুক্তিযুক্ত পরিণতি নির্দেশ করে : ভাববাদ বা অধ্যাত্মবাদের বিরুদ্ধে বস্তুবাদী বা নাস্তিকতাবাদী দর্শনের চূড়ান্ত বিজয়। মতাদর্শগত বা বিভিন্ন ভাবধারার সংগ্রামের এটিই মূল কথা। এবং ভারত-উপমহাদেশ ও শ্রীলংকায় বিভিন্ন চিন্তার এই সংগ্রামের ক্ষেত্রে ডঃ কোভুর একটি উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছেন, এ ব্যাপারে তাঁর খ্যাতি আন্তর্জাতিক।

"ডঃ কোভুর ও তাঁর অনুগামী যুক্তিবাদীরা ঈশ্বর, অবতার, ওঝাগুনিন, জ্যোতিষী, অলৌকিকত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত সমস্ত ধরনের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। এই সংগ্রাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কুসংস্কার থেকে জনগণকে মুক্ত না করলে সমাজের প্রগতি অসম্ভব। ডঃ কোভুর সমস্যার এই দিকটির মধ্যে তাঁর কর্মকাণ্ডকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিলেন এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ধর্ম, ঈশ্বর ইত্যাদি সম্পর্কিত বিশ্বাসগুলি ধারাবাহিকভাবে টিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তির বিশ্লেষণের মধ্যে যান নি। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি চূড়ান্ত অর্থে সর্বহারার মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম অংশ হিসেবেই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সাফল্যলাভ করতে পারে। অন্যভাবে বল্লে, জীবনের যে সব দুঃখ দুর্দশাকে ভুলে থাকার অন্যতম উপায় হিসেবে কুসংস্কারের সৃষ্টি, সেগুলির উৎসস্বরূপ সামাজিক প্রতিকূল শক্তিকে দূর করতে হবে।”

এ দিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস আঁকড়ে রাখার জন্য সরল-বিশ্বাসী অসহায় মানুষকে দোষারোপ বা উপহাস করা অবৈজ্ঞানিক মানসিকতার লক্ষণ। যে সমাজ-ঐতিহাসিক কারণে তাঁরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসের শিকার হয়েছেন ও অসহায়ভাবে আঁকড়ে রাখতে বাধ্য হচ্ছেন, সমাজ সচেতন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ঐ কারণগুলি সম্পর্কে ও বিশ্বাসের ভ্রান্তিগুলি সম্পর্কে তাঁদের শিক্ষিত করাটাই বিজ্ঞানমনস্ক, সচেতন ব্যক্তির সামাজিক ও মানবিক দায়িত্ব।

সম্প্রতি দেশ-বিদেশে বেশ কিছু সংস্থা, পত্রিকার ও ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্ছে, যাঁরা বিভিন্ন কুসংস্কারের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দায়িত্ব নিচ্ছেন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়কে জনগণের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছেন ইত্যাদি। এসব নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রগতিশীল সামাজিক ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এঁদের মধ্যে অনেকেই সমাজ, জনগণের জীবন ও সমাজ-ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, একপেশেভাবে (এবং প্রকৃত অর্থে অবৈজ্ঞানিকভাবে) বিজ্ঞানের টুকিটাকি কিছু আবিষ্কার সম্পর্কে প্রচার, মডেল তৈরী করা, অথবা দু'চারটি ভ্রান্ত বিশ্বাসের যান্ত্রিক বিশ্লেষণ ইত্যাদির মধ্যেই নিজেদের আন্তরিক উদ্যোগ ও পরিশ্রমকে সীমাবদ্ধ করে রাখছেন। এই সীমাবদ্ধতাকে দ্রুত কাটিয়ে তোলা প্রয়োজন। কারণ যান্ত্রিকভাবে কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্যকে শুধুমাত্র জানলেই সত্যিকারের বিজ্ঞামনস্কতা অর্জিত হয় না—এই কারণেই তথাকথিত বহু বিজ্ঞানীরাই একসময় অন্ধ-বিশ্বাস, ধর্মীয় নানা সংস্কার বা অন্যান্য নানা কুসংস্কারের শিকার হন। অন্যদিকে এই ধরনের সীমাবদ্ধ বিজ্ঞান চিন্তা যে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার জন্ম দেয় তা বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীকে তাঁর মহান সামাজিক ভূমিকা পালনে বাধা দেয়। তাই মানবজাতির সামগ্রিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বেশ কিছুটা এগুলেও পৃথিবীর জনগণের ব্যাপক অংশের কাছে এখনো তা পৌঁছয়নি, এবং জনগণ এখনো আধুনিক বিজ্ঞানের সুফল থেকে বঞ্চিত—দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য ইত্যাদির অন্ধকারে যেন আদিম অবস্থাতেই থেকে গেছেন। সমাজ ও জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন বিজ্ঞান গবেষকের একনিষ্ঠ কাজ চূড়ান্ত অর্থে মানবজাতির জ্ঞানকে উন্নত করলেও, তার আশু সুফল গ্রহণ করে কিছু ব্যবসায়ী ও শাসকশ্রেণী এবং তারা এই জ্ঞানকে ব্যবহার করে জনগণকে শোষণ করার কাজে। সত্যিকারের বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে বিজ্ঞানের এই অপপ্রয়োগকে বন্ধ করা—এটি জনগণের জীবন, সমাজ ও সমাজ-ইতিহাস থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে করা সম্ভব নয়।

বিপজ্জনকভাবে আরো কিছু অখ্যাত-স্বল্পখ্যাত-বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়েছে, যাঁরা অসচেতনভাবে, এবং কেউ বা সচেতনভাবেই, বিজ্ঞানের মোড়ক লাগিয়ে নানা চিত্তাকর্ষক কল্পকাহিনী সুদক্ষভাবে প্রচার করছেন। বিজ্ঞানের নানা তথ্যের উপর ভিত্তি করে সুদূরপ্রসারী কল্পনা ভাল ; কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক অথচ প্রকৃতপক্ষে অপবৈজ্ঞানিক নানা ধারণার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপর ভিত্তি করে আজগুবি ও অলৌকিক কল্পবিজ্ঞান মূলতঃ অবৈজ্ঞানিক চিন্তাকেই সমৃদ্ধ করে। কিশোর-ছাত্র-যুবা তথা ব্যাপক মানুষের মধ্যে এঁদের বিভিন্ন লেখা ব্যবসায়িক সাফল্য হয়তো আনে—কারণ মানুষের মধ্যে রোমাঞ্চ ও রহস্যপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে বর্তমান—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটি অবাস্তব কল্পনা ও অলৌকিকত্বের প্রতি মোহ ও আস্থা সৃষ্টি করে, বিশেষতঃ তরুণ-কিশোরদের অবচেতন মনে।

শাসকশ্রেণীর স্বার্থপুষ্টকারী সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থা এই একই কাজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে করে। ছোটবেলা থেকেই ধর্ম, ঈশ্বর, আত্মা, প্রেতাত্মা, জ্যোতিষবিদ্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত নানা অবাস্তব মিথ্যা বিশ্বাস সকলের মধ্যে ঢোকান হয়, যার ফলে তাদের বিজ্ঞানমনস্কতা, সমাজ সচেতনতা ও যুক্তিবোধ ক্রমশঃ ভোঁতা হতে থাকে।

এই ধরনের ব্যবস্থার অন্যতম ভয়াবহ প্রকাশ বিজ্ঞানের সুফল থেকে ব্যাপক মানুষকে বঞ্চিত করা। এখনো অব্দি মানুষ যে জ্ঞান অর্জন করেছে তার সুফল ভোগ করে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ এবং তার খেসারত দেয় জনগণ। বিজ্ঞানীরা চন্দ্র সূর্যকে কিছু জড় পদার্থের সমষ্টি বলে জানলেও পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে এ সত্য পৌঁছয়নি—তাঁরা এখনো চন্দ্র ও সূর্যকে দেবতার মত পূজো করে চলেছেন। একইভাবে বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তির সংখ্যা এখনো খুবই সীমিত। অন্যদিকে বিজ্ঞানের বলে মানুষ জীবনকে উন্নত করার নানা পদ্ধতি জেনেছে। যেমন ডায়ালিসিসের পদ্ধতি! প্রতিদিন হাজার হাজার টাকা ব্যয়ে বিত্তশালী বৃদ্ধ ব্যবসায়ীর বা রাজনৈতিক নেতার জীবনকে এর সাহায্যে প্রলম্বিত করা হচ্ছে, অন্যদিকে অতি সাধারণ ওষুধপত্রের অভাবে বিপুল সংখ্যক মানুষ মারা পড়ছে। একই ভাবে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-সংস্কৃতি ও মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত কিছুকে বিজ্ঞানের বলে উন্নততর করার পদ্ধতি মানুষ জানতে পেরেছে, কিন্তু এসবের ফল ভোগ করছে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ। আর অপুষ্টি অনাহারে, বস্ত্রহীন-গৃহহীন অবস্থায়, অশিক্ষা ও অনুন্নত চেতনার মধ্যে বিপুল সংখ্যক জনগণ আদিম, কি আরো নিকৃষ্ট, অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছে। বিজ্ঞানের বিষম প্রয়োগ সম্ভব হচ্ছে সামাজিক বৈষম্যের কারণেই, যা একদিকে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করছে, অন্যদিকে তেমনি সামগ্রিকভাবে পৃথিবীতে মানবজাতির অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে—যেমন মারণাস্ত্র ইত্যাদি তৈরীতে বৈজ্ঞানের অপপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে।

সামগ্রিক এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় ঠিক করতে পারেন কেবলমাত্র জনগণই। একাজে বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবোধ প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে তাঁদের সাহায্য করবে। ডঃ কোভুরদের মত ব্যক্তির প্রচেষ্টা এর জন্যই। এ বিষয়ে ডঃ কোভুরের সারাজীবনের গবেষণার ফসল তাঁর, 'Begone Godmen' ও 'Gods; Demons & Spirits' বই দুটি। এই বই দুটি অবলম্বন করেই আলোচ্য এই বইটি 'ভূত-ভগবান-শয়তান বনাম ডঃ কোভুর' তৈরী করা হয়েছে। ডঃ কোভুরের মূল দুটি বইয়ের কিছু অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য, পুনরাবৃত্তি, অতিকথন ইত্যাদি বাদ দিয়ে এবং প্রাসঙ্গিকভাবে কিছু তথ্য ও বক্তব্য যোগ করে, তাঁর বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতাকে কাটানর চেষ্টা করা হয়েছে। অনেকক্ষেত্রেই ডঃ কোভুরের বক্তব্য ও আমার সংযোজনের মধ্যে তফাৎ করা হয় নি তার কারণ ডঃ কোভুরের বক্তব্য, বা আমার সংযোজন, কোনটিরই মাহাত্ম্য প্রচার বইটির উদ্দেশ্য নয়—মূল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্বপক্ষে বক্তব্য রাখার চেষ্টা করাটাই উদ্দেশ্য। এই প্রচেষ্টার মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাও অনেক পাঠকবন্ধু উপলব্ধি করতে পারবেন। আরো সক্ষম ও যোগ্যতর ব্যক্তি এ কাজে সার্থকভাবে এগিয়ে এলেই এ ধরনের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ক্রমশঃ পূর্ণতা লাভ করবে। এছাড়া বইটির তথ্যগত কোন ত্রুটি, বক্তব্যের অসঙ্গতি, অন্যান্য ভুলভ্রান্তি বন্ধুত্বমূলকভাবে দেখিয়ে দিতে সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, এ ধরনের বক্তব্যকে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া। বৈজ্ঞানিক চিন্তা যাঁদের স্বার্থ মূলতঃ পুষ্ট করবে তাঁদের বিপুল অংশই লিখতে পড়তে জানেন না। যাঁরা শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা প্রথমে সচেতন হয়ে যদি বিভিন্ন মাধ্যমে, আন্দোলনধর্মী প্রচেষ্টায় ও যৌথ ভাবে জনগণের মধ্যে সমাজ সচেতন-বিজ্ঞান চিন্তাকে নিয়ে যান, তবেই এ ধরনের প্রচেষ্টার সার্থকতা। সঙ্গে সঙ্গে সাথে পুনরুক্তি হলেও আবার বলা প্রয়োজন, সমস্ত ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে এই বিজ্ঞান আন্দোলনকে সংপৃক্তভাবে যুক্ত না করলে, কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-যুব-নারী-বুদ্ধিজীবী—সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে একে না নিয়ে গেলে, কোন আন্দোলনই সফল হবে না। কষ্টকর ও দীর্ঘস্থায়ী হলেও এ কাজ খুব সামান্যই হচ্ছে এবং যদিও ক্রমশঃ বাড়ছে, তবু তাকে সচেতন প্রচেষ্টায় দ্রুততর না করলে সামাজিক সমস্যাবলী প্রলম্বিত হবে। অলৌকিকত্ব, পূর্বজন্মের কর্মফল, ইহকাল-পরকাল, জ্যোতিষবিদ্যা, মন্ত্র-পূজা-প্রার্থনা ইত্যাদির উপর অসহায় নির্ভরতা যে বিভ্রান্তি যুক্তিবোধহীনতা, অবৈজ্ঞানিক সংকীর্ণ মানসিকতা ও উদ্যোগহীনতার জন্ম দেয়, তা সমস্ত ধরনের আন্দোলনকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে।

এ কাজে বাধা অনেক। বহু শত বছর আধিপত্য বিস্তার করা ভাববাদী চিন্তা সচেতন বা অসচেতনভাবে এতে বাধা দেবে। তার সঙ্গে হাত মেলাবে জনগণের স্বার্থবিরোধী শাসকশ্রেণীর অন্যান্য ধরনের চিন্তা। ধর্মের স্বাধীনতা রক্ষা করা, জনগণের জীবনে বৈচিত্র্য আনা, পাপ-পুণ্যবোধের দ্বারা সামাজিক অপরাধ কমান, ঈশ্বর বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে মানসিক সাহস বজায় রাখা ও আত্মোপলব্ধি, আত্মশুদ্ধি অর্জন করা ইত্যাদি নানা গালভরা কথাই যে মূলতঃ জনগণের স্বার্থবিরোধী ও শাসকশ্রেণীর স্বার্থপুষ্টকারী তা এর আগে ও পরে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে।

কিছু কিছু তথাকথিত অলৌকিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে সেগুলির ভ্রান্ত অবাস্তব দিক তুলে ধরলেও ভাববাদী চিন্তাকে আঁকড়ে রাখা ব্যক্তিরা অতীত ও বর্তমানের আরো হাজারো উদাহরণ বলার চেষ্টা করবেন যে, —'এগুলি তো ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না বা ব্যাখ্যা করা হয় নি; এতএব এগুলি অলৌকিকত্ব অতিপ্রাকৃতিক অতীন্দ্রিয়বাদের সত্যতা প্রমাণ করছে'। অতীতের বহু রটনা বা ঘটনার ব্যাখ্যা তথ্যের অভাবেই বর্তমানে অনুসন্ধান করা বাস্তবতঃ সম্ভব নয়। এছাড়া অতীত ও বর্তমানের অসংখ্য ঘটনার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা দু'চারজন মানুষ সারাজীবন ধরে চেষ্টা করলেও পারবেন না, বাস্তবতঃই তা সম্ভব নয়। আর যে সব ঘটনা বর্তমানের জ্ঞান ও প্রাপ্ত তথ্যের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না, সেগুলিরও অবশ্যই বাস্তব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রয়েছে। আজ না হোক কাল, কি আরো পরে মানুষের জ্ঞান বাড়লে তা ব্যাখ্যা করা যাবে। কিন্তু তাই বলে সেগুলিকে অলৌকিক, ঐশ্বরিক বা অজ্ঞেয় ইত্যাদি হিসাবে গণ্য করা ভুল। বিজ্ঞানের সাধারণ সত্য ও সূত্রকেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োগ করতে হয়। আত্মার যেখানে অস্তিত্ব নেই সেখানে প্রেতাত্মা, পুনর্জন্ম, পূর্বজন্ম, ইহকাল-পরকাল, কর্মফল ইত্যাদি জাতীয় সমস্ত ব্যাপারই অসম্ভব—এটিই সত্য। তার জন্য কয়েকটি ঘটনা প্রতীকী হিসেবে বিশ্লেষণ করা যায়, কিন্তু জানা শোনা বা দেখা সব ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই, সম্ভবও নয়। অলৌকিকত্ব, অতীন্দ্রিয়বাদ, অতিপ্রাকৃতিক ঘটনাবলী বা এই ধরনের সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রেই এটি সত্য। তামার অন্যতম ধর্ম, সে সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তুঁতে তৈরী করতে পারে—এটি চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত। অতএব পৃথিবীর যে কোন পদার্থকে তামা বলে প্রমাণ করা গেলে এটিও সত্য যে সেই পদার্থটি তুঁতে তৈরী করতে পারবে। তার জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই, সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটনোর প্রয়োজন নেই। কিন্তু পাশাপাশি অবশ্যই এটিও সত্য যে অন্ধবিশ্বাসী, সন্দেহ প্রবণ ব্যক্তি ও ব্যাপক সংখ্যক মানুষের দৃঢ়তর আস্থা অর্জনের জন্য নানা ধরনের আপাত রহস্যময় বা অলৌকিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আরো করতে হবে, কারণ অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের তুলনায় সঠিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার স্বপক্ষে কাজ খুব কম দিনই শুরু হয়েছে।

ভাববাদীরা এও বলতে পারেন যে, এত অজস্র মানুষ এত যুগ ধরে ঈশ্বর, অলৌকিকত্ব, ধর্মবিশ্বাস, জ্যোতিষবিদ্যা ও অন্যান্য নানা সংস্কারকে মেনে আসছে, —তা ভুল হবে? অন্যদিকে দু'চারজন লোক এখন এগুলিকে মিথ্যা বিশ্বাস বলছে— সেটি সত্যি হয়ে যাবে? হ্যাঁ, হতে পারে। কোন ভুল ব্যাপারকে বহু মানুষ বহুদিন ধরে বিশ্বাস করলেই তা সত্যি হয়ে যায় না। কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও-র সময় পৃথিবীর সবাই বিশ্বাস করত সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে— অন্যদিকে মুষ্টিমেয় দু'চারজনই একে ভুল বলেছিলেন। তা সত্ত্বেও এই মুষ্টিমেয় দু'চারজনের কথাই ঠিক, তাঁদের বক্তব্যকেই বৈজ্ঞানিকভাবে সত্যি বলে প্রমাণ করা গেছে এবং বহু মানুষের বহু যুগের বিশ্বাস বৈজ্ঞানিক ভাবেই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। একইভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা 'ধর্মযুদ্ধে' হাজার হাজার মানুষ জড়িত থাকলেও তা সমর্থনযোগ্য নয়।

ভাববাদীরা দু'চারজন বৈজ্ঞানিকের এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও উদাহরণ দেন, যাঁরা ঈশ্বর, অলৌকিক শক্তি ও নানা কুসংস্কারে বিশ্বাস করতেন বা করেন। ভাববাদীরা বলেন এত বড় বড় বৈজ্ঞানিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কি ভুল করতে পারেন? এটিও একটি হাস্যকর যুক্তি। সমাজ বা বিজ্ঞানের বিশেষ কোন বিভাগে কিছু অবদান রাখলেও পরিপূর্ণ বিজ্ঞানমনস্কতা অর্জিত না হতেই পারে। এঁদের প্রাপ্য শ্রদ্ধা জানিয়েও বলতে হয়, এ ধরনের সব ক্ষেত্রেই ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিকের বা বিখ্যাত ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিজ্ঞানমনস্কতার অভাব, চিন্তাভাবনার সীমাবদ্ধতা, বার্দ্ধক্যের মানসিক দুর্বলতা, হতাশা বা এক ঘেয়েমি থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা, পারিপার্শ্বিক সমাজ ও পরিবেশের প্রভাব ইত্যাদির পরিচয় মাত্র। নিজেদের ভ্রান্ত বিশ্বাস বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা না করেই কল্পনা ও ভাববাদের প্রভাবে এঁরা এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস বা কুসংস্কারের কথা বলেন। তথাকথিত নানা কমিউনিষ্ট পার্টির ছোট-বড় তথাকথিত কিছু সদস্যরাও একইভাবে নানা কুসংস্কার ও ভ্রান্তবিশ্বাসের শিকার হন।

এবং গুরুগম্ভীর, বয়স্ক ও ভিন্নতর ক্ষেত্রে শ্রদ্ধার্হ নানা ভাববাদীরা সবচেয়ে ভুল করেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁরা তাঁদের বক্তব্যকে আদৌ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত করার চেষ্টা না করেই অন্ধভাবে, কোন যুক্তি-তর্কে না গিয়েই নিজেদের ভ্রান্ত বিশ্বাস আঁকড়ে রাখেন শিশুর মত বা অপরিণত বুদ্ধিবৃত্তির কোন ব্যক্তির মত। যেমন মানসিক শক্তি (psychokinesis) -এর অস্তিত্বে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা এই বিশ্বাসটিকে যাচাই করতে পারেন অতি সহজেই। এ ধরনের শক্তির অধিকারী বলে যারা নিজেদের দাবী করে তাদের একটি ঝুলন্ত পেণ্ডুলাম বা বস্তুকে, কোন চালাকি না করে মানসিক শক্তির সাহায্যে, আন্দোলিত করতে বলা যায়। একইভাবে অন্যান্য নানা মিথ্যা অনেক বিশ্বাসকেই সহজে যাচাই করে নেওয়া যায়। কিন্তু এই যাচাই করার মানসিকতাই যখন নষ্ট হয়ে যায়, তখন অন্ধ ও গোঁড়া বিশ্বাসই বিপজ্জনক ভাবে মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে রাখে এবং নানা বিভ্রম ও মতিভ্রম (illusion, hallucination)-এর সৃষ্টি করে। এই অসুস্থ মানসিকতা তৈরীর জন্য "বিশ্বাসে মিলয়ে হরি, তর্কে বহুদূর" ইত্যাদি জাতীয় কথার প্রচার ভাববাদীদের পুরনো একটি কৌশল।

ভাববাদীরা আরো একটি ভয় করতে পারেন যে, ধর্মবিশ্বাস, ঈশ্বরে আস্থা, পাপপুণ্যবোধ, আশীর্বাদ-অভিশাপ-স্বর্গ-নরক-কর্মফল ইত্যাদিতে আস্থা চলে গেলে মানুষের নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধগুলি নষ্ট হয়ে যাবে। এটিও যে ভুল চিন্তা তা আগেই বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের সার্থক বিকাশ একমাত্র বিজ্ঞানমনস্ক সামাজিক ব্যবস্থাতেই সম্ভব। রাষ্ট্র ব্যবস্থার বহু আইন-কানুনের মত, তথাকথিত নানা মূল্যবোধ ও নৈতিকতাগুলি অনেকক্ষেত্রেই শাসকশ্রেণীর দ্বারা তৈরী করা ও প্রচারিত ও তাদের স্বার্থরক্ষাকারী—জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী। সমাজ সচেতন বিজ্ঞানমনস্কতার মাধ্যমে জনগণের স্বার্থবাহী নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরাটিও বিজ্ঞান-আন্দোলনের তথা ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত কর্মীদের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য।

আলোচ্য এই বইটি, এই আন্দোলনে কিছুটা ভূমিকা রাখার চেষ্টা করবে।

কিন্তু স্পষ্টতঃই এই ধরনের কাজকে ব্যাপকতর ও সার্থক করে তোলার কাজ দু'একজন ব্যক্তি বা দু' একটি বই ও পত্র-পত্রিকার পক্ষে সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে এটিও বলা দরকার যে, আলোচনা প্রসঙ্গে বইটিতে দু'চারটি বিশেষ ধর্মমতের নাম করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে এই কয়েকটি ধর্মমতই সবচেয়ে ভ্রান্ত বা এগুলির ওপর ব্যক্তিগত বিদ্বেষ রয়েছে। ঈশ্বর-বিশ্বাস ও সাধারণ ধর্মবিশ্বাসের ঐতিহাসিক বিকাশ, বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা ও তাদের নানা ভ্রান্তিগুলি সম্পর্কে আলোচনার সুবিধার জন্যই এদের নাম করতে হয়েছে। একইভাবে তথাকথিত অবতারদের কয়েকজনের নাম করা হয়েছে—এরও অর্থ এই নয় যে, এদের প্রতিই রাগ বেশী বা এরাই বুজরুক-চূড়ামণি। বরং এরা সরল বিশ্বাসী মানুষকে কিভাবে প্রতারিত করে তা আলোচনার জন্যই প্রতীকী হিসেবে দু'চারজনের নাম করতে হয়েছে। যাঁরা উল্লেখিত ধর্মমতে বিশ্বাসী বা অবতারদের ভক্ত সেই বিপুল সংখ্যক মানুষকে বিনীতভাবে এটি পরিষ্কার করে বলা দরকার যে, তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে আঘাত করার কোন ইচ্ছা নেই—বরং সাধারণ অবৈজ্ঞানিক মানসিকতা, ভ্রান্ত ধারণা ও অসহায় ভ্রান্ত বিশ্বাসের ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া যে কয়েকটি ঘটনার ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেগুলিও এ ধরনের ঘটনাবলীর অতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ধুবর শ্রী শংকর মণ্ডল বাংলা ভাষায় এ ধরনের একটি বই বের করার দায়িত্ব নিয়ে নিঃসন্দেহে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁকে ধন্যবাদ।

বইটি চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে একই চিন্তার স্বপক্ষে কাজ করা 'উৎস মানুষ' পত্রিকা (বি. ডি. ৪৯৪, সল্ট লেক ; কলি-৬৪)-এর সম্পাদক ডঃ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমার স্ত্রী ডাঃ আরতি সাহু (চট্টোপাধ্যায়) যে সহযোগিতা করেছেন, তার জন্য এঁদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে আমি ঋণী। এছাড়া আরো অনেকের সাহায্য বইটিতে জড়িয়ে রয়েছে।

যে উদ্দেশ্যে বইটি তৈরী করা, তা এ কিছুটা পালন করতে পারলে এবং আরো অনেককে এই মানসিকতায় উৎসাহিত করতে পারলে বইটির সার্থকতা। আরো বহুজনের যৌথ উদ্যোগ ছাড়া এ ধরনের কাজের সার্থকতা নেই।

জুন, ১৯৮২ — ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাহু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখবন্ধ

('Begone Godmen!' বইতে ডঃ কোভুরের লেখা।)

সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা সৎ ও একনিষ্ঠ কাজের দ্বারাই তাঁদের জীবিকা নির্বাহ করেন। যাঁরা পরিশ্রম করে অর্থোপার্জন করেন তাঁদের ঠকিয়েই অসৎ লোকেরা নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে। সৎ ব্যক্তিদের মধ্যে যারা একটু সরল বা বোকা ধরনের তাঁদের প্রতারণা করে যে সকল অসৎ পরগাছাগুলো বেঁচে থাকে তারা নানা ধরনের হয়। এদের মধ্যে রয়েছে সেইসব গুরু, ধর্মপ্রচারক ও যাজক যারা রহস্যময় ধর্ম-তন্ত্রের কথা বলে; সেই সব অতীন্দ্রিয়বাদী সাধু মোহন্ত, যারা দাবি করে যে, ধ্যান বা কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে তারা মহাজ্ঞান অর্জন করেছে; সেই সব গুরু, বাবা, আনন্দ, ঋষি, স্বামীজি বা যোগীর দল যারা বলে যোগবলে বা ঈশ্বরের আশীর্বাদে তারা অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করেছে; সেইসব মহাজ্ঞানী, ওঝা, গুণিন, গণৎকার, ভবিষ্যদ্‌বক্তা ও সব ধরনের গূঢ় তাত্ত্বিকেরা যারা বলে যে আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপ, জ্যোতিষবিদ্যা, হস্তরেখাবিদ্যা, সংখ্যাবিদ্যা, টেলিপ্যাথি, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি, মানসিকশক্তি, অন্তর্দৃষ্টি, যাদুবিদ্যা, আত্মার ভর হওয়া ইত্যাদির সাহায্যে তারা বিশেষ ক্ষমতা অর্জন করেছে।

সম্প্রতি ভারতবর্ষে এক নতুন ধরনের বুজরুক গজিয়ে উঠেছে। হিন্দুদের অসংখ্য দেবতার এক একজনের অবতার বলে এরা নিজেদের দাবি করে। এ দেশের বুদ্ধিমান জোচ্চোররা স্বল্প আয়াসে প্রচুর অর্থ-উপার্জন করার এই এক নতুন উপায় খুঁজে পেয়েছে। হাত-সাফাই-এর কায়দা জানা এক একজন চালাক লোককে এরা করায়ত্ত করে এবং তাকে অবতার ছাপ দিয়ে দেয়। বিভিন্ন বই বা সংবাদপত্রে, এইসব অবতারগুলোর অলৌকিক রূপান্তর ও ঐশ্বরিক ক্ষমতার গাঁজাখুরি অনেক গল্প প্রকাশ করা হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধরনের ঐশ্বরিক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করার পর, তার দালালরা তাকে ধূপ-ধুনো-ফুল দেয় এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে থাকে। অধিকাংশ সরল ও হুজুগে মানুষই অন্যে যা করে তার অনুকরণ করে। তাই হাজার হাজার সরল বিশ্বাসী মানুষও ওই 'অলৌকিক' কাজকর্ম করা জোচ্চোরটিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে শুরু করে। তারপর লাখলাখ টাকার প্রণামীর স্রোত পড়ে যায়। আর ঐ হাত সাফাই জানা জোচ্চোরটা ও তার দালালগুলো এই টাকা ভাগ করে নেয়। এটি খুব দুঃখের ব্যাপার যে, যারা শঠতার সঙ্গে এইভাবে অবতার তৈরী করে তাদের মধ্যে দেশের কিছু উচ্চশিক্ষিত বিজ্ঞানীও থাকেন।

এইসব প্রতারকরা চোর, ডাকাত, পকেটমার, জালিয়াত, স্মাগলার ও কালোবাজারীদের মতই অপরাধী। তবু সরকার তাদের শাস্তি দিতে অনিচ্ছুক, কারণ তাদের কাজগুলো অধিকাংশ ধর্মের সমর্থন পায়। যে দেশের অধিকাংশ মানুষই বিভিন্ন ধর্মে অন্ধবিশ্বাস করে সেই দেশে এইসব প্রতারকরা তাদের জালিয়াতির ব্যবসা চালিয়েও অনায়াসে শাস্তি এড়িয়ে চলে। যদি এদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হয় তবে প্রথমেই অভিযুক্ত করতে হবে পোপ-কে, যিনি হোলি স্যাক্রামেন্ট (Holy Sacrament) নামক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাঁর সরল শিষ্যদের যে মদ পরিবেশন করা হয় তা যীশুখৃষ্টের রক্ত বলে বোঝান এবং এইভাবে তাদের প্রতারণা করেন। এই স্যাক্রামেন্ট-এর রাসায়নিক পরীক্ষা করলেই অনায়াসে বুজরুকিটা ধরা পড়ে যাবে।

এইসব দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~ অসচেতন

মানুষকে বোঝানোর জন্য আমি আমার যা কিছু রয়েছে সবকিছুকে বাজী রেখে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছি, যাতে কোন ধরনের বুজরুকির সুযোগ থাকবে না এরকম একটা পরিবেশে জালিয়াতরা তাদের ক্ষমতার পরীক্ষা দিতে পারে।

আমি এটিও জানি যে, অনেক টাকার বাজী রেখে চ্যালেঞ্জগুলো দেওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে যে, আমি বিরাট বড়লোক ও সস্তা প্রচারের মোহে প্রচুর অর্থব্যয় করছি। আমি এটিও জানি যে, এই সব চ্যালেঞ্জের ফল আমার পক্ষে ক্ষতিকরও হতে পারে। পৃথিবীতে যদি একজন লোকেরও অতিপ্রাকৃতিক, অলৌকিক ক্ষমতা প্রমাণিত হয় তবে আমাকে অনাথ আশ্রমে বাকী জীবন কাটাতে হবে। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলাম ও থাকব— কারণ আমি জানি যে, এই সব চ্যালেঞ্জের ফলে একটি কানাকড়িও আমি হারাব না। তার কারণ, যদিও ধর্মগ্রন্থগুলিতে ও আলোড়ন সৃষ্টির জন্য লালায়িত সংবাদপত্রগুলিতে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিদের সম্পর্কে অসংখ্য গালগল্প আমরা পড়েছি, তা সত্ত্বেও আসলে কিন্তু কোন ধরনের অলৌকিক ক্ষমতা কারোরই কখনো ছিল না বা এখনো নেই। এই কারণেই আমার মৃত্যু পর্যন্ত বা প্রথম বিজয়ী খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আমি আমার চ্যালেঞ্জ নিশ্চিন্ত মনে বলবৎ রাখছি।

অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী বলে যারা নিজেদের দাবি করে সেইসব বুজরুকদের কেউই আমার চ্যালেঞ্জে সাড়া দিতে সাহস পাবে না, কারণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় নিজেদের চালাকি ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় ওদের রয়েছে। বোকার মত মাত্র একজন ব্যক্তিই আমার চ্যালেঞ্জে সাড়া দেওয়ার আগ্রহে ১০০০ টাকা জমা দিয়েছিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার তিনি কিন্তু ঐ জাতীয় বুজরুক ছিলেন না, ছিলেন অতি ধার্মিক একজন ব্যক্তি যিনি অতিপ্রাকৃতিক ও অলৌকিক ঘটনাবলী অন্ধভাবে বিশ্বাস করতেন।

ব্যাঙ্গালোরের ডাক্তার জি.ভেংকটরাও এমনই এক সরল বিশ্বাসী লোক যে, তিনি বিশ্বাস করতেন, তাঁর গুরু অন্ধ্রপ্রদেশের মন্ত্রালয়ের রাঘবেন্দ্র স্বামীজির ঐশ্বরিক ক্ষমতা রয়েছে। তিনি ১০০০ টাকা জামানত হিসাবে জমা দেন ও অবশেষে তা হারান।

ডাঃ রাও বোকার মত বিশ্বাস করতেন যে, প্রতিদিন ১০০ বার 'ওম রাঘবেন্দ্র শরণম' মন্ত্র জপ করলে যে কেউ ঐশ্বরিক ক্ষমতা লাভ করবে। অতি সরল মনে এই গাঁজাখুরি গল্পও বিশ্বাস করতেন যে, মহীশূর জেলার এক গ্রামে ৬ বছরের এক ছেলের চোখ থেকে স্রোতের মত পবিত্র ছাই, মধু ও ফুল বেরিয়ে আসত। আমার অনুরোধে এই অলৌকিক শিশুটিকে যথাসম্ভব তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং তারপর তাঁর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছিল। পরে তাঁর জমা দেওয়া টাকা তিনি ফেরত চেয়েছিলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি এতে রাজী হতে পারিনি কারণ সেটি হত আমার চ্যালেঞ্জের শর্তবিরোধী।

শ্রী ভি.এ. মেনন সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য এ বইটি প্রকাশ করেছেন দেখে আমি খুবই আমি খুশী।*. আমার আন্তরিক আশা, তাঁর প্রচেষ্টায় এই বুজরুকদের আগাছা নির্মূল হবে এবং অতিপ্রাকৃতিক ও অলৌকিক ঘটনাবলীতে সরল লোকেদের বোকার মত বিশ্বাসগুলো দূর হবে।

ডঃ আব্রাহাম টি কোভুর

(* শ্রী ভি.এ. মেনন ডঃ কোভুর-এর দুটি বই-এর সম্পাদনা করেছেন।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম পরিচ্ছেদ
কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী এক জীবন— ডঃ কোভুর

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ এপ্রিল কেরালার তিরুভাল্লায় আব্রাহাম থোম্মা কোভুরের জন্ম হয়। তাঁর বাবা রেভারেণ্ড কোভুর এইপে থোম্মা কাত্থানার ছিলেন মালাবরের মার থোম্মা সিরিয়ান চার্চের প্রথম ভিকার জেনারেল। গোঁড়া খ্রীস্টান পরিবার।

নিজের জন্ম সম্পর্কে কুসংস্কারমুক্ত পরিণত বয়সে ডঃ কোভুর মন্তব্য করেছেন, "অন্য সকলের মত আমিও আমার মা-বাবার ক্ষণিকের জৈব ক্রিয়াকলাপের আকস্মিক ফসল ('accidental byeproduct') হিসেবে জন্মগ্রহণ করি। এর ওপর আমার নিজের কোন মতামত বা নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আমার মা-বাবা কে হবেন তার ওপর যেমন আমার কোন মতামত ছিল না, তেমনি আমার মাতৃভাষা, জাতি, ধর্ম এবং জন্মের সময় ও স্থানের ওপরও আমার কোন মতামত ছিল না।"

নিজের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "তরুণ বয়সে আমি ছিলাম খৃষ্টান, কারণ খৃষ্টান মা-বাবার দ্বারা একটি খৃষ্টান পরিবারে আমি বড় হয়েছি। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই তাঁদের মা-বাবার ধর্মকে নিজের ধর্ম বলে গ্রহণ করেন, কারণ মা-বাবা ছোটবেলা থেকেই ছেলে-মেয়েদের ঐ ধর্মে শিক্ষিত করতে থাকেন। কিন্তু বড় হয়ে আমি যখন স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে ও কাজ করতে শিখলাম, তখন আমি খৃষ্টানধর্ম পরিত্যাগ করে একজন যুক্তিবাদী হয়ে উঠলাম— বাইবেলকে একজন সর্বদর্শী ঈশ্বরের বাণী বলে আমি আর গ্রহণ করতে পারিনি।"

ডঃ কোভুরের বাবা প্রথমে তাঁর বাড়ীতে সিরিয়ান খৃষ্টান সেমিনারি স্কুলটি স্থাপন করেন। পরে তিনি একটি জমি চার্চকে দান করেন। এই জমিতে স্কুলটি উঠে যায়। ডঃ কোভুরের বাল্যশিক্ষা এই স্কুলেই।

স্কুল জীবনে তাঁর অন্যতম সহপাঠী ছিলেন তাঁর এক খুড়তুতো ভাই পাপ্পাচেন। পাপ্পাচেন সবসময় কোভুরের পাশেই বসতেন আর কোভুরের কাছ থেকে শিক্ষকদের প্রশ্নের উত্তর জেনে নিয়ে বলতেন। একবার যীশুখৃষ্টের ওপর ধর্মের ক্লাস হচ্ছিল। যাচিয়াস নামে একজন যীশুর দর্শন পাওয়ার জন্য তাঁর পথের পাশে একটি ডুমুর গাছে উঠে বসেছে। যেতে যেতে যীশু ডুমুর গাছটির কাছে এসে তাকে নেমে আসতে বল্লেন এবং তার গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার জন্য আশীর্বাদ করলেন। এতদূর পড়িয়ে মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন, যীশুখৃষ্ট কিভাবে জানতে পারলেন যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাচিয়াস গাছের উপর বসে আছে ? যথারীতি পাপ্পাচেন কোভুরের কাছ থেকে উত্তরটি জানতে চাইলেন। কোভুর তাঁকে বলে দিলেন, যীশু যখন গাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিলেন যাচিয়াস তখন একটি ডুমুর পেড়ে তাঁর মাথায় ছুঁড়ে মারে, এর ফলে যীশু বুঝতে পারেন যে, গাছে কেউ বসে আছে। কোভুরের বদমায়সিটা পাপ্পাচেন ধরতে পারেন নি। আর কেউ যখন উত্তর দিতে পারল না, তখন পাপ্পাচেন সরল বিশ্বাসে কোভুরের বলে দেওয়া উত্তরটি বলে দিলেন। উত্তর শুনে ধর্মপ্রাণ শিক্ষকমশাই তো রেগে আগুন ; পাপ্পাচেনকে মারতে শুরু করলেন। কাঁদতে কাঁদতে পাপ্পাচেন জানাল উত্তরটি আসলে কোভুরের বলে দেওয়া। ফলতঃ কোভুরেরও শাস্তি হল। এখানে প্রত্যাশিত উত্তরটি ছিল, যীশু তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায়, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে, যাচিয়াসকে দেখতে পেয়েছিলেন।*

ছোটবেলা থেকেই আব্রাহাম কোভুর ছিলেন এরকমই। ধর্ম বা ধর্মীয় কুসংস্কারের গোঁড়ামি তাঁর মধ্যে গেড়ে বসেনি— বরং এসবের অসারতা নিয়ে ঠাট্টাই করতেন এবং এ ধরনের কুসংস্কারের হাস্যকর দিকগুলিকে তীক্ষ্মভাবে তুলে ধরতেন। আরেকবারও তাঁকে এর জন্যে বেশ শাস্তি পেতে হয়েছে। কোভুরের স্কুল, সিরিয়ান খ্রীষ্টান সেমিনারি ছিল পাহাড়ের ওপর। পরে এখানে মার থোম্মা সিরিয়ান চার্চের প্রধান কার্যালয়টি স্থানান্তরিত হয়। ঐ সময় এই চার্চের প্রধান যাজক, মেথরাচেন ঐখানে থাকতেন। স্কুলের ছাত্রাবাসগুলি ছিল পাশাপাশি— দূরের ছাত্ররা ঐ গুলোতে থেকে পড়াশুনা করত। ছাত্রাবাসগুলির সারা বছরের খরচের জন্য একসঙ্গে বেশ কিছু ধান কিনে ফেলা হত। একদিন ছাত্রাবাসগুলির সামনের মাঠে ঐ বিপুল পরিমাণ ধান শুকনো হচ্ছে, কোভুর আর তাঁর বন্ধুরা ছাদে দাঁড়িয়ে দেখছেন। নবাগত এক ছাত্র জানতে চাইল, এত ধান কি হবে! কোভুর জানালেন, পরের মাসে যাজক মেথরাচেনের বিয়ে, তখন বিরাট ভোজ হবে, এত ধান ঐ সময় কাজে লাগবে। কোভুরেরই মত আরেক পুরনো ছাত্র এর সাথে যোগ করল যে, এর জন্য তিন দিন ধরে ভোজ হবে, সাত দিন স্কুল ছুটি থাকবে। সদ্য বাড়ী থেকে আসা নতুন

---

* ৮০-৯০ বছর আগে কেরালায় শুধু নয়, এখনো আমাদের স্কুলগুলিতে ছাত্রদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দেওয়ার চেয়ে ধর্ম, বিভিন্ন কুসংস্কার তথা অবৈজ্ঞানিক চিন্তাই ঢোকান হয় বেশী করে। প্রতিটি স্কুলেই বিভিন্ন প্রার্থনা-সঙ্গীত, ধর্মগুরুদের ওপর আলোচনা সভা, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদির মাধ্যমে সুচারুভাবে একাজ করা হয়ে থাকে। কিভাবে ছাত্রদের বৈজ্ঞানিক চিন্তা থেকে বিরত করা হয় তা একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া গেছে। সুবর্ণরেখা নদীর ধারে সোনার গুঁড়ো কিভাবে পাওয়া যায়, কোত্থেকে এলো তা জানতে চাইলে স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক জানিয়েছিলেন—এ ঈশ্বরের লীলা, তাঁরই দান, মানুষ তা আহরণ করে মাত্র। এর প্রতিবাদ করায় জীবিত বাবার শ্রাদ্ধের নাম করে অনেক কড়া কথাই শোনান হয়। ঐ শিক্ষককে তাঁর প্রাপ্য শ্রদ্ধা জানিয়েও বলতে হয়, এ ধরনের অবৈজ্ঞানিক যুক্তি ও কঠোর আচরণ অনুসন্ধিৎসু কিশোর মনে কি ছাপ ফেলে তা বোধ হয় তাঁর জানা ছিল না। আর বিজ্ঞানে স্নাতক হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞানশিক্ষক যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও যুক্তিবোধে বঞ্চিত তা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিই প্রকাশ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাত্রটি তো মহা খুশী ; সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে চিঠি দিয়ে যাজকের বিয়ের খবর জানিয়ে লিখল যে, সামনের মাসে সে সাতদিনের জন্য বাড়ী যাবে। বাড়ীর লোকেরা তো হতভম্ভ। মেথরাচেনের বিয়ের খবরটা আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ল আর চারদিকে সাড়া ফেলে দিল কারণ ঐ যাজকের বিয়ে ছিল একেবারেই নিষিদ্ধ, অভাবনীয়। ফলস্বরূপ চারদিক থেকে শ্রদ্ধেয় যাজক মেথরাচনের বিয়ের সম্পর্কে সন্দেহাকুল প্রশ্নের স্রোত আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত স্কুল থেকে তদন্ত করা হয়, জান গেল কোভুরই এর মূলে। ফলতঃ বেতের আঘাতে কোভুরের দেহটি ক্ষতবিক্ষত হল। পরে ডঃ কোভুর মন্তব্য করেছেন, "আংলিকান চার্চে যাজকদের বিয়ে না করার নিয়মটা নেই। কিন্তু মার থোম্মা সিরিয়ান চার্চের যাজকদের যৌন গ্রন্থি ও অঙ্গগুলোকে কঠোর ভাবে নিজেদের স্বাভাবিক কাজকর্ম করা থেকে বিরত করে রাখা হত। ... তিরুভাল্লার ১৮ মাইল দূরে কোট্রায়ামের সি এম এস স্কুলে আমি যদি ঐ ঠাট্টাটা করতাম তবে আমাকে বেত খেতে হত না, কারণ কোট্রায়ামের আংলিকান যাজকরা যতবার খুশি বিয়ে করতে পারতেন।"*

জাতিভেদ ও অস্পৃশ্য প্রথা দক্ষিণ ভারতে প্রবল ছিল। নাম্বুদিরিরা ছিল উঁচু জাত। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় ওরা মুখে নানারকম আওয়াজ করে যেত যাতে অস্পৃশ্য, নীচু জাতের লোকেরা সরে দাঁড়ায়— তাদের ছায়া বা ছোঁয়া যেন গায়ে না লাগে। ছোটবেলায় একবার কোভুর তাঁদের চাকর কুনহিরামনকে নিয়ে দূরে যাচ্ছিলেন। কুনহিরামনরা ছিল নীচু জাত— এঝাভা। গন্তব্য স্থানে যেতে গেলে

---

* এই সব ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা সাধারণভাবে এটি বুঝতে পারেন না বা বুঝতে চান না যে, নারীপুরুষের যৌথ উদ্যোগে ও সঠিক সহযোগিতাতেই মানবসমাজ বিকশিত হতে পারে। অবক্ষয়ী ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা যেমন নারীকে শুধু ভোগ্য পণ্য হিসাবে গণ্য করে ও প্রকৃতপক্ষে তাঁদের গণিকায় পর্যবসিত করে অন্যদিকে তেমনি ঈশ্বরকে পাওয়ার ও ধর্মের নাম করে এই সব যাজক বা ধার্মিকদের সামন্ততান্ত্রিক চিন্তা নারীকে নরকের দ্বার, অচ্ছ্যুৎ, পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ইত্যাদি বলে নারী জাতিকেই অপমান করে। কখনো বলে কামিনীকাঞ্চন থেকে দুরে থাকতে, কখনো বা নারীকে মাতৃজ্ঞান করতে। সব পুরুষ যদি তাই করে স্পষ্টতঃই পৃথিবীতে অচিরে মানুষ নামক প্রাণী লুপ্ত হবে— বেঁচে থাকবে অন্যান্য প্রাণী, কারণ, এরা এইসব ধর্মগুরুর উপদেশ শুনবে না। অথবা মাতৃদেবীদের সঙ্গে পুরুষদের যৌন সঙ্গম করার বর্বর প্রথার ভিত্তিতে মানবসমাজকে টিকিয়ে রাখতে হবে। সামাজিক বৈষম্যময় সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক মানুষকে কাঞ্চন থেকে দুরে থাকতে বলার অর্থ গরীব মানুষদের নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে উন্নত করার উদ্যোগকে নষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে এদের শোষণ করে মুষ্টিমেয় ধনীর (এদের মধ্যে ধর্মগুরুর ভক্তও আছে) কাঞ্চন উপার্জনের পথ সুগম করা। তেমনি সাধারণভাবে নারীদের থেকে দূরে থাকতে বলার অর্থ মানুষের স্বাভাবিক যৌন ক্রিয়াকে অবদমিত করে অসুস্থ ও বিকৃত পুরুষ শাসিত সমাজ সৃষ্টি করা। অনেক সময় সংশ্লিষ্ট ধর্মগুরুর যৌন-বিকৃতি, অক্ষমতা বা নপুংসকতার লক্ষণও এটি। এই ধরনের ধর্মগুরুদের অধিকাংশের মধ্যেই নানা ধরনের যৌন বিকৃতি থাকে। প্রকৃতির সম্পদ বন্টনে বৈষম্যহীন মানবসমাজ গড়ে তোলাই হওয়া উচিত মানবজাতির লক্ষ্য। এই সমাজে নারী-পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে, নারী পুরুষের যৌনসম্পর্ক থাকবে স্বাভাবিক ও সুশৃঙ্খল। এর জন্য কাউকে বিয়ে না করার বা অর্থকে পরিত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেরি নৌকা করে একটি নদী পেরুতে হত। কোভূরেরা নদীর ধারে গিয়ে দেখলেন একজন বয়স্ক নাম্বুদিরি ব্রাহ্মণও ওপারে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। নৌকা ছিল একটাই আর ওটিতে চড়ার পর যাত্রীকেই পাড়ে লগি ঠেলে যাত্রা শুরু করতে হত। নাম্বুদিরি বামুনটি কায়দাটা জানত না। তাই ও কোভূরকে অনুরোধ করল শুধু ওকেই নিয়ে ওপারে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসতে আর তারপর কুনহিরামনকে নিয়ে যেতে— তা না হলে একই নৌকায় কুনহিরামনের সঙ্গে তাকে চাপতে হবে। যাই হোক, প্রথমে বামুনটি চাপল, তারপর রাগ চেপে কোভূর উঠলেন এবং কুনহিরামনকে বল্লেন নৌকায় উঠে আসতে। ও একটু ইতস্তত করছিল, কোভূর ওকে টেনে তুল্লেন নৌকোয়। কিন্তু কুনহিরামন নৌকাটি ছুঁয়ে ফেলার পূর্ব-মুহূর্তে বামুনটি চীৎকার করে জলে ঝাঁপ দিল। আর পাড়ের কাছেই নদীটি বেশ গভীর থাকায় ডুবে মরার অবস্থা হল। কোভূরের নির্দেশে দক্ষ সাঁতারু কুনহিরামন নেমে বামুনটিকে উদ্ধার করল। এবার কোভূর কুনহিরামন ও বামুনটিকে নিয়ে একই নৌকায় ওপারে গেলেন। তামাশা দেখতে জড়ো হওয়া লোকেদের শুনিয়ে কোভূর বামুনটিকে বল্লেন, "ছোঁয়া বাঁচাতে আরেকবার স্নান করবেন না তো?"

ডঃ কোভূরের বাবা দু'বার বিয়ে করেছিলেন। প্রথম পক্ষের তিন মেয়ে ছিল। ছোটবেলায় একবার কোভূর এঁদের একজনের শ্বশুরবাড়ীতে এক সপ্তাহ ছিলেন। দিদির সঙ্গে বয়সের পার্থক্য এত বেশী ছিল যে, তিনি তাঁকে মায়ের মতই দেখতেন। ওখানে একদিন রাত্রে কোভূরের প্রচণ্ড কাশি হল। দিদি তাঁকে বিখ্যাত এক কবিরাজের দেওয়া ওষুধ মধু-র সঙ্গে খেতে দিয়ে বল্লেন, খাওয়ার সময় যীশুখৃষ্টের নাম নিতে। কোভূর বল্লেন, ওষুধটি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যীশুর নাম নিলে কোন্‌টির জন্য কাজ হচ্ছে তা তো বোঝা যাবে না, তার চেয়ে বরং আগে ওষুধ খাওয়া যাক, ওতে কাজ না হলে যীশুর নাম নেওয়া যাবে। যীশুকে নিয়ে ঠাট্টাটি বুঝতে দিদির দেরি হয় নি। সখেদে তিনি বল্লেন, 'আফশোষের কথা যে আমাদের এমন ধর্মপ্রাণ বাবা তোমার মত নাস্তিক ছেলে পেয়েছেন'।

স্কুলের পড়াশুনা শেষ করে আব্রাহাম কোভূর ছোট ভাই বেহনান কোভূরের কাছে কলকাতায় আসেন উচ্চশিক্ষার জন্য। (বেহনান কোভূর পরে জাতিসংঘ ও আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।) কলকাতায় বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হয়ে তিনি উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেন।

কলকাতায় পড়াকালীন তিনি নিয়মিত ব্যায়াম করতেন এবং এক পাঞ্জাবী বন্ধুর অনুকরণে পাঞ্জাবী পোশাক পরা শুরু করেন, দাড়ি রাখতেন। একদিন রাত দশটা নাগাদ এক জায়গা থেকে ফিরছিলেন। হস্টেলের গেট বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে প্রায় ছুটতে হচ্ছিল তাঁকে। হঠাৎ অসাবধানে এক সাহেবের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। কোভূর ক্ষমা চেয়ে চলে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সাহেবরা তখন পরাধীন ভারতের শাসক হিসেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেদের বিরাট কিছু ভাবত। যে কোন ভারতীয়ই তাদের কাছে ছিলো অনুগত প্রজা ছাড়া আর কিছুই না। এই সাহেবটিও এর ব্যতিক্রম ছিল না। কোভুরের পেছনে পেছনে এসে তাঁর দাড়ি চেপে ধরল সাহেবটি। ব্যায়াম করা চেহারার কোভুরও সাহেব দেখে ঘাবড়ে যাওয়ার পাত্র নন। তিনি উল্টে সাহেবকে চেপে ধরে মুখে সজোরে ঘুষি চালালেন। সাহেবটি কুপোকাৎ হয়ে রাস্তার ধারে ফেরিওয়ালার কাঁচের বাসনপত্রের ওপর ধপাস করে পড়ল। বাসনপত্র ভাঙ্গল, সাহেবের নাকও ভাঙ্গল— রক্তপাত হতে লাগল। চারপাশের ফেরিওয়ালারা হাঁ হাঁ করে ছুটে এল সাহেবটিকে একহাত নেওয়ার জন্য। স্যাহেবটি তখন কোভুরকেই কাকুতি-মিনতি করল বাঁচানোর জন্য। কোভুর তাকে বাধ্য করলেন ফেরিওয়ালার ভাঙ্গা বাসনপত্রের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে। আর বল্লেন, "তুমি যদি ভদ্রলোকের মত সৌজন্যের দাম দিতে পারতে তবে আমি ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার পরও আমার ওপর চড়াও হতে না— আর এতসব কিছু ঘটত না। কিন্তু তোমার মধ্যে রাজকীয় দম্ভ থাকার ফলে আমি যে তোমারই মত একজন মানুষ তা তুমি ভুলে গিয়েছিলে।"

কলকাতায় থাকাকালীন কোভুর মাঝে মাঝে গঙ্গাস্নান করতেন এবং কেরালার বাড়ীর আশেপাশে হিন্দুদের ফরমায়েশ অনুযায়ী পবিত্র গঙ্গাজল নিয়ে যেতেন বাড়ী যাওয়ার সময়। গঙ্গাজলমাহাত্ম্য সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং নোংরা গঙ্গাজলের পবিত্রতা সম্পর্কে কুসংস্কারের স্বরূপ উদঘাটন করে তাঁর কাজকর্মের বিস্তারিত বিবরণ অন্যত্র দেওয়া হয়েছে।

কর্মজীবনে ডঃ কোভুর প্রথমে কেরালার কোট্টায়ামে সি.এম.এস. কলেজে উদ্ভিদবিদ্যার সহকারী অধ্যাপক হিসেবে দু'বছর কাজ করেন। এই সময় একবার উটি-তে তিনি গিয়েছিলেন পাহাড়ী গাছপালার নমুনা সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে। ওখানে একই উদ্দেশ্যে আসা রেভারেণ্ড ক্যাশের সঙ্গে তাঁর আলাপ হল। রেভারেণ্ড পি.টি. ক্যাশ ছিলেন শ্রীলঙ্কায় মেথডিষ্ট মিশান পরিচালিত জাফনা সেণ্ট্রাল কলেজের অধ্যক্ষ। ইনি ডঃ কোভুরকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর কলেজে যোগদান করতে। এই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ডঃ কোভুর ১৯২৮ সালে শ্রীলঙ্কায় চলে এসে জাফ্না সেণ্ট্রাল কলেজে যোগ দিলেন।

প্রথম বছর তরুণ অধ্যাপক ডঃ কোভুরকে উদ্ভিদবিদ্যাছাড়া ধর্ম বিষয়েও পড়াতে বলা হয়েছিল। ফাইন্যাল পরীক্ষার ফল বেরুলে দেখা গেল তাঁর সব ছাত্রই এই বিষয়ে ভাল ফল করেছে। কিন্তু পরের বছর তাঁকে বিষয়টি পড়াতে দেওয়া হল না। বিস্মিত ডঃ কোভুর কারণ জানতে চাইলে রেভারেণ্ড ক্যাশ হেসে বল্লেন, "এটি ঠিকই যে, আপনি ধর্মবিষয়ে অভূতপূর্ব ফল দেখিয়েছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আপনার সব ছাত্রই বাইবেলে বিশ্বাস হারিয়েছে।"

একদিন বড়দিনের ছুটির পর কলেজ খোলার ঠিক আগে কলেজের সমস্ত অধ্যাপক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মচারীদের নিয়ে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ঐ বছর বেশ খরা চলছিল, রেভারেণ্ড ক্যাশ তাঁর বক্তৃতায় বৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাও জানালেন। পরে একসঙ্গে খাওয়ার সময় ডঃ কোভুর রেভারেণ্ড ক্যাশের পাশে বসে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়ার পেছনে কি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তা জানতে চাইলেন। রেভারেণ্ড ক্যাশ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে ডঃ কোভুরকে বুঝিয়ে দিলেন। এরপর ডঃ কোভুর জানতে চাইলেন, রেভারেণ্ড ক্যাশ বৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের কাছে যে প্রার্থনা করলেন সেটি কলম্বো অবজারভেটরি আবহাওয়ার পূর্বাভাস ঘোষণা করার সময় গণ্য করবে কিনা! ক্যাশ হেসে উত্তর দিলেন, "আব্রাহাম, আপনি আমায় বেশ ফাঁদে ফেলেছেন। আসুন আমরা ওসব কথা ভুলে আরাম করে খাই।"

সর্বদাই ডঃ কোভুরের চিন্তা ভাবনা ছিল বৈজ্ঞানিক, যুক্তিবাদী। সঠিক তথ্য ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছাড়া কোন কিছুই তিনি গ্রহণ করতেন না। বিয়ের সময়ও তিনি এদিকে নজর রেখেছিলেন। ধর্মীয় গোঁড়ামি নেই এ ধরনের মহিলার খোঁজ পাওয়া তখন বেশ দুষ্কর ছিল। অবশ্য আব্রাহাম কোভুর শেষ অব্দি তাঁর উপযুক্ত সঙ্গিনী খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ট্রাভাংকোরের জাস্টিস কে. এস. ইট্টি-র জ্যেষ্ঠ্যা কন্যা শ্রীমতী আক্কা ইট্টি। বিয়ের আগেই ডঃ কোভুর তাঁকে শর্ত দিয়েছিলেন যে, তাঁদের ছেলেমেয়েদের মনের মধ্যে কোন ধরনের ধর্মবিশ্বাস বা অন্যান্য ক্ষতিকর কুসংস্কার ঢোকান চলবে না। ডঃ কোভুরের উপযুক্ত জীবন-সঙ্গিনী এতে রাজী হয়েছিলেন। বিয়ের সময়কার নানা কু-সংস্কারাচ্ছন্ন আচারও তাঁরা লংঘন করেছিলেন। যেমন, বিয়ের মুহূর্তে যে পা বাড়াতে হয় তার বদলে ইচ্ছা করেই অন্য পা বাড়িয়েছিলেন ডঃ কোভুর। তা দেখে কোভুরের মা তো অমঙ্গল আশংকায় কেঁদে আকুল। অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই, কোভুরদের দাম্পত্য জীবনে এর ফলে কোন অমঙ্গল ঘটে নি।

১৯২৭ সালে এঁদের এক ছেলে হয়। ওঁর নাম রাখা হয় অ্যারিস কোভুর। এঁকে ছোটবেলা থেকেই সব ধরনের কুসংস্কার, ধর্মবিশ্বাস ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত রেখে মানুষ করার চেষ্টা তাঁরা করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও একদিন শ্রীমতী আক্কা কোভুর ডঃ কোভুরকে হতবাক করে দিয়ে জানালেন যে, অ্যারিস চার্চে যেতে শুরু করেছে। পরে অনুসন্ধানে জানা গেল,—ডঃ কোভুর মন্তব্য করেছেন, ধর্ম নয়—ভেস্বাদি গার্লস কলেজের মেয়েদের আকর্ষণেই ও চার্চে যাচ্ছিল।

ডঃ অ্যারিস কোভুর পরে প্যারিসে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। তিনিও তাঁর বাবার মতই একজন বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার যুক্তিবাদী মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর স্ত্রী অধ্যাপিকা জ্যাকেলিন কোভুরও এ ক্ষেত্রে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন; এবং এঁরাও তাঁদের তিন ছেলেকে ঐভাবে মানুষ করেন। ধর্মগুরু, জ্যোতিষী ও অন্যান্য যারা নানা অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে নিজেদের দাবি করে ডঃ আব্রাহাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোভুর একটি চ্যালেঞ্জ তাদের সামনে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। (এ সম্পর্কে পরের পরিচ্ছেদে বিস্তারিত বলা হয়েছে।) ডঃ আব্রাহাম কোভুরের মৃত্যুর পর ডঃ অ্যারিস কোভুর সেই চ্যালেঞ্জকে একইভাবে বলবৎ রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবে ভারতে ফরাসি দূতাবাসের মাধ্যমে ডঃ অ্যারিস কোভুর -কে চিঠি পাঠিয়েও তাঁর সঙ্গে পরবর্তীকালে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় নি।

১৯৫৩ সালে ডঃ কোভুরের সঙ্গে এক আমেরিকান দম্পতির আলাপ হয়। ওঁরা এক মাসের ভারত ভ্রমণ সেরে শ্রীলংকা এসেছিলেন। ভারতে নিজেদের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আমেরিকান ভদ্রমহিলা জানালেন, "দেশটি ভাল, কিন্তু ওখানকার লোকেরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নির্বোধ।" তারপর তিনি বিস্তারিতভাবে বল্লেন এলাহাবাদে প্রয়াগের কুম্ভমেলায় তাঁদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা। ভ্রান্ত বিশ্বাস অনুযায়ী 'পবিত্র' নদী গঙ্গা ও যমুনা এবং কাল্পনিক সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থলে, এই মেলায় প্রায় ৬০ লক্ষ লোক জড়ো হয়েছিল। বোকার মত এরা বিশ্বাস করে যে, এই সব নদী স্বর্গ থেকে আসছে। এখানে স্নান করে পাপস্খালন করার মূঢ় আশা নিয়ে ওরা এসেছিল। স্নানের 'পবিত্র' মুহূর্তটি শঙ্খধ্বনি আর কাঁসর ঘণ্টা দিয়ে সূচিত হল। আর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোক সঙ্গম স্থলের দিকে ছুটে গেল স্নানের উদ্দেশ্যে। সব শেষে দেখা গেল এই সব ভক্তদের পায়ের তলায় নিষ্পেষিত হয়ে বেশ কিছু লোক কাদার মধ্যে মরে পড়ে আছে। অবশ্য এর জন্য কেউ দুঃখিত নয়, কারণ ওদের বিশ্বাস ঐ পবিত্র মুহূর্তে মৃত্যুবরণ করার ফলে ওরা সবাই সরাসরি স্বর্গে যাবে। এই সব নির্বোধ ও সরলবিশ্বাসীদের মধ্যে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদও ছিলেন।* ভদ্রমহিলা বল্লেন, "আপনাদের দেশের লোকেদের এ ধরনের কুসংস্কার সম্পর্কে আপনি গভীরভাবে কিছু চিন্তা করেছেন ?" ডঃ কোভুর উত্তর দিলেন, "শুধু ভারতের নয়, আপনাদের মধ্যেকার কুসংস্কার সম্পর্কেও আমি গভীরভাবে ভেবেছি।" ভদ্রমহিলা বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলেন, "আমাদের লোকেদের মধ্যে কুসংস্কার রয়েছে নাকি ?"

---

* প্রকৃতপক্ষে ভারতের মত বহু দেশের সরকার আদৌ এধরনের ঘটনার জন্য প্রকৃত অর্থে দুঃখিত নন অথবা ধর্মীয় কুসংস্কারকে দূর করে এসব ঘটনার মূলোচ্ছেদ করার জন্য সত্যিকারের সচেষ্ট নন। বরং নির্বাচনে জেতার জন্য, ভোটের কাজে বা এই ধরনের সংকীর্ণ উদ্দেশ্যে নানা ধর্মীয় কুসংস্কারকেই কাজে লাগান হয় সুকৌশলে। এটি ঠিকই যে, শত শত বছরের লালিত ধর্মীয় সংস্কার আইন করে বা রাতারাতি ব্যাপক মানুষের মধ্য থেকে দূর করা সম্ভব নয় এবং অর্থনৈতিক-সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন না করে ও তাঁদের প্রস্তুত না করে তাঁদের উপর বৈজ্ঞানিক সত্যকে বাইরে থেকে চাপিয়ে দিলেই ব্যাপক মানুষ বৈজ্ঞানিক সত্য উপলব্ধি করতে পারবেন না। কিন্তু যাঁরা মানুষের মঙ্গল চান তাঁদের উচিত প্রকৃত সত্য সম্পর্কে মানুষকে ধীরে ধীরে সচেতন করার চেষ্টা করা। তাই জোর করে কুসংস্কার দূর না করার পাশাপাশি ধর্মীয় তথা সব ধরনের কুসংস্কারমুক্ত সঠিক বৈজ্ঞানিক সত্যকেও ব্যাপক মানুষের সামনে রাখা উচিত। দুঃখের কথা, এটি তো করাই হয় না, বরং নানাভাবে, সংকীর্ণ স্বার্থরক্ষার জন্য, কুম্ভমেলার মত এগুলিকে প্রশ্রয়ই দেওয়া হয়। যেমন হজ্ব করতে গিয়ে ১৯৯৪-এর মে মাসে ১০০০-এরও বেশি মানুষ মক্কায় ভীড়ে পদপিষ্ট হয়ে মারা গেলেন। প্রতি বছরই কম বেশি এমন মৃত্যু এখানে ঘটে চলেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"অবশ্যই", ডঃ কোভুর উত্তর দিলেন, "আমাদের ধর্মগ্রন্থ ও পুরোহিতরা বলে যে পবিত্র গঙ্গায় স্নান করলে পাপস্খালন করা যায়। লোকেরা অন্ধভাবে তা বিশ্বাস করে ও সেই অনুযায়ী কাজ করে। আপনাদের ধর্মগ্রন্থ ও যাজকেরা বলে যে, ব্যাপটিজম, বা হোলি কমিউনিয়নের মাধ্যমে ঐ একই কাজ করা যায়। আপনাদের ধর্মে কোন পবিত্র মুহূর্ত নেই বলে কুম্ভমেলার মত দুর্ঘটনা ঘটে না, কিন্তু মূলতঃ ব্যাপারটা একই।"

ডঃ আব্রাহাম কোভূর সারাজীবন ধরেই বিভিন্ন কুসংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তার স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্যে একনিষ্ঠভাবে গবেষণামূলক কাজ করে গেছেন কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে। আমেরিকার মিনেসোটা ইনস্টিটিউট অব ফিলসফি তাঁকে তাঁর এই গবেষণামূলক কাজের জন্য ডক্টরেট ডিগ্রীতে ভূষিত করে।

আমেরিকার 'আর্নস্ট হিকেল ইকলজি সেন্টার' একবার ভারত মহাসাগর ও তৎসংলগ্ন দেশগুলিতে অভিযান চালায়,—এর উদ্দেশ্য ছিল জীববিবর্তনের বিভিন্ন ধাপে যোগসূত্র হিসাবে খুঁজে না পাওয়া বিভিন্ন প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করা। এই বিখ্যাত ও গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক অভিযানটি হিকেল একস্‌পেডিশান নামে খ্যাত। সারা এশিয়া থেকে একমাত্র যে বিজ্ঞানীকে এই অভিযানে আমন্ত্রণ জানান হয়, তিনি ছিলেন ডঃ আব্রাহাম কোভূর। অবশ্য স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে শেষ অব্দি তিনি এই অভিযানে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি।

ডঃ কোভুরের উদ্যোগে শ্রীলংকার র‍্যাশন্যালিষ্ট অ্যাসোসিয়েশান (যুক্তিবাদীদের সংস্থা) প্রতিষ্ঠিত হয়। ডঃ কোভুর ছিলেন এর সভাপতি। এই সংস্থার পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার, বুজরুক ধর্মগুরু ইত্যাদিদের স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য নানা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও গবেষণা চালানো হয়।

ডঃ কোভুরের এইসব গবেষণালব্ধ তথ্যাদি নিয়ে 'পুনর্জনম' নামে একটি চলচ্চিত্র ও 'নাম্বিক্কাই' (বিশ্বাস) নামে জনপ্রিয় তামিল নাটক তৈরী হয়।

ডঃ কোভুরের স্ত্রী শ্রীমতী আক্কা কোভুর ছিলেন তাঁর যথার্থ সহধর্মিনী। তিনি শ্রীলঙ্কা র‍্যাশন্যালিস্ট অ্যাসোসিয়েশানের কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। শ্মশান বা কবরখানায় রাত্রে ভূতের অনুসন্ধানে তিনি যেমন ডঃ কোভুরের পাশে পাশে ছিলেন, তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে র‍্যাশন্যালিস্টদের বিভিন্ন সম্মেলনেও উপস্থিত থাকতেন এবং সর্বদা ডঃ কোভুরকে গবেষণায় সাহায্য করতেন। ১৯৭৪ সালে নভেম্বর মাসে ইনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। স্ত্রী-র শোকবার্তায় ডঃ কোভুর লিখলেন, "বোকা লোকেদের মাথা ঘামানোর জন্য কোন মন বা আত্মা না রেখেই শ্রীমতী আক্কা কোভুর মারা গেছেন। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর মৃতদেহটি আজ শুক্রবার সকাল ৮টায় বাসগৃহ—তিরুভিল্লা, পামানকাডা লেন, কলোম্বো-৬, থেকে কলম্বোর শ্রীলঙ্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিভাগে স্থানান্তরিত করা হবে। দাহ বা কবর নয়, প্রয়োজন নেই কোন ফুলের।" সমস্ত স্থানীয় সংবাদপত্রে শোকবার্তাটি প্রকাশিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। কিন্তু শ্রীলংকা বেতার তাদের শোকবার্তায় এটি ঘোষণা করতে রাজি হয়নি। সংসদে এ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। রোমান ক্যাথলিক বেতার মন্ত্রী জানালেন যে একজন রোমান ক্যাথলিক যাজক ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর আপত্তির কারণে ঐ শোকবার্তাটি প্রচার করা যায় নি। বৌদ্ধরা 'অনাত্মায়' বিশ্বাস করে, ক্যাথলিক যাজকরা বিশ্বাস করে পবিত্র হৃদয়ে। মজার ব্যপার হল দু'জনের সংস্কার দু'রকম হলেও এক্ষেত্রে তাঁরা কিন্তু একই পথের পথিক হলেন—কারণ কেউই কোন ধর্মীয় সংস্কারের উপর কোন ধরনের আঘাত সহ্য করতে রাজী নন।

কলম্বোর থার্স্টান কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান হিসেবে ১৯৫৯ সালে ডঃ কোভুর চাকুরিজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পরই তিনি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর এতদিনের কাজের উপর প্রকাশ্যে বক্তব্য রাখতে শুরু করেন। এ ব্যাপারে তাঁর যুক্তি ছিল—ভ্রান্ত অন্ধবিশ্বাস প্রচার করার জন্য প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের পরিচালিত কলেজে পড়িয়ে নিজের পেটের ভাত তাঁকে জোগাড় করতে হত, তাই এই সব কলেজে চাকুরি করাকালীন তিনি অন্ধবিশ্বাসের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য কাজ করলেও তা প্রকাশ্যে রাখতে পারেন নি।*

ডঃ কোভুর জীবনে পাঁচবার হার্ট এ্যাটাকে ভুগেছেন। প্রথম হয় ১৯৫৯ সালে। এ সময় তিনি কলম্বোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁর পাশের বেডে ছিলেন একজন রাজনৈতিক নেতা এবং একজন ধর্মীয় নেতা। হাসপাতালে বিভিন্ন ধর্মের পুরোহিত বা যাজকরা প্রায়ই বিনা বাধায় প্রবেশ করেন এবং রোগীদের রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা জানান, তাদের ধর্মকথা শোনান। ডঃ কোভুরের কাছেও এলেন একজন,—কলম্বোর বিশপ রেভারেণ্ড গ্রাহাম। ডঃ কোভুর এঁকে ঢুকতে দেখেই ডঃ কিনসের লেখা 'দি সেক্স বিহেভিয়ার অব আমেরিকান ইউথ্‌স্' বইটি পড়ার ভান করলেন। বিশপ বইটি দেখে ডঃ কোভুরকে বললেন "এটি একটি বিতর্কিত বই।" ডঃ কোভুর উত্তর দিলেন, "আপনার হাতে যে বাইবেলটি রয়েছে তার চেয়ে বিতর্কিত এটি নয়। এ বইটি ডঃ কিনসের গবেষণালব্ধ সত্য ঘটনা ও তথ্যের ওপর ভিত্তি করে লেখা। অন্যদিকে বাইবেলে বহু আজগুবি কথাবার্তা রয়েছে।" "হুঁ", আপনাকে বেশ সন্দেহবাতিক মনে হচ্ছে। আপনার কি হয়েছে ভাই।?" "আপনাদের ঐ ধর্মভাই- এর যা হয়েছে, আমারও তাই।" "আমি কি আপনার রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করতে পারি?" "না, না" ডঃ কোভুর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "আমি এখানে চিকিৎসার জন্য এসেছি। দক্ষ চিকিৎসকের চিকিৎসায় আমি

*প্রশ্ন উঠতে পারে প্রয়োজনে চাকরি ছেড়েও তিনি বৈজ্ঞানিক সত্যকে তুলে ধরার ব্রত পালন করতে পারতেন না কি? এক্ষেত্রে, ঐ সময়কার সামাজিক পরিবেশ, গবেষণা চালানর জন্য অর্থের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি দিকগুলি মাথায় রাখতে হবে। এছাড়া বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায়, নীতিগতভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয়বিশ্বাস ইত্যাদির বিরোধিতা করলেও কৌশলগতভাবে বাস্তবতঃ অনেক সময় এসবের সঙ্গে বোঝাপাড়া করার প্রয়োজন হতে পারে। অবশ্যই এই বোঝাপড়া নীতিগত বিরোধিতার পাশাপাশি ও নিছকই সাময়িকভাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আস্তে আস্তে ভালও হয়ে উঠেছি। আপনি নিজেও জানেন যে, আপনার প্রার্থনায় আমার রোগের আরোগ্য বিন্দুমাত্র হবে না। যদি তাই হত তবে আপনাদেরই আরেকজন ধর্মগুরুকে এখানে ভর্তি করার প্রয়োজন হত না। এখন যেহেতু তিনিও আস্তে আস্তে ভাল হয়ে উঠেছেন, তাই শেষ সময়ে এসেছেন কৃতিত্বের ভাগ নিতে!" ডঃ কোভূর মন্তব্য করেছেন রোগযন্ত্রণায় কাতর রোগীরা এবং জেলখানার শাস্তিপ্রাপ্ত কয়েদীরা এই সব ধর্মগুরুদের প্রার্থনার উত্তম শিকার।

একবার ডঃ কোভূর সস্ত্রীক ইহুদিদের একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ওরা ছিল একেবারেই গোঁড়া, সংস্কারাবদ্ধ। এদের কয়েকজনের সঙ্গে ভূত নিয়ে ডঃ কোভুরের বিতর্ক হয়। কোন যুক্তি না শুনেই ওদের বক্তব্য— ভূতের অস্তিত্ব রয়েছে, ভূতের ভর হলে অন্যরকম গলার স্বর বেরোয় ইত্যাদি। এটি যে একধরনের রোগমাত্র তা তারা শুনবে না। এমনকি রোগের জন্য তারা ওষুধ খেতেও নারাজ। যুক্তি—মানুষের পাপের শাস্তি হিসেবে ঈশ্বর তাকে অসুস্থ করেন; এর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা উচিত, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে পরাজিত করার জন্য ওষুধ খাওয়া নয়। ডঃ কোভুর জিজ্ঞাসা করলেন, "মানুষ যদি চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাহায্যে রোগকে সারিয়ে তোলে তবে কি তার অর্থ মানুষ ঐ তথাকথিত ঈশ্বরের চেয়ে শক্তিমান? ওষুধ দিয়ে অনেকের অনেক রোগ যে সারছে তা তো বাস্তব ঘটনা। আর ওষুধ যদি না খাওয়া হয়, তবে খাবারই বা খাওয়া কেন?" ইহুদিরা জানাল, "খাবার ওষুধ নয়, যীশুও খাবার খেতেন।" ডঃ কোভুর বল্লেন, "আপনারা ভুল করছেন। ক্ষুধা নামক রোগের ওষুধ হচ্ছে খাদ্য এবং তৃষ্ণা নামক রোগের ওষুধ হচ্ছে জল।"*

ধর্মীয় বিশ্বাস তথা সবধরনের অবৈজ্ঞানিক চিন্তাকেই ডঃ কোভুর তীক্ষ্ণভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও যুক্তি দিয়ে বিরোধিতা করেছেন। যে প্রাচীন আকুপাংচার চিকিৎসা বর্তমানে সাম্প্রতিক গবেষণার মধ্য দিয়ে সারা পৃথিবীর সামনে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে ডঃ কোভুর প্রথমে তাকেও অবৈজ্ঞানিক বলে উড়িয়ে দিতেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতির ভিত্তিতে তিনি ছিলেন গভীর আস্থাশীল এবং এর ওপর দাঁড়িয়ে, আকুপাংচারের যে সব ব্যাপার আপাতভাবে ব্যাখ্যার অতীত বা সহজে বোঝা যায় না, সেগুলিকে তিনি কাকতালীয় বলে বা এক ধরনের চালাকি বলে মনে করতেন। কিন্তু শ্রীলঙ্কার আকুপাংচার অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত তাঁর এক চিকিৎসক বন্ধু যখন বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটি তাঁর কাছে পরিষ্কার করেন তখন তিনি আকুপাংচার চিকিৎসা পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেন এবং নানাভাবে আকুপাংচার অ্যাসোসিয়েশনকে সাহায্য করেন।

*অবশ্য, প্রকৃত অর্থে ও সাধারণভাবে ক্ষুধা বা তৃষ্ণা রোগ অর্থাৎ শরীরের অস্বাভাবিক কোন অবস্থা নয়। শরীরের স্বাভাবিক কাজকর্মকে বজায় রাখার জন্য ও কাজকর্মের শক্তি যোগানোর উদ্দেশ্যে খাদ্য ও জল শরীরের স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য। ক্ষুধা-তৃষ্ণার স্বাভাবিক অনুভূতি স্বাভাবিক ঘটনাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, চীনের মত শ্রীলংকাতেও আকুপাংচার সরকারীভাবে স্বীকৃত।)

কর্মসূত্রে শ্রীলঙ্কায় আসার পর ডঃ কোভুর ওখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীলংকাতেই ১৯৭৮ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ৮০ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মূত্রথলির দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এর মধ্যেই তিনি যথাসাধ্য কাজ করে গেছেন। ১৯৭৬ সালে তাঁর প্রথম বই "Begone Godmen! Encounter with Spiritual Frauds" নামে বিখ্যাত বলিষ্ঠ বইটি প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর দু'বছর পরে ১৯৮০ সালে তাঁর বিভিন্ন লেখা নিয়ে প্রকাশিত হয় "Gods, Demons & Spirits" বইটি। দুটিরই সম্পাদনা করেন শ্রী ভি. এ. মেনন।

নিজের মৃত্যু সম্পর্কেও তিনি সমস্ত সংস্কারের ঊর্ধ্বে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। যারা মনে করে মানুষের এ জীবন মহান ঈশ্বর বা পরামাত্মার দান, একে হরণ করাও তাঁরই ইচ্ছে এবং তাই যে মুমূর্ষু প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছে তার করুণামৃত্যু (euthanasia) ঘটানো উচিত নয়, তাদের এই ভ্রান্ত নিষ্ঠুর ধারণার বিরোধিতা করে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যখন ক্যান্সারের অন্তিম অবস্থায় তীব্র কষ্ট পাবেন ও তাঁর কিছুটা কর্মক্ষম জীবনযাপনেরও বিন্দুমাত্র আশা থাকবে না, তখন যেন তাঁকে চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়। এবং এও বলেছিলেন যে, বাঁচবার শেষ আশায় তিনি কখনো বুজরুক সাঁইবাবাদের মত ধর্মগুরুর দেওয়া ছাই খেয়ে বা মোরারজি দেশাই-এর সরল অনুগামীদের মত নিজের প্রস্রাব খেয়ে বাঁচার চেষ্টা করবেন না।

মৃত্যুর পরেও যাতে তাঁর মৃতদেহের দাহ, কবর বা এই ধরনের ভিত্তিহীন আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা না করা হয়, তার জন্য তিনি নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। স্ত্রী-র মত তিনিও মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের শবব্যবচ্ছেদের কাজে ব্যবহারের জন্য নিজের মৃতদেহটিকে উইল করে যান, চোখ দুটি দিয়ে যান মাদ্রাজের একটি হাসপাতালে—এক অন্ধব্যক্তিকে চোখ দুটি দেওয়া হয়। এইভাবে জীবিত অবস্থায় তিনি যেমন পৃথিবীর মানুষদের ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাদের চিন্তাচেতনার মান তথা জীবনযাত্রাকে উন্নত করার চেষ্টা করে গেছেন, তেমনি মৃত্যুর পরেও সমস্ত সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে মানবসেবায় নিজের শরীরকে উৎসর্গ করে গেছেন।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বই দুটির সম্পাদক শ্রী মেনন সঠিকভাবেই বলেছেন, "ডঃ কোভুর আর নেই, কিন্তু তিনি যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবেন। মানবজাতি ক্রমশঃ অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারকে দূর করছে, নিজের ও এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে যথার্থ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে সে এই পৃথিবীতে একসময় ঐক্যবদ্ধ হবেই। তাই ডঃ কোভুর সারাজীবন ধরে যে আদর্শের স্বপক্ষে সংগ্রাম করে গেছেন তা অবশেষে জয়ী হবেই।" ডঃ কোভুরের জীবন-ইতিহাস এই সংগ্রামেরই ইতিহাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ভূত-ভগবান-শয়তান ও ডঃ কোভুরের চ্যালেঞ্জগুলি

আমরা অনেকেই নানা কুসংস্কারের নিন্দা করি। কিন্তু নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে নানা মিথ্যা সংস্কারকে চ্যালেঞ্জ জানানোর সাহস পাই না। ডঃ কোভুর এ কাজটি করার চেষ্টা করেছেন। নিজের বিয়ের সময়ে আচার-অনুষ্ঠান-সংস্কারকে যে তিনি মানেন নি তা আগেই বলা হয়েছে। শ্রীলংকায় তিনি যে বাড়ী করছিলেন, তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন, পাঁজির মতে সবচেয়ে অশুভ সময়ে। বাড়ির কনট্রাক্টর অবশ্য বহু আপত্তিই করেছিলেন, কিন্তু কোভুর সে সব আপত্তি শোনেন কি। আর এর ফলে কোন ক্ষতিও হয় নি বাড়ীর; আর যদি হতও তবে তা কখনোই ঐ শুভ-অশুভ সময়ের জন্য হত না, তার পেছনে থাকত কিছু বাস্তব কারণ। ভারতে কেরালার নিজের সম্পত্তি বিক্রির সময় বিক্রি-কবলা করার দিন হিসেবে তিনি বেছেছিলেন এমন একটি দিন যেটি কোভুর ও তাঁর ক্রেতা উভয়ের পক্ষেই ছিল অশুভ। এর জন্য তাঁকে ভাল খদ্দের হারাতেও হয়েছে। নিজের ছেলেকে তিনি ধর্ম-ঈশ্বর, ভূত-প্রেত ও অন্যান্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস থেকে মুক্ত রেখে মানুষ করার চেষ্টা করেছেন। নাতি-নাতনিদেরও এইভাবে মানুষ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী হয়ে উঠেছিলেন সবধরনের কুসংস্কারমুক্ত। প্রায়শঃই এ ব্যাপার দেখা যায় না। যাঁরা নিজেরা বলেন, কোন ধরনের কুসংস্কার মানেন না, তাঁদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তিনি যখন বাইরে এ সবের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করছেন তখন তাঁর স্ত্রী ঘরে বসে ঠাকুরপূজা করছেন, ছেলে পরেছে মাদুলি ইত্যাদি এবং এমন কি তিনি নিজেও হয়তো নানা খুঁটিনাটি কুসংস্কার মেনে চলেন।

ডঃ কোভুর তথাকথিত প্রেতাত্মা ও এদের কথা যারা বলে ঐ সব ভীতুদেরও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। ভূতের খোঁজে নির্জন কবর খানায় বা তথাকথিত ভুতুড়ে বাড়ি, হানা বাড়ীতে অনেক রাত কাটিয়েছেন। অনেক সময় সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী। ঐখান থেকে শ্রীলঙ্কা বেতারে তাঁরা বক্তব্যও রেখেছেন। কখনোই কোন ভূতের দেখা পাননি—পাওয়া সম্ভবও নয়, তার একটিই কারণ—ভূত বা ঐ জাতীয় কোন কিছুর বাস্তব অস্তিত্ব নেই। অবশ্য একই সঙ্গে তিনি স্বীকারও করেছেন যে, তাঁর সচেতন মন থেকে ভূত-প্রেত সম্পর্কে সব ধরনের বিশ্বাস দূর হলেও অবচেতন মনের কোথাও এ বিশ্বাসের তলানিটুকু লুকিয়ে থাকাটা অস্বাভাবিক নয়—কারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোটবেলাতে ইস্কুলের বই, বিভিন্ন গল্পের বই ইত্যাদি এবং আত্মীয় স্বজন-বন্ধু-বান্ধবদের করা ভূত-প্রেতের গল্পের মাধ্যমে তাঁর কিশোর মনে এ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ঢোকানো হয়েছেল। তাই কেউ যদি ভয় দেখানর জন্যই ঐ নির্জন কবরখানায় কোন অস্বাভাবিক আওয়াজ করত বা ম্যাজিসিয়ানসুলভ কিছু কাণ্ড কারখানা ঘটাত তবে হয়তো তিনি প্রথমে, সামান্য হলেও ভয় পেতেন। কিন্তু তাঁদের ছেলে অ্যারিস কোভুরকে ছোটবেলা থেকেই ভূত-প্রেত সম্পর্কিত মিথ্যা বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখে মানুষ করার চেষ্টা তাঁরা করেছেন, তাই ঐ পরিবেশে উনি হয়তো আদৌ ভয় পেতেন না।

ডঃ কোভুর নিজে দু'বছর ধরে জ্যোতিষবিদ্যা ও হস্তরেখাবিদ্যা নিয়ে পড়াশুনা করেছেন এবং শেষ অব্দি এগুলির অসারতা ও হাস্যকর ভ্রান্তিগুলিকে আবিষ্কার করেছেন। তিনি গবেষণা করে দেখেছেন প্রার্থনা, পূজা, বলি, অঞ্জলি ইত্যাদি, বা মন্ত্র-আশীর্বাদ-অভিশাপ ইত্যাদির মত ব্যাপারগুলি বাস্তবতঃ কিছুই ঘটাতে পারে না। কারোর ক্ষেত্রে কোন সময় যদি কিছু ঘটে তবে তা হয় ঐ ব্যক্তির মনের ওপর এগুলির প্রতি অন্ধবিশ্বাস থাকার কারণ জনিত সম্মোহনী প্রভাবে বা কাকতালীয় ভাবে।

নিজের জীবনের প্রায় ৫০টি বছর তিনি এই ধরনের নানা ভ্রান্তবিশ্বাস ও সংস্কারের উপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন। শেষ অবধি ঠিক করেন, নানা ধরনের বুজরুকদের অলৌকিক বলে প্রচার করা বুজরুকির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য তাদের সামনে চ্যালেঞ্জ দেওয়া দরকার। ১৯৬৩ সালের জুন মাসে তিনি এ ধরনের একটি চ্যালেঞ্জ প্রকাশ্যে রাখলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, যদি কেউ অলৌকিক ক্ষমতাবলে একটি খামে পোরা টাকার নোটের নাম্বার পড়ে দিতে পারে তবে ডঃ কোভুর তাকে ১০০০ থেকে ২৫০০০ টাকা দেবেন, আর না পারলে তাকেই ঐ পরিমাণ টাকা দিতে হবে। টেলিপ্যাথির ক্ষমতার অধিকারী বলে যারা নিজেদের দাবী করে তাদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করা ছিল। একটি ঘরে টাকার নোটসহ খামটি থাকবে, —ঐ ব্যক্তিকে পাশের ঘরে বসে নোটটির নাম্বার দেখেছে এমন একজনের মুখ দেখে নাম্বারটি বলতে হবে। এর জন্য ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জে. বি. রাইনেকে তিনি বিশেষ আমন্ত্রণ করেছিলেন, —ইনি অতীন্দ্রিয় অনুভূতির স্বপক্ষে গবেষণা করছেন বলে দাবি করতেন।

১৯৭৫ -এর জানুয়ারীতে এই চ্যালেঞ্জের টাকার পরিমাণ ৭৫০০০ করা হল। উদ্দেশ্য ছিল যে-সব বিদেশী এই ধরনের অলৌকিক ক্ষমতা বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির অধিকারী বলে নিজেদের দাবী করে তারা যাতে বাজীর টাকা জিতে যাতায়াতের খরচ ছাড়াও বেশ কিছু টাকা হাতে রাখতে পারে। কোন-কোন ব্যক্তি জানাল যে, বাজির টাকাটা তাদের পক্ষে বেশ বেশী। এত টাকার ভয়েই তারা সাহস করে চ্যালেঞ্জে সাড়া দিতে পারছে না। ডঃ কোভুর তাদের জন্য ৭৫ টাকা জমা দেওয়ার কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোষণা করলেন। কিন্তু কেউই কোনদিন এ বাজি জিততে পারে নি। প্রথমত, সাহস করে এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মত লোকই প্রায় আসেনি। কারণ যারা নিজেদের বিভিন্ন অলৌকিক ও অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবী করে, তারা জানে—এ ধরনের ক্ষমতার কোন অস্তিত্ব নেই, তাদের তো নেই-ই এবং তারা লোক ঠকানোর জন্য মিথ্যা কথাই বলে। অথবা এই মিথ্যার ওপর ভিত্তি করেই তারা লোক ঠকিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে, দু' পয়সা কামায়! নিজেদের মিথ্যুক বলে জানে বলেই চ্যালেঞ্জ জিতে এত হাজার টাকা উপার্জন করার চেষ্টা তারা করে নি। তারা যদি সত্যিই জানতো যে নিজেদের যে ক্ষমতার তারা কথা বলে তার মধ্যে কোন ফাঁকি নেই তবে এ ধরনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করার কোন কারণই নেই। বরং 'অবিশ্বাসী নাস্তিকদের' অবিশ্বাস দূর করার জন্য, ঈশ্বর অলৌকিকত্বের মহিমা প্রচার করার জন্য দায়িত্ব নিয়ে চ্যালেঞ্জ জেতার চেষ্টা করা উচিত। আসলে নিজেদের দাবীর অসারত্ব যেমন রয়েছে, তেমনি ওরা জানে যে, ব্যাপক সাধারণ মানুষ নিজেদের অসহায়তা ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার জন্য নির্বোধের মত এখনো এইসব আগড়ুম-বাগড়ুমের উপর নির্ভর করে ও বিশ্বাস করে। শুধু তাই নয়, এই ব্যাপক মানুষকে যারা শাসন করে তারা ও সমাজের কিছু মান্যগণ্য তথাকথিত শিক্ষিতরাও এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলির স্বপক্ষে—কখনো উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে, কখনো বা অসচেতনভাবেই। তাই চ্যালেঞ্জ না জিতলেও তাদের ব্যবসা এক্ষুনি খুব একটা মার খাবে না। দ্বিতীয়ত, দু' একজন লোক চেষ্টা করেছিল কোন রকমে, কৌশল করে বাজির টাকা জিতে নিতে। কিন্তু শেষ অব্দি এদের অধিকাংশই ভয়ে পিছিয়ে গেছে অথবা করুণভাবে পরাজিত হয়েছে।

এমনই একজন ছিল শ্রী সি. ডি. ইদুসুরিয়া। সে দাবী করেছিল যে, সে ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা এবং প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, পার্লামেন্ট সদস্য ইত্যাদি বহুজনই তার শিষ্য। সে খামে পোরা টাকার নোটের নাম্বার বলে দেবে বলে জানাল। বেশ কিছুদিন ধরে তারিখ পিছিয়ে একটি 'শুভদিন' সে স্থির করল। আর অবশেষে ঐ দিন সে যে নাম্বারটি বল্ল তা দেখা গেল, আসল নাম্বারের থেকে একেবারেই আলাদা। 'দাওয়াসা' নামক পত্রিকার সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে ডঃ কোভূর এই পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। এছাড়া শ্রী সি. সি. সি. গুণশীলন, জ্ঞানসিসি থেরো নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, আর্থার জীনদাস ইত্যাদি আরো কয়েকজনও চ্যালেঞ্জে সাড়া দিয়েছিল। কিন্তু শেষ অব্দি কেউই আর ডঃ কোভুরের মুখোমুখি হতে সাহস করে নি।

শ্রী নেভিল দ্য সিল্‌ভা নামে একজন দাবী করলো যে তার টেলিপ্যাথির ক্ষমতা রয়েছে অর্থাৎ কোন ব্যক্তির মুখ দেখে তিনি কি চিন্তা করছেন তা সে বলতে পারবে। ১৯৬৭ সালের ১৫ই আগস্ট 'টাইম্‌স্ অব সিলোন' -এর সম্পাদকের সামনে তার টেলিপ্যাথির ক্ষমতার পরীক্ষা করা হল। যে সাতটি উত্তর সে দিল দেখা গেল তার সবকটিই ভুল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছবি তোলা যায় এরকম একটি ভূত বা দৈত্যকে কেউ হাজির করতে পারলে ডঃ কোভুর তাকে ৫০০০ টাকা পুরস্কার দেবেন ঘোষণা করলেন। জ্যোতিষী-হস্তরেখাবিদদের জন্য বল্লেন, শতকরা বড়জোর ৫ ভাগ ভুল করে তাদের ক্ষমতা দেখাতে পারলে ১০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। ভারতবর্ষে বহু হিন্দুর বাস। এরা পাঁজি বা জ্যোতিষীর নির্দেশ ছাড়া অধিকাংশ কাজই করে না; তাই ভারতের বহু পত্রিকার মাধ্যমে ডঃ কোভুর এটি ঘোষণা করলেন। জ্যোতিষ বিদ্যার তথাকথিত বহু অধ্যাপকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে চ্যালেঞ্জটি জানিয়ে যোগাযোগ করা হল। কিন্তু না, কেউই সাহস করে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নি। শ্রীএস. সিত্তাম্পালাম নামে আন্তঃশুল্ক বিভাগের এক প্রাক্তন কমিশনার জানিয়েছিলো যে দেশের নানা চমকপ্রদ ও সঠিক রাজনৈতিক ভবিষ্যদবাণী সে করেছে। ডঃ কোভুর তাকে অনুরোধ করলেন সর্বসমক্ষে তাঁর একটি সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দিতে। না, এও আর আসে নি।

যারা মন্ত্রতন্ত্রের জোরে নানা কিছু করতে পারে বলে দাবী করে সেই সব গুণিন, ওঝা ইত্যাদিদেরও ডঃ কোভুর চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। আর এর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ৫০টিরও বেশী 'মন্ত্র' পেয়েছেন—ভূর্জপত্র, তাম্রপত্র ইত্যাদিতে লেখা। বেনামী প্রেরকরা মন্ত্রগুলো পাঠিয়ে জানিয়েছিল যে, এইসব মন্ত্রের জোরে ডঃ কোভুরের নানা ক্ষতি হবে, এমনকি তিনি মারাও যেতে পারেন। এবং ডঃ কোভুর বলেছেন, "এখনও আমি সুস্থ সবল রয়েছি। সব মানুষই মরে, আমিও একদিন মারা যাব। অবশ্য তখন এই বুজরুকগুলো বলতে পারে যে, তাদের মন্ত্রের বিলম্বিত ফলস্বরূপ আমার মৃত্যু ঘটল।" এ সবের প্রায় বছর দশেক পরে মূত্রথলির ক্যান্সারে ডঃ কোভুর মারা যান। ব্যাংক অব্ সিলোনের ক্যান্ডি শাখার জনৈক করণিক শ্রী সি. গণেশ্বরণ ডঃ কোভুরকে টেলিফোনে জানাল যে, সে মন্ত্রের জোরে তাঁর হাতের আঙ্গুল মচকে বা ভেঙ্গে দিতে পারে। ডঃ কোভুর আগ্রহের সঙ্গে ওকে আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সেও আর এল না!

১৯৭০ সালে 'কাতারাগামা ভক্ত সংঘের' সভাপতির একটি ঘোষণার উত্তরে ডঃ কোভুর এক লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করলেন—না পুড়ে গিয়ে কেউ ৩০ সেকেণ্ড জ্বলন্ত কয়লার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে তাকে এ পুরস্কার দেওয়া হবে। এটির উত্তরেও কেউ সাহস করে পুড়তে আসে নি। ১৯৭১ সালে শ্রী এম. মোহেত্তি ও শ্রীলাওনেল গ্যামেজ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানাল যে, তারা আগুনের ওপর ৩০ সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, —না ফোস্কা ফেলে বা না পুড়ে। ডঃ কোভুর শ্রী মোহাত্তিকে জানালেন যে, এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলে তাকে ১০০০ টাকা জামানত হিসাবে জমা দিতে হবে। শ্রী গ্যামেজ জানাল এত টাকা ওর নেই। ডঃ কোভুর বিনা জামানতেই ওর এই অত্যদ্ভুত ক্ষমতার পরীক্ষা নিতে রাজী হলেন। কিন্তু না, সেও শেষ অব্দি এল না। শেষে একদিন ডঃ কোভুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খবর পেলেন, রাস্তার ধারে লোকটি হাত দেখার বিরাট ব্যবসা ফেঁদে বসেছে এবং সাধারণ মানুষকে বোকা বানানোর জন্য চাতুরী করে প্রচার করছে যে, একমাত্র সে-ই ডঃ কোভুরের চ্যালেঞ্জে সাড়া দিয়েছে ও জিতেছে। প্রমাণ স্বরূপ ডঃ কোভুরের সঙ্গে কথা বলার সময়কার একটি ছবি সে বাঁধিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে। রেজেস্ট্রি ডাকে চিঠি পাঠিয়ে ও ব্যক্তিগতভাবে তার হাতে চিঠি পৌঁছে দিয়ে ডঃ কোভুর ওর বদমায়েসির বিরোধিতা করলেন এবং অনুরোধ করলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু ও আর দেখা করেনি।

আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে পুনর্জন্ম ইত্যাদির ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কেউ দাবী করে যে তারা সম্মোহনের প্রভাবে কাউকে বর্তমান অবস্থার আগের অবস্থায়, এমনকি পূর্বজন্মে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এবং এইভাবে তার শারীরিক নানা পরিবর্তনও ঘটাতে পারে। ডঃ কোভুর এ ধরনের মিথ্যেবাদীদের সামনে ৭৫ থেকে ৭৫০০০ টাকার চ্যালেঞ্জ রেখে ঘোষণা করলেন—যমজ দু'ভাইকে ওইভাবে সম্মোহিত করে তাদের পূর্বজন্মের অবস্থায় নিয়ে গিয়ে ওদের মুখ থেকে ঐ জন্মের বিবরণ বলাতে পারলে এ পুরস্কার দেওয়া হবে। কেউ যদি কোন গর্ভবতী মহিলাকে সম্মোহনী-ক্ষমতাবলে গর্ভাবস্থার আগের স্তরে নিয়ে গিয়ে গর্ভস্থ শিশুকে অদৃশ্য করে দিতে পারে তবে সেও এ পুরস্কার পাবে। নিজের গবেষণার স্বার্থেই ডঃ কোভুর সম্মোহন করার ব্যাপারটা শিখেছিলেন এবং সম্মোহন-চিকিৎসা (hypno-therapy) -র মাধ্যমে বিভিন্ন মানসিক রোগের চিকিৎসা করতেন। তাই তিনি সম্মোহন পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক দিক ও সীমাবদ্ধতা ভালভাবে জানতেন। যারা দাবী করে যে সম্মোহনের প্রভাবে কাউকে সর্বদর্শী করা যায় (যেমন নখ দর্পণে; ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ডঃ কোভুর তাদেরও এই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এই ধরনের দাবীকে ভ্রান্ত প্রমাণ করেছিলেন।

সত্যসাঁইবাবা, পন্দ্রিমালাই স্বামিগল, নীলকান্ত স্বামীগল, দত্তবাল, দাদাজি, আচার্য রজনীশ ইত্যাদিদের মত যে সব ব্যক্তি দাবী করে যে, তারা ভগবানের অবতার এবং শূন্য থেকে কোন জিনিস (যেমন ছাই বা বিভূতি, প্রসাদ বা ফুল ইত্যাদি) হাজির করার মত নানা আলৌকিক কাজ করতে পারে, ডঃ কোভুর তাদের মিথ্যাবাদী ও বুজরুক বলে অভিহিত করেছেন। ভারত, শ্রীলঙ্কাসহ বহু উন্নত ও অনুন্নত দেশের বহু ব্যক্তিই এদের শিকার অর্থাৎ ভক্ত। ডঃ কোভুর এইসব তথাকথিত অবতারদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বল্লেন যে, প্রথম তিনি এদের পুরো শরীর পরীক্ষা করে দেখবেন, তারপর শূন্য থেকে এ ধরনের জিনিস বের করে দিতে হবে। আসলে এ ধরনের কাজ দক্ষ-ম্যাজিসিয়ানসুলভ হাত-সাফাই ছাড়া আর কিছুই নয়। যাদুকর জুনিয়র পি সি সরকার তো কিছুদিন আগে সাঁইবাবার এ ধরনের চালাকি হাতে নাতে ধরে দিয়েছিলেন। ডঃ কোভুর আরো বল্লেন যে, ঐ সব 'পুণ্যাত্মা অবতারগণ' যদি তাঁর মত একজন নাস্তিকের ছোঁয়ায় আপত্তি করে তবে তারা যেন ডঃ কোভুরের দেখানো টাকার একটি নোটের অনুরূপ (অর্থাৎ একই নাম্বার যুক্ত) একটি নোট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শূণ্য থেকে তৈরী করে দেয়। অলৌকিক তথা ঐশ্বরিক শক্তির অস্তিত্ব ও নিজেদের অবতারত্বকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের এটা করা উচিত। কিন্তু না, ঐ সব তথাকথিত অবতাররা কেউই ডঃ কোভুরের চ্যালেঞ্জে সাড়া দেয়নি।

ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জ

বিভিন্নভাবে জানানো চ্যালেঞ্জগুলি ছাড়া, ১৯৬৩ সালেই ডঃ কোভুর তাঁর সামগ্রিক চ্যালেঞ্জটি পৃথিবীর সামনে রাখেন। তিনি ঘোষণা করেন—

"আমি শ্রী আব্রাহাম টি. কোভুর, তিরুভাল্লা, পামানকাডা লেন, কলম্বো-৬, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের সেই ব্যক্তিকে এক লক্ষ শ্রীলংকার টাকা পুরস্কার দেব, যিনি কোন ধরনের চালাকির সুযোগ থাকবে না, এরকম একটি পরিবেশে, অতিপ্রাকৃতিক বা অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ দেখাতে পারবেন। আমার মৃত্যু পর্যন্ত অথবা প্রথম পুরস্কার বিজেতা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত এই ঘোষণা বলবৎ থাকবে।

অবতার, সাধু, যোগী, সিদ্ধপুরুষ, গুরু স্বামীজি ও অন্যান্য যাঁরা দাবী করেন যে আধ্যাত্মিক তপস্যা বা ঈশ্বরের আশীর্বাদে তাঁরা অলৌকিক ক্ষমতা অর্জন করেছেন, তাঁরা নীচের যে কোন একটি 'অলৌকিক' কাজ করে এ পুরস্কার জিততে পারেন।

১। খামে পোরা টাকার নোটের নাম্বার বলে দেওয়া।

২। টাকার নোটের হুবহু আরেকটি তৈরী করা।

৩। তাঁর ভগবানের আশীর্বাদ নিয়ে, পায়ে ফোস্কা না ফেলে জ্বলন্ত কয়লার ওপর আধ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকা।

৪। আমি যে জিনিষটি চাইব ঐটি শূন্য থেকে সৃষ্টি করা।

৫। মানসিক শক্তিবলে একটি কঠিন বস্তুকে বাঁকান বা সরান।

৬। টেলিপ্যাথির ক্ষমতার সাহায্যে আরেকজনের মনের কথা জেনে নেওয়া।

৭। প্রার্থনা, আধ্যাত্মিক ক্ষমতা, পবিত্র জল, পবিত্র ছাই, আশীর্বাদ ইত্যাদির সাহায্যে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি বাড়িয়ে দেওয়া।

৮। যোগবলে শূন্যে ভেসে থাকা।

৯। যোগবলে পাঁচমিনিট হৃদস্পন্দন বন্ধ করে রাখা।

১০। জলের ওপর হাঁটা।

১১। একস্থানে শরীর ত্যাগ করে অন্যস্থানে আবির্ভূত হওয়া।

১২। যোগবলে ৩০ মিনিট শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ রাখা।

১৩। তুরীয় বা অন্য কোন ধরনের ধ্যানের সাহায্যে সৃজনশীল বুদ্ধি বা নতুন জ্ঞান অর্জন করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪। পূর্বজন্মের কর্মফলের বলে অথবা কোন পুণ্যাত্মা বা শয়তানের আত্মার ভর হয়ে একটি অজ্ঞাত ভাষায় কথা বলা।

১৫। ছবি তোলা যায় এ রকম একটি ভূত বা আত্মা সৃষ্টি করা।

১৬। ছবি তোলার পর ছবি থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।

১৭। ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলে তালাবন্ধ ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।

১৮। কোন বস্তুর ওজন বৃদ্ধি করে দেওয়া।

১৯। একটি লুকনো জিনিসকে বের করা।

২০। জলকে পেট্রোল বা মদে পরিণত করা।

২১। মদকে রক্তে পরিণত করা।*

২২। সে সব জ্যোতিষী ও হস্তরেখাবিদ, জ্যোতিষবিদ্যা ও হস্তরেখাবিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক বলে দাবী ক'রে সরল মানুষদের ঠকায়, তারাও আমার পুরস্কার জিতে নিতে পারে যদি তারা বড়জোর শতকরা ৫ ভাগ ভুল করে দশটি ঠিকুজি বা দশটি হাতের ছাপ দেখে সেগুলি নারী কি পুরুষের, জীবিত কি মৃতের বলে দিতে সক্ষম হয়। ঘণ্টা-মিনিটের হিসেব পর্যন্ত জন্ম সময় ও তারিখ এবং অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ দিয়ে জন্মস্থান বলে দেওয়া থাকবে।

নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে এই চ্যালেঞ্জ বলবৎ থাকবে—

১। আমার পুরস্কার চান বা না-ই চান, যিনি আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবেন তাঁকে আমার কাছে বা আমার মনোনীত ব্যক্তির কাছে জামানত হিসেবে ১০০০

---

* প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, অনেক দক্ষ ম্যাজিসিয়ানই হাজার হাজার দর্শকের সামনে তাঁদের বোকা বানিয়ে উপরোক্ত কাজগুলির অনেকগুলিই করে দেখাতে পারেন। যাদুকর পি সি সরকার তালাবন্ধ ঘর বা বাক্সের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছেন একাধিকবার। যাদুকর হুডিনী মাটির ৬ ফুট নীচে পোঁতা একটি কফিনের ভেতর টানা ৬০ মিনিট ছিলেন। পল হিউজ নামে একজন ফরাসী সাংবাদিক ১৯১৮ সালে জলের তলায় একটি কফিনের ভেতর ৮৫ মিনিট ছিলেন। শুন্য থেকে সন্দেশ, ব্রেড, এমন কি হাঁস মুরগী পর্যন্ত হাজির করেন অনেক যাদুকর। ইত্যাদি। এঁরা কেউই কিন্তু এগুলিকে নিজেদের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় বলে দাবী করেন না। তাঁরা স্বীকার করেন যে, এগুলি নিছক হাতসাফাই মাত্র। কোন কোনটি আবার দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলে বিশেষ শারীরিক দক্ষতা অর্জনের জন্য ঘটে, যেমন- দীর্ঘসময় জলের বা মাটির নীচে থাকা, শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ রাখা ইত্যাদি। দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে শরীরের অক্সিজেন, খাদ্য ইত্যাদির প্রয়োজনকে বেশ কিছুটা কমিয়ে দেওয়া যে সম্ভব তা বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত। আগুনের ওপর হাঁটাও যায় চেষ্টা করলে (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই ধরনের সব কাজের পেছনেই থাকে বিশেষ কিছু বৈজ্ঞানিক বাস্তব কারণ। কিন্তু কেউ কেউ এ ধরনের কাজ ক'রে তাকে অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় হিসেবে দাবী করে আর সাধারণ মানুষকে ঠকায়। আপত্তি এখানেই। ডঃ কোভুর এর বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করেছেন।

অতীতে অনেক ভারতীয় যোগী, ঋষিরাও দীর্ঘকালীন ব্যায়াম অর্থাৎ, প্রাণায়াম ইত্যাদির সাহায্যে নানা ধরনের অস্বাভাবিক শারীরিক দক্ষতা অর্জন করতেন। আর সাধারণ মানুষ এইসব ক্ষমতার জন্যই তাঁদের ভেতর দেবত্ব বা আলৌকিকত্ব আরোপ করেছেন। এখনো যে কেউ অধ্যবসায়ের সঙ্গে চেষ্টা করলে দীর্ঘক্ষণ শ্বাস বন্ধ করে রাখা, হৃদপিণ্ডকে মন্থর করা, জলের উপর ভেসে থাকা ইত্যাদি ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পারবেন। এর মধ্যে অলৌকিকত্ব বা দেবমাহাত্ম্য কিছু নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাকা আগে জমা দিতে হবে। তিনি জিতলে তাঁকে এই টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আমি এই টাকা জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি শুধুমাত্র সেই সব লোকদের ঠেকাতে, যারা সস্তা প্রচারের মোহে এগিয়ে এসে আমার সময়, অর্থ ও শক্তি-ক্ষয় করবে।

২। যে ব্যক্তি এই জামানতের টাকা দেবেন কেবলমাত্র তিনিই আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন বলে গণ্য করা হবে। এ টাকা জমা না দিলে কারোর সঙ্গে এ ব্যাপারে আর যোগাযোগ করা হবে না।

৩। এ টাকা জমা দেওয়ার পর আমার মনোনীত ব্যক্তির কাছে সর্বসমক্ষে ঐ ব্যক্তিকে উভয়ের সুবিধাজনক একটি দিনে তাঁর দাবীর প্রাথমিক পরীক্ষা দিতে হবে।

৪। যদি ঐ ব্যক্তি এই প্রাথমিক পরীক্ষায় হাজির না হন বা পরাজিত হন তবে তাঁর জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৫। যদি উনি প্রাথমিক পরীক্ষায় জেতেন তবে আমি নিজে সর্বসমক্ষে চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণ করব।

৬। যদি উনি এই চূড়ান্ত পরীক্ষায় জেতেন তবে তাঁর জামানতের টাকা ও পুরস্কারের এক লক্ষ টাকা তাঁকে দেওয়া হবে।

৭। আমাকে বা আমার মনোনীত ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করে, কোন ধরনের চালাকির সুযোগ থাকবে না— এরকম একটি পরিবেশে, এ সমস্ত পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।”

ভারত-শ্রীলংকাসহ পৃথিবীর বিভিন্নদেশের সংবাদপত্রে ডঃ কোভুর তাঁর এ চ্যালেঞ্জ প্রকাশ করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি ভারতের বহু জ্যোতিষী, হস্তরেখাবিদ (এঁদের মধ্যে জ্যোতিষবিদ্যার তথাকথিত বহু অধ্যাপকও ছিলেন), ‘অবতার’ ইত্যাদিদের তাঁর চ্যালেঞ্জের কপি পাঠিয়েছিলেন।

ব্যাঙ্গালোরের একজন ডাক্তার, জি. ভি. রাও, বোকার মত ডাঃ কোভুরের এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু অলৌকিক ক্ষমতা বা দৈবীশক্তির কোন অস্তিত্ব নেই, তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি পরাজিত হন। লাভের মধ্যে মাঝখান থেকে ডঃ কোভুর ডাক্তারের জামানতের ১০০০ টাকা উপার্জন করলেন। (তৃতীয় পরিচ্ছেদে সাঁইকৃষ্ণের অংশটি দ্রষ্টব্য।)

ডঃ কোভুর আরো একবার এইভাবে আর একজনের জামানতের টাকা উপার্জন করেছিলেন। আমেরিকার ‘ফেট’ পত্রিকায় ডঃ কোভুরের চ্যালেঞ্জটি প্রকাশিত হওয়ার পর তা দেখে সুইডেনের জেল আইড (Kjell Eide) নামে একজন ডঃ কোভুরকে জানাল যে, সে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে জলের ওপর হাঁটতে প্রস্তুত। সুইডেনে ডঃ কোভুরের মনোনীত ব্যক্তি, স্থানীয় একটি পত্রিকার সহ-সম্পাদক মি. উলফ্ মোলিং-এর কাছে লোকটি ডঃ কোভুরের নির্দেশে তার জমানতের টাকা জমাও দিল। শ্রীলংস্কার একজন ধনী ব্যক্তি শ্রীলংকায় জেল আইড-এর থাকা-খাওয়া এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রীলংকা থেকে সুইডেন ফিরে যাওয়ার খরচ বহন করতে রাজী হলেন। ৭৫০ টাকায় ভাড়া করে সেন্ট জোসেফ কলেজের দীঘিটিতে জেল আইড-এর জলে হাঁটার ব্যাপারটা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা হল। জেল আইড জানাল, "মনুষ্যজাতিকে ঈশ্বরের দেওয়া" শক্তি-বলেই সে এই ক্ষমতা অর্জন করেছে। দু'পক্ষেরই সুবিধা জনক একটি দিনে, ১৯৭৭ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, জেল আইড জলের উপর হাঁটবে স্থির হল। সুইডেন থেকে সে জানাল ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে সে কলম্বো পৌঁছাচ্ছে। —না, শেষ অব্দি সে আর আসে নি, চিঠিও দেয়নি। যথেষ্ট প্রচার ও মিথ্যে বাহাদুরি নিয়ে সে পিছিয়ে গেল। "মনুষ্যজাতিকে ঈশ্বরের দেওয়া" শক্তির আর পরিচয় পাওয়া গেল না! লাভের মধ্যে ডঃ কোভুর ওর জামানতের টাকাটা উপার্জন করলেন।

শ্রীলংকার সিলুমিনা পত্রিকার মাধ্যমে শ্রী মাদ্রিস দ্য সিল্ভা নামে এক পুরোহিত জানাল যে, সে ডঃ কোভুরের সামনে একটি ভূত ও আয়নার মধ্যে একটি দৈত্য দেখিয়ে দেবে। ডঃ কোভুর যে চেয়ারে বসবেন ঐ চেয়ারে অলৌকিক শক্তিবলে তাঁকে আটকে রাখবে এবং ডঃ কোভুরের বাড়ীর জিনিসপত্র তার অধীনস্থ ভূতের সাহায্যে ভেঙ্গে ফেলবে। অনেকবার দিন ঠিক করা হল। কিন্তু আসল সময়ে সে আর আসে নি, আর এগুলোর কিছুই ঘটে নি। রেভারেণ্ড ওয়ালাগেদারা ইন্দুসুমানা থেরো নামে শ্রীলংকার এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীও জানাল যে, ছবি তোলা যায় এরকম একটি ভূতকে সে দেখাবে। সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করা হল। কিন্তু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নিজের 'রেভারেণ্ড' উপাধিকে লজ্জা দিয়ে নিজেকে মিথ্যাবাদী প্রামাণিত করল—ডঃ কোভুরের কাছে আর এল না।

১৯৬৯ সালে ডাঃ এম এইচ এম নাজিম নামে একজন 'প্রেততাত্ত্বিক' জানাল, কোন শুভদিনে দিনের বেলায় সে ভূতের অস্তিত্বের প্রমাণ দেবে।.... "একটি তালাবদ্ধ ঘরের মধ্যে শুধু একটি তেলের ল্যাম্প বা মোমবাতি জ্বেলে দেবেন। আমরা সবাই ঘরের বাইরে থাকব। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আপনা থেকে ঘরের তালা ঘুলে যাবে, আলোটি নিভে যাবে। দশ মিনিট পরেই তা আবার জ্বলে উঠবে, দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। আপনারা ইচ্ছুক থাকলে আমাকে তিন সপ্তাহ সময় দিয়ে জানাবেন।"

কয়েকজন সাংবাদিক ও বিচারকদের সামনে তার ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে ডঃ কোভুর রেজিস্টার্ড চিঠি মারফত ডাঃ নাজিমের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ডাঃ নাজিম আমন্ত্রণ গ্রহণ করে চিঠিও দিল। দিন ঠিক হল ২২শে নভেম্বর। কিন্তু শেষ অব্দি নাজিম -এর টিকিটিরও দেখা পাওয়া গেল না। 'টাইমস অব্ সিলোন' পত্রিকা লিখলো, "**ডঃ কোভুর আবার ওয়াক্ওভার পেলেন**। —সে আর এলো না, আমরাও দেখতে পেলাম না এবং শ্রীলংকার যুক্তিবাদী, বৈজ্ঞানিক আব্রাহাম কোভুর ওয়াক্ওভার পেলেন। ওয়াটাওয়ালার একজন ডাক্তার ডঃ কোভুরের চ্যালেঞ্জে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাড়া দিয়ে জানিয়েছিল যে সে ভূত দেখাবে। আমরা অতীব আগ্রহে তার জন্য শুধু অপেক্ষাই করে গেলাম।"

ডঃ কোভুর ওকে কিন্তু সহজে ছেড়ে দেননি। পুলিসের ইনস্পেক্টর জেনারেলের কাছে সব ব্যাপার জানিয়ে তিনি চিঠি দিলেন। বল্লেন "যেহেতু তিনি এলেন না, এমন কি তাঁর অক্ষমতার কথাও জানালেন না, তাই আমি মনে করি, তিনি ইচ্ছে করেই আমাকে, আমাদের সংস্থাকে এবং যে অসংখ্য বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যাপারটি দেখার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের হেনস্থা করেছেন। আমি সিংহলের র‍্যাশনালিস্ট আসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি ঐ ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে, যাতে তিনি আর কখনও এই ধরনের বদমায়েসি করার ও ব্যাপক মানুষকে ঠকানোর সাহস না পান। আমার সন্দেহ ঐ ব্যক্তির ডাক্তারি ডিগ্রীটিও ভুয়া, লোক ঠকানোর জন্য মিথ্যে করে নেওয়া হয়েছে।" এরপর পুলিশের পক্ষ থেকে "ডাঃ" নাজিমের ব্যাপারে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল তা অবশ্য জানা যায় নি। কিছু নেওয়া না হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই—কারণ দেশের প্রশাসন, বিশেষতঃ ভারত-শ্রীলংকার মত অনুন্নত দেশগুলির প্রশাসন, ধর্মীয় বুজরুকির বিরুদ্ধে তো নয়ই বরং নিজেরাই একদিকে এ ধরনের বুজরুকির শিকার, অন্যদিকে নিজেদের শাসন টিকিয়ে রাখার জন্য এগুলিকে প্রশ্রয় দেয়, পরোক্ষ অনুমোদনও করে।

১৯৬৯ সালের জানুয়ারী মাসে 'টাইম্‌স্‌ উইক ওণ্ডার' পত্রিকার মাধ্যমে এক ব্যক্তি বেনামীতে ডঃ কোভুরকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে জানাল যে, কেলানিয়ার বৌদ্ধ মন্দিরে সে ঈশ্বর ও ঐশ্বরিক শক্তির অস্তিত্বের প্রমাণ দেখাবে। ডঃ কোভুর ঐ একই পত্রিকার মাধ্যমে ঐ ব্যক্তিকে তার পরিচয় প্রকাশ করতে অনুরোধ জানিয়ে চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করলেন। কিন্তু সে নিজের পরিচয় না দিয়ে বা মন্দির কর্তৃপক্ষের কোন অনুমতি না নিয়েই মার্চের তিন তারিখে সকাল আটটায় ঐ মন্দিরে তার ঐশ্বরিক পরীক্ষার কথা ঘোষণা করল। বল্ল, "ঈশ্বরের নাম নিয়ে" সে সকলের সামনে আবির্ভূত হবে! বিশাল জনতা জড়ো হয়েছিল "ঈশ্বরের শক্তি" দেখার আশায়। কিন্তু সে-ও আর আসে নি, ঈশ্বরের শক্তির প্রমাণও পাওয়া গেল না! পরে ব্যাপক অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা গেল লোকটি একজন ইয়োরোপীয় চামড়া-ব্যবসায়ী, পরে হয়েছে চলচ্চিত্র প্রযোজক-পরিচালক এবং নেশার ওষুধ খেয়ে খেয়ে মানসিক রোগিতে পরিণত হয়েছে। ঠিকই, এই ধরনের মানসিক রোগিরাই প্রকৃতপক্ষে 'ঈশ্বরের দেখা পায়' বা 'ঐশ্বরিক শক্তি' অর্জন করে।

শ্রীকেম্পিটিয়া ও শ্রীভ্যানক্যুইলেনবার্গ নামের দুই জ্যোতিষী জ্যোতিষবিদ্যার অভ্রান্ততার প্রমাণ দেবে ঠিক হয়েছিল। খ্রীষ্টান কলেজের হলঘরে পরীক্ষার দিনও ঠিক হয়েছিল। শেষ অব্দি এরাও আসেনি। শ্রীসিত্তিবিনায়কম নামে এক ব্যক্তিও আসেনি—এও জ্যোতিষবিদ্যা-হস্তরেখাবিদ্যার যাথার্থ্যের প্রমাণ দেবে বলে ডঃ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোভুরের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছিল ও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল।

শ্রীলংকার আবেকোলাওয়েয়া নামক স্থানের শ্রীরানাওয়াকা নামে একজন 'সিলুমিনা' পত্রিকার মাধ্যমে ঘোষণা করল যে তার একটি বাচ্চার মধ্যে অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার দেখা যাচ্ছে,— ওর ছবি তুললে একদিকে সাপ আরেকদিকে তরোয়াল দেখা যায়। একই পত্রিকার মাধ্যমে ডঃ কোভুর ঐ বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে তাকে কলম্বো আসতে অনুরোধ জানালেন—যাতায়াতের সব খরচ তিনিই বহন করবেন। শ্রীরানাওয়াকা কোন উত্তরই দিল না। শেষ অব্দি শ্রীলংকা র্যাশন্যালিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের দু'জন সদস্য ক্যামেরা নিয়ে ছুটলেন ঐ জায়গাতে ঐ অলৌকিক শিশুর ছবি তোলার জন্য। ওখানে কিন্তু বাচ্চাটিকে ওঁদের সামনে আনা হয়নি, এমনকি একবার দেখানও হয়নি। প্রতিবেশীদের কেউ কেউ জানাল ব্যাপারটা স্রেফ বদমায়েসি—গ্রামের সরল লোকেদের বোকা বানিয়ে প্রণামী আর নৈবেদ্য আদায় করার ব্যবসায়ী কৌশল ছাড়া আর কিছুই না।

সাঁইবাবা শূন্যে হাত নেড়ে ছাই, সন্দেশ ইত্যাদি তৈরী করে। তার নির্বোধ, যুক্তিবোধহীন, সরল ভক্তেরা এটিকে তার অন্যতম অলৌকিক মহিমা ভেবে ভক্তিতে গদ্‌গদ্ হয়ে যায়। সাঁইবাবার এ ধরনের কাজ যে এক দক্ষ ম্যাজিসিয়ানের সুচতুর হাতসাফাই ছাড়া আর কিছুই নয় তা হাতে নাতে দেখানোর জন্য ডঃ কোভুর নিজেই প্রকাশ্যে একইভাবে শূন্য থেকে ছাই, সন্দেশ ইত্যাদি তৈরী করে সমবেত দর্শকদের দিয়েছেন। কিছু মহিলাকে এই ছাই ডঃ কোভুরের অলৌকিক ক্ষমতার ফসল মনে করে ভক্তিভরে হাতব্যাগে তুলে রাখতে দেখে ডঃ কোভুর হতবাক হয়ে গেছেন! অবশেষে তাঁকে স্টেজে উঠে ঘোষণা করতে হয়েছে যে, আসলে এই ছাই তাঁর স্ত্রী ঘুঁটে পুড়িয়ে বাড়িতেই তৈরী করেছেন, তিনি তা জামার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন এবং কৌশলে সবার অলক্ষ্যে বের করেছেন।

ডঃ কোভুরের এসব কাণ্ডকারখানার খবর পেয়ে সাঁইবাবার এক ভক্ত 'সিলোন ডেলি নিউজ' পত্রিকায় লিখলো, "ডঃ কোভুরের অনুগামীদের মত কিছু বোকারাই কেবল বিশ্বাস করবে যে সাধু-সন্ন্যাসীদের সৃষ্টি করা ছাই শুধুমাত্র ম্যাজিক— অলৌকিক ব্যাপার নয়।" ভক্তটি আরো জানাল যে সে নিজে কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের সামনে মহাপুরুষকে শুধু শূন্যে হাত নেড়ে পবিত্র ছাই সৃষ্টি করতে দেখেছে! ডঃ কোভুর তাকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে জানালেন যে তাঁর সামনে কোন রকম চালাকি বা ম্যাজিকের কায়দা না করে যদি কেউ এসব কাজ করে দেখাতে পারে তবে তিনি তাকে এক হাজার থেকে একলক্ষ টাকা পুরস্কার দেবেন। এর পর ঐ ভক্ত একেবারে চুপ করে গেছে।

ভারতবর্ষ থেকেও বহু ব্যক্তি ডঃ কোভুরের চ্যালেঞ্জে সাড়া দেবে বলেছিল। এ সবই এরা করছিল বিভিন্ন পত্রিকা বা সংবাদপত্রে চিঠি লিখে। বলেছিল নিজেদের ঐশ্বরিক ক্ষমতার পরিচয় তারা দেবে। ডেকান হেরাল্ড পত্রিকার মাধ্যমে ডঃ ভাদলামুদি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দি হিন্দু' ও 'দি টাইম্‌স্‌ অব সিলোন' -এর মাধ্যমে শ্রী তীর্থংকর, 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' ও 'ভারত জ্যোতি'-র মাধ্যমে শ্রী আর. পি তেওয়ারি, 'অমৃত বাজার পত্রিকার' মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের কালনার জনৈক বেনামা ভদ্রলোক এদের মধ্যে কয়েকজন। ডঃ কোভুর এদের সবাইকেই চিঠি দিয়ে চ্যালেঞ্জের প্রমাণ দিতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু একে একে সবাই চুপ করে গেল। খবরের কাগজে নিজেদের কিছু মিথ্যে প্রচার করার পর আসল সময়ে সৎ সাহস আর কারোর হয় নি।

উল্টে অনেকে ডঃ কোভুরের এই সব চ্যালেঞ্জের মূলে তাঁর দুরভিসন্ধির অভিযোগ এনে বলেছে যে, ডঃ কোভুরের প্রচুর টাকা রয়েছে, তাই সস্তা প্রচারের লোভে এত টাকা খরচ করার কথা তিনি ঘোষণা করেছেন। এই ভিত্তিহীন অভিযোগের উত্তরে ডঃ কোভুর বলেছেন—কোন ধরনের অলৌকিক ক্ষমতা বা অতিপ্রাকৃতিক ঘটনাবলীর অস্তিত্ব যে নেই সে সম্পর্কে তিনি সুনিশ্চিত। তাই তিনি নিশ্চিন্ত যে, কেউই তাঁর এ চ্যালেঞ্জ জিততে পারবে না, তাঁকে একটা পয়সাও হারাতে হবে না। সঙ্গে এও জানিয়েছেন, "যদি পৃথিবীতে এমন একজন কেউ থাকে যার অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা রয়েছে তবে আমাকে বৃদ্ধ বয়সে কপর্দকহীন হয়ে অনাথ আশ্রমে কাটাতে হবে।"

সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছোটবড় নানা ধরনের বুজরুক ব্যাপক মানুষের সরল বিশ্বাস ও কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে তাদের ঠকাচ্ছে, এবং নিজেরা কুসংস্কার ছড়াচ্ছে, নিজেদের অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে পরিচয় দিচ্ছে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে কথা বলছে। কিন্তু এসবের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেওয়ার সৎসাহসের অভাব এবং তাদের ব্যর্থতা, ঐগুলির অনস্তিত্বটাকেই প্রমাণ করে। ডঃ কোভুর বলেছেন, "যদিও আমার মৃত্যু পর্যন্ত বলবৎ আমার এত সব চ্যালেঞ্জকে কেউ গ্রহণ করেনি বা জিততে পারেনি, তবু আমি সুখী এই জেনে যে, এর ফলে অসংখ্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অলৌকিক, অতিপ্রাকৃতিক বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই।

"প্রকৃতিতে যা কিছু ঘটে সবই প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক নিয়মেই ঘটে থাকে। অলৌকিক বলে কোন কিছু নেই। কিছু আছে রহস্যময় ব্যাপার। আমাদের পূর্বপুরুষের কাছে রহস্যময় অনেক কিছুর সমাধান এখন হয়েছে। এখনকার বহু রহস্যের সমাধান আগামীদিনের বৈজ্ঞানিকেরা করতে পারবেন অথবা অল্পদিনের মধ্যে না-ও করতে পারেন, আরও সময় লাগতে পারে। কিন্তু তখনো পর্যন্ত অব্যাখ্যাত রহস্যাবলীকে অতিপ্রাকৃতিক আখ্যা দেওয়াটা যুক্তিহীন।"

ডঃ কোভুরের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র, প্যারিসের সরবোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অ্যারিস কোভুর পিতার এই চ্যালেঞ্জকে বলবৎ রেখেছেন। তাই এখনো পৃথিবীর কোন প্রান্তে যদি এমন কেউ থাকেন, যিনি অলৌকিক বা ঈশ্বরের শক্তি, আত্মা-প্রেতাত্মার অস্তিত্ব, জ্যোতিষবিদ্যার যাথার্থ্য অথবা কোন অলৌকিক ক্ষমতায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন ধরনের অস্বাভাবিক কাজ করার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দিতে সক্ষম তাহলে তিনি এখনো এই চ্যালেঞ্জ জিতে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারেন এবং একই সঙ্গে ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্তের দায়িত্ব পালন করে ঈশ্বর-অলৌকিকত্বের মহিমাও প্রচার করতে পারেন।

ভূত-ভগবান-শয়তানদের নামে ডঃ আব্রাহাম থোম্মা কোভুরের চ্যালেঞ্জ এখনো খোলা রয়েছে—যে কেউ তা জিতে নিতে পারেন। (তবে কয়েক বছর আগে ভারতের ফরাসী দূতাবাসকে ডঃ অ্যারিস কোভুরের উদ্দেশ্যে লেখা একটি চিঠি পাঠিয়েছিলাম। তাঁরা সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠিটি পাঠিয়েওছিলেন। কিন্তু চিঠি ফেরৎ এসেছে প্রাপকের অভাবে।)

[ঈশ্বরের অবতার বা অলৌকিকত্বের ধ্বজাধারীরা অর্থাৎ 'ধর্মপ্রাণ' তথাকথিত পুণ্যাত্মা, সাধু, সন্ন্যাসীরা মুচকি হেসে বা ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে পারেন 'ধর্ম-ঈশ্বর অলৌকিকত্বের মহিমা কি এইভাবে চ্যালেঞ্জ দিয়ে প্রমাণ করা যায়? এ তো অনুভব-উপলব্ধির ব্যাপার।' 'গ্যাঁড়াকলটা' ঐখানেই। অলৌকিকত্ব বা ঈশ্বরকে বাস্তবে প্রমাণ না করতে পারলেও এদের এভাবেই প্রতিষ্ঠা করা চেষ্টা করা হয়। কেউ নিজের মনে ঈশ্বর সম্পর্কে ক্রমাগত চিন্তা করতে করতে (যে প্রক্রিয়াও স্নায়ু অর্থাৎ বস্তু নির্ভর) যে সব অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থা (illusion ও halluciation) -এর অভিজ্ঞতা লাভ করেন তা তাঁর ব্যক্তিগত (subjective) অভিজ্ঞতা। একে প্রমাণ করা যায় না। কোন ভয়াবহ দুর্ঘটনা থেকে কোন ভাবে রক্ষা পাওয়ার পর কোন ভক্তের যদি মনে হয় যে, ঈশ্বর বা তাঁর গুরুদেব তাঁর প্রাণ বাঁচালেন, তবে প্রাণ বাঁচার বাস্তব কারণ থাকলেও তাঁর মনে হওয়াকে তো প্রমাণ-অপ্রমাণ কিছুই করা যাবে না। একইভাবে গভীরভাবে কোনও দেবতার কথা ভাবতে ভাবতে কোন ব্যক্তির যদি মনে হয় যে আকাশে তিনি নারায়ণ বা অন্য কোন দেবতার মূর্তি দেখলেন, কালীঠাকুর তাঁকে খাইয়ে দিলেন (যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ) বা তাঁর বেড়া বেঁধে দিলেন (যেমন রামপ্রসাদ) ইত্যাদি—তবে বাস্তবে এটি না ঘটলেও বা এ সবের বাস্তব প্রমাণ না থাকলেও তাঁর মতিভ্রান্ত অভিজ্ঞতা (hallucinatory experiencc) অনুযায়ী তিনি কিন্তু মিথ্যা কথা বলছেন না, যদিও ব্যাপারটা মিথ্যা। এই মিথ্যা ব্যাপারটি অন্যদের যে যত সুদক্ষভাবে বোঝাতে পারবেন তিনি ততবড় 'অবতার' হয়ে উঠতে পারবেন।

☆ ☆ ☆

অন্যদিকে মানুষের কুসংস্কার, দারিদ্র্য, লোভ— সব কিভাবে একাকার হয়ে মিশে থাকে তার একটি করুণ উদাহরণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল কিছুদিন আগে। এই বইটির পূর্ববতী সংস্করণ পড়ে চ্যালেঞ্জের ব্যাপারটি জানতে পেরে, নদীয়া জেলার নবদ্বীপ থেকে এক ভদ্রলোক যোগাযোগ করেন। মাঝবয়সী। সারা শরীরে ও পোষাকে আর্থিক দুরবস্থার ছাপ স্পষ্ট। তিনি জানান চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী তিনি ভূত দেখাবেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং তারপর তাঁর করুণ প্রশ্ন, ‘‘তাহলে একলাখ টাকা দেবেন তো ?’’ তাঁকে সবিনয়ে জানানো হয়, চ্যালেঞ্জ জিতে নেওয়ার অন্যান্য শর্ত— অর্থাৎ আগে ১০০০ টাকা জামানত হিসেবে জমা দেওয়া, আমাদের শর্ত অনুযায়ী ভূত দেখানোর ব্যাপারটা করা এবং না পারলে জামানতের পুরো টাকাটা বাজেয়াপ্ত করা, ইত্যাদি। কিন্তু এসব শুনে তিনি পিছিয়ে যান এবং এক সময় জানান, প্রায় একবছর ধরে তিনি এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, কয়েকশ’ টাকা খরচও করেছেন এবং ‘‘কোনভাবে কি ব্যাপারটা একটু দেখা যায় না, ঐ কোভুরের ছেলেকে বলে টলে ?’’ স্পষ্টতই, ভদ্রলোক এ ধরনের চ্যালেঞ্জের মূল উদ্দেশ্য বোঝেন নি ; তিনি বিশেষ কিছু কৌশলের জন্য ট্রেনিং নিয়ে, দারিদ্র্য লাঞ্ছিত জীবনে কিছু অর্থ উপার্জনের আশা করেছিলেন। দু’চারবার ঘোরাঘুরি করার পর তিনি আর আসেননি।

এই বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর, বিগত ১০-১২ বছরে, আরো অনেকেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার কথা জানিয়েছিলেন। বাঁকুড়ার একজন বলেছিলেন বাণমারবেন এবং বর্ধমানের একজন ভূত দেখানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ; মেদিনীপুরের একজন বলেছিলেন টেলিপ্যাথির প্রমাণ দেবেন। ইত্যাদি। এঁদের নানাভাবে মোকাবিলা করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা কেউই সফল হন নি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা শেষ অব্দি আসেন নি। কিন্তু নবদ্বীপের এই ভদ্রলোকের ব্যাপারটি মনকে নাড়া দিয়েছিল— তাই বিশেষভাবে উল্লেখ করা।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
অবতারগণের কাণ্ডকারখানা

ডঃ কোভুর বলেছেন, “এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও তার মধ্যে বসবাসকারী জীবন্ত বস্তুগুলির, তথা মানুষের, সৃষ্টির জন্য কোন দেবতা দায়ী নয়, বরং পৃথিবীর মানুষই অতীতে অসংখ্য দেবতার সৃষ্টির জন্য দায়ী এবং সম্ভবত ভবিষ্যতেও মানুষ কিছুকাল এ কাজ করে যেতে থাকবে।”

অতীতে মানুষ বা মানুষের পূর্বপুরুষেরা প্রকৃতির প্রায় কোন রহস্যেরই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও সমাধান করতে পারেন নি। বহু লক্ষ বছর ধরে চলা জৈব-বিবর্তনের বিশেষ পর্যায়ে গুণগতভাবে উন্নত স্নায়ুকোষের অধিকারী হয়ে মানুষ চিন্তা ও কল্পনা করার ক্ষমতা অর্জন করেছে—ধীরে ধীরে তা বিকশিতও হয়েছে। প্রকৃতির কাছে অসহায় মানুষ প্রাকৃতিক নানা ঘটনাবলীর জন্য নিজেদের চারপাশের অনুভূতিগ্রাহ্য বস্তুগুলির বাইরে কোন শক্তির কল্পনা করে রহস্যের সহজ সমাধান করার চেষ্টা করেছে। বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড়, বৃষ্টি, ইত্যাদির জন্য দেবতা বা অপ-দেবতার সৃষ্টি হয়েছে। কল্পিত হয়েছে পৃথিবীর বাইরে আসীন সর্বশক্তিমান সর্বদর্শী এক ঈশ্বর—সহস্র সহস্র বছর ধরে এই কল্পনা বিকশিত হয়েছে। আর এক সময় এই বংশানুক্রমিক মিথ্যা বিশ্বাসের প্রায় স্থায়ী শিকারে পরিণত হয়েছে মানুষ, মিথ্যা বিশ্বাস পরিণত হয়েছে অন্ধ বিশ্বাসে।

কয়েক সহস্র বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানবগোষ্ঠী ধীরে ধীরে নিজেদের জীবনযাত্রা ও উৎপাদন ব্যবস্থাকে উন্নত করেছে, বিকশিত হয়েছে মানবসমাজ। আর এই বিকাশের ধারাবাহিকতায়, প্রাসঙ্গিক ভাবেই, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানবগোষ্ঠী ঈশ্বর ইত্যাদি সম্পর্কিত কাল্পনিক ও ভ্রান্ত বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে নানা সামাজিক অনুশাসন, কর্তব্য-অকর্তব্য, বিধিনিষেধ, নৈতিকতা ইত্যাদির জন্ম দিয়েছে। এ গুলিই ক্রমে সংকলিত হয়ে তথাকথিত ‘ধর্ম’ নামে আখ্যা লাভ করেছে, যা এক সময় সমাজকে ধরে রেখেছে, কোন কোন ক্ষেত্রে এগিয়েও নিয়ে গেছে—ব্যাপক মানুষকে রক্ষা করেছে উচ্ছৃংখলতা ও নৈতিক অধঃপতন থেকে। মানবসমাজের পক্ষে এই ধর্ম ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজন ছিল—যদিও তার ভিত্তি ছিল অবৈজ্ঞানিক এবং—তা বিকৃত ভাবে, ব্যাপক মানুষের স্বার্থের পরিপন্থীরূপে সমাজের ক্ষমতাশালী কয়েকজ[illegible] ব্যব[illegible] হয়েছে। সমাজের বিকাশের ধারাবাহিকতায় আজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বিংশ শতাব্দীতে এইসব অবৈজ্ঞানিক চিন্তার অধিকাংশেরই কোন সামাজিক উপযোগিতা না থাকলেও শুধুমাত্র অন্ধ বিশ্বাসের জন্য ব্যাপক মানুষ, এবং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই শাসকশ্রেণী, এদের সময়োপযোগী পরিবর্তন না ঘটিয়ে অচল সনাতন হিসেবে এগুলোকে টিকিয়ে রেখে সমাজবিকাশের গতিকে রুদ্ধ করতে চাইছে।

এ আরেক ইতিহাস।

☆ ☆ ☆

অতীতে যেমন, এখনো তেমনি সমাজের বুদ্ধিমান কৌশলী কিছু মানুষ ও শাসকশ্রেণী সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে, তথাকথিত এই ঈশ্বর বা ধর্মের নাম নিয়ে, ব্যাপক মানুষকে প্রতারিত করছে। এরা নিজেরাও হয়তো ঐ অবৈজ্ঞানিক ভ্রান্ত বিশ্বাসের শিকার, কিন্তু এদের অনেকেই তা জেনে-শুনেও* অভ্রান্ত বলে সাধারণ মানুষের কাছে প্রচার করেছে ও নিজেদের জাহির করেছে। একদিকে শাসকশক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতায় ও প্রশ্রয়ে ব্যাপক মানুষকে বোঝান হয়েছে, তাদের সুখ-দুঃখ-সমস্যা ইত্যাদির মূলে সামাজিক কোন কারণ বা শাসকশক্তির শোষণ-অত্যাচার নয়—রয়েছে অলৌকিক বা ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাব, পূর্বজন্মের কর্মফল ইত্যাদি। অন্যদিকে এই মিথ্যা প্রচারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু ধর্মীয় বুজরুকের সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্ছে—যারা নিজেদের ঈশ্বরের অবতার বা এই জাতীয় পরিচয় দিয়ে মানুষকে প্রতারিত করে এবং সরল বিশ্বাসী ভক্তবৃন্দের দেওয়া নানা দান, প্রণামী ইত্যাদিতে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে—এমন কি, বিপুল সম্পদেরও মালিক হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক নেতারা, তথাকথিত শিক্ষিত বা সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা, এমনকি তথাকথিত কিছু বিজ্ঞানীরাও এদের পেছনে

---

* জেনেশুনেও কিভাবে ব্যাপক মানুষকে শাসকশ্রেণী ঠকায় তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যাবে ২২০০ বছর আগে লেখা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে। সরলবিশ্বাসী মানুষের মধ্যে মিথ্যে প্রচার চালিয়ে কোথাও দেবতার আবির্ভাবের কথা বলা হত এবং ভক্তদের দেওয়া প্রণামী আত্মসাৎ করা হত। যেমন, বলা হয়েছে "কোনও প্রসিদ্ধ পুণ্যস্থানে ভূমিভেদ পূর্বক দেবতা নির্গত হইয়াছেন, এই ছলে সেখানে রাত্রিতে বা নির্জনে একটি দেবতার বেদি স্থাপন করিয়া ও এই উপলক্ষ্যে উৎসবাদি ও মেলা বসাইয়া সেই স্থানে শ্রদ্ধালু লোকের প্রদত্ত ধন দেবতাধ্যক্ষ গোপনে রাজসমীপে অর্পণ করিবেন" অথবা "দেবতাধ্যক্ষ (অর্থাৎ প্রধান পুরোহিতস্থানীয় ব্যক্তি) ইহাও প্রচার করিতে পারেন যে উপবনে একটি বৃক্ষ অকালে পুষ্প ও ফলযুক্ত হইয়াছে এবং ইহা হইতেই সেখানে দেবতার আগমন নিশ্চিত হইয়াছে।" (কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ; ৫ম অধিকরণ, ২য় অধ্যায়, ৯০তম প্রকরণ। 'উৎসমানুষ' পত্রিকা থেকে সংগৃহীত) অবতার বানিয়ে ধর্ম ব্যবসা, রাস্তার ধারে শনি বা শিবঠাকুর গজিয়ে ফেলা ইত্যাদির মধ্যেও একই সচেতন ব্যবসায়িক বুজরুকি কাজ করে। সম্প্রতিকালে সচেতনভাবে অবৈজ্ঞানিক চিন্তা বা কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেওয়ার উদাহরণও রয়েছে। ১৯৮০ সালে পশ্চিমবঙ্গে সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে সরকারী ছুটি ঘোষণা ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া বা ১৯৮২ সালে 'দুর্গাপূজা-কালীপূজার' তারিখ নির্ধারণে কেন্দ্রীয় সরকারের পজিশনাল অ্যাস্ট্রনমি সেন্টার বা বিশুদ্ধ পঞ্জিকার তারিখকে না গুরুত্ব দিয়ে অবৈজ্ঞানিক পঞ্জিকাকে গুরুত্ব দেওয়া ইত্যাদি ঐ ধরনের উদাহরণের কয়েকটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জড়ো হয় এবং ধনী ব্যবসায়ী, চোরাকারবারী ইত্যাদিরা—মানুষকে ঠকিয়ে বা শোষণ করে যে বিপুল অর্থের মালিক হয় তার কিছু অংশ (কালো টাকার কিছু অংশকে 'পুণ্য কাজে' নিয়োগ করার সবকার অনুমোদিত ব্যবস্থাই রয়েছে) এইসব অবতারদের পাদপদ্মে ঢেলে দেয়। সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষ অবতারটির প্রতি আস্থাশীল হয়ে ওঠে। দৈনন্দিনজীবনে অসহায়তা, অনিশ্চয়তা, সমাজে নালিশ শোনার বা সমস্যা সমাধান করার লোকের অভাব, নিজেদের অজ্ঞতা ইত্যাদি নানা কারণে সব মিলিয়ে ব্যাপক মানুষ ঈশ্বর আর অবতারদের উপর বিশ্বাস সৃষ্টি করে ও বজায় রাখে, রোগে-শোকে-দুঃখে যে বিশ্বাস কিছু নিরর্থক ভরসা দেয়, অথবা গভীর বিশ্বাসের কারণে মানসিক সাহস দেয়। কিন্তু এটিই সাধারণ মানুকে বুঝতে দেয় না যে নিজেদের নানা সমস্যার মূলে রয়েছে সামাজিক নানা কারণই— সামাজিক বৈষম্য, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির শোষণ ও চক্রান্ত, অনুন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্ক ইত্যাদি অর্থাৎ এই শোষণজীবী সমাজ ব্যবস্থা। এইভাবে এই ঈশ্বর-বিশ্বাস ও গুরুবাদ বা অবতারবাদ মানুষকে নিজের সমস্যার উৎসকে উপলব্ধি করা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে ও এইভাবে সমস্যা সমাধান করা থেকে বিরত করে এবং স্বার্থপুষ্ট করে মুষ্টিমেয় কিছু শোষকদের ও শাসকশ্রেণীর, রুদ্ধ করে সমাজবিকাশের বৈজ্ঞানিক পথকে।*

আর এইভাবেই ঈশ্বরবিশ্বাস ও অবতারগণ প্রকৃত অর্থে ব্যাপক মানুষের শত্রুই।

[তবে কোন কোন সময় দেখা যায়, এইসব তথাকথিত অবতারদের মধ্যে কেউ কেউ মানুষকে ঠকিয়ে নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ধান্দা করার জন্য নয়,— বরং ধর্ম, ঈশ্বর ইত্যাদি সম্পর্কিত নিজেদের সরল ও ভ্রান্ত বিশ্বাসকেই অভ্রান্ত জ্ঞান করে তাকে মানুষের মঙ্গলের জন্যই কাজে লাগাতে চান। আত্মসম্মোহনের জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতিতে এঁরা নিজেদের কোন কোন দেবতার বা ঈশ্বরের দূত বা অবতার বলে ভাবতে থাকেন, ক্রমশঃ নানা ধরনের মানসিক বিভ্রান্তি বা হ্যালুসিনেশনের জন্ম হয়! কেউ কালীঠাকুরের কথা ভাবতে ভাবতে কালী-ঠাকুর দেখেন, কেউ দেখেন কৃষ্ণ, কেউ বা দেবদূত—কেউ বা নিরাকার ঈশ্বরকে উপলব্ধি

* এ প্রসঙ্গে মহাশ্বেতাদেবীর একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। ৭০-এর দশকে পশ্চিমবাংলা তথা ভারতীয় উপ-মহাদেশ জুড়ে যে ব্যাপক বিপ্লবী আন্দোলন আমাদের দেশের শাসক শ্রেণীর ভিতকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল ও তাদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল তার প্রতিক্রিয়ায় শাসকশ্রেণী জনগণকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করার যে সব কৌশল অবলম্বন করে তার অন্যতম ছিল এই অবতারদের ঢালাও প্রশ্রয় দান। তিনি বলেছেন, "এই সময় কালেই ভারতবর্ষে সন্তোষী মা, সাঁইবাবা, মহেশযোগী ইত্যাদি নতুন মা-বাবাদের আবির্ভাব এবং আনন্দময়ী, অনুকূল ঠাকুর প্রমুখ প্রাচীন মা-বাবাদের নতুন নতুন করে বহুব্যাপী বিচরণ, অর্থাৎ গুরুবাদের আপিম দিয়ে জাতিকে মজিয়ে রাখার জঙ্গী কর্মসূচীর শুরু।" (সত্তর দশক ও তারপরে; শারদীয় অনুষ্টুপ, ১৯৮১) ঐ আন্দোলনের তাৎক্ষণিক সাফল্য অর্জনে ব্যর্থতা সমাজে যে ব্যাপক আশাভঙ্গ ও শূন্যতা সৃষ্টি করে সেটিও হয়তো জনগণকে অবচেতনভাবে বাধ্য করে এইসব 'আপিম' -এ ডুবে থাকার চেষ্টা করতে—এর সঙ্গে অবশ্যই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দুরবস্থাগুলি সম্পৃক্তভাবেযুক্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেন বলে মনে করেন। সঙ্গে কিছু দার্শনিক কথাবার্তাও বলেন এবং সমাজের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় সময়োপযোগী সমাজসংস্কারমূলক ও নৈতিক উপদেশাদি দেন—যা সমাজকে সুশৃঙ্খল করতে কিছুটা সাহায্য করে। বিশেষ দেশে, বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতি ও প্রয়োজনে এদের কেউ কেউ সমাজে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ডঃ কোভুরের ভাষার 'ঠক বা বুজরুক' এঁরা নন। যদিও এঁরা নানা পরস্পরবিরোধিতা এবং ভ্রান্ত ও অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের শিকার, তবু এঁরা মানুষের ভাল করার ইচ্ছাতেই অনেক ভাল ভাল কথাও বলেন বা কাজ করেন, তাই সমাজও ইতিহাসে মূল্যবান ভূমিকাও রাখেন ও স্থায়ী স্থান লাভ করেন। যীশুখ্রীষ্ট, গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর, মহম্মদ, শ্রীরামকৃষ্ণ ইত্যাদিদের এই দলে ফেলা যায়।]

লোক ঠকিয়ে ব্যবসা করা বুজরুক শয়তান 'অবতারদের' মুখোশ নির্মমভাবে টেনে ছিঁড়েছেন ডঃ কোভুর। তিনি দেখিয়েছেন সত্য সাঁইবাবা, নীলকান্ত বাবা, পন্দ্রিমালাই স্বামীগাল, আচার্য রজনীশ, ভাদলামুদি, তীর্থংকর, গুরুদেব মুক্তানন্দ, নির্মলাদেবী, ত্রিপ্রায়ার যোগিনী, পূজ্য দাদাজি, স্বামী চিন্ময়ানন্দ, আনন্দমূর্তি, গুরু মহারাজজি প্রমুখ নানা তথাকথিত অবতারগণের অলৌকিক ক্ষমতার দাবী সর্বৈব মিথ্যা। এরা তথাকথিত যে সব অলৌকিক কাজ করে দেখায় তা লোকঠকানো ভেলকি বা ম্যাজিক ছাড়া কিছুই নয়, কখনো থাকে তাদের নিজেদের মানসিক অস্বাভাবিকত্ব বা দক্ষ মানসিক চিকিৎসকের মত সরল ভক্তদের সম্মোহিত করার ব্যাপারটা। নিজের এই বৈজ্ঞানিক মতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ডঃ কোভুর দেশবিদেশের এই সব অবতারদের সামনে লক্ষ টাকার বাজি রেখেছিলেন—তা আগেই বলা হয়েছে। কয়েকজন চিঠি দিয়ে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণের কথা জানিয়েছিল। কিন্তু কেউই শেষ অব্দি নিজেদের অলৌকিক ক্ষমতাকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করার মত সৎসাহস দেখায়নি—তার কারণ একটিই,—তারা জানত সত্যিই এ ধরনের কোন ক্ষমতা তাদের নেই।

একজন সফল অবতার হওয়ার জন্য কি কি গুণের প্রয়োজন —তা বলতে গিয়ে ডঃ কোভুর বলেছেন, **প্রথমতঃ,** প্রয়োজন কিছু অর্থহীন গালভরা বুলি উপযুক্ত দক্ষতার সঙ্গে ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে তোতাপাখির মত আউড়ে যাওয়ার ক্ষমতা—যেমন, আত্মমুক্তি, আত্মারশুদ্ধি, আত্মোপলব্ধি, ত্যাগ, তিতিক্ষা, পরমপ্রাপ্তি, দেবশক্তি, মহাপ্রজ্ঞা, অতীন্দ্রিয় মানস, কর্মযোগ, নির্বাণ, মোক্ষ, কুণ্ডলিনী ইত্যাদি ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ, ম্যাজিসিয়ান সুলভ কয়েকটি লোক ঠকানো কৌশল আয়ত্ত করা প্রয়োজন, যেমন, শূন্যে হাত নেড়ে ফুল, ছাই, সন্দেশ ইত্যাদি বের করা, নিজের নাড়ী 'বন্ধ' করে দেওয়া, হঠাৎ সুগন্ধের সৃষ্টি করা, কারোর পোশাকের ভিতরে কি আছে বা বাড়ীতে কি ঘটেছে তা আচমকা বলে দিয়ে চমকে দেওয়া ইত্যাদি। (আর এসবের সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত বা উদাস চাউনি, এলোমেলো পোশাক, পাগল পাগল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাব, নিজের পায়খানা খেয়ে ফেলা বা এই ধরনের কিছু অস্বাভাবিক আচরণ ইত্যাদি এবং কথাবার্তার মাধ্যমে ভক্তদের সম্মোহিত করার ক্ষমতা কিছুটা অর্জন করলে তো সোনায় সোহাগা—তাকে আর ঠেকায় কে ?)

তৃতীয়তঃ যেটি সবচেয়ে দরকারী তা হল কিছু প্রচারক দালাল। এরা অবতারটির মাহাত্ম্য সম্পর্কে নিজের ও অন্যদের অভিজ্ঞতার কথা, মুখে মুখে, সংবাদপত্র-রেডিও-টেলিভিশন ইত্যাদি প্রচার যন্ত্রে, তাদের গল্প-কবিতা-উপন্যাস ইত্যাদি 'সাহিত্য-কীর্তির' মাধ্যমে রগরগে করে প্রচার করতে থাকবে। কখনো কখনো এরা কাজ করবে অবতারটির সঙ্গে আর্থিক ভাগবাঁটোয়ারার চুক্তির বিনিময়ে, আবার কখনো নিজেদের সরল বিশ্বাস জনিত নির্বোধ বিশ্বাসের প্রেরণায়।

চতুর্থতঃ, অবশ্যই প্রয়োজন চারপাশে বিপুল সংখ্যক সরল, বোকা ও অশিক্ষিত, যুক্তিবুদ্ধিহীন, অসহায় ও নির্বোধ ধর্ম-বিশ্বাসীর দল যারা প্রণামী, নৈবেদ্য ও সরল বিশ্বাস নিয়ে অবতার-ব্যবসাকে ফাঁপিয়ে তুলবে নির্দ্বিধায়। ভারতবর্ষ সহ পৃথিবীর বহু দেশেই এ ধরনের অসহায় লোকের অভাব তো নেইই বরং তাদের সংখ্যাই বেশী এবং এ সংখ্যা কমানোর সক্রিয় প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে এখনো শুরু হয় নি। ডঃ কোভুরের ভাষায়, একটি পচেগলে যাওয়া মৃতদেহের চারপাশে যেমন অজস্র মাছি জড়ো হয় তেমনি এই সব লোকেরা এই তথাকথিত অবতারদের চার পাশে জমা হতে থাকে।

(সাধারণ মানুষের আস্থা, সম্মান, সহানুভূতি ও সম্ভ্রম আদায় করে সফলভাবে ব্যবসা করার জন্য এই সব অবতাররা বা তাদের প্রতিষ্ঠানগুলি **আরেকটি কৌশলও** অবলম্বন করে ;— তা হল লোক ঠকানো ধর্মব্যবসায়ে আয় করা বিপুল পরিমাণ অর্থের কিয়দংশ স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের কাজে অথবা দুর্যোগ পীড়িত সাধারণ মানুষের ত্রাণকার্যে ব্যয় করা। সাধারণ মানুষের কিছু সমস্যার সাময়িক সমাধানের ক্ষেত্রে এবং ধর্মীয় প্রেরণায় ধর্মীয় কর্মীদের একনিষ্ঠ কিছু কাজ একদিক থেকে নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য, কিন্তু মূলগত অর্থে তা সাধারণ মানুষের ক্ষতিই করে। ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কিত অবৈজ্ঞানিক চিন্তায় সাধারণ মানুষের চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে ও আস্থা বাড়িয়ে তুলে, এই ধরনের কাজ মানুষকে বৈজ্ঞানিকভাবে সচেতন ও স্বনির্ভর হতে এবং নিজেদের দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য, অশিক্ষা, দুর্দশা ইত্যাদি সমস্যার মূল কারণ জেনে তাকে বৈজ্ঞানিকভাবে ও স্থায়িভাবে দূর করতে বাধা দেয়। অর্থাৎ মানুষের মূল সমস্যাকে বজায় রেখে কিছু সংস্কারমূলক কাজের মধ্যেই নিজেদের এবং ব্যাপক মানুষদের আটকে রাখে। সাঁইবাবা, অনুকূলচন্দ্র, রজনীশ, গুরু মহারাজজী প্রমুখদের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলি এবং বহু দেশী-বিদেশী ধর্মপ্রতিষ্ঠান এই কায়দা গ্রহণ করে। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে অর্থউপার্জন করা কিছু ধনী ব্যক্তির অর্থ-বিনিয়োগের অন্যতম ফসল বিভিন্ন ব্যাংক, বেসরকারী সঞ্চয় প্রতিষ্ঠানগুলিও নিজেদের ব্যবসায়িক অস্তিত্বকে সুরক্ষিত করতে এদের হাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাত মেলায় —ধর্ম প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা, হাসপাতাল বানান ইত্যাদির মত চোখে ঠুলি পরান কাজে টাকা বিনিয়োগ করে। ঐ ধরনের সেবামূলক কাজ ধর্মের নাম না করে, সমাজ ও প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে করলেই তা সাধারণ মানুষের প্রকৃত উপকার করবে। যেমন বন্যাত্রাণের কাজ গেরুয়া পরে বা কোন ধর্মীয় মিশনের জয়গান প্রচার না করেও করা যায় এবং একই সঙ্গে কেন আমাদের দেশে চক্রাকারে খরা, বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জানিয়ে মানুষকে সচেতন করা উচিত।)

হে পাঠক! আপনি যদি বেকার হন এবং মানবজাতি ও মানব সমাজের সর্বনাশ করতে উচ্ছুক হন, তবে উপরোক্ত সব কাজগুলি সুনিপুণভাবে করে বা ঘনিষ্ঠ কাউকে দিয়ে করিয়ে রমরমা অবতার ব্যবসা বা ধর্ম -ব্যবসা শুরু করতে পারেন। চাকুরি বা অন্য ব্যবসা করার প্রয়োজন হবে না,—যেমন করছে বেশ কিছু অবতাররা।

সত্য সাঁইবাবা

এদেরই একজন হচ্ছে সাঁইবাবা। সিল্কের গেরুয়া আলখাল্লায় ঢাকা, ঝাঁকড়া চুলওয়ালা এই লোকটির ভক্ত সংখ্যা বিপুল। এইসব ভক্তরা বাবার 'অলৌকিক ক্ষমতার' পরিচয় পেয়ে তার পায়ে গদ্গদ্ হয়ে লুটিয়ে পড়ে। এই ক্ষমতার অন্যতম হচ্ছে শূন্যে হাত নেড়ে সুগন্ধি 'পবিত্র' ছাই বা বিভূতি বের করা। ব্যাপারটি যে ম্যাজিসিয়ানসুলভ একটি নিছক হাতসাফাই তা দেখানোর জন্য ডঃ কোভুর নিজেই বহুবার প্রকাশ্য জনসমাবেশে একইভাবে ছাই সৃষ্টি করেছেন।* কখনো বা হতবাক হয়ে দেখছেন, কিছু যুক্তিবুদ্ধিহীন, সরল মহিলা এই ছাই ডঃ কোভুরের অলৌকিক ক্ষমতা-প্রসূত, পবিত্র সৃষ্টি মনে করে শ্রদ্ধাভরে ব্যাগে তুলে রাখছেন। তিনি তাঁদের জানিয়েছেন এ ছাই নিছকই ঘুঁটে পোড়ান ছাই, কোন পবিত্র সৃষ্টি নয়, তিনি এটি লুকিয়ে রেখেছিলেন এবং বলেছেন, "আগে যদি আমার শরীর পরীক্ষা করে দেখা হত তবে আমার চালাকিটা ধরা পড়ত। সত্য সাঁইবাবা এভাবে তার শরীর পরীক্ষা করতে দেবে না, কারণ সে চায় না তার চালাকিটা এভাবে ধরা পড়ে যাক।"

কোন ভক্তের বাড়ীতে রাখা সাঁইবাবার ছবি থেকেও নাকি সুগন্ধি ছাই বা বিভূতি ঝরে পড়ে। ডঃ কোভুর এ ব্যাপারটিরও অনুসন্ধান করেন। কলম্বোর শ্রীমতী কার্থিসান

---

*যাদুকর জুনিয়ার পি. সি. সরকারও সাঁইবাবার এই ম্যাজিকের ব্যাপারটি প্রমাণ করেছেন। তিনি প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে যান, কিন্তু তাঁকে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। পরে পরিচয় না দিয়ে একজন সাধারণ ভক্তের মত তার কাছে যান ও প্রণাম করেন। সাঁইবাবা তাঁকে দেখে অন্যান্যদের মত শূন্যে হাত নেড়ে 'পবিত্র ছাই' বের করে তাঁকে দিল। অন্য নির্বোধ ভক্তের মত ভক্তিতে গদ্গদ্ হয়ে সাঁইবাবার পায়ে লুটিয়ে না পড়ে শ্রী সরকার সাঁইবাবার মতই শূন্যে হাত নেড়ে একটি রসগোল্লা তৈরি করে সাঁইবাবাকে দেন। এভাবে নিজের 'অলৌকিক' চালাকিটি ধরা পড়ে যাওয়ায় সাঁইবাবা আতঙ্কে চীৎকার ক'রে স্থান ত্যাগ করে। (১৬.৪.৭৮. তারিখের ইংরেজী সাপ্তাহিক 'সানডে' অনুসারে)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামে এক সাঁইবাবা-ভক্তের বাড়ীতেও নাকি ছবির নীচে এইভাবে গাদা গাদা ছাই ঝরে পড়ত। অনুসন্ধানে ডঃ কোভুর সুনিশ্চিত হন যে, অন্ধবিশ্বাস-প্রসূত মানসিক ভারসাম্যহীনতার বশে অবচেতনভাবে ঐ ভদ্রমহিলা নিজেই ছাই রাখতেন এবং পরে ভাবতেন তা ঝরে পড়েছে। ভদ্রমহিলার স্বামীকে লেখা চিঠিতে ডঃ কোভুর জানালেন, "যে শত শত ভৌতিক ক্রিয়াকলাপের আমি অনুসন্ধান করেছি সেগুলির মত আপনার বাড়ীতে সাঁইবাবার ছবির নীচে তথাকথিত ছাই-ঝরে পড়ার ব্যাপারটাও আপনার স্ত্রীর অবচেতন মনের কার্যকলাপ ছাড়া কিছুই নয়—ভ্রান্ত ধারণার ফলে সৃষ্টি হওয়া মানসিক রোগের কারণে তিনি নিজেই এ কাজ করেছেন। এই তথাকথিত অলৌকিক ঘটনার পেছনে আপনার স্ত্রীর ভূমিকাটি নিজেই পরীক্ষা করে দেখে নিতে পারেন, যদি সাঁইবাবার ছবিটি আপনি অন্য জায়গায় কয়েকদিন লুকিয়ে রাখেন। ভক্তিভরে বা ছবিটির পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে আপনি যদি একাজ না করেন ও রহস্যটির মূলে না যান তবে আপনার অবহেলার কারণে আপনার স্ত্রীর আরো মানসিক বিকৃতির জন্য আপনিই দায়ী থাকবেন।"*

সাঁইবাবার অ্যাপেন্ডিসাইটিসের জন্য অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল। এত অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী সর্বশক্তিমান এক অবতারের কেন রোগ হবে, বা তা যদি হয়ও, তবে তার চিকিৎসার জন্য অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্য না নিয়ে নেহাতই বস্তুতান্ত্রিক, বৈজ্ঞানিক ও লৌকিক চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্যই বা নেওয়া হবে কেন? এ সব কথা বলায় সাঁইবাবার ভক্তরা তো ডঃ কোভুরের ওপর রেগে আগুন। এমন কি এক ডাক্তারভক্ত নির্বোধের মত লিখেই ফেল্লো যে, সাঁইবাবা নিজের অ্যাপেন্ডিক্সটির অস্ত্রোপচার আদৌ করান নি, আসলে আরেক ভক্তের অ্যাপেণ্ডিসাইটিস হয়েছিল—করুণাভরে ভগবান সত্য সাঁইবাবা ভক্তের রোগগ্রস্ত অ্যাপেন্ডিক্সটির সঙ্গে নিজের সুস্থ অ্যাপেন্ডিক্সটি বদলা-বদলি করে নেয়; নিজের শরীরে ধারণ করা ভক্তের এই অসুস্থ অ্যাপেন্ডিক্সটিই সাঁইবাবা নাকি অস্ত্রোপচার করে বের করে দিয়েছে ইত্যাদি। ব্যাপারটি যে হাস্যকরভাবে গাঁজা তা যে কোন সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তিই বুঝতে পারবেন। কোন ধরনের অস্ত্রোপচার ছাড়া এইভাবে একজনের শরীরের কোন অংশের সঙ্গে

* ম্যাজিসিয়ান জুনিয়ার পি. সি. সরকারও সাঁইবাবার ছবি থেকে এইভাবে ছাই বা বিভূতি ঝরে পড়ার ব্যাপারে অনুসন্ধান করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, কোন ছবির গায়ে বা কাঁচে ল্যাকটিক অ্যাসিড ক্রিস্টাল একটু সুগন্ধি মাখিয়ে ঘষে দিলে, পরে সেটি বাতাসের সংস্পর্শে এসে গুঁড়ো গুঁড়ো ছাই -এর মত ঝরে ঝরে পড়বে। এটিকেই বিভূতি নাম দেওয়া হয়। শুধু সাঁইবাবা নয়, যে কোন লোকের বা জীবজন্তুর বা অন্য কোন কিছুর ছবি থেকেই এভাবে বিভূতি ঝরান যায়। এতে সাঁইবাবার অলৌকিক মাহাত্ম্যের কোন ব্যাপার নেই। সাঁইবাবার ছবিতেও এ জাতীয় রাসায়নিক কারসাজি করে, সদ্যকেনা ছবি থেকে বিভূতি ঝরিয়ে সরল ভক্তদের প্রাথমিক আস্থা অর্জন করার চেষ্টা করা হয়। (সানডে, ১৬.৪.৭৮. অবলম্বনে) এছাড়া মারকিউরাস ক্লোরাইডের সংস্পর্শে এনে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু প্রথমে গরম হয়ে যায় এবং পরে ছাই -এর আকারে পদার্থ তৈরী হয়। অনেকে এটিকেও কাজে লাগিয়ে ভেল্কি দেখায় (আর এই গরম হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটিকে 'আধ্যাত্মিক বা অলৌকিক তেজ' বলে চালায়)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের শরীরের কোন অংশ বদলাবদলি করার কোন পদ্ধতি এখনো পৃথিবীতে কোন চিকিৎসক বা বৈজ্ঞানিক জানেন না। খোসপাঁচড়া, যক্ষ্মা বা কুষ্ঠ জাতীয় কোন রোগ কোন ব্যক্তি আরেকজনের শরীর থেকে গ্রহণ করতে পারেন—যদি তিনি ঐ রোগীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে থাকেন, যদি তাঁর রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কম থাকে ইত্যাদি কারণে—কিন্তু এর ফলে প্রথম ব্যক্তির রোগটি আদৌ কমে না। সাঁইবাবার ঐ ক্ষমতা যদি থাকত তবে বড় বড় হাসপাতালে হৃদপিন্ড, কিডনি ইত্যাদির দেহান্তরকরণের জন্য বহু ব্যয় করে জটিল অস্ত্রোপচার করার প্রয়োজন থাকত না—সাঁইবাবার কাছে কিছু লোককে 'অলৌকিক ট্রেনিং' দিইয়ে নিয়ে অত্যন্ত কম ব্যয়ে ও সহজে কাজটি করা যেত। আর যে লোক একজনের শরীরের একটি অংশের সঙ্গে নিজের শরীরের একটি অংশের বদলাবদলি করার মত দুরূহ কাজটি করতে সক্ষম, সে ঐ অংশের অর্থাৎ অ্যাপেণ্ডিক্সের সামান্য প্রদাহ (inflammation) ঠিক করতে পারল না— এটিও আশ্চর্যজনক। সাঁইবাবার ডাক্তার-ভক্তের দাবি যে মিথ্যা ও অন্ধভক্তিপ্রসূত তা বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। * এই অন্ধ ভক্তিভরেই এক ভক্ত বলেছে সাঁইবাবার পবিত্র ছাই মেখে তার হার্নিয়া ভাল হয়ে গেছে। কেউ বলেছে, কোন যন্ত্রপাতি ছাড়াই বাবা তার ওপর 'অস্ত্রোপচার' করে রোগ সারিয়ে দিয়েছে। কেউ বলে 'ভগবান' এরোপ্লেনের ককপিটে হাজির হয়ে দুর্ঘটনা থাকে বাঁচিয়েছে, পেট্রোল ছাড়া গাড়ি চালিয়েছে ইত্যাদি। সিলোন ডেলি

AMARBOI.COM

* ভক্তের কোন রোগকে নিজের শরীরে গ্রহণ করার ব্যাপারটি অবতার বা 'ভগবানের দূতদের' একটি পুরনো প্রচার। এর দ্বারা সরল ভক্তদের আস্থা অর্জন করা যায়। দুরারোগ্য রোগে যারা ভোগে তারা বহু চিকিৎসার বিফল হয়ে অবশেষে শেষ জীবনে কিছু নিশ্চিন্ত শান্তি লাভের জন্য 'ভগবান' তথা অবতারের পাদপদ্মে নিজেকে সমপর্ণ করে। আর কখনো যদি ঐ অবতারের কতাবার্তর সম্মোহনী প্রভাবে বা তার দেওয়া কোন গাছগাছড়ার ওষুধে রোগকষ্টের কিছুটা লাঘব হয় তবে তো কথাই নেই—আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ে বাবার মাহাত্ম্য। হাজারে তা একটি হলেও বিফলতার ৯৯৯টি উদাহরণকে ছাপিয়ে যায় ঐ একটি সাফল্যের প্রচার। এই সাফল্য ঘটার পেছনেও বাবার কোন অলৌকিক ভূমিকা নেই—বাস্তব কারণপ্রসূতই তা ঘটে।

আর শুধু সাঁইবাবা নয়, প্রায় সব অবতারই ভক্তের রোগ গ্রহণ করার কথা সাড়ম্বরে প্রচার করে ও মিথ্যা কথা বলে। যেমন প্রয়াত শ্রী শ্রী অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের এই কথাটি ধরা যাক, "..এই যেমন আমার অসুখ হল। হল কেন ? ঐ জামতলার ঘরে, ভাল মানুষ শুয়ে আছি। ব্লাডপ্রেসার নেই, কিছু না। হঠাৎ অসুখ হয়ে গেল। তার মানে, তখন কেবল প্যারালিসিস -এর রোগী আনতে লাগল আমার সামনে। তার মধ্যে একজন আবার কয়েই ফেল্ল, 'বাবা! আমার রোগটা আপনি নেন। আপনি ভোগ করতে পরবেন। আমি আর পারছিনে।' তার থেকে এই অসুখ।" ('সৎসঙ্গ' -এর পক্ষ থেকে প্রচারিত মাসিক পত্রিকা 'আলোচনা', বৈশাখ, ১৩৮৮) আসলে এরা ভক্তের রোগ কখনোই নেয় না, নিজের রোগ হলে সেটি ভক্তের কাছ থেকে নেওয়া বলে চালিয়ে দেয় ও এভাবে প্রচার করতে থাকে। অন্যান্য অবতারদের মত এই অনুকূলচন্দ্রও নিজের সম্পর্কে ও তার ভক্তরা তাদের গুরুটি সম্পর্কে হাস্যকর অনেক কিছুই প্রচার করে। এরকম এক ভক্ত ডঃ রেবতীমোহন বিশ্বাস The Guide বইতে বলেছেন, ছোট বেলা থেকেই অনুকূলচন্দ্রের মধ্যে "অসাধারণ গুণাবলী" দেখা যায় যেমন তাড়াতাড়ি হাঁটতে শেখা, প্রাণচাঞ্চল্য, হাসি খুশী ভাব ইত্যাদি। সত্যিই অসাধারণ বটে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিউজ (২৭.৪.৭০) -এ এক ভক্ত একবার জানাল যে সাঁইবাবা একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে, এতে পাশ্চাত্য ডিগ্রীধারী অনেক ডাক্তার আছেন; একই সঙ্গে সাঁইবাবাও নাকি রোগীদের চিকিৎসা করে, তবে বিনা ঔষধে—শুধুমাত্র তার শক্তিশালী আধ্যাত্মিক শক্তিদ্বারা। সাঁইবাবা যেখানে চিকিৎসা করতে পারছে, সেখানে পাশ্চাত্য ডিগ্রীধারী ডাক্তারের প্রয়োজন কি—নাকি ঐ ডাক্তাররা ওষুধ বা অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি ছাড়া পবিত্র ছাই -এর সাহায্যে চিকিৎসা করছেন?

সাঁইবাবার এরকমই এক ভক্তের সিদ্ধিলাভের ফলে পাওয়া অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ দেখার জন্য ১৯৭৩ সালের ১১ই জুলাই সিংহলের র‍্যাশন্যালিস্ট অ্যাসোসিয়েশানের বিশেষ সভা ডাকা হয়েছিল। শ্রীথিরুশাভুক্কারাসু নামে অ্যাসোসিয়েশানের এক সদস্যের ব্যবস্থাপনায় এটি করা হয়। ইনি ঐ ভক্তকে নিয়ে আসছিলেন। কিন্তু পথে এক সময় বিপদ বুঝে সুযোগমত ভক্তটি আরেক মহিলা ভক্তের সঙ্গে কেটে পড়ে। সভার লোকেরা হতাশ হলেও শ্রীচন্দ্রসেনা নামে এক ম্যাজিসিয়ান সাঁইবাবার তথাকথিত নানা অলৌকিক কাজ করে দেখালেন। সাঁইবাবার এক প্রাক্তন ভক্তের মতে শ্রীচন্দ্রসেনা সেদিন শূন্যে হাত নেড়ে যে পরিমাণ ছাই বের করেছেন তা সাঁইবাবার সৃষ্টি করা ছাই-এর থেকে অনেক বেশী।

সাঁইবাবা বা এইসব অবতারদের ভক্তদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ ছাড়া এরকম লোকও রয়েছে যারা সমাজে 'বৈজ্ঞানিক বা বিশিষ্ট ব্যক্তি' বলে পরিচিত। এ ধরনের দু'চারজন ভক্তের সাহায্যে এইসব অবতারদের পক্ষে ব্যাপক মানুষের চোখে ঠুলি পরাবার কাজ সহজ হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ ভাবে এতবড় একজন 'বৈজ্ঞানিক' বা বিখ্যাত লোক যে কথা বলছেন তা কি আর মিথ্যা হতে পারে? এ ধরনেরই একজন 'বৈজ্ঞানিক' ছিলেন ডঃ এস. ভগবন্থম্, এম. এস. সি., ডি. এস. সি., পি. এইচ. ডি.। ইনি ছিলেন ভারত সরকারের প্রাক্তন বিজ্ঞান উপদেষ্টা। তিনি জানালেন সাঁইবাবার নানা অলৌকিক কাজ দেখে অভিভূত হয়ে তিনি তাঁর অবিশ্বাস দূর করে সাঁইবাবার ভক্ত হয়ে গেছেন। এই ধরনের একটি অলৌকিক কাজের বর্ণনা তিনি দিয়েছেন এইভাবে—

"কয়েক বছর আগে জাপানের এক বিশ্ববিখ্যাত ঘড়ি প্রস্তুত কারক সংস্থার কর্তাস্থানীয় ব্যক্তি ভারতে এসে যে বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তা সম্ভ্রম জাগায়। সিকো ঘড়ি তৈরী করার পর তিনি আরো উন্নত ধরনের একটি ঘড়ির মডেল তৈরি করে নিজের আলমারির ভেতর রাখেন পরবর্তী পরীক্ষাদির জন্য। এরপর ভারতে এসে তিনি নিছক কৌতূহলবশতঃ সাঁইবাবার আশ্রমে তাঁর দর্শনে আসেন। ভক্তদের মধ্যে এই জাপানী ভদ্রলোককে দেখে সত্য সাঁইবাবা শূন্য থেকে একটি পার্সেল সৃষ্টি করে তাঁকে দেন। পার্সেলটি খুলে হতবাক হয়ে তিনি দেখলেন, ওর ভেতর রয়েছে জাপানে আলমারিতে রেখে আসা ঘড়ির ঐ মডেলটি; ঘড়ির সঙ্গে বাঁধা সিল্কের ফিতে ও ঘড়ির নতুন নাম লেখা লেবেলটিও সঙ্গে রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব দেখে সাঁইবাবার ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর সমস্ত সন্দেহ মিলিয়ে গেল। তিনি সাঁইবাবার পায়ে লুটিয়ে পড়ে তাঁর পূজা করলেন। এরপর থেকে তিনি ভগবান সাঁইবাবার একজন একনিষ্ঠ ভক্ত। জাপানে ফিরে এসে তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন আলমারির ভেতর ঘড়িটি নেই। তাঁর ব্যক্তিগত সচিব যা জানালেন তা আরো বিস্ময়কর। সচিব জানালেন যে, মাথায় ঝাঁকড়া চুলওয়ালা দেবসদৃশ এক ব্যক্তি একদিন অফিসের ভেতর হেঁটে আসেন, তারপর আলমারি খুলে ঘড়িটি নিয়ে বেরিয়ে গেছেন।"

ডঃ ভগবন্তমের মত একজন কথাকথিত বৈজ্ঞানিক এই গাঁজাখুরি গল্পটি বিনা অনুসন্ধানে বিশ্বাস করলেন ও তা প্রচার করছেন দেখে ডঃ কোভুর ঘটনাটির সত্যতা যাচাই-এর জন্য তাঁকে চিঠি দিয়ে সিকো প্রস্তুতকারক ঐ জাপানী ভদ্রলোকের নাম-ঠিকানা জানতে চাইলেন। বারবার চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও ডঃ ভগবন্তম কিন্তু কোন উত্তর দেননি। অবশেষে ডঃ কোভুর শ্রীলংকার জাপানী দূতাবাস থেকে সিকো কোম্পানীর ঠিকানা জোগাড় করলেন এবং কোম্পানীর প্রেসিডেন্টকে পুরো ঘটনাটি জানিয়ে জানতে চাইলেন তিনি বা তাঁর কোম্পানীর কেউ সাঁইবাবার সঙ্গে কোনদিন দেখা করেছিলেন কিনা, তাঁর কোম্পানীতে সত্য সাঁইবাবার কোন ভক্ত আছেন কিনা ইত্যাদি। এর উত্তর এল এই রকম—

ডঃ এ. টি. কোভুর
পামানকাডা লেন
কলম্বো-৬, শ্রীলংকা

কে হাট্টোরি এ্যাণ্ড কোং লিঃ
৫, কোয়োবাশি ২ কোমে চুওকু
টোকিও-১০৪
৮ই নভেম্বর, ১৯৭৩

প্রিয় ডঃ কোভুর,

আপনার ৩০শে অক্টোবরের চিঠির জন্য ধন্যবাদ। অস্বাভাবিক ক্ষমতার দাবি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালানোর ব্যাপারে আপনার আগ্রহের আমি প্রশংসা করছি। কিন্তু আপনি আপনার চিঠিতে মি. সাঁইবাবা নামে যে ভদ্রলোকের ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন, তাঁর সম্পর্কে আমি বেশী কিছু জানাতে পারছি না। আমার বা আমাদের কর্মচারীদের কারোর সঙ্গেই এই ভদ্রলোকের কখনো পরিচয় হয়নি। আমি নিশ্চিত যে, যে ঘটনার কথা আপনি বলেছেন তার কোন ভিত্তি নেই। তাই ঐ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি যেসব প্রশ্ন করেছেন, সেগুলির উত্তরে 'না' বলা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই।

আপনার একান্ত
কে হাট্টোরি এ্যান্ড কোং লি
স্বাঃ শোজি হাট্টোরি
প্রেসিডেন্ট

এই চিঠির খবর জানিয়ে ডঃ কোভুর আবার ডঃ ভগবন্তমকে চিঠি দিলেন এবং

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানতে চাইলেন যে, তিনি যে জাপানী ভদ্রলোকের কথা বলেছেন তিনি অন্য কেউ কিনা। না, এরও কোন উত্তর আসেনি। অবশেষে ডঃ কোভুরকে বাধ্য হয়ে বলতে হয়েছে, "আমার এই বিশ্বাসকেই সুনিশ্চিত করতে হল যে, বুজরুক সত্য সাঁইবাবার সঙ্গে যোগসাজস করে ডঃ ভগবন্থম মিথ্যে প্রচার চালাচ্ছেন এবং এর পেছনে রয়েছে সংকীর্ণ উদ্দেশ্য ও নিজের স্বার্থ।"

ডঃ কোভুরের মতে এই সব তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা তাদের বিজ্ঞানের পেশাকে ত্যাগ করে ভক্ত বনে যায় তার কারণ তারা দেখে যে, এই ধর্মব্যবসায়ে অর্থোপার্জন ও খ্যাতি অর্জন অতি সহজে অনেক বেশী হয়। পাশাপাশি এটিও ঠিক যে, তথাকথিত বৈজ্ঞানিকদের অনেকেই প্রকৃত অর্থে বৈজ্ঞানিক চেতনাসম্পন্ন হয়ে ওঠেন না—যার মূলে রয়েছে দেশের সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থা। নিজেদের অবৈজ্ঞানিক মানসিকতার ফলে দৈনন্দিন জীবনের নানা হতাশা, জটিলতা বা একঘেঁয়েমি থেকে মুক্তি পাবার আশায় এঁরা নানা ধরনের আজগুবি, ভিত্তিহীন ধর্মীয় বিশ্বাস বা বুজরুকির শিকার হন এবং নির্বোধ সরল বিশ্বাস নিয়ে একটি নিস্পৃহ, শান্ত জীবনযাপন করতে থাকেন।

অবতারদের নানাধরনের দালালের মধ্যে সাংবাদিকদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এরা বিভিন্ন সংবাদপত্র ও প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে অবতারটির স্বপক্ষে বক্তব্য রেখে বিপুল সংখ্যক মানুষকে বিভ্রান্ত করে। সাঁইবাবার সঙ্গে যুক্ত এরকম একজন হচ্ছেন বিখ্যাত'ব্লিৎস' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ করঞ্জিয়া। ১৯৭৬-এর ১লা মে তারিখের 'ব্লিৎস'-এ তিনি লিখেছেন, "কুণ্ডলিনী শক্তি আয়ত্ত করে একজন যোগী সিদ্ধিলাভ করতে পারেন এবং জীবন ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর, প্রকৃতির অদৃশ্য শক্তির উপর, নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতা অর্জন করতে পারেন,—এটিই অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক ক্ষমতা,...শূন্যে ভাসা, রোগ ও মৃত্যু থেকে মুক্তি লাভ করা, মানসিক শক্তিতে রোগ আরোগ্য করা, পৃথিবীর যে কোন স্থানে আবির্ভূত হওয়া, চিরন্তন যৌবন উপভোগ করা, যত খুশী বড় বা ছোট আকার ধারণ করা, যত খুশী ভারী বা হাল্কা হয়ে যাওয়া, সমস্ত বস্তুকে শাসন করতে পারা, এমন কি জীবন-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পুনর্জন্ম ও কষ্টের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া। এই ধরনের এক বা একাধিক অলৌকিক কাজ করতে সক্ষম শত শত, হাজার হাজার বা তারও বেশী জীবন্ত অবতারদের উদাহরণ ভারতে রয়েছে।...ভারতীয় বা বিদেশীদের লেখা সত্য সাঁইবাবার ডজন খানেক জীবনীগ্রন্থে এ ব্যাপারটিকে সমর্থন করা হয়েছে। বর্তমানকালে বিজ্ঞান হারিয়ে যাওয়া মানসিক ক্ষমতা ও মানসিকশক্তির ঘটনাবলীকে উদ্ধার করেছে। বর্তমানে ভারতে এ ব্যাপারটি নতুন কিছু নয়। কারণ ৫০০০ বা তারও বেশী বছর সময় ধরে ভারতে প্রকৃতির এই প্রাথমিক নিয়মটি জানা রয়েছে।"

ডঃ কোভুর মন্তব্য করেছেন, "কেবলমাত্র নির্বোধরাই বিশ্বাস করবে যে কুণ্ডলিনী যোগের সাহায্যে মানুষ মৃত্যুকে জয় করতে পারে বা চিরন্তন যৌবনে বেঁচে থাকতে পারে। গত ৫০০০ বছর বা আরও বেশী সময় ধরে ভারতে যদি কুণ্ডলিনী পদ্ধতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানা থাকে তবে এখানে ৫০০০ বছর বা তারও বেশী বয়সের কুণ্ডলিনী যোগী নিশ্চয়ই রয়েছেন। মি. করঞ্জিয়া এ ধরনের একজনকে খুঁজে দিতে পারেন কি ?"*

কির্লিয়ান পদ্ধতিতে তোলা একটি ছবির চারপাশে উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা দেখিয়ে মিঃ করঞ্জিয়া বলেছেন এটি 'বায়োপ্লাজমা' বা ঐশ্বরিক মহাজাগতিক শক্তির ফলে সম্ভব। ডঃ কোভুর বলেছেন, "তাঁর এই অবাস্তব বিশ্বাসের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি খোঁজার জন্য মিঃ করঞ্জিয়া মানুষের চিন্তা চেতনাকে বিকৃতকারী কয়েকজন রাশিয়ানের সমর্থনও খোঁজেন।...কির্লিয়ান পদ্ধতিতে জড় বা প্রাণী যারই ছবি তোলা হোক না কেন তার চারপাশে আলোকচ্ছটা দেখা যেতে পারে। এর সঙ্গে যার ছবি তোলা হচ্ছে তার প্রাণের কোন সম্পর্ক নেই। আমার কাছে দু'টি ধাতুমুদ্রার কির্লিয়ান পদ্ধতিতে তোলা ছবি রয়েছে। এদের চারপাশেও উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা দেখা যাচ্ছে। মিঃ করঞ্জিয়া বলতে পারেন এদের মধ্যেও বায়োপ্লাজমা বা প্রাণাবরণ রয়েছে।"*

ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সাঁইবাবার ওপর একটি ১২ জনের অনুসন্ধান কমিটি (Saibaba Exposure Committee) করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ডঃ নরসিমহাইয়া ছিলেন এর উদ্যোক্তা এবং ডঃ কোভুর ছিলেন এর সভাপতি। এই অনুসন্ধান কার্যকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে ব্লিৎস-এ সাঁইবাবার ওপর ভক্তিরসে ভরা একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছিল (৩১.৭.৭৭)।

ব্লিৎস-এ সাঁইবাবার একটি বাণী প্রকাশ করা হয়েছিল—" আমি প্রতারণা করি

---

*মিঃ করঞ্জিয়া ২২.৩.৮১. তারিখের 'সানডে'তেও একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন "ব্যাপক অর্থে আমি একজন মার্কসবাদী। কিন্তু এ দেশে কম্যুনিষ্টরা ব্যর্থ হয়েছে কারণ তারা কখনই এই বিদেশী গাছটিকে ভারতের মাটিতে গভীরভাবে প্রোথিত করার চেষ্টা করে নি।" এই "মার্কসবাদী" করঞ্জিয়া এরপর বলেছেন, "এদেশের রয়েছে সুবিপুল আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য...সম্প্রতি যোগ-এর মাধ্যমে আমি এর ভেতরে প্রবেশ করেছি। উদাহরণস্বরূপ, আমরা দু'জন এখানে বসে আছি এবং আমাদের চারপাশে রয়েছে বিপুল মহাজাগতিক শক্তি আর আমরা জানিনা কিভাবে একে কাজে লাগাব। এইসব কিছুই আমাকে ভারতীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট করেছে এবং সাঁইবাবার মধ্যে এই মহাজাগতিক শক্তির কিছু বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই।" নিজেকে 'মার্কসবাদী' বল্লেও করঞ্জিয়া যে আদৌ তা নন তা যে কোন মার্কসবাদীই বুঝতে পারবেন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ যে মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তিস্বরূপ সেই বৈজ্ঞানিক চিন্তা করঞ্জিয়া ও ধরনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কথার বিরোধিতাই করে।

*বিভিন্ন ঠাকুর-দেবতা বা 'অবতারদের' ছবিতে মাথার বা শরীরের চারপাশে প্রায়শঃই আলোকচ্ছটা দেখা যায়। ব্যাপারটা নিছকই শিল্পীর কল্পনায় আঁকা বা ছবি তুলে তার চারপাশে ভক্তিভরে এঁকে দেওয়া। কির্লিয়ান পদ্ধতিতে তোলা ছবিতেও এ ধরনের আলোকচ্ছটা দেখা যায়। এই পদ্ধতির স্রষ্টা রুশ বৈজ্ঞানিক এস. ডি. কির্লিয়ান ও তাঁর স্ত্রী ভ্যালেন্টিনা। ১৯৬৪ সালে তাঁদের এ পদ্ধতি বিশ্বস্বীকৃতি পায়। সহজভাবে বল্লে, এই পদ্ধতিতে দুটি ধাতুর প্লেটের মধ্য দিয়ে উচ্চশক্তির বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয়। দুটি প্লেটের মাঝে কোন জৈব বা ধাতব বস্তু ইত্যাদিকে রেখে তার পেছনে একটি ফটোগ্রাফিক ফিল্ম্ রেখে দিলে চারপাশে উজ্জ্বল আলোকচ্ছটাসহ বস্তুটির ছবি উঠে যায়। এটি ঘটে বস্তুটি একটি বিশেষ বৈদ্যুতিক চরিত্র পায় বলে। পদ্ধতিটিকে বিভিন্ন কৌশলে প্রয়োগ করে এই ধরনের নানা ছবি তোলা সম্ভব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, সৃষ্টি করি।" কর্ণাটকের একজন মন্ত্রীও সাঁইবাবার ওপর এই অনুসন্ধান কাজে বাধা দিয়েছিলেন। এইসব লোকেদের জন্যই সাঁইবাবার মত বুজরুকরা তাদের ধর্মব্যবসা চালিয়ে যেতে পারে নির্দ্বিধায়।

[এই ধরনের বিখ্যাত ভক্তদের মধ্যে আরো অনেকেই আছেন। ১৯৮১-এর জুলাই মাসে 'মালিনী' নামে একটি বাংলা সাময়িক পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছিল পণ্ডিত রবিশংকর নাকি বলেছেন যে, সাঁইবাবা তাঁকে শূন্য থেকে বিভূতি ও হীরেরআংটি সৃষ্টি করে দিয়েছিল। যদি সাঁইবাবার সত্যিই এই ক্ষমতা থাকে তবে ভারতবর্ষের হত-দরিদ্র অনাহারক্লিষ্ট মানুষদের প্রত্যেককে এই রকম হীরের অংটি দিলেই ভাল হয়—ওঁরা ওটি বিক্রি করে বেশ কিছুদিন ভালমন্দ খেয়ে বাঁচতে পারেন। তা না করে পণ্ডিত রবিশংকরদের মত লোককে দেওয়া কেন? স্পষ্টতঃই এভাবে আংটি বের করানটা প্রকৃতপক্ষে ছাই বা রসগোল্লা বের করবার মতই বুজরুকি,—শরীরে লুকিয়ে রেখে ম্যাজিসিয়ানের কায়দায় বের করা। যাই হোক এর পর থেকেই নাকি পণ্ডিত রবিশংকর সাঁইবাবার একনিষ্ঠ ভক্ত। একই ভাবে বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় সুনীল গাভাসকার, গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ ও তাঁর স্ত্রী কবিতা বিশ্বনাথও সাঁইবাবার ভক্ত—গুরুর অলৌকিক মাহাত্ম্যের বলে ও বিভূতি খেয়ে খেলায় নিজেদের সাফল্য সম্ভব হয়েছে বলে বলেছেন। এ যদি সত্যি হয় তবে কেনই বা এঁরা মাঝে মাঝে শূন্য রানে আউট হন? নিজস্ব ক্ষেত্রে এঁদের দক্ষতা যেমন প্রশংসার্হ তেমনি হাস্যকর তাঁদের এই ধরনের যুক্তি-বোধহীন অবৈজ্ঞানিক উক্তি।]

অধ্যাপক কস্তুরির লেখা সাঁইবাবার জীবনীতে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে সত্য সাঁইবাবা এক বালতি জলে আঙ্গুল ডুবিয়ে জলকে পেট্রলে বা ডিজেলে পরিণত করেছিল। ডঃ কোভুর মন্তব্য করেছেন যে, এই ধরনের ঘটনা তো ভারত বা শ্রীলংকার মত অনুন্নত দেশের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ! সত্য সাঁইবাবাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কোন নদীর জলে আঙ্গুল ডোবাতে বল্লে তো, নদীর সব জল পেট্রল বা ডিজেলে পরিণত হবে, দূর হবে দরিদ্র দেশের জ্বালানি সমস্যা। মন্ত্রীরা এইসব অবতারদের মদৎ দিচ্ছেন,—তাই তাঁদেরই উচিত দেশের এসব সমস্যা সমাধানে সাঁইবাবাদের কাজে লাগান। তা করা হচ্ছে না, তার একটিই কারণ—ব্যাপারটি সর্বৈব মিথ্যা। আর যেহেতু মিথ্যা, তাই সরকারের উচিত এ ধরনের লোক ঠকানো ব্যবসা বা প্রতারণামুলক প্রচারকে আইন করে ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে বন্ধ করা।*

---

* কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থাদি যে বৈজ্ঞানিক চিন্তার স্বপক্ষে দৃঢ়ভাবে কাজ করবে না তা স্পষ্ট। যেমন এই খবরটি, "মাধাপা বংগা রাও আবার সেনসর সমস্যায় পড়েছেন। শ্রীসত্য সাঁইবাবার মত দেখতে একজন বাবা-কে তিনি তাঁর 'প্রজাশক্তি' সিনেমায় রূপায়িত করেছেন, সেই চুল, সেই চেহারা। বাবা-কে একজন প্রতারক হিসেবে দেখানো হয়েছে। এতে সাঁইবাবার ভক্তরা ক্ষেপে গিয়ে সেনসর বোর্ডের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছে। ফিল্মটিকে রিভাইজিং কমিটিতে পাঠান হয়েছে। কিন্তু মাধাপা বংগা রাও দৃঢ়ভাবে বলেছেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্য সাঁইবাবা এক বাচ্চাকে কৃষ্ণের অবতার বলে ঘোষণা করেছিল—এর নাম দেওয়া হয়েছিল সাঁইকৃষ্ণ। বহু লোক এই নতুন অবতারটির দ্বারা প্রতারিত হতেও শুরু করেছিল। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে চালাকিটি প্রকাশ করার পর তা বন্ধ হয়ে গেছে।

পাঠক বন্ধুরা ! সাঁইবাবার কথা আর না। আসুন সাঁইকৃষ্ণের কাছে।

[এখানে সাঁইবাবার ব্যাপারটি কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। এর কারণ এই নয় যে, ব্যক্তিগতভাবে সাঁইবাবার ওপর কোন আক্রোশ রয়েছে বা সাঁইবাবা বুজরুক-চূড়ামণি। বরং সাঁইবাবাকে অবতারদের মধ্যে একটি প্রতীকী উদাহরণ হিসেবেই নেওয়া ভাল। তার ব্যাপারগুলোর সবকটিই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে অন্যান্য অবতাররাও অতীতে করেছে বা এখনো করে থাকে। তাদের ঐ কাজের ক্ষেত্রেও পূর্বোক্ত কথা ও বিশ্লেষণগুলি একইভাবে প্রযোজ্য।]

সাঁইকৃষ্ণ

কর্ণাটকের পাণ্ডবপুরের ৬ বছরের বাচ্চা ছেলে কিট্টি। সাঁইবাবা ও বাচ্চাটির মা-বাবা তাকে দাবি করলো কৃষ্ণের অবতার বলে। সাঁইবাবার ভজনের সময় তার নাকি ভর হয়, সে নাকি শূন্য থেকে পবিত্র ছাই,, মধু, টাকা, সাঁইবাবার ছবি ইত্যাদি তৈরী করতে পারে। এর স্বপক্ষে প্রমাণ দিতে ডঃ জি ভেংকটরাও নামে ব্যাঙ্গালোরের এক ভক্ত ডঃ কোভুরের এক লাখ টাকার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন এবং ভারতে ডঃ কোভুরের মনোনীত ব্যক্তি ইণ্ডিয়ান র‍্যাশন্যালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদকের কাছে ১০০০ টাকা জমা দেন। সাঁইকৃষ্ণের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি ডঃ কোভুরকে লিখলেন, "... আমার এই অলৌকিক শিশুটি শুধু ছাই, কুমকুম, মধু ইত্যাদিই সৃষ্টি করবে না, সে খামে পোরা টাকার নোটের নাম্বারও পড়ে দেবে। এটি তার কাছে একটি সাধারণ ব্যাপার। ওকে দেখলে আপনারা সন্তুষ্ট হবেন এবং পুরস্কারের এক লাখ টাকা দিতে বাধ্য হবেন। এই শিশু আমাকে বলেছে যে আপনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভের জন্য লালায়িত। সে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, যে সম্মান আপনার আপাতত আছে তা আপনি হারাবেন। ফল ভোগ করবেন খুব শিগগিরই।"

কঠোরভাবে তিনি সেনসর বোর্ডের সব নিয়ম মেনে ছবিটি তৈরি করেছেন। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই ছবিটির প্রকৃত লক্ষ্য। 'বিপ্লব সংযম' ছবির ক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে তিনি যেটি করেছেন, সেই অনশন ধর্মঘট করার হুমকি তিনি দিয়েছেন। শিগগিরই সেনসর বোর্ড ছবিটির অনুমোদন না দিলে তিনি একাজ করতে বাধ্য হবেন বলে জানিয়েছেন।" (সানডে; ১৭-২৩ অক্টোবর, ১৯৮২) কুসংস্কার ও বুজরুক অবতারদের বিরুদ্ধে নিয়মানুগ প্রচার করতে গেলেও বাধা আসে—তার জন্য অনশন ধর্মঘটের প্রয়োজন হয়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সংবাদটি বহুল প্রচারিত হয়। ফলস্বরূপ লক্ষ লক্ষ নির্বোধ মানুষ সাঁইকৃষ্ণের আশীর্বাদ নিতে ছুটে আসে। রমরমা হয়ে ওঠে তার অবতার ব্যবসা। কিন্তু কর্ণাটক র‍্যাশন্যালিস্ট অ্যাসোসিয়েশানের সভাপতি অধ্যাপক এ. এম. ধর্মলিঙ্গম যখন চ্যালেঞ্জ গ্রহণের পরবর্তী ধাপ হিসাবে সাঁইকৃষ্ণকে পরীক্ষা করতে যান তখন ডঃ রাও পিছিয়ে গেলেন। বাচ্চাটির সঙ্গে তাঁদের দেখা করতেই দেওয়া হল না! অবশেষে জামানতের ১০০০ টাকাটি বাজয়াপ্ত হয়ে গেল। ডঃ রাও পরে নির্লজ্জভাবে বল্লেন, "বাচ্চাটি বলেছে ডঃ কোভুরের এক লাখ টাকার প্রয়োজন তার নেই। বরং ডঃ কোভুরের যদি প্রয়োজন থাকে তবে সে-ই এই টাকা তৈরি করে তাঁকে দিতে পারে।" আসলে নিজের ব্যাপারটি ধাপ্পা জেনে-শুনেও ডঃ রাও-রা ব্যাপক প্রচার করে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন একটিই কারণে, তা হল সরল মানুষদের টেনে এনে ব্যবসাটিকে ফাঁপিয়ে তোলা।

[ডঃ জি ভেংকটরাও সম্পর্কে ডঃ কোভুর অন্যত্র বলেছেন ('মুখবন্ধ' দ্রষ্টব্য) তিনি নাকি শেষ অব্দি বাচ্চাটির চালাকি ধরতে পারেন এবং জামানতের টাকা ফেরত চান।]

ডঃ কোভুরও সুনিশ্চিত হলেন যে তা ব্যাপারটি ধাপ্পা ছাড়া আর কিছুই নয়। শেষ অব্দি ব্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ও পরমাণু বিজ্ঞানী ডঃ এইচ. নরসিমহাইয়ার সভাপতিত্বে ১২ জনের অনুসন্ধানকারী দলগঠন করা হল—এতে বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও মনস্তাত্ত্বিক, উকিল ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন।

১৯৭৬ সালের ১৫ই জুলাই বৃহস্পতিবার এই দলের কয়েকজন সদস্য বিনা নোটিসে হঠাৎ সাঁইকৃষ্ণের বাড়ী গিয়ে হাজির হন। তাঁরা বেছে বেছে ঐ দিনই গিয়েছিলেন কারণ এটি সাঁই-ভজনার বিশেষ দিন, ঐদিন সাঁইকৃষ্ণ নানা অলৌকিক কাণ্ডকারখানা দেখায়। কিন্তু এ দিন কোন অলৌকিক কাণ্ড ছাড়াই ভজন শেষ হয়ে গেল। স্পষ্টতঃই, তার কারণ একটিই,—তা হল ঐদিন অন্ধবিশ্বাসী ভক্তরা ছাড়াও সন্দেহপ্রবণ, তীক্ষ্মদৃষ্টি অনুসন্ধানী দলও ছিল,—যাঁরা যে কোন ধরনের চালাকি সকলের সামনেই ধরে ফেলতেন। যাই হোক, সাঁইভজনার ব্যাপারটি মিটে যাওয়ার পর সবাই যখন চলে যাচ্ছে, তখন অনুসন্ধানকারী দলের জনৈকা সদস্যা, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ (শ্রীমতী) বিনোদা মূর্তি লক্ষ্য করলেন যে সাঁইকৃষ্ণ কোমরের কাছটা চেপে আছে। "কি হয়েছে খোকা? তোমার পেট ব্যথা করছে?" তিনি জিগ্যেস করলেন। "হ্যাঁ", বাচ্চাটি জানাল। তখন তিনি ওর কাছে গিয়ে ওর কোমরের কষিটা আলগা করে দিলেন। আর তারপরই তার জামা ও বেনিয়ানের ভাঁজ থেকে প্রচুর ছাই বেরিয়ে পড়ল। পরিষ্কার হয়ে গেল কিভাবে বাচ্চাটি ছাই লুকিয়ে রেখে তা সুকৌশলে, ধূপ-ধুনোর আড়ালে অন্ধ ভক্তদের সামনে বের করায় এবং এটাকেই তার অলৌকিক ক্ষমতা বলে চালায়। এইভাবে চালাকি ধরা পড়ে যাওয়ার পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাঁইকৃষ্ণের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। সাঁইবাবাকেও যদি এইভাবে পরীক্ষা করা যায় তাহলেও তার পোশাকের ভেতর একই কারসাজি আবিষ্কার করা যাবে।

নীলকান্ত বাবা

এ তথাকথিত অবতারদের আরেক জন। সাঁইবাবা বা অন্যান্য অবতারদের মত এরও নাকি নানা অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে। শ্রীলংকার একটি পত্রিকায় নীলকান্ত বাবার জনৈক ভক্ত ১৯৭১ সালে একটি প্রবন্ধে বাবার নানা "অলৌকিক বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা" বর্ণনা করে। লক্ষণীয় যে আরো অনেকেই ঠিক একই ধরনের অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা বা শক্তির দাবি করে। ভক্তবর্ণিত বাবাজির 'ক্ষমতাগুলি' এই রকম—

১। "একবার ভগবান নীলকান্ত বাবাজির চোখ দিয়ে যখন জল পড়ছিল তখন উল্টোদিকের দেওয়ালে টাঙ্গানো শিবের একটি ছবির চোখ থেকেও জল পড়তে দেখা গেছে।"

—যদি ঐ ভক্ত আদৌ এটি ঘটতে দেখে থাকে তবে তা দৃষ্টি বিভ্রম বা বাবাজির সম্মোহনীশক্তি অথবা ম্যাজিসিয়ান সুলভ কোন চাতুরী ছাড়া কিছুই নয়। কথা নেই বার্তা নেই একটি প্রায় নীরস কাগজের ছবির চোখ দিয়ে জল সাধারণভাবে বেরুতে পারে না। যদি সত্যিই বেরিয়ে থাকতে দেখা গিয়ে থাকে তবে ছবিটি উল্টোলে হয়তো দেখা যেত ছবিতে ফুটো করে পেছনে কোন কারিকুরি করা আছে।

২। "শূন্য থেকে সৃষ্টি করা ছাই এক অন্ধ বালকের চোখে ঘষে দিয়ে বাবাজি তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।"

—শূন্য থেকে ছাই সৃষ্টি করার রহস্য আগেই বলা হয়েছে। ঐ ছাই ঘষে বিনা খরচে যদি সত্যিই কোন অন্ধের দৃষ্টি ফিরে আসে তবে বাবাজি পৃথিবীর সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হতে পারতো। প্রতিবন্ধীবর্ষ সার্থকভাবে উদ্‌যাপনের জন্য বাবাজিকে লাগান যেত। ভারতবর্ষে তাহলে এত অন্ধ কেন ? বাবাজির গোঁড়া ভক্তেরা বলতে পারে যে প্রকৃত ভক্তই আসলে এইভাবে চোখে ছাই-য়ের ঘষা পাওয়ার 'সৌভাগ্য' অর্জন করতে পারে এবং এই ধরনের বুজরুকরা এইভাবেই ব্যাপারটায় গোঁজামিল দেয়।

৩। "বাবাজীর আদেশে তামিলনাড়ুর একটি নদীর জল সরে গিয়েছিল, যাতে বাবাজী গাড়ী নিয়ে নির্বিঘ্নে পেরিয়ে যেতে পারেন।"

—মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে বয়ে যাওয়া নদীর জলকে শুধু কথা বলে সরিয়ে দেওয়া যে অসম্ভব তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। যুদ্ধের সময় এ বাবাজিকে ফ্রন্টে নিয়ে গিয়ে কাজে লাগালে নদী পেরুনোর জন্য আর সেতু বাঁধা ইত্যাদির প্রয়োজন থাকবে না—সারা দেশে এত সেতু, বাঁধ ইত্যাদি তৈরির জন্য অর্থব্যয় করার প্রয়োজনও থাকবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪। "একই সময়ে ভগবান (নীলকান্তবাবা) বিভিন্ন স্থানে আবির্ভূত হয়েছিলেন।"

—নিছক মিথ্যে কথা। দু'জায়গায় বাবাজিকে নিশ্চয়ই একজন লোকই দেখে নি, দেখেছে অন্তত দু'জন লোক। এদের মধ্যে যে কোন একজন হয় ইচ্ছে করে মিথ্যে কথা বলেছে অথবা দৃষ্টিবিভ্রম বা ম্যাজিক-এর শিকার হয়েছে। যাদুকর পি.সি. সরকারও এই জাতীয় ম্যাজিক দেখাতেন এবং তাকে অলৌকিক ক্ষমতা না বলে ম্যাজিকই বলেছেন!

৫। "ভগবান (নীলকান্তবাবা) একবার গাড়ী করে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় এক জঙ্গলের ধারে পেট্রোল ফুরিয়ে যাওয়ায় গাড়ীটিকে থামাতে হয়। তখন ভগবান নিজে গাড়ীর স্টীয়ারিং ধরলেন এবং তারপর ২৩ মাইল ঐ অবস্থাতেই গাড়ীটিকে চালিয়ে পরবর্তী পেট্রোল পাম্পে নিয়ে গেলেন।"

—ডঃ কোভুর প্রশ্ন করেছেন যে, এই ড্রাইভিং জানা ভগবানটি অলৌকিক ক্ষমতাবলে যদি পেট্রল ছাড়া ২৩ মাইল গাড়ী চালাতে পারে তবে বাকী রাস্তাটাই বা পারবে না কেন?

৬। "অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল নাগেশকে বাবাজির পাকস্থলীতে সৃষ্ট একটি শিবলিঙ্গ উপহার দেওয়া হয়েছিল।"

—একটি চূড়ান্ত হাস্যকর ঘটনা! পাকস্থলীতে পাথর সৃষ্টি হয় না। তাই শিবলিঙ্গের আকারে কোন পাথর পাকস্থলী থেকে বেরুনো অসম্ভব। (এই ধরনের কোন এক বাবাজির পিত্তথলির পাথরের জন্য অস্ত্রোপচার করে যদি প্রায় শিবলিঙ্গের আকারের কোন পাথর বেরুত—তাকেও ভক্তদের পক্ষে বাবাজির অলৌকিক মহিমা বলে চালানো বিচিত্র নয়।) এক হতে পারে, দীর্ঘকালীন অভ্যাসের পর বাবাজি হয়তো ছোট্ট কোন শিবলিঙ্গ মুখের পেছনে লুকিয়ে রেখেছিল (যেমন অনেক স্মাগলার হীরা ইত্যাদি লুকিয়ে রাখে)। পরে সেটি উগরে দিয়ে বলল যে পাকস্থলী থেকে বের করেছে।

৭। "রাজ্যপাল নাগেশের যখন লণ্ডনের একটি অপারেশন থিয়েটারে অস্ত্রোপচার চলছিল, তখন ভগবান (নীলকান্তবাবা) সেখানে আবির্ভূত হয়ে দর্শন দিয়েছিলেন।"

—অপারেশন থিয়েটারে জীবাণুসংক্রমণের বিরুদ্ধে কঠোর সাবধানতা না নিয়ে বাইরের লোকের ঢোকা একেবারেই বারণ, বিশেষ পোষাক তার জন্য পরতে হয়। বাজাজি কি ডাক্তার, নার্স বা কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে অ্যাপ্রন ইত্যাদি পরে অপারেশন থিয়েটারে ঢুকেছিলেন? তা না করে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে ভেতরে ঢোকা একেবারেই অসম্ভব। ঢুকে থাকলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্যরা তাকে বের করে দিতেন! একটাই সম্ভাবনা—রাজ্যপাল নাগেশ বাবাজিটির অন্ধ ভক্ত, অপারেশনের আগে ভয়ে গুরুর নাম নিচ্ছিলেন একাগ্রভাবে। এই ভাবে একসময় তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম (visual

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

hallucination) ঘটে—তাঁর মনে হয় যেন গুরুদেব এসে তাঁকে আশীর্বাদ করছে। অন্য কারোর এই বিভ্রম না ঘটায় আর কারোরই 'বাবাজি এসেছে' বলে ভ্রান্ত ধারণা হয়নি। আর এই অন্ধ বিশ্বাস ও বিভ্রমের বশেই অস্ত্রোপচারের পর বৃদ্ধ ভক্ত রাজ্যপাল বাইরে এসে ব্যাপারটিকে বাবাজির অলৌকিক মহিমা বলে ঢালাও প্রচার করেছেন ভক্তিবশে। রাজ্যপাল যা বলছেন সাধারণ মানুষ তাকে মিথ্যে বলে কি করে! একাগ্রভাবে কোন বিশেষ কিছু নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ভাবলে (যেমন ঘটে তপস্যা ইত্যাদিতে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে অস্বাভাবিক রাসায়নিক বিক্রিয়ার দরুন নানা ধরনের বিভ্রম (hallucination)-এর যে সৃষ্টি হতে পারে—এটি পরীক্ষিত ঘটনা।

৮। "ভগবান (নীলকান্ত বাবা)-এর আশীর্বাদ নিতে এলে ভগবান নীলকান্ত বাবা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণনকে শূন্য থেকে শিবলিঙ্গ তৈরী করে দিয়েছেন।"

—এ ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য ডঃ কোভুর শ্রীমতী গান্ধীর কাছে চিঠি দিয়েছিলেন। এর উত্তর এল এই রকম—

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর

AMARBOI.COM

নং—পি.এম.এস. ২৫৫৯৪
মি. আব্রাহাম টি কোভুর
সম্পাদক, দি সিলোন র‍্যাশন্যালিস্ট অ্যামব্যাসাডার
৮৯, পামানকাডা লেন, কলম্বো—৬

নিউ দিল্লী
২২শে নভেম্বর, ১৯৭১,

প্রিয় মহাশয়,

আপনার ১৮ই নভেম্বর, ১৯৭১ তারিখের চিঠির উত্তর এটি। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে,—প্রধানমন্ত্রী নীলকান্ত বাবাজির দর্শনে গিয়েছিলেন এবং তিনি শূন্য থেকে শিবলিঙ্গ তৈরি করে প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছিলেন—এই গল্পের মধ্যে কোন সত্যতা নেই।

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাঃ এন. কে সেশান
প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব

এইভাবে নীলকান্তবাবাজির একটি সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচারের আসল স্বরূপটি নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত কোন ব্যক্তিতে ভক্ত বানিয়ে সাধারণ, সরল বিশ্বাসী মানুষকে আকৃষ্ট করার কৌশল অনেকেই নেয়। ডঃ কোভুরের মত অনুসন্ধান করলে দেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাবে তাদের অধিকাংশই মিথ্যা। দু'একটি ক্ষেত্রে সত্যি হওয়ার কারণ, ঐ বিখ্যাত ব্যক্তিটিও অবৈজ্ঞানিক চিন্তা তথা নানা কুসংস্কারের শিকার, তাই তিনিও স্বাভাবিকভাবেই ঐ ধরনের বুজরুক অবতারের শিকার অর্থাৎ ভক্তে পরিণত হন।

এ প্রসঙ্গে ডঃ কোভুর, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, "আমি যে সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছিলাম তখন ভারত পাকিস্থান যুদ্ধ চলছে। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড ব্যস্ত। কিন্তু এত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি কেন এত তাড়াতাড়ি আমাকে উত্তর দিলেন? কারণ, তাঁর বাবারই মত একজন যুক্তিবাদী হওয়ার জন্য শ্রীমতী গান্ধী ব্যাপারটার জরুরী দিকটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সঙ্গে সঙ্গেই যদি এই ধরনের কাল্পনিক গালগল্পকে অস্বীকার না করা হয় তবে তা লক্ষ লক্ষ সরল মানুষদের মধ্যে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে।" এখানে বলে রাখা ভাল—প্রয়াত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও কিন্তু এই সব অবতারদের বা ধমকর্মের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নির্বাচনে জেতার জন্য, পুত্রের মঙ্গলের জন্য ইত্যাদি নানা কারণে তিনি প্রায়ই বিভিন্ন গুরু বা সন্ন্যাসীর আশীর্বাদ নিতেন, বিভিন্ন মন্দিরে পূজা দিতেন, জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হয়েছেন ইত্যাদি। শ্রীমতী গান্ধীর জ্যোতিষী প্রীতির কথা ডঃ কোভুর অন্য প্রসঙ্গে উল্লেখও করেছেন। তাই ডঃ কোভুর এখানে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে যে যুক্তিবাদী বা "rationalist" বলেছেন তা সম্পূর্ণ অপাত্রে প্রয়োগ।

AMARBOI.COM

শ্রীশিববালযোগী মহারাজ

এ ব্যাঙ্গালোরের আরেক 'অবতার'। এর সিদ্ধিলাভের বর্ণনা নিম্নলিখিতভাবে একটি সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল (অন্যান্য অনেক 'বাবাদের' ক্ষেত্রেও প্রায় এই ধরনের গল্প ছড়ান হয়)—

"তার নাম ছিল রাজু। মাত্র ১২ বছর বয়সে তার জীবন আলাদা পথে চলতে শুরু করে। একদিন সে তালবনের ভেতর দিয়ে স্নান করে ফিরছিল— এমন সময় দু'টি ফল তার সামনে পড়ল। ছোট ছেলেটি একটি তুলে নিয়ে খেতে গেল। হঠাৎ ওটা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে একটি শিবলিঙ্গের আবির্ভাব ঘটল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই শিবলিঙ্গটি একটি ৬ ফুট লম্বা মানুষে রূপান্তরিত হল। সে সত্যরাজুকে আদেশ করল বসে পড়তে। সত্যরাজু বসে পড়লে, ঐ ব্যক্তিটি তাকে মন্ত্র দিল এবং কৃচ্ছ্রসাধন করতে বলল।

"১২ বছর ধরে ঐ ছোট ছেলেটি প্রার্থনা ও কৃচ্ছ্রসাধনের পর যখন প্রস্তুত হল, তখন সে নিজেকে শ্রীশিববালযোগী মহারাজ নামে জগতের সামনে প্রকাশ করল—শুরু করল তার সতীর্থদের সেবা ও উপদেশ দান।"

ডঃ কোভুর মন্তব্য করেছেন, "এটি যথেষ্ট আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এই ধরনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবাস্তব ও কাল্পনিক গাল গল্পকে যাচাই না করে বিশ্বাস করার মত নির্বোধও রয়েছে।" হ্যাঁ, একটি ফল ফেটে শিবলিঙ্গ বেরুন ও সেটি আবার মানুষে পরিণত হওয়ার মনগড়া গাঁজাখুরি গল্পকে বিশ্বাস করার মত সরল লোকের অভাব নেই। সম্প্রতি বা অতীতের এই ধরনের বহু ঘটনাই ভারতের মত দেশগুলির অসংখ্য মানুষ যুগ যুগ ধরে বিশ্বাস করে আসছে। ব্যাপক অশিক্ষা ও অসচেতনতাই এর মুলে। তথাকথিত কিছু শিক্ষিত লোকেও এর শিকার।

একবার এই শ্রীশিববালযোগী মহারাজজি তার ভক্তদের "দর্শন" দেবার সময় পা মুড়ে উলঙ্গ অবস্থায় বসেছিল। এক প্রত্যক্ষদর্শী ভক্তের বর্ণনা অনুযায়ী, অনেকক্ষণ এইভাবে বসে থেকে মহারাজজির পা অবশ হয়ে যায়— যেমন হয় আমার-আপনার মত সাধারণ মানুষদের বেলাতেও। ফলে মহারাজজি দাঁড়াতেই পারছিল না। অবশেষে উপস্থিত ভক্ত পুরুষ ও মহিলারা উলঙ্গ গুরুর পা ম্যাসেজ করে দেওয়ায় পায়ের রক্তসঞ্চালন স্বাভাবিক হয়— ফলে সে দাঁড়াতে পারে। (উলঙ্গ অবস্থায় মহিলাদের দ্বারা ম্যাসেজ পাওয়ায় লালসায় ব্যাপারটি মহরাজজির ভান ও বিকৃত মানসিকতার লক্ষণ কিনা তাই বা কে বলতে পারে?)—শুধুমাত্র এই জাতীয় ঘটনাই প্রমাণ করতে যথেষ্ট যে, তথাকথিত সিদ্ধিলাভ করে শরীর ও মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ করার তথাকথিত অলৌকিক ব্যাপারটি আসলে ধাপ্পা ছাড়া কিছুই না।

AMARBOI.COM

শ্রীল শ্রীপন্দ্রিমালাই স্বামীগল

বোম্বাই-এর 'ভারত জ্যোতি' পত্রিকায় (২১, দালাল স্ট্রীট, ফোর্ট, বোম্বাই-১) একবার এই অবতারের অলৌকিক ক্ষমতার বিস্তৃত বর্ণনা বেরোয়। "যে অভিজ্ঞতা ভোলা যায় না," "দৈবশক্তির বিস্ময়" ও "যেখানে বিজ্ঞানও ব্যর্থ হয়"—এই তিনটি প্রবন্ধের মাধ্যমে পত্রিকার সম্পাদক সুনিপুণভাবে ব্যাপারটি তুলে ধরেন। ডঃ কোভুর লেখাগুলি পড়ে পত্রিকার সম্পাদক শ্রী এ বি নায়ারকে চিঠি দিলেন। জানালেন যে, শ্রীল শ্রীস্বামীগলের যে সব অলৌকিক ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে তা একজন সাধারণ ম্যাজিসিয়ানও করতে সক্ষম। সুতরাং কোন ধরনের চালাকি বা বুজরুকি করার সুযোগ থাকবে না এরকম একটা পরিবেশে যদি স্বামীজি ঐ কাজগুলি করতে পারে তবেই সেগুলিকে তার অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় বলে ধরা যেতে পারে। অন্যথায় বিনা অনুসন্ধানে ঐ সব কাজকর্মকে অলৌকিক বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অতীত বলে ধরে নেওয়াটা মোটেই বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়।

স্বামীজি বলেছে যে, "সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তিদের শুদ্ধি"র জন্য সে অলৌকিক কাজের নমুনা দেখাচ্ছে। তাহলে ডঃ কোভুর-এর মত একজন সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তির সন্দেহ দূর করা তথা শুদ্ধির জন্য তার সচেষ্ট হওয়া উচিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডঃ কোভুর শ্রীল শ্রীপন্দ্রিমালাই স্বামীগলকে নিম্নলিখিত চিঠি দিলেন—
শ্রীপন্দ্রিমালাই স্বামীগল
১২, শ্রীপন্দ্রিমালাই স্বামী স্ট্রীট
পণ্ডুর, ডিণ্ডিগাল
তামিলনাড়ু

তিরুভাল্লা
পানামকাডা লেন
কলম্বো—৬
১৫.৪.১৯৭১

প্রিয় স্বামীজি,

‘ভারতজ্যোতি’ পত্রিকায় আমি কয়েকটি প্রবন্ধ পড়েছি যা বর্ণনা করেছে কিভাবে আপনি আপনার সিদ্ধিবলে অলৌকিকভাবে বিভিন্ন বস্তু সৃষ্টি করেছেন।

অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার সমস্ত ধরনের দাবীকে আমি অনুসন্ধান করতে আগ্রহী। তাই আপনার সমস্ত দাবীকেও পরীক্ষা করতে দেওয়ার অনুমতি দিতে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি।

আপনার পোশাক ও শরীর ভাল করে পরীক্ষা করে দেখার পর আমি আপনাকে যে বস্তু সৃষ্টি করে দিতে বলব তা যদি আপনি দিতে পারেন তবে একজন ‘পুণ্যাত্মা’ বলে আমি আপনার শুধু পূজাই করব না, ‘প্রণামী’ হিসেবে আপনাকে ২৫০০০ টাকাও দেব।

সম্ভবত আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, ধার্মিক ব্যক্তিদের ছদ্মবেশধারী ধূর্ত প্রতারকদের বুজরুকিতে অনেক সরল বিশ্বাসী অথচ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিও প্রতারিত হন। এই ধরনের বিপদকে দূর করার জন্যই আমি ঐ সমস্ত দাবীর সত্যতাকে পরীক্ষা করতে আগ্রহী এবং আমার আন্তরিক আশা আমাদেরই মত অন্যান্য বহু মানুষের মঙ্গলের জন্য ও সত্যের স্বার্থে আপনি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

আপনার শরীরকে আমার স্পর্শের দ্বারা ‘কলুষিত’ করতে যদি আপনি না চান তবে আমি আপনার শরীর ও পোষাক পরীক্ষা করব না। তার পরিবর্তে আমি টাকার একটি নোট আপনাকে দেব। আপনি যদি ওর অবিকল আরেকটি সৃষ্টি করে দিতে পারেন তবে আপনার ‘সিদ্ধি’-তে আমি বিশ্বাস করব।

কোন অজুহাত দেখিয়ে যদি আপনি আমাকে এই সুযোগ না দেন অথবা চুপ করে থাকেন, তবে আমি যুক্তিসঙ্গতভাবে এই সিদ্ধান্তেই আসতে বাধ্য হব যে, আপনিও পুত্তাপার্থির সাঁইবাবার মত একজন বুজরুক এবং তাঁর মত বোকা মানুষদের টুপি পরাতে চান। আপনার উত্তরের প্রতীক্ষায়।

স্বাঃ আব্রাহাম টি. কোভুর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ডঃ কোভুর এর কোন উত্তর পান নি। সোজাকথায় বোঝা গেল যে, শ্রীপন্দ্রিমালাই স্বামীগলও "সাঁইবাবার মতই একজন বুজরুক।"

☆ ☆ ☆

এইসব অবতারগণ ভারতবর্ষ বা তার বাইরের অসংখ্য অবতারগণের কয়েকজন মাত্র। এদের কথা বিশেষভাবে বলা হলেও সাধারণভাবে সব অবতার তথা ধর্মগুরু, স্বামীজি ইত্যাদিদের ঐ ধরনের কাজকর্ম-কথাবার্তার ক্ষেত্রেও কথাগুলি একইভাবে প্রযোজ্য।

স্বাধীনতার আগে ভারতবর্ষের অবতারগণ প্রধানতঃ এদেশের মানুষদের ঠকিয়েই নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করত। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের বাইরে তারা নিজেদের বাজার ছড়াল। পাশ্চাত্যদেশে ভারতবর্ষের সাধারণ পরিচয় আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মের দেশ হিসেবে। এটি এখানকার অবতারদের ধর্মব্যবসায়ের পথ সুগম করেছে।

ডঃ কোভুর বলেছেন, "এই সব অবতারদের কয়েকজন বিদেশ থেকে মাঝে মাঝেই ভারতে ফিরে আসে, সঙ্গে আসে সাহেব ভক্তরা। এতে ভারতের আরো কিছু ধূর্ত লোক উৎসাহিত হয়ে গুরু, স্বামীজি, মহাত্মা, আনন্দ, বাবা, ভগবান, ঋষি, মহর্ষি, মহারাজ ইত্যাদি নানা নাম নিয়ে বিদেশে যাওয়া শুরু করে।

"এইসব অবতারদের অধিকাংশই তাদের আশাতীত অর্থ ও ধনী সাহেব-ভক্ত লাভ করেছে। এটি বর্তমানে এমন একটি লোভনীয় ব্যবসা হয়ে উঠেছে যে, ভারতের অবতারগণ ঐ দেশের পক্ষে একটি অতি উত্তম বৈদেশিক মুদ্রাঅর্জনকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। একজন সত্যিকারের যাত্রীকে বাইরে যাওয়ার পাসপোর্ট পেতে যখন অনেক ঝামেলা পোয়াতে হয় তখন অবতারদের বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রায় কোন বাধাই আসে না। অবতার ব্যবসা ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষের একটি রাষ্ট্রানুমোদিত ব্যবসা বলেই মনে হয়।"

এদেরই একজন হল **গুরু মহারাজজি**। তরুণ বয়সেই সে তার কাজ কারবার শুরু করে। তার ধূর্ত বাবা, কয়েকজন প্রচারক দালাল এবং শতশত উন্মাদ ভক্ত মিলে কিভাবে এই বালক অবতারের সৃষ্টি করেছে তা নিয়ে একটি চলচ্চিত্রও তৈরী হয়ে গেছে। পালাম বিমানবন্দরে ভারতীয় শুল্ক বিভাগের লোকেরা একবার এই বালক-অবতারকে বেআইনী স্মাগলিং-এর অপরাধে ধরেছিলেন। তার কাছে পাওয়া গেছিল প্রায় ৪ লক্ষ টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা ও ট্রাভেলার্স চেক, ৭০০০০ টাকা দামের হীরা এবং কয়েকটি ঘড়ি, যার দামও প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। ডঃ কোভুর বলেছেন, এসব সত্ত্বেও "কিন্তু হাজার হাজার মানসিক ভারসাম্যহীন হিপি, ফুল বাবু ও বিবিদের সে আকর্ষণ করতে থাকবে, কারণ এরা সব সময়েই কোন না কোন মানসিক উত্তেজক জিনিসের জন্য লালায়িত, তা সে নেশার ওষুধ বা বড়িই হোক, আর অতীন্দ্রিয় ধ্যান জাতীয় জিনিসই হোক।" এ ছেলেটি অভিনয় আর বক্তৃতায় তুখোড়, কিছু আধ্যাত্মিক কথাবার্তা তোতা পাখির মত আউড়ে যায়। এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা একদা অবতার সেজে উত্তর ভারতে জীবিকা-নির্বাহ করত। ভারতের অধিকাংশ অবতারদের মত তারও দাবী, সে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে ভারতের সমতলে 'দয়া করে' নেমে এসেছে।

বিদেশে যাদের রমরমা ব্যবসা তাদের আরেকজন হল **মহর্ষি মহেশ যোগী**। লক্ষপতি পপ-সঙ্গীতশিল্পী বিট্‌লস্‌দের ভক্ত হিসেবে পেয়ে যাওয়ায় এর অনেক সুবিধে হয়েছিল। গুরু মহারাজজি যেমন স্মাগলার হিসেবে ধরা পড়েছিল তেমনি এই মহেশ যোগী সম্পর্কেও, বিট্‌ল্‌ জন লেননের ভাষায় "বেশ জোরালো কথা শোনা গেছিল যে মহর্ষি তাঁদের এক মহিলা সদস্য মিয়া ফারাওকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করেছিল।" কিন্তু না, এসবের পরেও এদের ধর্মব্যবসা কিছুটা মার খেলেও একেবারে বন্ধ হয় নি, তার কারণ অবতার-ব্যবসায় সাফল্যের জন্য যেসব প্রয়োজনের কথা প্রথমের দিকে বলা হয়েছে, তা সবই এরা পূরণ করতে পারছে।

[বিদেশী সাহেব ভক্তদের জোগাড় করে নিজেদের ধর্মব্যবসা বাড়িয়ে তোলা এবং একই সঙ্গে এদেশের সাধারণ মানুষের সামনে তাদের হাজির করিয়ে নিজের প্রতি সম্ভ্রম ও ভক্তি আদায় করার কৌশলটি বেশ কয়েকজন ধর্মাত্মা বা অবতাররা ভালভাবেই আয়ত্ত করেছে। পাশ্চাত্যে যান্ত্রিক বস্তুবাদী সভ্যতার কুফলে ভুগে বেশ কিছু মানুষের সৃষ্টি হয়েছে যারা প্রাচুর্য, বিলাস ও হৃদয়বৃত্তিবিবর্জিত যান্ত্রিক সভ্যতা তথা নিজেদের সামাজিক অবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং এসবে আর কোন তৃপ্তি পায় না। হিপি ইত্যাদির সৃষ্টি এইভাবেই হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে বিপুল সংখ্যক মানসিক রোগী যারা নানা রকম উত্তেজক ওষুধ, নেশার বা ঘুমের বড়ি, গাঁজা, চরস, আফিং ইত্যাদির মাধ্যমে এই অতৃপ্তি থেকে মুক্তি পেতে চায়। ভারত থেকে ঐ সব দেশে ধর্মব্যবসা করতে যাওয়া অবতারদের প্রবর্তিত তুরীয় ধ্যান (transcedental meditation বা T. M.), মানসিক ব্যায়াম, কৃষ্ণ-চৈতন্য বা পরমাত্মার সঙ্গে মিলন, ধর্মের মোড়কে নতুন ধরনের যৌন চেতনা ও তথাকথিত যৌন স্বাধীনতা ইত্যাদি নানা পদ্ধতির মধ্যে এই মানসিক রোগীদের একটি অংশ তাদের মানসিক যন্ত্রণা ও হতাশা থেকে মুক্তির পথ খুঁতে পায়—এগুলি ঐসব নেশা বা উচ্ছৃংখল জীবনের বিকল্প হিসেবে তাদের কাছে কাজ করে। আজন্মের বিলাস-ব্যসন আর যান্ত্রিক জীবন থেকে সরে গিয়ে গেরুয়া পরে, নেড়া হয়ে খোলকর্তাল বাজিয়ে নেচে নেচে এরা বেশ মজাই পায়। ঐসব দেশের কিছু বয়স্ক গুরুগম্ভীর, প্রতিষ্ঠিত লোকও এদের সঙ্গে যোগ দেয়, যারা নেশাভাঙ্গ বা উচ্ছৃংখল জীবনকে রুচিকর হিসাবে মেনে নিতে পারে নি, অথচ একইভাবে যান্ত্রিক পুঁজিবাদী সভ্যতার শিকার। এসব কিছুই অবক্ষয়ী পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বিকৃত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয়। পাশাপাশি এটিও ঠিক, বিদেশীদের মধ্যেও অনেকে রয়েছে যারা অবৈজ্ঞানিক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তার শিকার; এরাও সরল বিশ্বাসে ধর্ম ইত্যাদিকে গ্রহণ করে এবং বুজরুকির শিকার হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতবর্ষের মত অনুন্নত দেশগুলির বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে অন্ধ পরানুকরণ, নানা কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তা, গুরুবাদ ইত্যদি নানা সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণা যথেষ্ট মাত্রায় বিদ্যমান। এরা উন্নত দেশগুলির শিক্ষিত সাহেব ভক্তদের দেখে ভাবে—সাহেবরা যার ভক্ত সে নিশ্চয়ই বিরাট অবতার বা গুরু। দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত অসহায় জীবনের নানা অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি ও সান্ত্বনা পাবার আশায় অশিক্ষা ও অসচেতনতার প্রভাবে, এরাও ঐ সব ধূর্ত অবতার বা গুরুদের ফাঁদে পা দেয়, তার চারপাশে জড়ো হয় পচে গলে যাওয়া মৃতদেহের চারপাশে ভন্‌ভনে মাছির ঝাঁকের মত। ক্রমশঃ বাড়তে থাকে কুসংস্কার ও সমাজ সম্পর্কে অবৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা,—কমতে থাকে বিচারবুদ্ধিবোধ ও আত্মনির্ভরতা। এটি একদিকে যেমন এইসব ধর্মগুরুদের ব্যবসার পথ সুগম করে, তেমনি সহজতর করতে থাকে দেশী-বিদেশী শাসকদের ব্যাপক সাধারণ মানুষকে শাসন ও শোষণের কাজ।

তাই এইভাবে সাহেব ভক্ত আমদানি করা এবং সামগ্রিক ভাবে ধর্মীয় কুসংস্কারগুলিকে প্রশ্রয় দেওয়ার মধ্যে অনেকেই জনগণের বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের আভাস পান। অনুন্নত দেশের গরীব মানুষদের চিন্তাভাবনা, নৈতিক মূল্যবোধ, সমাজ ও সংস্কৃতিকে ধর্মের জালে আটকে রেখে এই ষড়যন্ত্র ব্যাহত করে সমাজের বৈজ্ঞানিক বিকাশকে,—জনগণকে করে তোলে মেরুদণ্ডহীন, বিচারবুদ্ধিহীন, নিস্পৃহ ও নির্বোধ।

বিদেশীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নানা ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের সরাসরি সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের আভাসও মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। এই ধরনের বিভিন্ন ধর্ম-প্রতিষ্ঠানে মাঝে মাঝে খুন জখম, সীমান্তের খবরদারি, নানা ধরনের গোয়েন্দাগিরি, দেশের মিলিটারি এলাকা, ও অস্ত্র কারখানা বা সীমান্ত উপকূলবর্তী অঞ্চলে আশ্রম প্রতিষ্ঠা, আশ্রম থেকে অস্ত্র উদ্ধার ইত্যাদি এই আভাসকে স্পষ্ট করে তোলে। জনগণকে শোষণ করার অন্যতম কৌশল হিসেবে শাসকশ্রেণীর চিন্তা ধর্ম ও ধর্মীয় অবতারদের ব্যবহার করে।]

“আরেক অবতার—আব্রাহাম কোভুর”

ডঃ আব্রাহাম কোভুর সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অবতারদের তথাকথিত অলৌকিক কাণ্ডকারখানার পেছনের চালাকিগুলির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন। একজন সাধারণ ম্যাজিসিয়ানের ম্যাজিকের থেকে ওগুলো যে আলাদা কিছু নয় এবং ওগুলির মধ্যে অলৌকিকত্বের যে কোন ব্যাপারই নেই—তা তিনি নিজেই ম্যাজিকের সাহায্যে করে দেখিয়েছেন। সিংহলের থার্স্টান কলেজে সিংহল র‍্যাশন্যালিস্ট অ্যাসোসিয়েশানের একটি সভায় ডঃ কোভুর কিভাবে এসব দেখিয়েছেন তার একটি বর্ণনা ‘দি নেশন’ পত্রিকার ১৫ই এপ্রিল,, ১৯৭২ সংখ্যায় বেরিয়েছিল। সাঁইবাবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মত তিনিও শূন্য থেকে "পবিত্র ছাই" বের করে সকলের মধ্যে বিতরণ করেন। সভায় পেছনের দিকে উপস্থিত পুলিসদের এই ছাই দিয়ে তিনি মজা করে বল্লেন, "ওঁদেরও স্বর্গে-যাওয়ার ব্যবস্থা অবশ্যই করা উচিত।" এরপর তিনি এক মিনিট নিজের নাড়ী বন্ধ করে রাখলেন। একজন চিকিৎসক ও চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্র তা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হন। তিনি মজা করে জানালেন, এর আগে তিনবার হার্ট অ্যাটার্ক হয়ে যাওয়ায় এর চেয়ে বেশীক্ষণ তাঁর পক্ষে 'নাড়ী বন্ধ' করে রাখা সম্ভব নয়। এরপর তিনি 'আগুন খেলেন'। আগুনে যাতে তাঁর সাধের গোঁফ জোড়াটা পুড়ে না যায় তার জন্য আগেরদিন যে তাঁকে গোঁফ ছাঁটতে হয়েছে তাও জানালেন তিনি। ডঃ কার্লো ফোনসেকো নামে র‍্যাশন্যালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের একজন সদস্য আগুনের ওপর হেঁটে গেলেন—পায়ে ফোস্কা পড়ল না। ডঃ কোভুর তাঁর "টেলিপ্যাথির ক্ষমতার" প্রমাণ রাখলেন খামে বন্ধ দশটি নাম ও প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে বলে। মৃত ব্যক্তির আত্মার "ভরের" ব্যাপারটা দেখানোর জন্য তিনি সিংহলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী সি. ডি. এস. সেনানায়ক-এর আত্মাকে নিজের শরীরে ভর করালেন। নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি ('ডঃ কোভুর অথবা শ্রী সেনানায়ক) জানালেন, বর্তমান সরকারের আয়ু আর মাত্র চার বছর।

ডঃ কোভুর এই প্রদর্শনী সভায় যা সব করে দেখালেন তা তথাকথিত অবতার বা ধর্মগুরুরা নিজেদের তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ স্বরূপ সাধারণ মানুষদের করে দেখায়। ডঃ কোভুর কিন্তু এগুলিকে নিজের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় না বলে, জানালেন যে, এ সবই ম্যাজিসিয়ানসুলভ নানা ধরনের চালাকির দ্বারা করা সম্ভব হয়েছে। (কিভাবে এগুলি করা সম্ভব তা অন্যত্র ব্যাখ্যা করা আছে।) তিনি আরো জানালেন যে, "ঐসব অলৌকিক ক্ষমতাবানরাও" আসলে দক্ষ ম্যাজিসিয়ান ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু ম্যাজিসিয়ানদের সঙ্গে তাদের তফাৎ হল এরা নিজেদের ম্যাজিসিয়ান হিসেবে পরিচিত না করে, অলৌকিক বা ঐশ্বরিক ক্ষমতাবান বলে চালায় এবং এইভাবে মানুষকে ঠকিয়ে ধর্ম-ব্যবসা করে।

এইসব ধর্মব্যবসায়ীদের কেউ কেউ ডঃ কোভুরের বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী, বিশ্লেষণী কাজকর্মের পেছনের চিন্তাটি সম্পর্কেও সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে, একেও এক ধরনের আধ্যাত্মিক কাজ বলে প্রচার করে ঘুরেফিরে ধর্ম আর ঈশ্বরের ব্যাপারটিকেই প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে।

এদেরই একজন ঋষিকেশ থেকে আসা স্বামী সত্যানন্দ। সে বলেছে, "মানুষের মন থেকে অজ্ঞতা দূর করার জন্য, তাদের ঐশ্বরিক জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করার জন্য ঈশ্বরই শ্রীআব্রাহাম কোভুরকে ধরাধামে পাঠিয়েছে। শ্রী কোভুর আমাদের মত ধার্মিক না হতে পারেন কিন্তু আমাদের কুসংস্কারের মুখোশ খোলার জন্য একটি প্রয়োজনীয় কাজ তিনি করে চলেছেন।" "তিনি একজন ধার্মিক ব্যক্তি, কিন্তু আমরা যেভাবে চাই সেভাবে নন। তাঁর আত্মার মধ্যে একটা জাগরণ ঘটেছে। এই জাগরণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদ্ধতিই হোল ধর্ম।...ধর্মের অর্থহীন দিকগুলি দূর করার জন্য এ ধরনের কাজের প্রয়োজন রয়েছে।” ইত্যাদি ইত্যাদি।

শেষ অব্দি সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে ডঃ কোভুরকে এ ধরনের সূক্ষ্ম বদমায়েসির প্রতিবাদ করতে হয়েছে। তিনি লিখেছেন,

“সত্যানন্দ নামে এক স্বামীজি আরেক স্বামীজির ভক্ত। ভারতের যোগীঋষিদের তথাকথিত পবিত্র আবাসস্থল ঋষিকেশে নাকি ইনি থাকেন। এক ভজনের সময় ধর্মোপদেশ দেওয়াকালীন তিনি বলেছেন যে, কোভুর হলেন একজন অবতার এবং একজন সত্যানুসন্ধানী ধার্মিক ব্যক্তি।”

“দিনকরণ বরমঞ্জরী’ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি লেখা থেকে জানা গেল একটি সংবাদিক সম্মেলনেও তিনি এই মত প্রকাশ করেছেন এবং ভারতের দু’জন অবতার, সাঁইবাবা ও পেরিয়ার রামস্বামী নাইক্কার-এর সঙ্গে আমার তুলনা করেছেন।

“ওই ‘ধর্মাত্মা’ ব্যক্তিটির এই কথাবার্তা অবশ্যই এদেশে তাঁর সহস্র-সহস্র অন্ধ ভক্তকে বিপথে চালিত করবে। আমি যদি একজন বুজরুক ও সুবিধাবাদী হই তবে একজন ‘অবতার’ হওয়ার ক্ষেত্রে এটি আমার কাছে একটি বিরাট সুযোগ। আমি নিশ্চিত যে এর ফলে হাজার হাজার লোক আমার পূজা ও আমাকে প্রণাম করতে শুরু করতে পারে।

“কোন্ প্রমাণের ভিত্তিতে এই স্বামীজি বল্লেন যে, কোভুর একজন অবতার? সম্মেলনে উপস্থিত কারোরেই এই প্রশ্ন করার সাহস বা সাধারণ বুদ্ধি ছিল না।

“তিনি যা বলেছেন তা যদি এই স্বামীজি সত্যিই বিশ্বাস করে থাকেন তবে আমাকে জোর দিয়ে বলতে হচ্ছে যে, তিনি সম্পূর্ণ ভুল কথা বলেছেন। আর অন্যদিকে, তিনি যদি এদেশের যে যুবকরা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় যুক্তিবাদের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে তাদের সন্তুষ্ট ও বিপথগামী করার উদ্দেশ্য এই কথাগুলি বলে থাকেন তবে তাঁর সত্যবাদিতায় সন্দেহ করতে হচ্ছে।

“এই স্বামীজি একটি কথাই ঠিক বলেছেন, ‘কোভুর একজন সত্যানুসন্ধানী’। আমি অনুসন্ধান করে দেখেছি যে, সমস্ত দেবতা, ভগবান, স্বামীজি, সাধু সন্ত, দৈত্য, দানব, দেবদূত, অবতার, অবধূত—এরা বিকার-গ্রস্ত মানসিক রোগী বা ধূর্ত ‘ধার্মিক’ ব্যক্তি মাত্র।

“নতুন ‘ভগবানের দর্শন’ পাওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই আমার বাড়ীতে অসংখ্য বোকারা আসতে শুরু করেছে। অনুগ্রহ করে আমার এই চিঠিটি আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশ করুন এবং অবাঞ্ছিত ভক্তদের হাত থেকে আমায় বাঁচান।”

এইভাবে টোপ ফেলে ডঃ কোভুরকে নিজেদের দলে টানার চক্রান্তকে ডঃ কোভুর নিজেই ব্যর্থ করেন। ‘অবতাররা’ ডঃ কোভুরকে ‘অবতার’ হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও ডঃ কোভুর নিজে তা অস্বীকার করলেন। আগেই বলা হয়েছে, কিভাবে ডঃ কোভুর যখন শূন্যে হাত নেড়ে ছাই বের করেছিলেন তখন সরল বিশ্বাসী মহিলা ও মানুষরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটিকে তাঁর অবতার-সুলভ কাজ বলে মনে করেছিলেন আর ডঃ কোভুর ঐ ছাইকে নেহাতই ঘুঁটে পোড়ান ছাই বলে প্রকৃত রহস্য ফাঁস করে দেন ও নিজের অবতারত্বকে অস্বীকার করেন।

অবতার হওয়ার এমন সুযোগ হেলায় হারানোর উদাহরণ পৃথিবীতে যথাসম্ভব এই একটিই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অস্তিত্বহীন ঈশ্বর ও 'চরিত্রহীন' দেব-দেবীরা

পৃথিবীর সমস্ত কিছুর মধ্যে এক প্রাণ বা আত্মা বিরাজমান—এ বিশ্বাসটি মানবজাতির একটি অতি আদিম বিশ্বাস। নৃতত্ত্ববিদ্ ও গবেষকরা এই মতবাদকে সর্বপ্রাণবাদ (animatism) বলেন—যার অর্থ, চারপাশের সব বস্তুর মধ্যেই এক আত্মা রয়েছে এ ধরনের চিন্তা।

সর্বপ্রাণবাদ (animatism) সম্পর্কে লুই স্পেন্স বলেছেন, এর অর্থ এই ধারণা (notion) যে, মানুষের নিজেরই মত এই প্রাকৃতিক জগতের সব কিছুই জীবন্ত ও সংবেদনশীল*। এটি নিছকই একটি ধারণা (notion)। আত্মা (spirits or soul) সম্পর্কিত ধারণা সৃষ্টির পর মানুষ তার চিন্তাভাবনাকে জড়বিশ্বের ওপর আরোপ করে। এটিই animism. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তার "বাংলার লোকশ্রুতি" বইতে animatism -কে বলেছেন সর্বপ্রাণবাদ ও animism-কে বলেছেন জড়াত্মবাদ। ঢাকা থেকে প্রকাশিত "লৌকিক সংস্কার ও মানবসমাজ" বইতে আবদুল হাফিজ অবশ্য প্রথমটিকে বলেছেন প্রথম পর্যায়ের সর্বপ্রাণবাদ ও দ্বিতীয়টিকে বলেছেন পূর্ণাঙ্গ সর্বপ্রাণবাদ। বাংলা পরিভাষা যাই হোক না কেন, আদিম মানুষ তাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান সত্ত্বেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও প্রকৃতির নানা রহস্যের আপাত যুক্তিগ্রাহ্য সমাধান করার চেষ্টা করেছে আত্মার ধারণা করে। তখন তার পক্ষে এর বেশী কিছু ধারণা করা সম্ভবও ছিল না,—এবং এর থেকেই ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়েছে ঈশ্বরের, মহাত্মা-পরমাত্মা- ব্রহ্মের ধারণা। স্যার এডওয়ার্ড বার্নেট টাইলর বলেছেন, "আকাশ-পৃথিবী সমুদ্রে অবস্থিত ও তাদের নিয়ন্ত্রক শক্তিমান আত্মার ধারণাই সম্ভবত এশিয়ায় বিস্তৃত হয়ে মহাত্মা- পরমাত্মার ধারণার জন্ম দেয় এবং এ থেকেই সর্বত্র বিরাজমান আত্মা বা ব্রহ্মের সৃষ্টি হয়—অন্যান্য ধর্মেও এর অনুরূপ সর্বশক্তিমান, ব্রহ্মস্বরূপ ঈশ্বরের ধারণার সৃষ্টি হয়।"** স্যার টাইলর আরো মন্তব্য করেছেন, "এইভাবে আত্মার বিশ্বাসের ব্যাপারটি পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত সর্বপ্রাণবাদের অন্তর্ভুক্ত এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেবতা ও তার অধীনস্থ আত্মা-প্রেতাত্মাগুলিও এর অন্তর্গত

---

* The Outlines of Mythology, Watts & Co, London

** Religion ... New York, 1956

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়—বাস্তবতঃ এইসব চিন্তাই নানা সক্রিয় পূজা-আচ্চার জন্ম দেয়।" অপরদিকে সৃষ্টি হয় অন্যান্য দেবতার, এবং তাদের আরাধনার। পৃথিবীর সব প্রাচীন মানবগোষ্ঠীর মধ্যেই এই ব্যাপার ঘটেছে—কিন্তু তার প্রকাশ হয়েছে বিভিন্নভাবে,—তাদের পরিবেশ, প্রয়োজন ও সামাজিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে। ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়েছে নানা সংস্কার-নিয়মকানুন—সৃষ্টি হয়েছে তথাকথিত নানা ধর্মমত ও ধর্মীয় দর্শনের। এইসব ধর্মমত বা দার্শনিক চিন্তার জন্ম হয়েছে বহু দিনের প্রক্রিয়ায় এবং প্রক্রিয়াটি অত্যন্তই জটিল, বিতর্কিতও বটে। এই সব ধর্মমত ও ধর্মীয় অনুশাসন সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সংহতি সাধন ও বিকাশে বিভিন্ন সময়ে একটি উপযোগী ভূমিকাও পালন করেছে, জনগণকে রক্ষা করেছে নৈতিক অধঃপতন, হতাশা ও ভয় থেকে। পাশাপাশি আত্মা-পরমাত্মা ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধারণা সদা অনুসন্ধিৎসু মানুষকে এই রহস্যময় প্রকৃতির একটি আপাত যুক্তিগ্রাহ্য সমাধানের পথ দেখিয়েছে।

অন্যদিকে, অতীতে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতন কিছু ব্যক্তি এই ভ্রান্ত চিন্তার বিরোধিতা করার চেষ্টা করেছেন। প্রাচীন ভারতের নিরীশ্বরবাদী বস্তুতান্ত্রিক চার্বাক দর্শন, সাংখ্য দর্শন ইত্যাদি এর অন্যতম উদাহরণ। কিন্তু শক্তিশালী ভাববাদী চিন্তা তথা অজ্ঞতা, শাসকশ্রেণীর সচেতন সহায়তায় এই সব চিন্তাকে প্রতিহত করে রেখেছে। ভয় ও অসম্পূর্ণ জ্ঞানের কারণেই অতীতে মানুষের কল্পনা বাস্তবে অস্তিত্বহীন ঈশ্বর বা ভগবানের এবং নানা দেবদেবীর সৃষ্টি করেছে। পরিবেশ ও কল্পনার বৈচিত্র্যই বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর দেব-দেবী-আরাধ্য শক্তির বৈচিত্র্যের জন্য দায়ী। ঈশ্বর ও দেব-দেবীকে মানুষ নিজেদের সমাজ ও জীবন অনুযায়ীই চিত্রিত করেছে। কখনো দেবতা অত্যাচারী রাজা বা পুরোহিতের মত ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য পেয়েছে, কখনো বা সে হয়েছে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী। কখনো প্রভাবশালী মুষ্টিমেয় ব্যক্তিরা নিজেদের মত করে দেবতার রূপ দিয়েছে এবং মানুষের ঈশ্বর বিশ্বাস, ধর্ম ও দর্শনে আস্থা ইত্যাদিকে এই শাসকশ্রেণী তথা রাজা ও পুরোহিতরা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। প্রাচীন ধর্মমত ও দেব-দেবীর আচরণের মধ্যে প্রাচীন মানব সমাজেরই প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় অনেকখানি। তাই ঈশ্বর বা দেবদেবীরা বাস্তবে অস্তিত্বহীন হলেও এদের ঘিরে প্রাচীন নানা কাজ কর্ম, মতামত ও অনুষ্ঠানাদি মানবজাতির ইতিহাসকে কতটা উপকৃত করেছে, ও কতটা তাদের জীবনযাত্রাকে প্রতিফলিত করেছে তা নিয়ে নৃতাত্ত্বিক গবেষণার প্রয়োজন। তখনকার সমাজে যে সব 'ধর্মীয়' প্রথা স্বাভাবিক ছিল এখনকার দিনে তা অসামাজিক, অশ্লীল মনে হতে পারে, তার অনেকগুলিরই হয়তো এখন আর সামাজিক কোন উপযোগিতা নেই, বরং কোন কোনটি সমাজের প্রগতির পক্ষে ক্ষতিকর। তাই এখনো ঐ সবের প্রচার বা ঐ চিন্তাকে আঁকড়ে রাখাটা সমগ্র মানবসমাজের পক্ষেই ক্ষতিকর।]

☆ ☆ ☆

দৈনন্দিন জীবনের অনিশ্চয়তা, প্রকৃতির কাছে মানুষের অসহায়তা ও তার সম্পর্কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাই ঈশ্বর তথা দেব-দেবী সৃষ্টির মূলে। জ্বালানী ছাড়া যেমন আগুন জ্বলতে পারে না, বাস্তব কোন ভিত্তি ছাড়া যেমন কোন শক্তির সৃষ্টি হয় না, তেমনি জীবন্ত কোন শরীর ছাড়াও তথাকথিত ঈশ্বরের জন্ম বা অস্তিত্ব সম্ভব নয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করা ও তাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য চিন্তাভাবনা ও কাজ করার জন্য সক্রিয় মস্তিষ্ক, মাংসপেশী, রক্ত সংবহনতন্ত্র, শ্বাসতন্ত্র ইত্যাদি প্রয়োজন। তাই কোন অশরীরী ঈশ্বরের কথাবার্তা ভ্রান্ত বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই না। বহুশত বছর ধরে চলে আসা এই বদ্ধ মূল ভ্রান্তবিশ্বাস (delusion) -এর বশবর্ত্তী হয়েই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি মতিভ্রম (hallucination)-এর শিকার হয়। কেউ নিজেদের চিন্তাভাবনা বা ধারণার মত করে ঈশ্বর বা দেব-দেবীর সাক্ষাৎ পেয়েছে। কেউ দেখেছে জিভ বের করা অর্ধোলঙ্গ নারীমূর্তি বা কালী, কেউ দেখে ডানা-ওয়ালা দেবদূত, কেউ বা বাঁশী-বাজান নীল রঙের কৃষ্ণ ইত্যাদি ইত্যাদি। নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যাবে নানা ধরনের দেবতার সৃষ্টি, তাদের কাজকর্ম ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রাচীন মানুষের জীবনযাত্রার প্রতিফলন ও সুনির্দিষ্ট সমাজ-ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে।

স্নায়ুকোষযুক্ত মস্তিষ্ক বা এই ধরনের কোন বাস্তব যন্ত্র ব্যতীত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও কোন মহাপ্রজ্ঞা বা পরমাশক্তির অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। একটি আলুর প্রাণ থাকতে পারে, কিন্তু তার প্রজ্ঞা, মানস বা চিন্তা করার ক্ষমতা নেই—কারণ তার স্নায়ুকোষ নেই। একটি জীবন্ত আরশুলার স্নায়ুকোষ থাকার কারণে সে চিন্তাও করতে পারে, তা সে যত সামান্যই হোক না কেন। বহু লক্ষ বছরের বিবর্তনে মানুষ নামের প্রাণীর মস্তিষ্ক জীবজন্তুর মধ্যে উচ্চতম রূপ পেয়েছে, তাই তার চিন্তা করার ক্ষমতা সবচেয়ে উন্নত। তথাকথিত ঈশ্বরও এ ধরনের মস্তিষ্ক ছাড়া চিন্তাভাবনা করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে পারে না। অর্থাৎ ঈশ্বর বলে আদৌ যদি কেউ থাকে তবে সেও বস্তুর বাইরে নয়, মস্তিষ্ক ও নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েই সে তৈরী; বড় জোর হতে পারে তার মস্তিষ্ক ইত্যাদির কাজ আরো উন্নত ধরনের। ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, দেখা যায় না বা অশরীরী ইত্যাদি জাতীয় কোন ব্যাপার নয়।

মস্তিষ্ক তথা স্নায়ুকোষরূপ বস্তু ছাড়া মনের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। মস্তিষ্কের বহু শত স্নায়ুকোষের মধ্যে বহু বিচিত্র ও জটিল রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলই চিন্তা ও মন। পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন বস্তু ও বাস্তব ঘটনার অভিজ্ঞতার সংকলিত রূপই প্রাণীর চিন্তা ও মনকে নিয়ন্ত্রণ করে। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী, স্নায়ুতত্ত্ববিদ বিজ্ঞানী ওয়াল্টার হেস দেখিয়েছেন মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে উত্তেজিত করলে অর্থাৎ ঐ সব অংশের রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে, কোন প্রাণীর মধ্যে, ঘৃণা, প্রেম, নিষ্ঠুরতা, দয়া, ক্ষুধা, দুঃখ, আনন্দ ইত্যাদি বিভিন্ন অনুভূতি অর্থাৎ মানসিক বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করা সম্ভব। একই ভাবে তিনি দেখিয়েছেন, তথাকথিত আধ্যাত্মিক প্রবণতা বা চিন্তা ভাবনা স্নায়ুকোষের তড়িৎ রাসায়নিক বিক্রিয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফল, তা কোন ঈশ্বর নির্দেশিত বা ঈশ্বর অভিপ্রেত ব্যাপার নয়। সোজা কথায় যে সব অবতার বা ধর্মগুরুদের সম্পর্কে বলা হয় যে, ঈশ্বর তাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছে মানুষের অজ্ঞতা দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য,—"যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি" তখন আবির্ভূত হওয়া এই সব মানুষদের কাজকর্মের পেছনে অস্তিত্বহীন ঈশ্বরের ভূমিকার কথা নিছকই ভ্রান্ত ধারণা বা ভ্রান্ত প্রচার। লাইসার্জিক অ্যাসিড ডাই ইথাইল অ্যামাইড (L.S.D.), হেরোইন, গাঁজা ইত্যাদি জাতীয় রাসায়নিক বস্তুর প্রভাবেও মস্তিষ্কের সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক ক্রিয়াকে অস্বাভাবিক করে তুলে এই ধরনের আধ্যাত্মিক ভাব বা মতিভ্রম (hallucination) জাগানো যায়। ঈশ্বর-উন্মাদ বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ব্যক্তির মস্তিষ্কে এই ধরনের রাসায়নিক বস্তুর অস্তিত্ব উচ্চমাত্রায় ধরা পড়েছে—যা পাওয়া গেছে সিজোফ্রেনিয়া ইত্যাদি জাতীয় মানসিক রোগের রোগীদের মস্তিষ্কেও। ধর্ম-উন্মাদনা ভ্রান্ত বিশ্বাস (delusion) -জনিত এক ধরনের রোগ ছাড়া কিছুই নয়। ঈশ্বর-মহিমা কিংবা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দর্শন জাতীয় কোন ব্যাপার এতে নাই।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অবাস্তব, অলৌকিক তথা বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক রহিত কোন কিছু নেই বা কোন ঘটনা ঘটে না! বস্তু ও তার থেকে সৃষ্ট শক্তির বহু বিচিত্র প্রকাশ ও রূপান্তরই সব কিছুর মূলে। জগতে প্রাণের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে যাঁরা ঈশ্বরের কথা বলেন, তাঁদের সত্যি কথাটা জানা উচিত। প্রকৃত পক্ষে মহাশূন্যে ভাসমান পৃথিবী নামক সূর্যের এই গ্রহে বস্তুকণার পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া বহু লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চলতে চলতে এক সময় এমনই একটি নতুনতর বস্তু সৃষ্টি হল যার মধ্যে আমরা যে অর্থে প্রাণ বা জীবনের কথা বলি তার প্রাথমিক গুণগুলো দেখা গেল। এই ধরনের নানা বস্তুর আরও বিবর্তনের পর এককোষী প্রাণী এবং তারপর আরো বিবর্তনে বহুকোষী প্রাণী ও শেষ অব্দি মানুষ নামক প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ পারমাণবিক বিন্যাসের জন্য তামার অন্যতম গুণ যেমন সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তুঁতে তৈরী করা, তেমনি বিশেষ পারমাণবিক ও আণবিক গঠন ও গুণের জন্যই নানাধরনের প্রাণী কোষের নিজস্ব নানা বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে কোন পরমাত্মা বা ঈশ্বরের ভূমিকা নেই, নেই আত্মার অস্তিত্ব। জৈব কোষকে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে কিছু কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, সালফার ইত্যাদি পাওয়া যায়। জৈব কোষের অন্যতম ভিত্তি অ্যামাইনো অ্যাসিডকে কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে। আরো কিছুদিন পরে আস্ত জৈব কোষকেও বিজ্ঞানীরা তৈরী করতে সক্ষম হবেন—কোন ঈশ্বর বা আত্মা-পরমাত্মার সাহায্য ছাড়াই।

এই পৃথিবীও কোন ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়। বাইবেলে পৃথিবীর বয়স বলা হয়েছে ৬০০০ বছর, কিন্তু গবেষকরা দেখেছেন আসলে তা চারশ' কোটি বছরেরও বেশী। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে নানা ধরনের কাল্পনিক মত রয়েছে। বর্তমানের বিজ্ঞানীরা সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী পৃথিবীর বয়স ইত্যাদি নির্ণয় করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেষ্টা করেন—এ ক্ষেত্রেও কিছু মতপার্থক্য হতে পারে কারণ মানুষের জ্ঞান এখনো চূড়ান্ত নয়। কিন্তু বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলির মতপার্থক্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের অজ্ঞতা ও বিভিন্ন খাতে বওয়া কল্পনার কারণেই ঘটেছে।*

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও প্রকৃতিজগতের ঘটনাবলী কোন ঈশ্বরের নির্দেশে চলে না, এর কোন পূর্ব পরিকল্পনাও নেই। তা চলে প্রকৃতি বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট নিয়মেই যার অনেক কিছু মানুষ জানতে পেরেছে—এবং এখনো অনেক কিছু জানা বাকী রয়েছে, কিন্তু এক সময় তা জানা যাবেই। পৃথিবীর ক্ষেত্রে যেমন—সূর্য নামক নক্ষত্রের প্রভাবে জল বাষ্পীভূত হয়ে মেঘ সৃষ্টি করে, সেই মেঘ আবার বৃষ্টি ঘটিয়ে কখনো শস্য ফলায়, কখনো বা বন্যার সৃষ্টি করে, উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবননাশ করে। এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় যদি সব কিছু সৃষ্টি হত তবে সে কেন নিজেরই এক সময়ের নানা সৃষ্টি নিজেরই অন্যান্য সৃষ্টির সাহায্যে ধ্বংস করবে। একে অনেকে ঈশ্বরের লীলা বলে মনে করেন যা একটু তলিয়ে দেখলেই হাস্যকর মনে হবে। সৃষ্টি ও ধ্বংসের মূলে যদি বিশেষ কারোর ইচ্ছাই থাকে তবে আর মিছিমিছি সেতু বা খাল ইত্যাদি তৈরী করে তার ইচ্ছার বিরোধিতা করা কেন? অন্যদিকে হিরোসিমা-নাগাশাকিতে পারমাণমিক বোমায় শত শত ব্যক্তির মৃত্যু জাতীয় ঘটনাকে ঈশ্বরের লীলা বলেই ছেড়ে দিলে হয়—তার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে নিন্দা করা এবং পরমাণু শক্তি-নিয়ন্ত্রণ-চুক্তি করার প্রয়োজনটা কোথায়? কলেরায় বা কোন রোগে মৃত্যু হলে তা হবে ঈশ্বরের ইচ্ছারই প্রকাশ, তাহলে আর কেন এই সব রোগের চিকিৎসার জন্য গবেষণা করা? ঈশ্বরবিশ্বাসী ধার্মিক লোকেরাই বা কেন রোগগ্রস্ত অবস্থায় ঈশ্বরের করুণার বদলে আধুনিক চিকিৎসা করায় আর যে সব উন্মাদ ধর্মপ্রাণেরা চিকিৎসা না করে পরমেশ্বরের উপর নিজেকে ছেড়ে দেয় তারা রোগে ভুগে মারা যায়?

---

* এ প্রসঙ্গে এরিখ ফন দানিকেন নামে এক জার্মান ব্যক্তির কথাবার্তা উল্লেখ করা যায়। প্রায় অবতারদের মতই সে বলা শুরু করেছে, মহাকাশের অন্য কোন উন্নত স্থান থেকে অতি উন্নত প্রাণী প্রাচীন পৃথিবীতে এসেছিল। তারাই নাকি মানুষকে অতি বুদ্ধিমান প্রাণীতে পরিণত করেছে, প্রাচীনকালে নানা অদ্ভুত কীর্তি স্থাপন করেছে। মানুষের মস্তিষ্ক-বুদ্ধিবৃত্তি-সভ্যতার বিবর্তনে প্রকৃতি ও মানুষের শ্রমের ভূমিকাকে অস্বীকার করে—তার এইসব চমক লাগানো কথাবার্তা ব্যবসায়িক সাফল্য এনে দিয়েছে। ঐশ্বরিক শক্তির উপর নির্ভরতার মত অপার্থিব এক মহাশক্তির উপর মানুষের নির্ভরতা সৃষ্টি করার এই চেষ্টার ফল বা মূল উদ্দেশ্যও একই—মানুষের দৃষ্টিকে মূল সমস্যা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া, সঙ্গে কিছু ব্যবসায়িক মুনাফা। তার দাবী পৃথিবীর নানা অগম্য স্থানে গিয়ে সে তার বক্তব্যের স্বপক্ষে বাস্তব প্রমাণ জোগাড় করেছে। কিন্তু তার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কথাবার্তার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, প্রায় সব ক্ষেত্রেই তার পর্যবেক্ষণ, হিসাবনিকাশ ভ্রান্ত ও মনগড়া কল্পনার উপর দাঁড়িয়ে আছে। আরো বড় কথা—দেখা গেছে, সে প্রচুর ডাহা মিথ্যা কথা বলেছে। পশ্চিম জার্মানির পেটার কাউফহোল্ড দানিকেন-বর্ণিত নানা স্থানে গিয়ে হাতেনাতে এই মিথ্যাচার প্রমাণ করেছেন এবং দেখিয়েছেন, দানিকেন যেসব স্থানে গেছে বলে দাবী করেছে, তাঁর অনেক স্থানে আদৌ যায়ই নি। লেখক অ্যানষ্ট ফনকুওন যুক্তিতর্ক দিয়ে দানিকেনের কথাবার্তাকে 'নির্ভেজাল রূপকথা' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলায় শ্রীসমীরণ মজুমদারের 'দানিকেনের বিভ্রান্তি' নামক বইতেও এই ধরনের যুক্তিতর্কের উদাহরণ পাওয়া যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু ব্যক্তি যারা ব্যাপক মানুষকে শাসন-শোষণ করে নিজেদের প্রতিপত্তি ও অর্থাগমের পথকে বজায় রাখতে চায় তারা প্রায়শঃই অসহায় সরলবিশ্বাসী মানুষের উপর ঈশ্বরবিশ্বাসের ভ্রান্ত চিন্তাকে চাপিয়ে দেয়, বা পরোক্ষভাবে, এই চিন্তাকে মদত দেয়। সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য, রোগকষ্ট, অশিক্ষা ও নানা দুর্দশার পেছনে ঈশ্বরের ইচ্ছা বা পূর্বজন্মের কর্মফল রয়েছে বলে চালালেও, নিজেরা কিন্তু নির্বাচনে জেতার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না অথবা কোন কোন সময় এর জন্য পূজা-আচ্চা করলেও, মুখ্যতঃ নির্ভর করে সাধারণ মানুষের ইচ্ছা ও নিজেদের নানা জাল-জোচ্চুরির উপর। ঈশ্বর চিন্তা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস মানুষকে উদ্যোগহীন নিশ্চেষ্ট একটি প্রাণীতে পরিণত করে। সামাজিক বৈষম্য ও শোষণের জন্য সমাজব্যবস্থা ও শাসক শ্রেণী দায়ী নয়, দায়ী ধরাছোঁয়ার বাইরে এক ঈশ্বর এবং নিজেদের পূর্বজন্মের কর্মফল—ইত্যাদি বলে শোষিত মানুষের বিক্ষোভের বর্শামুখকে বিপথে চালিত করা হয়। বোঝানো হয়, সামাজিক উন্নতির জন্য সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন, তথা শাসকশ্রেণীর উচ্ছেদ ও মানুষের জ্ঞানকে সমগ্র মানবজাতির উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিকভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা ইত্যাদি করে লাভ নেই, —আধ্যাত্মিক উন্নতি, ঈশ্বর চিন্তা ও সবকিছুকে 'তাঁর ওপর ছেড়ে' দিলেই মোক্ষলাভ হবে, মুক্তিলাভ হবে। যারা ধর্মের নামে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে, সরল মানুষের ভ্রান্ত ঈশ্বরবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাদের ঠকায় এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে, বংশপরম্পরায় মানুষের মধ্যে ঈশ্বরবিশ্বাসের শেকড়কে গভীর ক'রে রাখে তারা প্রকৃত অর্থে মানুষের ক্ষতিই করে। মানুষ এর ফলে নিজেদের জীবনযাত্রাকে সুখী ও উন্নত করার সঠিক পথের দিশা খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হয়। যারা বলে, "আমি নিজে ঈশ্বরে বিশ্বাস করছি, এতে অন্যের তো ক্ষতি করছি না" ইত্যাদি, তাদের জানা উচিত তার নিজের ঈশ্বর বিশ্বাস আরেকজনের বিশ্বাসকে প্রভাবিত করবেই কারণ আমরা সমাজবদ্ধ জীব—এবং পারস্পরিক চিন্তার আদানপ্রদান সেখানে ঘটেই। তাই অবতার ও শাসকশ্রেণীর ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি, সামাজের সাধারণ মানুষের ঈশ্বর-বিশ্বাস তথা অলৌকিকত্বে আস্থা জাতীয় অবৈজ্ঞানিক চিন্তাগুলি নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারারই সামিল, নিজেদের জীবনকে উন্নত করার পথকে তথা সামগ্রিকভাবে সমাজের প্রগতিকে তা রুদ্ধ করে। অন্যদিকে শাসকশ্রেণী এই সুযোগে ধর্মকে শাসন-শোষণের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

ব্যাপক মানুষের মধ্যে নিজেদেরই স্বার্থবিরোধী ঈশ্বরবিশ্বাস টিকে থাকার অন্যতম প্রধান কারণ হল এর ব্যবহারিক গুরুত্ব। প্রকৃতির কাছে অসহায় মানুষ প্রাকৃতিক লীলা-রহস্য ও তার জন্য নিজেদের দুর্দশাকে ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দিয়ে নিজেদের সদা অনুসন্ধিৎসু মনকে তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত করার চেষ্টা করে। নানা দুর্দশার জন্য অসহায় মানুষ নালিশ জানানোর জন্য উপযুক্ত কাউকেই পায় না—রাষ্ট্রব্যবস্থায় যাদের তারা নির্বাচিত করে প্রায়শঃই তারা বহু সহস্র নির্বাচকের চেয়ে শুধু নিজের স্বার্থ দেখার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যই সচেষ্ট। তাই ধরাছোঁয়ার বাইরে নালিশ জানানোর মত একজনকে মানুষ কল্পনা করে, কল্পনা করতে ভালবাসে এই একজনের কাছে নালিশ জানিয়ে তার সব সমস্যার সমাধান হওয়ার কথা, স্বর্গ নামে সর্বসুখের একটি জায়গার কথা। সমাজের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি যখন অন্যায়ভাবে, অল্প আয়াসে ধনী হয় বা অন্যের উপর অত্যাচার চালায় তখন সাধারণ মানুষ এই সমাজব্যবস্থায় তাকে উপযুক্ত শাস্তি না দিতে পেরে এই ভেবে তৃপ্ত হয় যে ঈশ্বর তাকে ঠিক শাস্তি দেবে বা সে নরকে পচবে ইত্যাদি। আর এসবের ফলে একটি বিক্ষোভহীন, পঙ্গু নিশ্চেষ্ট চেতনার আলস্যও উপভোগ করা যায়। এছাড়া বাস্তব জীবনের একঘেয়েমি ও নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে ঈশ্বর চিন্তা বা তার জন্য খোল কর্তাল বাজান, গান করা, পূজো আচ্চা করা ইত্যাদি জাতীয় কাজকর্ম মানুষকে কিছুটা বৈচিত্র্য এনে দেয় ; সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা ইত্যাদির বাইরে মানুষ তার মানবিক কোমলবৃত্তির বশে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একটি চিন্তার মধ্যে শারীরিক ও মানসিক জোর খোঁজার চেষ্টা করে। প্রিয়জন মারা গেলে, আত্মার বিশ্বাসের ফলে এই ভেবে শোক লাঘব হয় যে, তার আত্মা আশেপাশেই আছে, একবোরে সে চলে যায়নি, অথবা পরমাত্মার ইচ্ছেতেই সে চলে গেল, আয়ু ফুরিয়ে গেছে, নিয়তি তাকে টেনে নিল—অতএব কিছু করার নেই ইত্যাদি। সব মিলিয়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও চিন্তা-ভাবনার মধ্যে ঈশ্বর-বিশ্বাস বা এই জাতীয় অবৈজ্ঞানিক চিন্তা তার সমস্যা কন্টকিত জীবনে কিছুটা শীতল হাওয়ার প্রলেপ দেয়। কিন্তু অসচেতন মানুষ বুঝতে পারে না, এই প্রলেপ চিরকাল শুধু প্রলেপই দিয়ে যায়, সামাজিক সমস্যার দগদগে ঘা-এর ফলে ভেতরে ভেতরে স্থায়ী হতে থাকে—আর শুকোয় না! এবং চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়তে থাকে ঈশ্বর চিন্তা তথা প্রলেপ দেওয়ার কাজ।]

☆ ☆ ☆

ঈশ্বর যদি থেকে থাকে তবে সে কোথায় থাকে, কবে কোথায় তার জন্ম, কবে কখন তার মৃত্যু হবে? না, এ সবের কোন উত্তর নেই। একইভাবে উত্তর নেই এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের, মহাকাশ ও মহাশূন্যের শুরু কোথায় ও কবে থেকে, শেষই বা কোথায়, তার পরেই বা কি আছে, তার আগে কি আছে? ইত্যাদি। মহাকাশের বহু রহস্য মানুষ কিছুটা সমাধান করলেও এ মূল রহস্যের সমাধান এখনো হয়নি। ঈশ্বরবিশ্বাসীরা তাই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের জন্ম নেই—'তিনি অনন্ত, অক্ষয়, অব্যয়' ইত্যাদি বলে সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে গেছে, কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি।

বর্তমান মানুষের জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসা এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে। আজ না হোক কাল বা আরো পরে এ সমস্যার সমাধান হবেই—হয়তো সৃষ্টি হবে নতুনতর কোন বৈজ্ঞানিক ধারণা। কিন্তু যত দিন না সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধান হচ্ছে ততদিন তাকে ঈশ্বরের উপরে ছেড়ে দিলে, তা যে বর্তমান মানবজাতির বৃহত্তর অংশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষতিই করছে তা আগেই বলা হয়েছে। তাই এ রহস্য সমাধানের জন্য মহাকাশ গবেষণা ইত্যাদি জাতীয় কাজের পাশাপাশি তাকে আপাতত সমাধানের অতীত একটি ব্যাপার বলে সাময়িকভাবে ধরে নেওয়া উচিত।*

গবেষণায় জানা গেছে, এই মহাকাশে আমাদের সূর্যের মত $১০^{২৩}$ টিরও (one hundred thousand million billion) বেশি নক্ষত্র আছে—তারা আবার ছড়িয়ে আছে অবিশ্বাস্য দূরত্বে। দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাসার্দ্ধ হবে ১০০০০০০০০০০০০ (one billion) আলোকবর্ষ। এটিই সব নয়, এর বাইরে আরো রয়েছে।

[million =দশ লক্ষ (১০০০০০০), billion =ইংলণ্ড ও জার্মানিতে মহাপদ্ম (১০০০০০০০০০০০০); ফ্রান্স ও আমেরিকায় শত কোটি (১০০০০০০০০০)। আলোকবর্ষ —এক সেকেণ্ডে আলোকরশ্মি যায় ১৮৬০০০ মাইল, এইভাবে একবছর সময়ে আলো যে দূরত্ব অতিক্রম করে অর্থাৎ প্রায় ৫৮×১০^{১১} মাইল।]

আমাদের সৌরমণ্ডলী একটি গ্যালাক্সির অতিক্ষুদ্র একটি অংশ। এ ধরনের কম করেও ১০০০০০০০০ টি গ্যালাক্সিকে বিজ্ঞানীরা দেখতে পেয়েছেন যন্ত্রের সাহায্যে। এগুলিও আবার রয়েছে পরস্পরের থেকে একটি অবিশ্বাস্য দূরত্বে এবং প্রচণ্ড একটি গতিতে পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

---

* অবশ্য মহাকাশ গবেষণা জাতীয় ব্যাপারগুলির বাড়াবাড়িও পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক অর্ধভুক্ত সমস্যাক্লিষ্ট মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী। পৃথিবীর মুষ্টিমেয় দু'চারটি ধনী দেশ মহাকাশ গবেষণায় যে বিপুল অর্থ ও উদ্যম ব্যয় করে তার সামান্য অংশের সাহায্যেও তৃতীয় বিশ্ব এবং নিজেদের দেশেরও বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষের দু'বেলা পেটপুরে খাবার, সুস্বাস্থ্য ও বাসস্থান-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা যায়। দু'জন আমেরিকান চাঁদের বুকে পা দিয়ে ছিলেন, এর জন্য খরচ হয়েছিল ১৯,২০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে ভারতে প্রতিবছর ১২-১৪ হাজার শিশু ভিটামিন 'এ-'এর অভাবে অন্ধ হয়ে যায়। আমার অভুক্ত প্রতিবেশীদের বাঁচ-মরার সমস্যা সমাধান করায় বিন্দুমাত্র সাহায্য না করে, এবং তাঁদের কাছ থেকে কৌশলে নিয়ে নেওয়া বিপুল অর্থের কিছু অংশ মহাকাশের রহস্য জানার জন্য ব্যয় করাটা সেই পুরনো গল্পকেই মনে করিয়ে দেয়। নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে এক পণ্ডিত যাচ্ছিলেন কুয়ো থেকে জল তুলতে। অসংখ্য নক্ষত্রের সৌন্দর্য দেখে তাঁর মাথায় চিন্তা এল এই মহাকাশের শেষ বা শুরু কোথায়, শুরুই বা কবে থেকে, তার আগে কি ছিল, এই সব নক্ষত্র কোথা থেকে এসেছে, ইত্যাদি। গভীরভাবে এসব সমস্যা ভাবতে ভাবতে তাঁর কোন হুঁশই ছিল না। তিনি খোলা কুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়ে, মহাকাশ সম্পর্কিত যাবতীয় চিন্তা সহ নিজের মৃত্যু ঘটালেন। বর্তমান মানবজাতিরও যেন এই অবস্থা না হয়। নিজেদের উদ্যম ও সাম্প্রতিক জ্ঞানকে সমগ্র মানবজাতির জলজ্যান্ত আরো নানা জরুরী সমস্যার সমাধানে না লাগিয়ে মহাকাশের সমস্যা সমাধান -এর মত কাজে লাগানোর চিন্তার উৎসই হল মানবজাতির স্বার্থবিরোধী মানসিকতা—যার ফলে ঐ সব ধনী দেশগুলিই সারা পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক মানুষের দুঃখ দুর্দশা ও মৃত্যুর কারণ হচ্ছে নানা ভাবে। জানার চেষ্টা ভাল কিন্তু দু'বেলা পেট পুরে আহারের ব্যবস্থা না করে শুধু গবেষণা করে গেলে গবেষকের (অর্থাৎ মানবজাতির) দুরবস্থাই বৃদ্ধি পাবে। ঝাঁঝরা অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যেও প্রাক্তন সোভিয়েত রাশিয়ায় মহাকাশ গবেষণা খাতে সাধ্যাতীত ব্যয় করা তাঁদের সমস্যা হয়তো আরো বাড়িয়েছে। আমেরিকা বা রাশিয়া, ভারত বা চীন, কিংবা অন্য দেশ যারাই করুক না কেন, এ ধরনের গবেষণার মধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে সামরিক ও অন্যান্য আধিপত্য বিস্তার করার ইচ্ছাও জড়িয়ে থাকে। বিশুদ্ধ জ্ঞান আহরণের জন্য মহাকাশ গবেষণা অবশ্যই কাম্য। কিন্তু তার সঙ্গে যখন এই আধিপত্যবাদ এবং বৈষম্যমূলক শোষণজীবী ব্যবস্থায় বৈষম্য বাড়িয়ে তোলার ব্যাপারটি জড়িয়ে যায়, তখন তা বেদনার বিষয় হয়ে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবীর মত বহু গ্রহেই প্রাণের অস্তিত্ব থাকাটা একান্তই স্বাভাবিক। পৃথিবীর মত যেখানেই প্রাণের বিকাশের অনুকূল পরিবেশ ও রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া হয়েছে সেখানেই প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে এবং পরিবেশের বিভিন্নতার জন্য এদের প্রকৃতি বিভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন গ্রহ ইত্যাদির উপর ঈশ্বরের বিশেষ পক্ষপাতের ফলে বা তার ইচ্ছায় এসব হয় না; বিভিন্ন গ্রহের নিজস্ব প্রাকৃতিক পরিবেশই এর মূলে। বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে কৃত্রিমভাবে প্রাণের প্রাথমিক ভিত্তি জৈব অণু সৃষ্টি করেছেন, এবং এর ধারাবাহিকতায় একদিন বিভিন্ন ধরনের প্রাণীরও সৃষ্টি করা সম্ভব হবে বলে যুক্তিযুক্ত ভাবেই মনে করা হচ্ছে। প্রাণ বা প্রাণীর সৃষ্টির জন্য পরমাত্মার অলৌকিক ও অবাস্তব ক্ষমতা ও ইচ্ছা দায়ী নয়, জড় বস্তুর থেকে প্রকৃতি বিজ্ঞানের নিয়মেই তা সৃষ্টি করা সম্ভব—এটি আজ, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের পক্ষে অপ্রিয় হলেও, সত্য বলেই প্রমাণিত। বর্তমানে যে সব প্রাণী ও উদ্ভিদ পৃথিবীতে রয়েছে সেগুলি বহু লক্ষ বছরের বিবর্তনেই ফসল। তাই ক্যাথলিক ধর্মমত অনুযায়ী মানুষই যে 'ঈশ্বরের সর্বোত্তম সৃষ্টি' তা সত্য নয়।

[অবশ্য পৃথিবীতে যত প্রাণী বা উদ্ভিদ রয়েছে তার মধ্যে মানুষের মস্তিষ্কই সর্বোন্নত। এছাড়া, একদল বিজ্ঞানী এ ধরনের অনুমান করেন যে পৃথিবীতে মানুষের চেয়ে গুণগতভাবে উন্নততর প্রাণী বর্তমান বরফযুগের মধ্যে আর সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়, —এবং এটিও প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও বিবর্তনের নিয়ম অনুসারেই —'ঈশ্বরের' ইচ্ছায় নয়। এছাড়া, জড় বস্তু থেকে কৃত্রিমভাবে মানুষের পক্ষে বিভিন্ন প্রাণী সৃষ্টির তাত্ত্বিক সম্ভাবনা থাকলেও, বাস্তবত তা কতটা সম্ভব হবে সে নিয়ে সন্দেহ আছে। এ ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হচ্ছে 'সময়'। শত শত কোটি বছরের রাসায়নিক ভাঙ্গাগড়ায় প্রাণের তথা প্রাণীর সৃষ্টি। বর্তমান মানুষের কয়েক প্রজন্মের পক্ষেও এর সামান্য অংশ সময় পাওয়া মুস্কিল।]

প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান সমৃদ্ধতর হচ্ছে, ক্রমশঃ পরিপূর্ণতা লাভ করছে। এককালে বিশ্বাস ছিল পৃথিবী স্থির, সূর্য তার চারপাশে ঘুরছে। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে নানা ধর্মীর মতামতও গড়ে ওঠে। অনেকে এর প্রতিবাদে বৈজ্ঞানিক তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করেন। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট (জন্মঃ আনুমানিক ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দ) এবং বরাহ মিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর প্রমুখ গণিতজ্ঞ জ্যোতির্বিদগণ এঁদের অন্যতম। (অবশ্য আর্যভট্ট-এর বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা পরে,—শাসকশ্রেণীর স্বার্থবাহী ভাববাদী চিন্তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, বরাহমিহিরের মত ব্যক্তিদের দ্বারা কিছুটা বিকৃতও হয়েছিল। যেমন, আর্যভট্ট জ্যোতিষবিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্বিদ্যাচর্চার অন্তর্ভুক্ত করেন নি; বরাহমিহির কিন্তু জ্যোতিষবিদ্যাকেও জ্যোতির্বিদ্যার সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রচার করেন। ইত্যাদি।) পিথাগোরাস (572-497 B. C.) -এর শিষ্য ফিলোলাউস সূর্যকেন্দ্রিক পৃথিবী পরিক্রমার কল্পনা করেন; অ্যারিস্টাকার্স (310-230 B. C.) সুনিশ্চিতভাবে এই ধারণার স্বপক্ষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বলেন। নিকোলাস কোপার্নিকাস (1473-1543 A. D.) এর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেন ; কিন্তু প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক মতকে প্রতিষ্ঠা করতে সাহস পাননি, মৃত্যুর মাত্র কয়েকমাস আগে তা প্রকাশ করেন—যদিও তিনি সূর্যকেন্দ্রিক পৃথিবী পরিক্রমার কথা গোপনে অনেক আগে বন্ধুদের জানিয়ে ছিলেন। পৃথকভাবে গ্যালিলিও গ্যালিলেই (1564-1642 A. D.) কোপার্নিকাসের মতকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করেন। কিন্তু তা বলার জন্য ধর্মযাজকরা নানা ধরনের অত্যাচার করে এবং এইসব ধর্মগুরুরা ধর্মকে রক্ষা করার নাম করে বৈজ্ঞানিক সত্যকে চাপা দিয়ে রাখে। পরে জিওরদানো ব্রুনো (1548-1600 AD) কোপার্নিকাস ও গ্যালিলিও-র বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণকে জনসমক্ষে তুলে ধরেন এবং প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করেন। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক ধর্মচিন্তা ও গোঁড়ামির এমনই নির্মম পরিণতি যে, ধর্মযাজকদের ষড়যন্ত্রে ব্রুনোকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। বৈজ্ঞানিক তথ্যাদিকে জোর করে দাবিয়ে রেখে ধর্মীয় গোঁড়ামির এ ধরনের উদাহরণ আরো রয়েছে। এবং এখনো ঘটছে।

মানুষের জ্ঞান আরো এগিয়েছে। সে জেনেছে সূর্য একটি জ্বলন্ত নক্ষত্র ছাড়া কিছুই নয়, চাঁদ হচ্ছে কিছু জড়পদার্থের সমষ্টি মাত্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক অশিক্ষিত ও অসচেতন মানুষ সূর্যদেবতা ও চন্দ্রদেবতার পূজা করে চলেছে—নৃতাত্ত্বিকরা যাকে animatism বলেছেন তারই ধারাবাহিকতায়। একইভাবে টিকে আছে আরো অসংখ্য দেব-দেবীরাও।

হাজার হাজার বছর আগে মানুষ এই সব দেব-দেবীর যে সব ক্রিয়াকলাপ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা কল্পনা করেছে, সেগুলির বর্তমানের অপ্রাসঙ্গিকতা, নীতিবোধহীনতা ও অমানবিক অশ্লীল নানাদিকের উদাহরণ ডঃ কোভুর দিয়েছেন।

[আসলে এ সবই প্রাচীন মানব-সমাজের প্রতিফলন। প্রাচীন মানুষ নিজের মত করেই দেব-দেবীদের কল্পনা করেছে—তারা বাস্তব কিছু নয়। এ প্রসঙ্গে ক্যাথলিন ফ্রীম্যানের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি মন্তব্য করেছেন— "কিন্তু যদি ষাঁড়-ঘোড়া-সিংহ ইত্যাদিদের হাত থাকত অথবা হাতের সাহায্যে ছবি আঁকতে পারত এবং মানুষের মত শিল্প সৃষ্টি করতে পারত তবে তারা নিজেদের মত করে (অর্থাৎ ঘোড়ারা ঘোড়ার মত দেখতে, ষাঁড়েরা ষাঁড়ের মত দেখতে) তাদের দেবতাদের আঁকত এবং তাদের দেবতাদের চেহারা করত নিজেদের গোষ্ঠীর চেহারার আদলে। এইভাবে ইথিওপিয়ানদের দেবতার নাক ভোঁতা, চুল কালো ; থ্রাসিয়ানদের দেবতার চুল লাল ও চোখ বাদামী।"* একই ভাবে বাঙালীদের দেব-দেবীরা ধুতি-শাড়ি পরে, আদিবাসীদের দেব-দেবী অর্ধোলঙ্গ ইত্যাদি।

* Ancilla to Pre-Socratic Philosophers ; Oxford.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে কল্পিত দেব-দেবীরা সেখানকার পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে—দেব-দেবী যে বাস্তব ও চিরন্তন কিছু নয়, কল্পনা মাত্র, সেটিও এর থেকে বোঝা যায়। এর বহু উদাহরণ রয়েছে, যেমন ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী তাঁর 'হিন্দুসংস্কৃতির স্বরূপ' বইতে বলেছেন, "নেপাল, মিথিলায়, কামরূপ প্রদেশে ও উড়িষ্যায় দুর্গাপূজা প্রচলিত আছে। তবে সেখানে ঠিক বাংলাদেশের মত দুর্গোৎসবে এমন ঘটা নেই এবং লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক-গণপতি সহ এইরূপ সমারোহ সহকারে প্রতিমা বিসর্জন চলে না। এখন আসামে বাঙালীদের প্রতি একটু ভিন্ন ভাব হওয়ায় তাঁহারা নিজেরাই প্রতিমা করান এবং দেখিয়াছি বাঙালি শাড়ী-পরিহিতা দেবীর বদলে তাঁহারা আসামী বুক ঢাকনি পোষাকে দেবীপ্রতিমা তৈরি করান।"

এই কল্পিত দেবদেবীর রূপ কল্পনার স্তর সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিকেরা বলেছেন—

"(১) দেব-দেবী, প্রাকৃতিক শক্তি ও বস্তু, জন্তু-জানোয়ার প্রভৃতি নরমূর্তিরূপে কল্পিত হয়েছে। (২) নরত্বারোপের ক্ষেত্রেও স্তর ছিল। প্রথমত, দেব-দেবীদের জন্তু-জানোয়ারের মূর্তির মত করে কল্পনা করা হয়েছিল (Theriomorphic Stage)। এই স্তরে গ্রীক দেবতা জীউস কল্পিত হয়েছে ঈগলরূপে ও আর্টেমিসের মূর্তি ছিল হরিণের মত। (হিন্দু দেবতাদের মধ্যে এর কাছাকাছি উদাহরণ গণেশ ঠাকুর। বিভিন্ন পশুকে বিভিন্ন দেব-দেবীর বাহন হিসেবে কল্পনা করাও এরই ধারাবাহিকতা।) (৩) এর পর মানুষ দেব-দেবীর ওপর নিজের শারীরিক বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছে (Physical Anthropomorphic stage)। এ অবস্থায় জীউস আর ঈগল মূর্তিতে নয়, মানুষের আকারেই কল্পিত হয়েছে।"* নৃতাত্ত্বিক মেলিনোওস্কি (Magic, Science & Religion ; New York, 1954), র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন (Structure & Function in Primitive Society ; London, 1852), রেমণ্ড ফোর্থ (Elements of Social Organisation, London, 1951) প্রমুখ বহু গবেষকই এই সব দেব-দেবী তথা ধর্মের সামাজিক ভূমিকা ও উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রত্যেক ধর্মই যে জগত ও জীবনের সঙ্গে জড়িত, ধর্মের সঙ্গে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি সবকিছুই যে যুক্ত ছিল এবং নানা ধর্মের নানা আচার-অনুষ্ঠান তথা দেব-দেবীরা —কাল্পনিক হলেও —তারা যে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা প্রমাণিত।]

অবাস্তব কাল্পনিক দেব-দেবীকে ঘিরে নানা প্রাচীন কল্পকথার অনৈতিক দিক সম্পর্কে ডঃ কোভুর এইভাবে বলেছেন,—

"**ব্রহ্মা ও সরস্বতী** —হিন্দুশাস্ত্রের তিন প্রধান দেবতা 'ত্রিমূর্তির' একজন হল ব্রহ্মা। ** সে (নাকি) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা (ব্রহ্ম বা ব্রহ্মার ধারণার উৎপত্তি সম্পর্কে

* Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend (Edited by Maria Leach) (New York, 1949).

** ত্রিমূর্তি হল ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, —একজন সৃষ্টি করেন, আরেকজন পালন করেন এবং শেষজন ধ্বংস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৃতাত্ত্বিকদের মতামত ও animatism সম্পর্ক আগেই বলা হয়েছে।) সরস্বতী ব্রহ্মার মেয়ে, পরে তার বাবারই স্ত্রী। সরস্বতীপুরাণে সরস্বতীর জন্ম নিয়ে দু'ধরনের গল্প রয়েছে। একটি হচ্ছে ব্রহ্মা নিজের জীবনীশক্তি বা বীর্য থেকে সরাসরি সুন্দরী সরস্বতীর জন্ম দেয়। অন্যটি হচ্ছে, ব্রহ্মার বীর্য থেকে অগস্ত্য নামে এক ঋষির জন্ম হয়। সেই ঋষি পরে সরস্বতীর জন্ম দেয়। তাই সরস্বতীর কোন মা নেই।

ব্রহ্মার এই মেয়ে, মতান্তরে নাতনি, বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী হিন্দুদেবী। সরস্বতীর রূপ দেখে ব্রহ্মা আর নিজেকে সামলাতে পারেনি। বাবার (বা ঠাকুর্দার) কামনা থেকে রেহাই পেতে সরস্বতী বিশ্বচরাচরে পালিয়ে বেড়াতে লাগলো, কিন্তু রেহাই পেল না। শেষ অব্দি ব্রহ্মার লালসার কাছে তাকে আত্মসমর্পণ করতে হল। ব্রহ্মা ও সরস্বতী ১০০ বছর ধরে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বাস করে। স্বয়ম্ভূমরু নামে তাদের এক ছেলে এবং শতরূপা নামে এক মেয়ে হয়। স্বয়ম্ভূমরু তার বোন শতরূপার সঙ্গে প্রেম করে, ফলে ব্রহ্মাদের দুই নাতি ও দুই নাতনির জন্ম হয়।

শিব—শিব দেবতার দুই বৌ,—গঙ্গা ও পার্বতী। হস্তীরূপ ধরে এক জঙ্গলে শিব যখন পার্বতীর সঙ্গে মিলিত হয় তখন হাতীর মাথাওয়ালা-দেবতা গণপতির জন্ম হয়। আরেক সময় বাঁদরের রূপ ধরে পার্বতীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার ফলে বাঁদর-দেবতা হনুমানের জন্ম হয়।

[ভিন্ন গল্প হচ্ছে, শনির দৃষ্টিতে বাচ্চার মাথা উড়ে যাওয়ার পর হাতির মাথা নাকি লাগানো হয়েছিল।]

একবার যখন পার্বতী ধারে কাছে ছিল না, তখন শিব মধুরা নাম্নী এক মহিলা,—যে তাকেই পূজা করতে এসেছিল, তার সঙ্গে যৌন সংসর্গ করে। ফিরে এসে পার্বতী শিব-মধুরার যৌনমিলন দেখে ফেলে। এক ভক্ত-মহিলাকে ধর্ষণ করার জন্য শিবের উপর রাগ করার বদলে, পার্বতী মধুরাকেই অভিশাপ দেয়—সে ব্যাঙ হয়ে যায়। ১২ বছর পরে অভিশাপের ফল কেটে গেলে ব্যাঙটি মন্দোদরী নামে জন্ম নেয় এবং শ্রীলঙ্কার দশমাথাওয়ালা রাজা রাবণের স্ত্রী হয়। শিবের যে বীর্য ব্যাঙ-রূপিণী মন্দোদরীর গর্ভে সুপ্ত ছিল সেটি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অবশেষে ইন্দ্রজিতের জন্ম দেয়। এইভাবে রাবণের তথাকথিত পুত্র, শ্রীলংকার ইন্দ্রজিৎ ছিল শিবের অবৈধ সন্তান।

ইন্দ্র— ইন্দ্র সব দেবতাদের প্রধান। তার স্বর্গীয় আবাসস্থল হল অমরাবতী। পাণ্ডুর স্ত্রী-র সঙ্গে অবৈধ যৌন সম্পর্কের ফলে অর্জুনের জন্ম হয়। শ্রুতবতী নামে

করেন। প্রাচীন লোককথা-লোকসংস্কার-ধর্মপুস্তক-পুরাণ ইত্যাদিতে এই ৩ সংখ্যাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মত লোককাহিনীতে তিনবন্ধু, তিনকন্যা, তিনদিন, তেমাথা রাস্তা ইত্যাদির ছড়াছড়ি বেশ বেশী। জন্ম-বৃদ্ধি-মৃত্যু —জীবনের এই তিন অবস্থাই যথাসম্ভব মানুষের সমাজজীবনে তিনকে বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে। ফ্রয়েড ৩ সংখ্যাকে যৌনতাসূচক বলেছেন (মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম, নারীদের সঙ্গে জীবন কাটান, ধরিত্রী-মায়ের মাটিতে বিলীন হওয়া)। (তবে এ প্রসঙ্গে এটিও মনে রাখা দরকার যে, ফ্রয়েডের চিন্তাধারা মূলতঃ ভাববাদী ও ভাববাদেরই পরিমার্জিত রূপ।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের বৌ থাকলেও অন্যের বৌদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনে ইন্দ্রের বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। একদিন দেবশর্মার সুন্দরী স্ত্রী রুচিকে দেখে ইন্দ্র ভীষণ কামার্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু রুচি তাড়া করলে অতৃপ্ত অবস্থায় ইন্দ্রকে পালিয়ে যেতে হয়।

আরেকবার গৌতমের স্ত্রী অহল্যাকে দেখে ইন্দ্র তার যৌন আবেগ চেপে রাখতে পারেনি। স্বামীর অবর্তমানে ইন্দ্র অহল্যার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে। বাড়ী ফিরে গৌতম দেখলেন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ইন্দ্র যৌন-মিলনে রত। তিনি দু'জনকেই অভিশাপ দিলেন।

একবার এক মহিলার ছদ্মবেশে অরুণ দেবলোকে এসেছিল। ইন্দ্র এই ছদ্মবেশী মহিলাকে দেখেও তার কাম দমন করতে পারেনি। এই অস্বাভাবিক সমলিঙ্গ মিলনের ফলে বলির জন্ম হয়।

কৃষ্ণ— ঈশ্বর মহাবিষ্ণুর নমব অবতার হচ্ছে কৃষ্ণ। যীশুখ্রীষ্টের মত কৃষ্ণও ‘মানব সন্তান’ হিসেবে গোয়ালাদের ঘরে জন্মগ্রহণ করে। যদিও নিজের ১৬০০৮ জন গোপিনী ছিল, তবু কৃষ্ণ কোন মহিলাকেই বাদ দিতেন না। একবার কালিন্দী নদীতে কয়েকজন গোপিনীকে স্নান করতে দেখে কৃষ্ণ লুকিয়ে নদীর ধার থেকে তাদের কাপড়-চোপড় নিয়ে একটি গাছে উঠে পড়ে এবং স্নানরতা গোপিনীদের নগ্ন শরীর তারিয়ে তারিয়ে দেখতে থাকে। সবাই উঠে এসে তার পূজা করার পর কৃষ্ণ তাদের কাপড়-চোপড় ফিরিয়ে দেয়। ফলে কৃষ্ণ মহিলাদের পুরো উলঙ্গ শরীরটাই দেখতে পায়। দাবি করা হয়, কৃষ্ণের এমনই ক্ষমতা ছিল যে, সে একসঙ্গে তার ১৬০০৮ জন গোপিনীকে তৃপ্ত করতে পারত।

রাম— শ্রীরাম মহাবিষ্ণুর আরেক অবতার। সে ও তার তিন ভাই লক্ষ্মণ, ভরত শত্রুঘ্ন রাজা দশরথের তিন স্ত্রীর ছেলে। দশরথ যদিও এদের মায়েদের স্বামী, কিন্তু এদের বাবা কোন মানুষ ছিল না—যীশুখ্রীষ্টের মতই। ওই তিন মহিলা এক পবিত্র পণীর খাওয়ার ফলে গর্ভবতী হয়ে পড়ে।

যীশুখ্রীষ্ট— সেন্ট মেরির অন্য ছেলেমেয়েদের বাবা ছিলেন তাঁর স্বামী জোসেফ। কিন্তু বলা হয় একমাত্র যীশুর ক্ষেত্রেই মেরির গর্ভাধান হয় এক পুণ্যাত্মার দ্বারা, —এ খ্রীষ্টানদের একাধারে তিনজন দেবতার কাজ করে। মেরির যদিও অনেকগুলি বাচ্চাকাচ্চা ছিল তবুও তাঁকে খ্রীষ্টানরা কুমারী হিসেবেই পূজা করে।

শীলাবতীর গর্ভাধান— এক বৌদ্ধশাস্ত্র অনুযায়ী শীলাবতী সেন্ট মেরি ও দশরথের পত্নীদের মত অস্বাভাবিকভাবে, কোন পুরুষের যৌন-মিলন ব্যতিরেকেই গর্ভবতী হয়েছিল। দেবলোকে শক্র জানতে পারলো যে পৃথিবীতে শীলাবতী ভীষণভাবে সন্তান কামনা করছে। একরাত্রে শীলাবতী যখন ঘুমুচ্ছে তখন শক্র পৃথিবীতে নেমে এসে পায়ের আঙ্গুল দিয়ে শীলাবতীর নাভি ছুঁয়ে দিল। শীলাবতী গর্ভবতী হল ও এক শিশুর জন্ম দিল।

সবরিমালাই ষষ্ঠ— ভারতবর্ষের তামিলনাড়ু ও কেরালার সরল-বিশ্বাসী হিন্দুরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বন্যদেবতা সবরিমালাই ষষ্ঠ বা আইয়াপ্পার পুজো করে। শিব ও বিষ্ণুর সমলিংগ মিলনের ফলে তার জন্ম।

শক্তিশালী দৈত্যে দুর্বাসার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সব দেবতা মিলে দুগ্ধ মন্থন করে মাখনের মত 'অম্রুত' (অমৃত) বের করল। একটি পাত্রে অমৃত রাখল স্বর্গের ভোজসভায় পরিবেশনের জন্য। এদিকে এক অসুর এই অমৃতের পাত্রটি দেবলোক থেকে চুরি করে নিল। চুরিটি ধরা পড়ার পর, সর্বদর্শী বিষ্ণু দেখতে পেলো কোথায় ওটি রাখা আছে। পরমাসুন্দরী মোহিনীর বেশ ধরে সে অসুরের রাজ্যে গেলো এবং অমৃত ফিরিয়ে এনে দেবতাদের পরিবেশন করলো। অমৃত পরিবেশন করাকালীন মোহিনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে শিব উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং মোহিনীবেশী বিষ্ণুর সঙ্গে যৌনসঙ্গমে মিলিত হলো। এই সমলিঙ্গ মিলনে বিষ্ণু গর্ভবতী হয়ে গেল এবং নিজের উরু তেকে ষষ্ঠের জন্ম দিল। শিব ও বিষ্ণু এই অবৈধ সন্তানটিকে কেরালার সবরিমালাই জঙ্গলে পরিত্যাগ করে।

জগন্নাথ— পুরীর বিখ্যাত হিন্দু-মন্দিরে জগন্নাথদেব আসীন। ভারতের বর্তমান হিন্দুদের প্রধান শঙ্করাচার্য পুরীর জগন্নাথের একজন ভক্ত। এখানে প্রতিদিন হাজার হাজার ভক্তকে খাওয়ানোর জন্য প্রচুর চাল-ডাল রান্না করা হয়।

এই মন্দিরের জয়-বিজয় তোরণে জগন্নাথদেবের বহুধরনের যৌন ভঙ্গীর গ্র্যানাইট পাথরে গড়া ভাস্কর্য দেখা যাবে। এই মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে বাৎস্যায়নের কামসূত্রে বর্ণিত নর-নারীর ৬৪ ধরনের যৌনমিলনভঙ্গীর শরীর-প্রমাণ ভাস্কর্য রয়েছে।

এই মন্দিরে প্রতিদিন রাত দশটার পর রুদ্ধ ঘরের ভেতরে ভজনের নাচ শুরু হয়। মন্দিরের সেবায় নিয়োজিত ১২০ জন মেয়ের একজন এটি করে। প্রতি রাত্রে জগন্নাথদেবের সামনে নতুন নতুন মেয়েরা নাচে। এ নাচ দেখে শুধু জগন্নাথের প্রাণহীন মূর্তি এবং পুরোহিত ; সে বাজনাও বাজায়।

নাচ চরম পর্যায়ে গেলে মেয়েটি তার সব কাপড়-চোপড় খুলে ফেলে এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে নাচতে থাকে। তারপর সে নিজেকে জগন্নাথের মূর্তির কাছে সঁপে দেয় এবং উত্তেজনায় চেচাঁতে থাকে, 'হে দেবতা, আমি তোমারই স্ত্রী, আমাকে গ্রহণ কর।'

জগন্নাথের প্রাণহীন মূর্তি না জীবন্ত পুরোহিত—কে মেয়েটিকে গ্রহণ করে সেটি অজ্ঞাত।

এইসব নর্তকীদের যারা একসময় অবসর গ্রহণ করে, তারা পুরীর রাস্তায় বারাঙ্গণা হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করে। তাদের খদ্দের তারাই যারা হাজারে হাজারে এই পবিত্র শহরে ঠাকুরের পুজো দিতে আসে।

বাস্তবে এই সকল দেবতার কোনো অস্তিত্বই নেই, কোনদিন ছিলও না। অতীতের কিছু কল্পনাপ্রবণ সৃজনশীল চিন্তাবিদের মানসিক ভাবালুতার ফসল এরা। এখনো অনেক মানসিক রোগী রয়েছে যারা নতুন নতুন ঠাকুর-দেবতা সৃষ্টি করে চলেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইসব ঠাকুর দেবতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা প্রেমঘটিত গালগল্পগুলি প্রকৃতপক্ষে ঐসব যৌন-কাতর ভাববাদী চিন্তাবিদদের যৌন-চিন্তার ফসল।

ভারতের অবতারদের ঘৃণ্য বিকৃতচরিত্র তাদের দেবতাদের অস্বাভাবিক যৌন লালসার জন্য হতে পারে। সাঁইবাবার আমেরিকান ভক্ত টল ব্রুক তার বইতে নিজের সঙ্গে ও পুত্তাপার্তির অন্য সুন্দর চেহারার ভক্তদের সঙ্গে সাঁইবাবার সমলিঙ্গ অবৈধ যৌন আচরণের কথা বলেছে।

বীট্‌ল জন লেননের বিবৃতি অনুযায়ী,—বীট্‌লরা মহর্ষি মহেশ যোগীকে ত্যাগ করেছে কারণ সে তাদের একজন মহিলা সদস্যা, মিয়া ফারাওকে ধর্ষণ করতে গিয়েছিল।

একটি লুকনো ক্যামেরায় গুরু মহারাজজীর ছবি উঠেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে সে তার বাড়ীর চাকরাণীকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করছে—তার আমেরিকান স্ত্রী তখন ছিলেন পাশেরই ঘরে।

প্রথম শংকরাচার্য চিরকুমার আদি-শংকর সর্বজ্ঞানী হিসেবে নিজেকে দাবি করত। তার এক ভক্ত যখন তাকে যৌন ব্যাপারে জিগ্যেস করল তখন সে উত্তর দিতে পারেনি, —কারণ তার নিজের যে ব্যাপারে অভিজ্ঞতা নেই সেটি সম্পর্কে সে তার মহাগুরুর কাছে প্রশ্ন করতে পারেনি। তাই সে ভক্তকে বলল, পরে আসতে, —যৌন অভিজ্ঞতা লাভের পর সে তার উত্তর দেবে। এরপর ঐ শংকরাচার্য একজন বিবাহিত ভদ্রলোকের ছদ্মবেশে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়।

যারা স্কুলে ধর্মশিক্ষার অনুমোদন করে তার প্রায়শঃই উপলব্ধি করে না কিভাবে এইসব কাল্পনিক দেবতাদের নোংরা গল্পগুলো নিষ্পাপ শিশুদের ঐ বয়সে কি বিপদের সৃষ্টি করে। শিশুদের এই বয়সে তাদের মনে সবকিছুই সহজে ছাপ ফেলে। সভ্য মানুষের নীতিবোধ ও চেতনার আধুনিক মান অনুযায়ী আমাদের শিশুদের উচ্ছন্নে দেওয়ার ক্ষেত্রে এইসকল দেবতারা খুব ক্ষতিকর উদাহরণ। ধর্মের নামে স্কুলের শিশুদের মিথ্যেকথা পড়ান থেকে আমাদের বিরত হওয়া উচিত।"

[অতীতে এই জাতীয় ঘটনা অর্থাৎ ভাইবোনের বিয়ে, অবাধ যৌন সম্পর্ক ইত্যাদি স্বাভাবিকভাবে চালু ছিল। এগুলি প্রাচীন লোকগাথায় প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজের শাসক রাজা ও পুরোহিতদের যৌন উচ্ছৃংখলতা ইত্যাদিও এর সঙ্গে মিশেছে। আর পরে এগুলিই ধর্মগ্রন্থগুলিতে স্থান পেয়েছে, এদের ওপরও আরোপিত হয়েছে অলৌকিকত্ব, দেবত্ব। কামুক, উচ্ছৃংখল, অত্যাচারী রাজা-পুরোহিতদের প্রজাদের চোখে সহনীয় করে তোলার নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র এতে জড়িয়ে রয়েছে।]

ঈশ্বরবিদ্যা (Theosophy)

জীবনের অনিশ্চয়তা, প্রকৃতির কাছে অসহায়তা এবং প্রকৃতি সম্পর্কে অসম্পূর্ণ জ্ঞানের জন্য আদিম মানুষ আত্মা-পরমাত্মা তথা সর্ব শক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও সর্বপ্রাণের উৎসস্বরূপ ঈশ্বরের যে ধারণা করেছে সে ধারণা এখনো বর্তমান। এই ধারণার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ও নিয়মে অতীতে নানা সংস্কার, দর্শন বা ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে। অধ্যাত্মবাদীরা এসব চর্চার সঙ্গে শুধু ঈশ্বর ও তার অস্তিত্ব-প্রমাণ সম্পর্কিত বিদ্যারও চর্চা শুরু করেছে। এর নাম ঈশ্বরবিদ্যা (Theosophy)। ঐতিহাসিক আর্নস্ট টয়েনবি একে হিন্দুদের অপবিজ্ঞান (Hindu pseudoscience of theosophy) বল্লেও এটি শুধু হিন্দুদের মধ্যে নয়,—প্রায় সব ধর্মাবলম্বীদের ধর্মবিশ্বাসের মূলেই এর উপাদান লুকিয়ে আছে। আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, ভারত, শ্রীলংকা সহ বহু দেশেই ঈশ্বরবাদী সঙ্ঘ (Theosophical Society) স্থাপিত হয়েছে; বহু ধান্দাবাজ বুজরুক ঈশ্বর ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিপুল সংখ্যক সরল বিশ্বাসী মানুষ মানসিক শান্তি ও তৃপ্তি লাভের আশায় নির্দোষভাবে এতে যোগ দিয়েছেন।

ঈশ্বরবিদ্যা (Theosophy) -র চর্চা শুরু করে হেলেনা পাট্রভনা ব্লাভাৎস্কি নামে এক মহিলা। রাশিয়ার ইউক্রেনে ১৮৩১ সালে এর জন্ম। বাবা ছিলেন সেনাবিভাগের অফিসার। ছোটবেলা থেকেই মেয়েটি ছিল ছিটগ্রস্ত খাপছাড়া গোছের—আর শরীর দুর্বল হলেও চেহারাটি ছিল বেশ। ১৭ বছর বয়সে এক রাজপুত্রের সঙ্গে কিছু ফষ্টিনষ্টি করে। পরে তাকে ছেড়ে এরিভান প্রদেশের ভাইস-গভর্নর জেনারেল নাইসফোর ব্লাভাৎস্কিকে বিয়ে করে। কিন্তু তিনমাস পরেই সে তার ঠাকুর্দার কাছে পালিয়ে যায়। ঠাকুর্দা জাহাজে করে তাকে ওডেশায়, তার বাবার কাছে ফেরত পাঠায়। কিন্তু জাহাজেরই একজনের সঙ্গে সে পালিয়ে গেল কন্‌স্ট্যান্টিনোপল-এ। পরে কায়রোতে এলবার্ট রয়ন নামে এক আমেরিকান বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে সে তিনমাস কাটায়। ভদ্রলোক হেলেনা ব্লাভাৎস্কিকে পাভলোয়া মেটামন নামে এক জাদুকরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। এই জাদুকর তাকে জাদুবিদ্যা অর্থাৎ ম্যাজিক ইত্যাদি শেখায় তিনমাস ধরে। এটিই হেলেনার জীবনে একমাত্র বিধিবদ্ধ প্রশিক্ষণ। কায়রোতে থাকাকালীনই মহিলাটি তার সারাজীবনের নেশা গাঁজা-চরস খেতে শুরু করে, যাতে তার চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়। এক সময় সে আবার কনস্ট্যান্টিনোপল -এ চলে যায়—ওখানে প্রথমে একটি সার্কাসে এবং পরে এক গায়কের সহকারী হিসেবে কাজ করে, যথাসম্ভব এর সঙ্গে বিয়েও হয়। পরে জানা যায় হেলেনা প্যারিসের জনৈক ডি. ডি. হোম -এর সঙ্গে আত্মার ভর হওয়ার মাধ্যম বা medium হিসাবে কাজ শুরু করেছে। কয়েকবছর পরে সে রাশিয়ার ফিরে আসে এবং 'আত্মার মিডিয়াম' হিসেবে কাজ ক'রে সবাইকে চমৎকৃত করে। প্রথম স্বামী নাইসফোর ব্লাভাৎস্কির সঙ্গে কিছুদিন থেকে ঐ গায়কের সঙ্গেই আবার পালিয়ে যায়। ১৮৭১ সালে এই গায়ক ভদ্রলোক এক দুর্ঘটনায় প্রাণত্যাগ করেন। কায়রোতে এসে হেলেনা আরো দু-একজনের সঙ্গে প্রেতাত্মার ভর হওয়া বা মিডিয়ামের ব্যবসা শুরু করে। কিন্তু একবার প্রেতাত্মার আবির্ভাব দেখানোর সময় শূন্যে ভাসমান একটি হাতকে দর্শকরা তুলোভরা দস্তানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে ধরে ফেলে। ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। হতাশ হেলেনা রাশিয়ায় ফিরে আসে, কিন্তু ঝগড়াঝাঁটি করে প্রথমে যায় প্যারিসে, ওখান থেকে নিউইয়র্কে। এখানেই ১৮৭৪ সালে হেনরি স্টীল অলকট নামে সেনাবিভাগের এক প্রাক্তন অফিসারের একটি লেখা হেলেনার চোখে পড়ে, যেটিতে প্রেতাত্মার ভর সম্পর্কে নানাকথা ছিল। হেলেনা, অলকটের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং আগে শেখা ম্যাজিক-বিদ্যার নানা ভেলকি দেখিয়ে তাকে মুগ্ধ করে। নিজের স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের ছেড়ে দিয়ে তাকে বিয়ে করার জন্য অলকটকে চাপও দেয়, একসঙ্গে ম্যানহাটানে কিছুদিন কাটাও। অলকট দু'জনের সম্পর্ককে আধ্যাত্মিক বল্লেও অলকটের স্ত্রী তা মেনে নিতে পারেননি এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য মামলা করেন। পরে হেলেনা ব্লাভাৎস্কি ও হেনরি অলকটের রমরমা ব্যবসা শুরু হয়। হেলেনা তার ম্যাজিসিয়ানসুলভ দক্ষতায় ঈশ্বর ও প্রেতাত্মার আবির্ভাব ইত্যাদি দেখাতে শুরু করে এবং ভরের সময় সে ঈশ্বরের কাছ থেকে নানা বাণী পেয়েছে বলে প্রচার করতে থাকে। সে এরই সাহায্যে নানা ‘ভবিষ্যদ্বাণীও’ করতে থাকে।

১৮৭৫ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর অলকটের সভাপতিত্বে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এক সদস্যের প্রস্তাব অনুযায়ী নাম দেওয়া হয় ঈশ্বরবিদ্যা (Theosophy)। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের নানা লোককথা ও ধর্মপুস্তক ঘেঁটে এবং জ্যোতিষবিদ্যা, সংখ্যাবিদ্যা, প্রেতাত্মা ও ঈশ্বরের নানা শক্তি ইত্যাদি মিলিয়ে ব্লাভাৎস্কি তাদের Theosophical Society -র পক্ষ থেকে নানাবিধ চমকপ্রদ কাজকর্ম করতে থাকে—আসলে সবই ছিল তার ম্যাজিক ও চালাকি। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র থেকে কর্মযোগ, অবতারতত্ত্ব ও পুনর্জন্ম, স্বর্গীয় মহাত্মাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ইত্যাদি নানা গালভরা তত্ত্বও সে গ্রহণ করে।

একসময় তারা ঠিক করে ভারতে যাবে। অলকট বোম্বাই -এর দয়ানন্দ সরস্বতীকে চিঠি দেয়। এই ভদ্রলোক হিন্দুধর্মের আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে স্থাপিত ‘আর্য সমাজ’ -এর প্রতিষ্ঠাতা। ভারতীয়দের বোঝান হল, আর্যসমাজ ও Theosophical Society -এর উদ্দেশ্য মূলতঃ একই। ১৮৭৮ সালে হেলেনা ও অলকট ভারতে এল। দয়ানন্দ সরস্বতী তাদের বিপুল সম্বর্ধনা জানায়।

উত্তর ভারতে গিয়ে হেলেনা ব্লাভাৎস্কি একজন ম্যাজিক জানা লোক ঠিক করে—লোকটি ম্যাজিকের সঙ্গে রহস্যময় গলার আওয়াজ ও অদ্ভুত চিঠি লিখে অলকট-ব্লাভাৎস্কির ‘অলৌকিক ও ঐশ্বরিক’ কাজকর্মকে শক্তিশালী ক'রে। পরে তারা ‘দি থিওসফিস্ট’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও অলৌকিকত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে লেখা প্রকাশ করতে থাকে। শুরু থেকেই পত্রিকাটি প্রচণ্ড সফল হয়। তারা বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমর্থনও পায়। এঁদেরই একজন ছিলেন অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম নামে এক ইংরেজ,—ইনিই পরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। হেলেনা ব্লাভাৎস্কি জানায় যে, তিব্বত ও হিমালয়ের নানা মহাত্মার আত্মার সঙ্গে ওর নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিমলায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটির সবাইকে নানাবিধ 'অলৌকিক' কাজকর্ম দেখিয়ে সে মুগ্ধ করে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে নানাবিধ আওয়াজ, অনেক উচুঁতে অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ ইত্যাদি সে শোনায় (যা আসলে নানা ধরনের ম্যাজিকের কায়দা ও ভাড়া করা লোকেদের কাজ) এবং বলে যে, ঐসব শব্দ তিব্বত-হিমালয়ের মহান আত্মায় গলার আওয়াজ। অ্যালান হিউম এমনই সম্মোহিত হন যে, তিনি একসময় চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিব্বতে মহাত্মাদের খোঁজে বেরিয়েও পড়েন।

এদিকে অলকট সারা ভারত ও সিংহল ঘুরে ঘুরে তাদের Theosophical Society -র ঈশ্বর ও আত্মা সম্পর্কিত বাণী প্রচার করতে থাকে এবং নানা শাখা-উপশাখা প্রতিষ্ঠা করে। অবৈজ্ঞানিক চেতনাসম্পন্ন, অসচেতন বহু মানুষ সরলবিশ্বাসে এসবের পেছনে জড়ো হয়। কুট্ হুমি নামে এক তিব্বতী মহাত্মা নাকি অলকটদের সাক্ষাৎ দিয়েছিল এবং কিছু বাণী বিতরণ করে মিলিয়ে গিয়েছিল। অলকটরা প্রায়ই এর উল্লেখ করত। অ্যালফ্রেড সিনেট নামে একজন একবার ব্লাভাৎস্কিকে বললেন, এই মহাত্মাকে দিয়ে ওই দিনের এককপি 'লণ্ডন টাইমস' এনে দিতে। হেলেনা ব্লাভাৎস্কি ধ্যানস্থ হয়ে কুট হুমির কাছ থেকে উত্তর নিয়ে জানাল যে, মহাত্মাটি এ ধরনের দুষ্টুমি পছন্দ করে না। আসলে ঐ ধ্যান, মহাত্মা ইত্যাদি সবই বুজরুকি ; যেহেতু ঐ দিনেরই 'লণ্ডন টাইমস' ঐ সময় পাওয়া সম্ভব ছিল না—তাই ম্যাজিক বা কোন চালাকির সাহায্যে সেটি হাজির করা ব্লাভাৎস্কির পক্ষে অসম্ভব ছিল। স্রেফ এই কারণেই সে ব্যাপারটি এড়িয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। আরেকবার একটি পিকনিকে কাপ-ডিস অভাব পড়ায় ব্লাভাৎস্কি একইভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে নির্দেশ সংগ্রহ ক'রে দূরের একটি জায়গা খুঁড়তে বললো। জায়গাটি খুঁড়তেই কিছু কাপডিস পাওয়া গেল। সবাই এই অলৌকিক ও ঐশ্বরিক ঘটনায় অভিভূত হলেও, একজন প্রত্যক্ষদর্শী জায়গাটির ওপর সদ্য খোঁড়া কিছু কিছু কাঁচা মাটি দেখতে পেয়েছিলেন। আসলে ব্লাভাৎস্কিরা আগে থেকেই ওখানে কাপডিস পুঁতে রেখেছিল।

ব্লাভাৎস্কিদের Theosophical Society -র ঐশ্বরিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ে অ্যালফ্রেট সিনেট 'রহস্যময় জগৎ' (The Occult World) নামে একটি বই লেখেন। চারিদিকে সংস্থার খবর ছড়িয়ে পড়ে। অকটাভিয়ান হিউম অবশ্য একসময় বিভ্রান্ত হয়ে Theosophical Society ছেড়ে যান। কিন্তু যোগ দেয় সুভা রাও, মোহিনী চ্যাটার্জী প্রমুখ প্রভাবশালী ভারতীয়রা। ধনী ভক্তরা অর্থ সাহায্য করতে থাকে। Hindu Theosophical Society of India -র প্রধান দপ্তর মাদ্রাজের আদায়ারে একটি বাংলো বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। বাংলোর দোতলায় ব্লাভাৎস্কি থাকত। এর একটা ঘর ছিল, অলৌকিক কাজকর্ম দেখানোর জন্য। ঘরের এক কোণে ছিল পুরু পর্দা দিয়ে আলাদা করা একটি জায়গা—এখানে তিব্বতের মহাত্মারা নাকি তাদের বাণী কাগজে লিখে পাঠিয়ে দিত। আসলে পাশের ঘরের সঙ্গে একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোপন ফুটো দিয়ে জায়গাটির যোগ ছিল, পাশের ঘর থেকে একজন এই ফুটো দিয়ে লেখা কাগজ ঢুকিয়ে দিত। দর্শকদের মাথার ওপর এ ধরনের কাগজ পড়ত। পরে অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, তথাকথিক মহাত্মা বা ঈশ্বরের দূতদের এই লেখা আসলে ব্লাভাৎস্কি অথবা দামোদর নামে এক ভারতীয় ভক্তের হাতে লেখা।

এদিকে সংস্থার টাকাপয়সা নিয়ে গোলমাল হওয়ায় সংশ্লিষ্ট একজন ব্লাভাৎস্কির ৪০টি চিঠি ফাঁস করে দেন। এই সব চিঠিতে দর্শকদের সামনে নানারকম ম্যাজিক করার জন্য ব্লাভাৎস্কির নানারকম নির্দেশ ছিল। ব্লাভাৎস্কি সংস্থা থেকে এঁদের তাড়িয়ে দেয়।

[বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং পরিষদের পত্রিকা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' -এর প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য (১.৮.১৮৯৫—৮.৪.১৯৮১) ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী সংখ্যার 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন— "১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এই সমিতি গৃহ (theosophical society) মাদ্রাজের আডিয়ারে স্থানান্তরিত করা হয়। আডিয়ারে সমিতিগৃহে নানারূপ অলৌকিক কার্য সাধিত হয় বলিয়া এদেশে ও বিদেশে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়। লণ্ডনের Society for Psychical Research এই ব্যাপারের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য মি. আর. হাডসনকে ভারতে প্রেরণ করেন। তাঁহার অনুসন্ধানের ফলে ম্যাডাম ব্লাভাৎস্কির সাহায্যকারিণী মিসেস কোলম্ ফাঁকি সংক্রান্ত উপদেশপূর্ণ ম্যাডামের স্বহস্ত লিখিত বহু পত্র সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া দেন। এই সম্বন্ধে 'It is very much unveiled' ও 'The frauds of Theosophy exposed' নামক পুস্তকগুলিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।....."]

সব চালাকি ধরা পড়ে যাওয়ায় অবশেষে Theosophical Society -র ঈশ্বরভক্ত সহকর্মীরা ব্লাভাৎস্কিকে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে ভারতে Hindu Theosophical Society ও সিংহলে Buddhist Theosophical Society। (মধ্য কলকাতায় Theosophical Society -র একটি শাখা এখনো রয়েছে।)

ইংলণ্ডেই ব্লাভাৎস্কির সঙ্গে মাদাম অ্যানি উড বেসান্ট -এর সাক্ষাৎ হয়। এর কিছুদিন আগেই অ্যানি বেসান্ট ঈশ্বর, নারীর অধিকার, জন্মনিয়ন্ত্রণ, সমাজতন্ত্র ও আধ্যাত্মবাদ ইত্যাদির স্বপক্ষে আত্মত্যাগ করার উদ্দেশ্যে স্বামীকে ত্যাগ করেছেন। দু'জন মহিলার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। অ্যানি বেসান্ট অলকটদের সঙ্গে যোগ দেন। কিন্তু ১৮৯১ সালে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে ব্লাভাৎস্কি মারা গেলে বেসান্ট, অলকট ইত্যাদিদের মধ্যে theosophy বা ঈশ্বরবিদ্যা নিয়ে নিজেদের বুজরুকি, ক্ষমতার ভাগাভাগি ইত্যাদি নানা বিষয়ে ঝগড়া শুরু হয়। ১৮৯৩ সালে অ্যানি বেসান্ট ভারতে চলে আসেন। এখানকার Theosophical Society -র লোকেরা তাঁর ব্যক্তিত্বময়, গম্ভীর আধ্যাত্মিক কথাবার্তা শুনে তাঁকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করে। অ্যানি বেসান্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতীয় সংস্কৃতি, হিন্দুধর্ম ও জাতীয়তাবাদের পুনরুদ্ধারে কাজ করতে থাকেন। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি সতীদাহপ্রথা, দেবদাসীপ্রথা ইত্যাদিকেও সমর্থন জানান। ভারতের জনজীবনে তাঁর প্রভাবের পরিধি বোঝা যাবে আরেক ঈশ্বরবাদী ইংরেজ, অকটাভিয়ান হিউম প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রীর পদগ্রহণ থেকে।* মাদ্রাজের আডায়ারে Hindu Theosophical Society -র প্রধান ল্যাণ্ডবীটার আবার আশ্রমের কিছু অল্পবয়সী ছেলেদের সঙ্গে সমলিঙ্গী ব্যভিচার ও অন্যান্য নানা কুকর্মের জন্য ধরা পড়ে এবং পালাতে বাধ্য হয়। তবে অ্যানি বেসান্ট তাকে সাদরে গ্রহণ করেন। পরে ল্যান্ডবীটারের পরামর্শক্রমে জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি নামে এক ভারতীয় তরুণ ব্রাহ্মণকে তার বাবা-মা'র কাছ থেকে প্রায় কিডন্যাপ করে নিয়ে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইত্যাদি জায়গায় শিক্ষিত করা হয় এবং অ্যানি বেসান্ট তাকে ধর্মগুরু বা মেসিয়া হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ক'রে কাজ চালাতে থাকে। কিন্তু ১৯২৭ সালে কৃষ্ণমূর্তি বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে জানায় যে, সে আদৌ কোন মেসিয়া নয়—ঈশ্বর পূজা, পুরোহিত ইত্যাদি সব ফালতু ব্যাপার ; ধর্ম একটি ভাঁওতা ছাড়া কিছুই নয়, নিজেকেই সত্য খুঁজতে হবে** ইত্যাদি। এ সবের ফলশ্রুতিতে Theosophical Society থেকে বিপুল সংখ্যায় পদত্যাগ ঘটতে থাকে। মধ্য ইয়োরোপের ২৪০০ ভক্ত রুডলফ স্টেইনারের নেতৃত্বে পদত্যাগ করে ও Anthroposophical Society গঠন করে।

---

* ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। ভারতের বিপুল সংখ্যক অশিক্ষিত, অসচেতন ও বৈজ্ঞানিক চেতনাবিহীন জনগণের মধ্যে ধর্ম, ঈশ্বর ও জাতীয়তাবাদের সংমিশ্রণে সৃষ্ট ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দর্শন ও কাজকর্ম তার উপযুক্ত ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি ও তাৎপরবর্তী কাজকর্মের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ও ঈশ্বরতত্ত্বের সম্পৃক্ততা, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি ও পরবর্তী ফলাফলের উপর যে প্রভাব ফেলেছে, সেই বিতর্কিত বিষয়ে নিরপেক্ষ ও বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা প্রয়োজন।

** সান্ডে (১২-১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮২) -তে এ প্রসঙ্গে প্রীতিশ নন্দীর একটি বিস্তারিত লেখা বেরোয় (Jiddu Krishnamurty : The Messiah Without a Mission)। অ্যানি বেসান্ট -এর চাকর লক্ষ্মণ কিভাবে ল্যাণ্ডবীটার ও কৃষ্ণমূর্তিকে রাত্রিতে ঘরে উলঙ্গ, আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় দেখেছে তার বর্ণনা এতে রয়েছে। অ্যানি বেসান্ট ১৯০৯ সালে চিকাগোতে এক জনসভায় বলেন, যেহেতু কৃষ্ণ ও যীশুখ্রীষ্ট প্রাচ্যে আবির্ভূত হয়েছেন, তাই এবার জগৎ গুরু পাশ্চাত্যে আবির্ভূত হবেন এবং ঐ অনুযায়ী চিকাগোয় ডঃ ভ্যান হুক -এর ১৩ বছর বয়সী সুন্দর চেহারার ছেলে হিউবার্টকে জোগাড় করেন। কিন্তু তাঁর অজান্তেই ল্যান্ডবীটার কৃষ্ণমূর্তিকে আগে জোগাড় করে ফেলেছিলো। ল্যাণ্ডবীটার ও অ্যানি বেসান্ট -এর সম্পর্ক নিয়ে বলা হয়েছে, "অনেকে সন্দেহ করেন, ল্যাণ্ডবীটার ছিলো চার্লস ব্র্যাডল, ই. বি. অ্যাভলিং ও জর্জ বার্নার্ড শ' -এর মত অ্যানি বেসান্টের অন্যতম প্রেমিক।" ল্যাণ্ডবীটার সম্পর্কে সমলিঙ্গী ব্যভিচারের অভিযোগে অ্যানি বেসান্ট খুবই ক্ষেপে যান। অবশ্য ল্যান্ডবীটার এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তবে স্বীকার করেছে যে সে আশ্রমের ছেলেদের হস্তমৈথুন করার জন্য উৎসাহিত করতো।

কৃষ্ণমূর্তি বেরিয়ে যাওয়ার পর অ্যানি বেসান্ট রুকমিনি আরুণ্ডেলে নামের মহিলাকে নতুন করে জগৎমাতা ও মা মেরী-র অবতার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, ধর্মপ্রাণ মোরারজি দেশাই এক সময় এই মহিলার নামই রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রস্তাব করেন। (ভারতের বিপুল সংখ্যক অশিক্ষিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৩৩ সালে অ্যানি বেসান্ট ও পরের বছর ল্যান্ড বীটার -এর মৃত্যু হয়। এরপর Theosophical Society ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়ে ও দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু চালাকি, বুজরুকি ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তার মূল ধারাটি অব্যাহত থাকে। সেই ধারাবাহিকতায় ঈশ্বর ও অলৌকিক শক্তির নাম নিয়ে ভারতের নানা প্রান্তে নানা অবধূত, বাবা, স্বামীজী, অবতারের দল নানা নাম নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে বা নানা সংগঠন গড়ে ব্যাপক মানুষকে ধোঁকা দিয়ে চলেছে, এমনকি দেশের রাজনীতিতেও এরা ও এই চিন্তা প্রভাবশালী। পৃথিবীর অন্যত্রও এই ধরনের বহু ঈশ্বরবাদী রয়েছে—যারা মানুষকে সত্য কথা জানা ও বৈজ্ঞানিক চেতনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে; এরা ঈশ্বর-ধর্ম -অধ্যাত্মবাদের ঠুলিতে তাদের চোখ ও মনকে আচ্ছন্ন করে রেখে নিজেদের তথা মুষ্টিমেয় শাসকগোষ্ঠীর সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধি করে চলেছে এবং বিপুল সংখ্যক নিপীড়িত মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

দরিদ্র নাগরিকের উপর অবৈজ্ঞানিক চিন্তা চাপিয়ে রাখার জন্য, উপযুক্ত প্রচেষ্টা ও প্রস্তাবই বটে! অবশ্য এ প্রস্তাব কার্যকারী না হলেও, এই ধরনের ব্যক্তিই আমাদের দেশে সর্বোচ্চ পদে আসীন হন ও শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। যেমন ভারতের রাষ্ট্রপতি গিয়ানী জৈল সিং -এর বৈজ্ঞানিক চিন্তার পরিধি এই রকম—কিছুদিন আগে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক নৃতত্ত্ববিদদের এক সম্মেলনে, ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি বলেন, "আপনারা বলছেন, মানুষ বানরের সন্তান। আপনারা হতে পারেন, আমি নই। এসব আপনাদের বানানো মিথ্যা তত্ত্ব। মানুষ যদি বানরের সন্তান হয়, তাহলে আমায় বলুন টিয়াপাখি কার সন্তান? এ কি করে এল? কি করে এর ঠোঁট এবং সবুজ ডানা এখনো একই রকম আছে? কেন এরা বানরে পরিণত হল না বা মানুষে রূপান্তরিত হল না? এবং বানর যদি পরিবর্তিত হয় ও তাদের লেজ খসে পড়ে এবং মানুষে পরিণত হয় তাহলে কি করে আজো তাদের অস্তিত্ব রয়েছে। কেন তারা আপনাদের চেহারা পেল না? আমাদের পুরান গুহা অজান্তা ইলোরার দিকে তাকান। সেকানে গৌতম বুদ্ধের স্ট্যাচুগুলি দেখুন। তার মুখ আমাদের চেয়ে সুন্দর। সেকি বানরের সন্তান ছিল? যত সব বাজে কথা।" —মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন!!)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা

ধর্মের উৎপত্তি প্রসঙ্গে ডঃ কোভুর বলেছেন, "বর্বর অবস্থায় আদিম মানুষের ধর্ম ছিল সর্বপ্রাণবাদ (animism)। সর্বপ্রাণবাদীরা (animist) মনে করত যে, জড় বা জীবিত প্রতিটি বস্তুরই আত্মা রয়েছে। তাই তারা পাহাড়, নদী, সমুদ্র, সূর্য, মূর্তি ইত্যাদির পূজা করত। এখনো অনুন্নত অনেক মানুষ এই ধরনের জড় পদার্থের পূজা করে—অন্যরা বর্বর অবস্থা থেকে উন্নতির প্রক্রিয়ায় অসংখ্য ধর্ম আর দেবতার সৃষ্টি করেছে। এই সব ধর্ম ও দেবতাদের অনেকগুলিই এখন বিলুপ্ত। প্যারিস, লণ্ডন, রোম, গ্রীস, চীন, অ্যাসিরিয়া, মেক্সিকো-পার্সিয়া, মেসোপটেমিয়া, চালডিয়া ইত্যাদি প্রাচীন সভ্যতার বিলুপ্ত দেবতাদের আমি দেখেছি। অতীতের বিলুপ্ত দেবতাদের মত এখনকার চালু দেবতারাও অবশ্যই একদিন ভবিষ্যৎ মানুষের যাদুঘরে স্থান পাবে।

"সর্বপ্রাণবাদী স্তরের পরবর্তী অবস্থায় অনেক ধর্মই জড়-এর মধ্যে আত্মার অস্তিত্বের ধারণাকে পরিত্যাগ করেছে। প্রাচীন ধর্মগুলির মধ্যে এখনো চালু ধর্ম হিসেবে হিন্দুধর্ম প্রাচীনতম, —এই ধর্ম শিক্ষা দেয় যে প্রতিটি জীবন্ত বস্তুরই অমর আত্মা রয়েছে। জুদা, খ্রীষ্টান ও ইসলাম—যার জন্ম হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যে, —এই ধর্মগুলি শেখায় যে, কেবলমাত্র মানুষই অমর আত্মার অধিকারী, অন্য কোন প্রাণী নয়। কিন্তু ২৫০০ বছর আগে ভারতের মহান সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারক গৌতম বুদ্ধ, যিনি হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, —তিনি বলেছিলেন যে মানুষেরও অমর আত্মা বলে কিছু নেই।"*

---

* এই হিসেবে ডঃ কোভুর বৌদ্ধ ধর্মকে "অন্যান্য ধর্মের তুলনায় অপেক্ষাকৃত যুক্তিমুক্ত" বলে অভিহিত করেছেন। তবে পরবর্তিকালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে এর মধ্যেও অনেক কুসংস্কার, ভ্রান্ত ধারণা ও আচার সর্বস্বতা অনুপ্রবেশ করে। ডঃ কোভুর এগুলির প্রতিবাদ করেছেন, যেমন ব্যঙ্গ করে বলেছেন 'মহাকাশ-বিজ্ঞানীদের উচিত বৌদ্ধ ধর্মপুস্তক অনুযায়ী শিক্ষিত বৌদ্ধদের সাহায্য নিয়ে মহাকাশ গবেষণা করা'। আচারসর্বস্ব ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জড়প্রায় হিন্দুধর্মের আবিলতা থেকে মুক্ত করে, মানুষকে এক নতুনতর ও উপযোগী সামাজিক মানবিক মূল্যবোধে শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে গৌতমবুদ্ধের (জন্মঃ ৫৬৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) ঐতিহাসিক ভূমিকা অনস্বীকার্য (যা আরো প্রায় সব ধর্মপ্রবর্তকদের ক্ষেত্রে ভিন্নতর পরিস্থিতিতে সত্য)। কিন্তু বর্তমান যুগে, ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিকাশকে অনুসরণ করে এই সব ধর্মমতের মোহ কাটিয়ে, মানুষকে সমাজ-বৈজ্ঞানিক বাস্তব চিন্তায় শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে ডঃ কোভুর সুনির্দিষ্ট মতামত রাখেননি। এই কারণে ডঃ কোভুরের বিশ্লেষণগুলি প্রায়শঃই যান্ত্রিকতা লাভ করেছে, নিছক কুসংস্কারের 'বিরোধিতা করার জন্য বিরোধিতা' করার মত ব্যাপারে পর্যবসিত হয়েছে এবং জনগণের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে তাঁদের বৈজ্ঞানিক, সমাজ-সচেত[illegible] অর্জন করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মার কল্পনার ধারাবাহিকতায় প্রকৃতির বহুবিধ রহস্যের সমাধানে অক্ষম, অসহায় আদিম মানুষ অস্তিত্বহীন সর্বশক্তিমান এক পরমাত্মা ঈশ্বরের কল্পনা করেছে। নিজেদের জীবনযাত্রাকে উন্নত ও নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে এই ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার নানাবিধ মনগড়া পদ্ধতি গ্রহণ করেছে (যেমন পূজা প্রার্থনা, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি)। এর সঙ্গে মিশেছে বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে, বিশেষ সামাজিক প্রয়োজনে বিশেষ মানবগোষ্ঠীর মধ্যে কিছু প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ, আচার-আচরণ। এইসব মিলিয়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তে গড়ে উঠেছে নানা ধরনের ধর্মমত ও নানা মানবিক নীতিবোধ। ব্যাপক মানুষকে শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে এটি লোকশিক্ষার কাজও করেছে। এরও আগে প্রকৃতির কাছে অসহায় আদিম মানুষ নানা কৌশল করে প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার চেষ্টা করেছে (যেমন বৃষ্টি আনানো, বজ্রপাত রোধ করা, রোগ মুক্তি ইত্যাদি।) সৃষ্টি হয়েছে ভোজবাজি বা যাদুবিদ্যার। এটিও পরে ধর্মের সঙ্গে মিশেছে।

নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠীয় মধ্যে অভিজ্ঞ, বুদ্ধিমান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিশেষ এক একজন ব্যক্তিত্বশালী মানুষ বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিতে এই সবকিছুর সংকলন করেছেন, তিনি হয়ে উঠেছেন শ্রদ্ধেয় ধর্মগুরু। হাজার হাজার বছর ধরে এই বিশেষ ধর্মমত তথা ধর্মীয় নানা অনুশাসনকে অনুসরণ করতে করতে বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে নানা ধরনের গোঁড়ামি, দৈনন্দিন সমাজ জীবনের উপর ভিত্তি করে মূল মতাদর্শের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিত্য নূতন ধর্মীয় আচারবিধি। এক সময় এই ধর্ম সমাজকে ধরে রাখার ক্ষেত্রে, বিভ্রান্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সমাজকে একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত শৃংখলাবদ্ধভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে, ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে—যদিও তার ভিত্তি ছিল অনেকটাই কাল্পনিক ধারণার ওপর গড়ে ওঠা। এই ধর্মের নাম করে সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ—রাজা পুরোহিত, তথা সামন্ততান্ত্রিক শাসক শ্রেণী— সাধারণ মানুষকে শোষণও করেছে। এবং এর ধারাবাহিকতা এখনো বর্তমান। আদিম ঐসব ধর্মমত এখন তার সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা ও ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা হারালেও মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ ঐ ধর্মমতকে এখনো টিকিয়ে রেখে ব্যাপক মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে, রুদ্ধ করছে সমাজের ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক প্রগতিকে।

বিভিন্ন ধরনের ধর্মের অবৈজ্ঞানিক নানা দিকগুলি একদিকে যেমন মানব-সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, তেমনি বর্তমান যুগের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় নৈতিক মানবিক নানা নীতি ও নির্দেশগুলিকে (—যেগুলি ধর্মের নাম না করেও বলা যায়), সম্পূর্ণ বাতিল করার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু সাধারণভাবে ধর্মশিক্ষা কি স্কুলে, কি তার বাইরে মানুষের মধ্যে নানা অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ও বিকৃত রুচিরই জন্ম দেয়।

ঈশ্বর ইচ্ছা করলো অমনি পৃথিবী, প্রাণ ইত্যাদি সৃষ্টি হয়ে গেল, কুমারী অবস্থায় মা মেরী সন্তান প্রসব করল, দশরথের ছেলেপুলে হল তাঁর রানীরা পবিত্র পায়েস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাওয়ার পর, বৌদ্ধ জাতক অনুযায়ী কুশ নামে বুদ্ধের এক জন্মে তাঁর স্ত্রীর গর্ভাধান হল শক্র তার নাভিতে বুড়ো আঙ্গুল ঘষে দেওয়ার পর ইত্যাদি ধরনের অজস্র গালগল্প নানা ধর্মগ্রন্থেই ছড়িয়ে আছে। নানা দেবদেবীর ব্যভিচারের কথা রসিয়ে রসিয়ে নানা ধর্মগ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। এইভাবে অল্প বয়স থেকেই মানুষের মনে অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ও বিকৃতি ঢোকানো হচ্ছে।

রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতে নরনারীর মিলনকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় সেটি পুরুষ ও মহিলাদের শরীর ও মনের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে—নানা ধর্মের বিভিন্ন অনুশাসন কিভাবে নানা বিকৃতির জন্ম দেয় এটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতে নারী পুরুষের যৌন মিলনের সময় হিসেবে নারীর দুটি মাসিক ঋতুস্রাবের মাঝামাঝি কয়েকটি দিনকে নিষিদ্ধ করা হয়। এই সময়টি নারীদের ডিম্বকোষ নিঃসরণের সময়। তাই উপরোক্ত এই পদ্ধতি অবলম্বন করে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় এবং এটি জন্মনিয়ন্ত্রণের একটি প্রাকৃতিক পদ্ধতি হিসেবে গণ্য, যদিও পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়। রোমান ক্যাথলিক মতে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য কৃত্রিম কোন কিছুর (যেমন লুপ, পিল, কণ্ডোম ইত্যাদি) ব্যবহারকে ঈশ্বরের মহান ইচ্ছার বিরোধী অধার্মিক কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু ডিম্বকোষ নিঃসরণের সময়টি নারীদের চরম যৌন উত্তেজনার সময়। এই সময় প্রতি ঋতুতে যৌনমিলন নিষিদ্ধ হলে একজন নারী পরিপূর্ণ যৌনতৃপ্তি পান না। ফলে ধীরে ধীরে তিনি সচেতন বা অবচেতনভাবে নানা মানসিক রোগের শিকার হন, কখনো বা যৌনমিলনে নিরুৎসাহী হয়ে পড়েন যা তাঁর পুরুষসঙ্গীকেও পরিপূর্ণ যৌনতৃপ্তি দেয় না, উভয়েই মানসিকভাবে অস্বাভাবিক হয়ে পড়েন ; নানা পারিবারিক অশান্তিরও সৃষ্টি হয়, —সৃষ্টি হয়, নানা মানসিক রোগ ও বিকৃতির। ডঃ কোভুর এ ধরনের রোগাক্রান্ত কয়েকটি ধর্মভীরু রোমান ক্যাথলিক দম্পতির উদাহরণও দিয়েছেন। যৌন মিলনের সময়কে অস্বাভাবিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার এই পদ্ধতিকে বাদ দিয়ে, জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য বিজ্ঞান সম্মত কৃত্রিম পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে তাঁরা শেষ পর্যন্ত রোগ-মুক্ত ও সুখী হয়েছিলেন। পৃথিবীর আরো নানা ধর্মমতেও এই ধরনের নানা অনুশাসন বর্তমান।*

ধর্মের নামে নরহত্যা ও দাঙ্গা তো মানবজাতির একটি প্রাচীন ও অন্ধকারময় পাশবিক দিক। ধর্মযুদ্ধে সবই ন্যায়, কাফেরদের হত্যা করা পুণ্য কাজ, নিজ ধর্মকে

---

* প্রাচীনকালে পারিবারিক কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়তো ছিল, কিন্তু তখন কৃত্রিম পদ্ধতিগুলির আবিষ্কার হয় নি। তাই এইভাবে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক পদ্ধতির কথা বলা হত যা অনেক ক্ষেত্রে কার্যকারী এবং তাকে ধর্মের নাম দিয়ে প্রচার করতে হত, —যদিও এ থেকে ধর্মভীরুদের মধ্যে নানা বিকৃতিরও জন্ম হত। আজ মানুষ নানা বিকল্প পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে এবং স্বাভাবিকভাবেই ধর্মীয় অনুশাসনের নামে প্রাচীন ও তৎকালে প্রাসঙ্গিক এই সব বিধি-নিষেধ বর্তমানে তার ঐ উপযোগিতা হারিয়েছে। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য সংশ্লিষ্ট দম্পতিকে সঠিকভাবে পরীক্ষা করে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পদ্ধতিগুলির কোনটিকে অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া উচিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্ষা করার স্বার্থে বিধর্মীকে হত্যা করা প্রয়োজন ইত্যাদি ধরনের নির্দেশ বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষকে পারস্পরিক হানাহানিতে ঠেলে দিয়েছে। অসহায় ও দরিদ্র মানুষকে ধর্মের নাম করে বোঝানো হয়েছে, সামাজিক নানা সমস্যার সমাধানের জন্য জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস নয়, নিজের ধর্মকে রক্ষা করা ও তার জন্য অন্যান্যদের হত্যা করাই যথেষ্ট। বাইবেলে জিহোবা তার শিষ্যদের বলে, "যাও এবং অমলেকদের হত্যা করো, ছেড়ো না; তাদের নারী পুরুষ, কোলের বাচ্চা ও শিশু, ষাঁড় ও ভেড়া, উট ও গাধা—সবাইকে হত্যা কর; নিঃশ্বাস নেয় এমন কিছুকে বাঁচিয়ে রেখো না।" (কোরআন শরিফে বলা হয়েছে, "হে ইমানদারগন! তোমরা ইহুদি ও খ্রীষ্টানদিগকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করিও না"....., "নিশ্চয় আমি কাফিরদের জন্য শিকল, গলার বেড়ী ও জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রাখিয়াছি" ইত্যাদি।) পুণ্য কাজ হিসেবে এই সব নির্দেশ সাধারণ মানুষদেরই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং স্বার্থপুষ্ট করেছে ধর্মীয় নেতার ও শাসকশ্রেণীর। এখনো একই ভাবে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা হরিজন হত্যা ইত্যাদি চলছে বা সুপরিকল্পিতভাবে চালানো হচ্ছে। হিরোসিমা-নাগাসাকি-ভিয়েতনাম ইত্যাদি স্থানের হত্যালীলা, রাজনৈতিক নানা দাঙ্গা ইত্যাদি যেভাবে অন্যায়, ঐ একইভাবে অন্যায় ধর্মের নামে নরহত্যাও।

প্রাচীন বিভিন্ন ধর্মেই মানবজাতির অর্ধেক অংশ নারীদের শুধুমাত্র পুরুষের ভোগের সামগ্রী, সন্তানধারণের যন্ত্র ইত্যাদি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। বিরলক্ষেত্রে কোন কোন নারী স্বমহিমায় সমাজে সম্মানিত স্থান অর্জন করতে পারলেও, পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থার একটি স্তরে সৃষ্ট নানা ধর্ম নারীকে মূলত শোষণ-নিপীড়নের শিকার করে রেখেছে। জিহোবা বলেছে, "বন্দীদের মধ্যে সুন্দরী মহিলা খোঁজ, তাকে কামনা কর ও নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ কর...স্বামী হিসেবে তার সঙ্গে মিলিত হও এবং যখনই তুমি তার মধ্যে আর আনন্দ পাবে না তাকে ছেড়ে দাও, সে যেখানে খুশি যাক।" [Deuteronomy; XXI—II—14]

[মহাভারতেও নারীকে কোন কোন ক্ষেত্রে সম্মান দিয়েও "স্ত্রীলোক পুরুষদেরই একান্ত অধীন," "ভর্তা স্ত্রীলোকের পরম দেবতা" ইত্যাদি ধরনের 'ধর্মবাক্য' ব্যবহার করা হয়েছে (শান্তি পর্ব)। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, "বিধাতা কর্তৃক স্ত্রীজাতি স্বভাবত এইরূপ (ব্যভিচারিণী) —ইহা বিশেষ অবগত হইয়া সতত তাহার রক্ষা বিধানে সবিশেষ যত্নবান হওয়া পুরুষের কর্তব্য। শয়ন-আসন-ভূষণ, কামক্রোধ, পরহিংসা, কৌটিল্য এবং কুৎসিতাচার —এই সকল স্ত্রীলোকের জন্যই সৃষ্টি সময়ে মনু কল্পিত করিয়াছেন। অর্থাৎ নারীদিগের ঐ সকল স্বভাবগত" অথবা "শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে স্ত্রীজাতির জাতকর্মাদি মন্ত্রদ্বারা সম্পন্ন হয় না, স্মৃতি ও বেদাদি ধর্মশাস্ত্রে ইহাদের অধিকার নাই এবং কোন মন্ত্রেও ইহাদের অধিকার নাই, —এজন্য ইহারা মিথ্যা অর্থাৎ অপদার্থ ইহাই শাস্ত্রস্থিতি।" (নবম অধ্যায়; ১৬-১৭) ('আর্য শাস্ত্র' পত্রিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে)। মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের অনুসৃত কোরআন শরিফ -এও এই ধরনের নানা নির্দেশ রয়েছে যেগুলিতে নারীজাতিকে পুরুষের একান্ত অনুগত এবং গৃহকোণে আবদ্ধ করে রাখার মত প্রাণী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে; নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রয়োজনে তাদের ওপর অত্যাচার করার, এমনকি হত্যা করারও। বলা হয়েছে, "পুরুষের নারীর উপর কর্তৃত্ব আছে, কেন না আল্লাহ্ তাহাদের একজনকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন....."; "সাধ্বী নারীরা পুরুষের হুকুমের মত চলিবে"....ইত্যাদি। প্রাচীনকালে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও পারস্পরিক হানাহানিতে রত 'আরবজাতিকে' ঐক্যবদ্ধ করার জন্য মহম্মদ নানা মানবিক নির্দেশাবলী সংঘবদ্ধ করেছিলেন (যেমন বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সমানাধিকার ইত্যাদি) —এগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজ-ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু পাশাপাশি অন্যান্য নানা নির্দেশ (যেমন আল্লার কাছে প্রার্থনা, কাফেরদের প্রতি আচরণ, নারীপুরুষের সম্পর্ক ইত্যাদি) এবং সামগ্রিক ধর্মীয় চেতনাটিই ছিল কল্পনাশ্রয়ী। সমাজে মুষ্টিমেয়, প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা, অন্যান্য ধর্মমতের মত, এটিকেও শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। বর্তমান পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতিতে এবং মানুষের জ্ঞান যখন অনেক ধাপ এগিয়ে গেছে তখনো এগুলিকে অনুসরণ করা সমাজ প্রগতিকে পিছিয়ে রাখার অবৈজ্ঞানিক চেষ্টা মাত্র। তবে সুখের কথা মুসলিম ধর্মালম্বীদের মধ্যেই সচেতন, মুক্তমনা ব্যক্তিরা এ ব্যাপারে অনেক সময় সচেষ্ট হন। (অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রেও এটি সত্য।) এ প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক একটি খবরের উল্লেখ করা যেতে পারে— "ইসলামাবাদ, ১০ মে— পাকিস্থানী মহিলা সংগঠন সমূহের তীব্র সমালোচনায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউলের উপদেষ্টা পর্ষদের সদস্যপদে ইস্তফা দিয়েছেন বিশিষ্ট ধর্মীয় তত্ত্ববিদ আসরার আহমেদ। আহমেদ প্রস্তাব দিয়েছিলেন, পাকিস্তানে কর্মরতা মেয়েদের অবসর গ্রহণ করিয়ে দেওয়া হোক এবং সকলকেই পাঠানো হোক ঘরের কোণে। তাঁর মতে ইসলামী আইনে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা চলতে পারে না এবং মেয়েদের (বাইরে) কাজ করাটাও পরদা আইনের বিরোধী। আহমেদের এই কথায় দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঢেউ ওঠে।"...এ এফ পি (আনন্দবাজার পত্রিকা ; ১১ই মে, ১৯৮২)। সাম্প্রতিক বাংলাদেশেও আরজ আলি মাতুব্বর (বাংলা ১৩০৭-১৩৯২)-এর মত ব্যক্তিরা ইসলামী কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমরণ লড়াই করেছেন।

আদিম মানব-সমাজে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ইত্যাদি সৃষ্টির আগে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা চালু ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও তার ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রের উৎপত্তি, সম্পত্তির সঠিক উত্তরাধিকারী নির্ধারণ, আর্যদের অনার্য নারী-বিবাহ ইত্যাদি নানা কারণে ও প্রয়োজনে ধীরে ধীরে নারীজাতিকেই সামগ্রিকভাবে পুরুষদের একান্ত অধীন করে তোলা হল। এরই বিষময় ফল এখনো মানবসমাজ বহন করে চলেছে। ধার্মিক পুরুষরাও ধর্মের নামে নারীদের উপর তাদের অত্যাচার ও অবদমন অব্যাহত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেখেছে। নিজেরা হাজার অনাচার, ব্যভিচার করলেও মেয়েদের মধ্যে সামান্য এদিক ওদিক দেখলেই তাদের কঠোর শারীরিক-মানসিক শাস্তি দেওয়াকে ন্যায্য শাস্ত্রানুমোদিত কাজ বলেই গণ্য করেছে। বহু যুগ ধরে পুরুষ-শাসিত হতে হতে, নারীদের মধ্যেও, নিজেদের হীন-অবস্থাকে স্বাভাবিক বলেই ধরে নেওয়ার অসুস্থ মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে।]

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের ধর্ম বিভিন্ন, সেই অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রে তাদের নীতিবোধও ভিন্ন। কোন কোন ক্ষেত্রে এটি সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থান ও প্রয়োজনের বিশেষত্ব অনুযায়ী ঘটলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব কাল্পনিক নিয়মকানুন বিশেষ শ্রেণীর মানুষের স্বার্থকে পুষ্ট করে। কোথাও রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিভূ হিসেবে দেখিয়ে প্রজাদের আনুগত্য আদায় করা হয়েছে এবং রাজা অত্যাচারী, অবিবেচক হলেও রাজদ্রোহিতাকে ধর্মবিরোধী পাপকার্য বলে আখ্যা দিয়ে তাঁর স্বার্থরক্ষা করা হয়েছে। কোথাও বা পুরোহিতরা রাজার ভূমিকা নিয়েছে। ইতিহাসের নিয়মে এই সবকিছুই ঘটেছে সমাজবিকাশের এক একটি বিশেষ পর্যায়ে। কোন কোন সময় এগুলির সামাজিক প্রয়োজনও ছিল বা রয়েছে। কিন্তু যখনি বিভিন্ন নীতিবোধগুলিকে ঈশ্বর নির্দেশিত বলে আখ্যা দেওয়া হয় ও এই কারণেই ব্যাপক মানুষের ওপর চাপান হয় তখনি প্রকাশ পায় পেছনের অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ও বিশেষ এক গোষ্ঠীর স্বার্থবাহী দিকটির। সততা, বিনয়, পারস্পরিক সহযোগিতা, সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহ, যৌন সঙ্গী-সঙ্গিনীদের পারস্পরিক বোঝাপাড়া, প্রতিবেশীদের বিপদে আপদে সাহায্য করা, নিঃস্বার্থপরতা ইত্যাদি সাধারণ মানবিক নীতিবোধগুলি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং এদের অনেকগুলিকেই মানুষ তার জৈববিবর্তনের আগের স্তর থেকে অর্থাৎ জন্তু-জানোয়ারের পরবর্তী স্তর থেকেই ধীরে ধীরে বহু সহস্র বৎসর ধরে অর্জন করেছে—স্বাভাবিক প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতায়, বেঁচে থাকার তাগিদে। কিন্তু কোন ঈশ্বর বা দেবতার কাছ থেকে বা তার নির্দেশে এগুলি পাওয়া যায়নি। একই ভাবে জীবসেবার বা অন্যদের সহযোগিতার মানবিক দিকটি, সুস্থ সামাজিক জীবনযাপনের একটি আবশ্যিক শর্ত—সেটি ঈশ্বরকে সেবা করার অন্যতম মাধ্যম নয়।

[সামাজিক পরিবর্তন কিভাবে নীতিকথা ও তৎসংক্রান্ত ধর্মীয় অনুশাসনে প্রতিফলিত হয় তার বহু উদাহরণ রয়েছে। যেমন 'চুরি করা মহাপাপ বা ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ' এই নীতি বাক্যটি। আদিম অবস্থায় মানুষের যখন কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও সামাজিক বৈষম্য ছিল না, তারা যৌথভাবে, সামানাধিকার ও সম-বন্টনের ভিত্তিতে বসবাস করত— তখন চুরি করার ব্যাপারটিরই অস্তিত্ব ছিল না, তাই এই নীতিকথারও কোনও অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু সমাজবিকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির ও সামাজিক বৈষম্যের তথা নানা শ্রেণীর উদ্ভব হল (এখন থেকে প্রায় ৬০০০ বছর আগে), তখন ধনীদের এই সম্পত্তিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই এই নীতিকথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচারের প্রয়োজন হল এবং তা ধর্মীয় রূপ পেল। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে এ নিয়ে বহু গল্পে চোরকে শাস্তি দেওয়ার উদাহরণ ইত্যাদি ঢুকে গেল। এখনো সামাজিক বৈষম্য ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব রয়েছে। তাই এগুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্মপুস্তক, শিশুপাঠ্য, লোকশিক্ষার বিভিন্ন মাধ্যম ইত্যাদিতে এই নীতি কথাটি এখনো প্রচারিত হয়। এখনো টিকে থাকা কিছু কিছু আদিবাসী-গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব না থাকায় তাদের মধ্যে চুরি করার প্রয়োজনীয়তা বা এই ধরনের প্রবণতা গড়েই ওঠেনি। তারা আধুনিক সভ্যদের চোখে সরল, মূর্খ, সৎ। ভবিষ্যতে সামাজিক পরিবর্তনে যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণীবৈষম্য লোপ পাবে, তখন 'চুরি করা পাপ' জাতীয় নীতিকথার প্রয়োজনই থাকবে না, কারণ চুরি করার প্রয়োজনই তখন কারোর থাকবে না। এই ধরনের আরো নানা নীতিকথাই (যা অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিশে গেছে) এখনো সামাজিক প্রয়োজনেই টিকে আছে যদিও তার অনেকগুলিই স্বার্থপুষ্ট করছে বিশেষ কিছু ব্যক্তির। এইভাবে নানা ধরনের ধর্মীয় নিয়মকানুন আদৌ চিরন্তন বা সনাতন বা ঈশ্বরের মুখ-নিঃসৃত বাণী জাতীয় কোন ব্যাপার নয় এবং এগুলির সামাজিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণও প্রয়োজন।]

আদিম সমাজে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, জৈন, শিখ ইত্যাদি কোন ধর্মমতেরই কোন অস্তিত্ব ছিল না। অর্থাৎ এগুলির কোনটিই চিরন্তন বা অত্যাবশ্যক আদৌ নয় ; পরবর্তীকালে সামাজিক প্রয়োজনে এবং কখনো বা বিশেষ কিছু বুদ্ধিমান মানুষের স্বার্থপূরণ করার জন্য এগুলির সৃষ্টি হয়েছে। অনেক ধর্মেই বহুবিধ মানবিক নীতিবোধকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হয়, এর ফলেই মানুষের দীর্ঘস্থায়ী সহানুভূতি ও সম্ভ্রম আদায় করা সম্ভব হয়। কিন্তু এটি অবশ্যই বোঝা উচিত—মানুষ বা কোন প্রাণীই যেমন কোন ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়, তেমনি এই সব মানবিক নীতিবোধগুলিও কোন ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত নয়। সেগুলির উৎসও নিতান্তই মানবিক এবং মানুষের প্রয়োজনেই সেগুলিকে পরিবর্তিত করা প্রয়োজন। আর তথাকথিত ধার্মিক ব্যক্তিরা বা ধর্মমতের নানা প্রবক্তারা এই বাস্তব মানবিক দিকটিকে অস্বীকার করেছে এবং ধরা ছোঁয়ার বাইরে কাল্পনিক একটি ঈশ্বরকে হাজির করে মানুষকে প্রতারিত করেছে—এই ধারা এখনো বর্তমান, হয়তো কিছুটা পরিবর্তিত আকারে। ধর্মবিশ্বাস তথা ঈশ্বরবিশ্বাস মানুষের চেতনাকে নিষ্ক্রিয় উদ্যোগহীন করে তোলে। 'ফলের জন্য চেষ্টা করো না—কাজ করে যাও' (অর্থাৎ মেহনতী মানুষ হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটুক কিন্তু তার বিনিময়ে বঞ্চিত থেকে যাক) অথবা 'এ জন্মে না হোক পরজন্মে কর্মফলে তুমি সুখী হবে', কিংবা 'পৃথিবীতে না হোক, স্বর্গে তুমি আরামে থাকবে'—ধর্মের নামে এ ধরনের অপপ্রচার সরাসরিভাবে ব্যাপক মানুষকে প্রতারিত করে, স্বার্থপুষ্ট করে শাসকশ্রেণীর। অন্যদিকে সত্য নারায়ণের বা লক্ষ্মীর পাঁচালি সহ নানা 'ধর্মগ্রন্থে' হাবিজাবি গালগল্প রয়েছে, যেগুলিতে বলা হয় কিভাবে দেবতার আশীবাদে একজন ধনী হয়ে উঠল ইত্যাদি। এটিও সরলবিশ্বাসী মানুষদের ঈশ্বর-নির্ভর, উদ্যোগহীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে তোলে এবং সবই ভাগ্য বা ঈশ্বরের ইচ্ছা-নির্ভর বলে ছেড়ে দেওয়ার সর্বনাশা প্রবণতার সৃষ্টি করে। শাসকশ্রেণী কিন্তু সচেতনভাবে এই সারল্যের সুযোগ নেয়।

আদিম মানবগোষ্ঠীতে এক নারীর বহু পতি বা এক পুরুষের বহু পত্নী, স্বামী-স্ত্রী ছাড়াও অন্যান্যদের সঙ্গে যৌন-সংসর্গ ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। কিন্তু পরে নর-নারীর যৌনমিলনকে সামাজিক কারণেই বিধিবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল করা হয়েছে এবং এর মানবিক দিকটিও অনস্বীকার্য। এ সব সত্ত্বেও আদিম মানবগোষ্ঠীর রীতিগুলিকে বিনাদ্বিধায়, বিনা সমালোচনায় ধর্মের নাম করে প্রচার করা বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীভোগ, শ্রীকৃষ্ণের উলঙ্গ গোপিনী দর্শন, বা দেবতার সময়ে-অসময়ে অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে যৌনমিলন ইত্যাদি অজস্র ঘটনার প্রচার বন্ধ করা উচিত। "কোন ব্যক্তি যদি তার কুমারী প্রাপ্তবয়স্কা কন্যার সঙ্গে মিলিত হয় তবে তাকে তার প্রয়োজন তৃপ্ত করতে দাও। সে পাপ করে না।" অথবা "তোমার কন্যারা বা স্ত্রী বেশ্যাবৃত্তি করলে আমি তাদের শাস্তি দেব না"—খ্রীস্টান 'দেবতার' এ ধরনের ব্যভিচারী উক্তির যে কোন ধরনের প্রচার আইন করে বন্ধ করা উচিত। এবং "তুমি তোমার পুত্র-কন্যার মাংস ভক্ষণ করবে। শিশু ও তোমাদের মধ্যেকার নরম তুলতুলে নারীদের মাংস" (Deuteronomy ; 28th Chapter) বা "তুমি যদি একটি হিব্রু ক্রীতদাস কেনো, তবে সে ৬ বছর তোমার সেবা করবে ; যদি তার প্রভুই তাকে বিয়ে দিয়ে থাকে ও এর ফলে সন্তানাদি হয়ে থাকে তবে ঐ স্ত্রী ও সন্তানাদি প্রভুরই সম্পত্তি থাকবে" (Exodus ; Ch. 21) অথবা "যদি তোমার ভাই, পুত্র, কন্যা বা স্ত্রী তোমাকে অন্য দেবতার আরাধনা করতে বলে তবে তুমি অবশ্যই তাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করবে" (Deuteronomy, 13th Chapter)ইত্যাদি কথাগুলি প্রাচীন ও অ-সভ্য সামাজিক অবস্থার নানা চিত্র। এসবের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা চলতে পারে কিন্তু সাধারণ প্রচার কখনোই নয়, বরং এ ধরনের প্রচারকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করা উচিত।*

পাশাপাশি শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত অবৈজ্ঞানিক চিন্তা প্রচার করার জন্যও। পৃথিবীকে ধরে আছে একটি কচ্ছপ, পৃথিবীর চারপাশে রয়েছে দধি সমুদ্র, ক্ষীরসমুদ্র ইত্যাদি কিংবা আদমের পাঁজরা থেকে ঈশ্বর ঈভের সৃষ্টি করলেন, ১৫ হাত বৃষ্টির পর পৃথিবীর সব পর্বত ডুবে গেল (Book of Genesis, Ch.7) ইত্যাদি কথাগুলি যে কতটা ভ্রান্ত ও প্রাচীনকালে কতটা কাল্পনিক ছিল তা এখনকার বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করেছেন। তা সত্ত্বেও এসবের প্রচার জোর করে বন্ধ করা হয়নি, বরং এসবের বিরোধিতা ক'রে যাঁরা বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও সমাজ-সচেতনতার কথা বলেন তাঁদেরই

* অনেক গবেষকের মতে ২০০০ বছর আগে, ক্রীতদাস প্রথা যখন ঐতিহাসিক ভাবে ভেঙে যাচ্ছে এবং তৎকালে প্রগতিশীল সামন্ততন্ত্রের সৃষ্টি হচ্ছে, তখন খ্রীস্টধর্ম একটি গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, ক্রীতদাসদের মুক্তির পথ সুগম করেছিল। স্পষ্টতঃ এখন এর ঐ ভূমিকা আর নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখ বন্ধ করা হয় নানা ভাবে—এর প্রধান কারণ এ কাজ করার ক্ষমতা যাদের হাতে সেই শাসকশ্রেণী আন্তরিকভাবে চায় না মানুষের বৈজ্ঞানিক সচেতনতা আসুক।**

ডঃ কোভুরের মতে বৌদ্ধধর্মে কিছুটা বৈজ্ঞানিক সচেতনতার আভাস পাওয়া গেছিল। বুদ্ধ তৎকালীন ভারতবর্ষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আচারসর্বস্ব ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধিতা করে আত্মার অস্তিত্বহীনতা বা অনাত্মা, সৃষ্টি কর্তা হিসেবে ঈশ্বরের অনস্তিত্ব, জৈব পরিবর্তন ইত্যাদির কথা প্রচার করেন। অবশ্য পরবর্তীকালে আবার ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবেই নানা আচার সর্বস্বতা ও ভিন্নতর কথাবার্তা এর মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবও ইতিহাসের একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা। বিশেষ সমাজ-ঐতিহাসিক প্রয়োজনে একসময় যে হিন্দুধর্ম ও তার বিভিন্ন অনুশাসনের সৃষ্টি হয়েছিল, তার বহু কিছুই কল্পনানির্ভর হলেও নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠীর কাজে তা লেগেছে। কিন্তু ঐতিহাসিক নিয়মে সময়ের সঙ্গে এর বিকাশ ঘটানো হয়নি। পুরোহিত ও রাজন্য সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থেই একে অনড়-অচল অনুশাসন হিসেবে বজায় রাখার চেষ্টা করেছে এবং নিজেদের মত করে আরো নানা আচারবিধিকে ঢুকিয়েছে। এক সময় তা এমন একটি কিম্ভুত রূপ পায় যে, ঐতিহাসিক নিয়মেই তারও জড়ত্বকে কাটানোর জন্য বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টি হয়, —যদিও এর মধ্যে অসম্পূর্ণ জ্ঞানজনিত নানা কাল্পনিক ব্যাপারও জড়িত ছিল। অন্য সব সময়েই একই ব্যাপার ঘটেছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, সব ধর্মে বা গোষ্ঠীর মধ্যে। তাই "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহমা।" ইত্যাদি কথাগুলি ভারত বলে নয়, পৃথিবীর সমাজ ইতিহাসেই সত্যি—কিন্তু সেটি হিন্দু ধর্ম ইত্যাদির অভ্যুত্থান ঘটানোর সংকীর্ণ উদ্দেশ্যে নয়; মানবসমাজকে ঐতিহাসিক নিয়মে পরিবর্তিত করার জন্যই।

ধর্মের নামে হানাহানি ধর্মের অন্তর্নিহিত সংকীর্ণ উদ্দেশ্যকে নগ্নভাবে প্রকাশ করে। প্রোটেস্টান্ট ও রোমান ক্যাথলিক, সুন্নি ও সিয়া, শাক্ত ও বৈষ্ণব, হীনযান ও মহাজান, নানা অবতারের সৃষ্টি— ইত্যাদি নানা গোষ্ঠীভাগ ও 'কে ঈশ্বরের সঠিক এজেন্ট' তা ঠিক করার জন্য হানাহানি ও নরহত্যার ঘটনা আজো ঘটে চলেছে।

** এরি পাশাপাশি আরেক ধরনের উদ্ভট 'গবেষকের' সৃষ্টি হয়েছে যারা এইসব আদিম, বস্তাপচা অবৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীকে বৈজ্ঞানিক চিন্তার রঙ চড়িয়ে হাজির করছে এবং এসবের ভিন্নতর তাৎপর্য সৃষ্টি করছে। ভিন্ন গ্রহবাসী উন্নতজীবের দ্বারা মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশ সাধন ও মানবজাতির প্রগতিকে ত্বরান্বিতকরণ, বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের নানা অত্যাদ্ভুত কাজকে প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন গ্রহবাসীদের উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে সম্পন্ন করা বা প্রাচীন বিজ্ঞানের ফলশ্রুতি ইত্যাদি ধরনের আজগুবি কথা এরা প্রচার করছে। এর জন্য নানা তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হাজির করছে যা স্ববিরোধিতায় ভরপুর। এটিও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মানুষকে অপার্থিব এক শক্তির উপর নির্ভরশীল করে তুলতে চাইছে, অস্বীকার করছে মানুষের বিবর্তনে মানুষের নিজের শ্রম, সংগ্রাম ও প্রকৃতির ভূমিকাকে। ধর্ম-ঈশ্বর-অলৌকিকত্বের মহিমা ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তা টিকিয়ে রাখার তথা মানবসমাজের ঐতিহাসিক বিকাশকে অস্বীকার করে মানুষকে স্বনির্ভরতা অর্জন না করতে দেওয়ার ষড়যন্ত্রেরই এটি আরেকটি দিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ যখন জানতে পারবে, বিভিন্ন ধর্মমত ও ঈশ্বর আসলে চিরন্তন ও বাস্তব কোন কিছু নয়, তা একশ্রেণীর কল্পনাপ্রবণ ও স্বার্থপর মানুষের দ্বারা কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট ; যখন জানতে পারবে ঐসব ধর্মীয় অনুশাসন অতীতে একসময় কিছুটা প্রাসঙ্গিক থাকলেও এখন তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে, যখন জানতে পারবে তাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যার পেছনে কোন ঈশ্বর বা ঠাকুর-দেবতার ধর্মীয় অভিপ্রায় দায়ী নয়, দায়ী সামাজিক কিছু কারণ,—তখন সে ধর্মের নামে অহেতুক গোঁড়ামি, হানাহানি ও আত্মহত্যার পথ ত্যাগ করবে, পৃথিবীর মেহনতী জনগণ তখন বৈজ্ঞানিক চেতনায় শক্তিশালী হয়ে ধর্ম ও ঈশ্বরের ধোঁকাকে চুরমার করে বৈজ্ঞানিকভাবেই নিজেদের সমস্যার সমাধান করবে। দূর হবে, অলৌকিকত্বের উপর নির্ভরতার জড়ত্ব, মানুষ হবে আত্মবিশ্বাসী ও সহস্রগুণে বলীয়ান।

ধর্মশিক্ষার মাধ্যমে নীতিবোধ ইত্যাদিকে শিক্ষা দেওয়ার অনৈতিক পদ্ধতির পরিবর্তে বৈজ্ঞানিকভাবেই মানবিক গুণাবলী ও নীতিবোধের শিক্ষা দেওয়া উচিত। মানবতাবাদ ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শকে সামনে রেখেই সারা বিশ্বের জনগণ এগিয়ে যাবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ হবে শুধু মানবজাতি ; প্রকৃতির সম্পদ, বৈজ্ঞানিক সচেতনতা ও জ্ঞান সমগ্র মানবজাতির উন্নতিতে সমানভাবে প্রযুক্ত হবে। ঐতিহাসিক নিয়মেই মানুষ এ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের পথে এগিয়ে চলেছে। ভবিষ্যতে অবশ্যই মানুষ তথাকথিত ধর্ম ও ঈশ্বরের সংকীর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে। কিন্তু বহু সহস্র বছরের অভ্যস্ত অন্ধবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে মানুষকে আলোয় বের করে আনার জন্য কিছু সচেতন মানুষকে এগিয়ে এসে নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে হয়। ডঃ কোভুর ও আরো অনেকেই নানা নির্যাতন সয়ে এ কাজ করেছেন—প্রয়োজন আরো অনেকেরই।

☆ ☆ ☆

এবং এই বৈজ্ঞানিক চিন্তাই হবে মানবজাতির প্রকৃত ধর্ম, যা তাকে তথা তার সমাজকে ধারণ করবে, এগিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু এর পরিবর্তে অন্ধভাবে প্রাচীন মানবগোষ্ঠীর ধর্ম ও শাস্ত্রাদিকে অনুসরণ করে চলা সমাজ-প্রগতির ঐতিহাসিক নিয়মকে অস্বীকার করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখন এই বিংশ শতাব্দীতে এসে, আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞানে বলীয়ান এবং পৃথিবীর পরিবর্তিত ও পরিবর্তনশীল পরিবেশ-পরিস্থিতিতে বসবাসকারী মানবজাতির সময় এসেছে প্রাচীন ধর্মগুলির মূল্যায়ন করার। ঈশ্বর ইত্যাদি সম্পর্কিত কাল্পনিক ধারণাগুলিকে দূর করে, পৃথিবীর সমগ্র জনগণের স্বার্থবাহী বৈজ্ঞানিক চিন্তাই হবে মানবজাতির প্রকৃত ধর্ম—যা প্রকৃত অর্থে মানবসমাজকে ধরে রাখবে ও তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, প্রকৃতির সম্পদ ও মানুষের জ্ঞান প্রযুক্ত হবে পৃথিবীর সব মানুষের স্বার্থে। তথাকথিত ধর্মগুরু ও শাসক শ্রেণী ধর্ম আর ঈশ্বরের ধোঁকায় জনগণের চিন্তাচেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখে তাদের উদ্যোগহীন, বিক্ষোভহীন, নিষ্ক্রিয় করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোলে— ব্যাপক মানুষকে এই আচ্ছন্নতা কাটিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

[এই প্রসঙ্গে আর একটি দিক মনে রাখা দরকার। মানুষের মনের গভীর থেকে আচমকা বা খুব তাড়াতাড়ি ধর্মচেতনা ও ঈশ্বর বিশ্বাস ইত্যাদি দূর করা সম্ভব নয়। ধর্ম ও ধর্মীয় নানা অনুশাসন সমাজ বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত এবং মানুষের জীবনের অনিশ্চয়তা ইত্যাদি এইসব ভ্রান্ত বিশ্বাসকে শক্তিশালী করেও টিকিয়ে রাখে। আমূল সামাজিক পরিবর্তন না হলে এবং মানুষের জীবনে অনিশ্চয়তার সুষ্ঠু সমাধান না হলে ধর্মবিশ্বাস, ঈশ্বর নির্ভরতা, অলৌকিকত্বে আস্থা ইত্যাদিও সম্পূর্ণ দূর হবে না। ধর্ম ও ঈশ্বরবিশ্বাস জনগণের দৈনন্দিন জীবনে ও সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গেছে। তাই যাঁরা ডঃ কোভুরের মত, জনগণের জীবনযাত্রাকে পরিবর্তিত না করে তথা বৈপ্লবিক সামাজিক পরিবর্তন না ঘটিয়ে মানুষের মধ্য থেকে ধর্ম বা ঈশ্বরবিশ্বাস ইত্যাদিকে দূর করে দেওয়ার কথা বলেন তাঁরা যান্ত্রিকভাবে মানুষের উপর বৈজ্ঞানিক যুক্তিবোধকে চাপিয়ে দেবেন এবং সফলও হবেন না—বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও যুক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজ সমাজ পরিবর্তনের প্রচেষ্টার সঙ্গে সম্পৃক্তভাবে যুক্ত করা উচিত। অন্যদিকে এই সমাজ পরিবর্তন, যা সাধিত হবে জনগণেরই দ্বারা, সেটির সাফল্যও নির্ভর করে জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপর।

ধর্মপ্রসঙ্গে ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস বলেছেন, “সমস্ত ধর্মই দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করা বাহ্যিক শক্তিগুলির মানবমনে প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই নয়—এই প্রতিফলনের প্রক্রিয়ায় জাগতিক শক্তিগুলি অতিপ্রাকৃতিক রূপ পায়। ইতিহাসের শুরুতে, প্রকৃতির নানা শক্তিই কেবল এইভাবে প্রতিফলিত হত এবং ক্রমবিবর্তনের ফলে, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে, এইগুলিতে বহু বিচিত্র ধরনের ব্যক্তিত্ব আরোপিত হয়েছে।...কিন্তু খুব বেশিদিনের কথা নয়, প্রাকৃতিক শক্তিগুলির পাশাপাশি, সামাজিক শক্তিগুলিও সক্রিয় হতে শুরু করল—এই শক্তিগুলি প্রাকৃতিক শক্তিগুলির মত একই ধরনের বৈরিতা, রহস্যময়তা, শক্তিমত্ততা নিয়ে মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে থাকল, যেন স্বাভাবিকভাবেই। যে সব অদ্ভুত চরিত্রগুলি এতদিন শুধু প্রকৃতির রহস্যময় শক্তিগুলিরই প্রতিনিধিত্ব করত, এখন থেকে তারা সামাজিক রূপ পেল, ইতিহাসের শক্তিসমূহের প্রতিনিধিত্ব করল। সমাজবিবর্তনের আরো পরে, অসংখ্য দেব-দেবীর প্রাকৃতিক-সামাজিক দিকগুলি রূপান্তরিত হল একটি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে—যে মানুষেরই সামগ্রিক রূপের প্রতিফলন। এইভাবে সৃষ্টি হল একেশ্বরবাদ...। এই সুবিধা-জনক, সহজ ও সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য রূপের ফলে, ধর্ম তাৎক্ষণিকভাবে তার অস্তিত্ব বজায় রেখে যেতে সক্ষম হল—অর্থাৎ এটি বৈরী ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রাকৃতিক ও সামাজিক শক্তিগুলির সঙ্গে মানুষের একটি আবেগের সম্পর্ক—যদ্দিন মানুষ এই সব শক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকবে তদ্দিন ধর্ম তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হবে। যাই হোক, আমরা বারবারই দেখেছি যে, বর্তমানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষ তার নিজেদেরই তৈরী করা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা এবং যেন একটি সর্বশক্তিমান বৈরী শক্তির প্রভাবে নিজেদেরই তৈরি করা উৎপাদন প্রক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ধর্মের সৃষ্টি যেখান থেকে, সেই প্রতিফলনশীল প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তিটি তাই বর্তমান এবং একই সঙ্গে বর্তমান ধর্মীয় প্রতিফলনও। যদিও ধনতান্ত্রিক রাজনৈতিক অর্থনীতি এই বৈরী নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গে সম্পর্কের কারণের ব্যাপারে কিছুটা দৃষ্টিপাত করেছে তা সত্ত্বেও এর ফলে প্রয়োজনীয় কোন পার্থক্য ঘটেনি। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি সাধারণভাবে বিপর্যয় আটকাতে পারে না; কোন একজন পুঁজিপতিকে ক্ষতি, ঋণ ও দেউলিয়াপনা থেকে বাঁচাতেই পারে না। এখনো এটি সত্যি যে মানুষ ভাবে এক, 'ভগবান' (অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থায় প্রতিকূল প্রভাব) করে আর। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিজ্ঞানের চেয়ে আরো গভীরে এগিয়ে গেলেও শুধুমাত্র জ্ঞানের সাহায্যে সামাজিক শক্তিগুলিকে সমাজের অধীনে আনা যাবে না। সবার উপরে যা প্রয়োজন তা হল সামাজিক কাজ। যখন এই কাজ সারা হবে, যখন সমাজ উৎপাদনের সমস্ত প্রক্রিয়াকে হস্তগত করে সেগুলিকে সুপরিকল্পনার ভিত্তিতে ব্যবহার করবে এবং এইভাবে সমাজ নিজেকে ও তার সমস্ত ব্যক্তিকে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত করবে,— যে বন্ধনে সে নিজে নিজেরই তৈরি করা, অথচ নিজেরই প্রতি অপ্রতিরোধ্য অস্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ করার বিরূপতা নিয়ে হাজির হওয়া, উৎপাদন পদ্ধতির সাহায্যে আবদ্ধ— এবং যখন এইভাবে মানুষ শুধু ভাববে না, সবকিছু নিজেই ঠিক করবে বা নিয়ন্ত্রণ করবে, কেবলমাত্র তখনই, এখনো ধর্মের মধ্যে প্রতিফলিত হওয়া অস্বাভাবিক প্রতিকূল শক্তির অবশেষটুকু চলে যাবে এবং একই সঙ্গে অন্তর্হিত হবে ধর্মীয় প্রতিফলনের ব্যাপারটি— এর সহজ কারণ এইটিই যে, তখন প্রতিফলিত হওয়ার মত আর কিছু থাকবে না।" (Anti-Duhring; Frederik Engels; 2nd Edition; Foreign Languages Publishing House; Moscow: 1959, Pp. 435-437)

জর্জ টমসন (কেমব্রিজের কিংস কলেজের ভূতপূর্ব ফেলো এবং বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক) ধর্ম ও বিজ্ঞানচিন্তার প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "ধর্মকথাটার ব্যাখ্যা এইভাবে করা যায়,—এটি হচ্ছে এক ধরনের প্রক্রিয়া ও বিশ্বাস—যার মূল রয়েছে এই ধারণার মধ্যে যে, এই বিশ্ব পরিচালিত হয় একটি অতিপ্রাকৃত শক্তি দ্বারা— যে শক্তির কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বা বলিদান করে তাকে সন্তুষ্ট করা যায় এবং জ্ঞানের দ্বারা নয়—বিশ্বাসের দ্বারাই যে শক্তিকে জানা যায়। আর বিজ্ঞান হচ্ছে এমন এক ধরনের প্রক্রিয়া ও বিশ্বাস যার মূলে রয়েছে এই চিন্তা যে, এই বিশ্ব হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত বস্তুগত বিকাশপদ্ধতি এবং যে পরিমাণে মানুষ এই বিকাশ-পদ্ধতি জানতে পারে সেই পরিমাণে মানুষ তাকে প্রভাবিত করতে পারে। বিশ্বাসের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে, যে ঘটনাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে মনে হয় বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে তাকেই বস্তুগতভাবে প্রত্যক্ষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা অপ্রত্যক্ষ উপায়ে বিশ্লেষণযোগ্য ঘটনা বলে বোঝা যায়। ধর্ম বলে যে, ঈশ্বরের অনুকরণেই মানুষের সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু ধর্মের ইতিহাস বৈজ্ঞানিকভাবে অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে যে, মানুষ তার নিজের কল্পনা থেকেই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে। এক ধর্ম যে আরেক ধর্ম থেকে বেশী সত্য এ কথা প্রমাণের কোন ভিত্তি নেই। ভুল ধারণার উপর ভিত্তি করেই সব ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে। যদি তার কোনটির মধ্যে সামান্য কিছু সত্য থাকেও তবে দেখা যাবে যে সে সত্যটুকু বিজ্ঞানই তাকে মানতে বাধ্য করেছে। বিজ্ঞান হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান বা বাস্তবভাবে প্রামাণ্য। বিজ্ঞান তার শেষ সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছায়নি, বিজ্ঞান সব সময়েই ক্রম প্রকাশমান। যে পরিমাণে বিজ্ঞান বিকাশলাভ করেছে সেই পরিমাণেই ধর্ম লোপ পাচ্ছে। কারণ জ্ঞান শক্তির জন্ম দেয় এবং মানুষ তাকে কাজে লাগিয়ে যে পরিমাণে তার নিজের ও তার পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতা অর্জন করছে সেই পরিমাণেই তার ঈশ্বরের উপর আস্থার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বরের উপর আস্থা হচ্ছে মানুষের অজ্ঞতা ও দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ।"

তিনি আরো বলেছেন, "এ কথা সত্য যে, বহু বুর্জোয়া বৈজ্ঞানিক ধর্মবিশ্বাসী এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিজ্ঞানের পরিধিকে সীমাবদ্ধ করে এই দুই চিন্তাধারার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করছেন। এটা হচ্ছে বুর্জোয়া বৈজ্ঞানিকদের দুর্বলতারই প্রকাশ, যে দুর্বলতা জন্ম নিয়েছে বুর্জোয়াশ্রেণীর ব্যর্থতার মধ্য থেকে। কারণ, ধনিক শ্রেণী আজ আর ধনতন্ত্রের অগ্রগতি বিধান করতে বা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমস্যা বুঝতে সক্ষম নয়। ....বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ইতিহাসকে বিচার করলে ধনতন্ত্রের আসন্ন ধ্বংসের বাস্তব চিত্রটাই প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং এই বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হতে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা প্রস্তুত নন। তেমনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেও এটা যতই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, ধনতন্ত্র বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ততই বুর্জোয়া চিন্তানায়কদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে ঘুরিয়ে ধরবার বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিত্যাগ করে দার্শনিক ভাববাদ বা দুর্জ্ঞেয়বাদে আশ্রয় নেবার একটি মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে।" (ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা-৭৩ প্রকাশিত 'An Essay on Religion' এর অনুবাদ; আগষ্ট, ১৯৮২)।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কিছু অলৌকিক ক্ষমতা ও ঘটনা—সীমিত জ্ঞান, বদমায়েসি বা মানসিক রোগের লক্ষণমাত্র

ধর্ম-ঈশ্বর-আত্মা-অলৌকিকতত্ত্ব সম্পর্কে বিপুল সংখ্যক সরল বিশ্বাসী মানুষকে ধোঁকা দিয়ে ঐসব ভ্রান্ত অন্ধবিশ্বাস টিকিয়ে রাখার একটি প্রধান কৌশল হল—নানা ধরনের অলৌকিক কাজ করে দেখানো এবং এগুলিকে ঈশ্বরের আশীর্বাদে বা ঈশ্বরেরই কাজ বলে চালানো। যারা সাধারণ মানুষকে এই ধরনের ধোঁকা দিয়ে ব্যবসা চালায় ও শ্রদ্ধা ভক্তি আদায় করে তারা বদমায়েসি করেই এই সব কাজ করে। আবার অনেক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ঈশ্বর ও তাঁর অলৌকিক মহিমায় আবাল্য-লালিত অন্ধ বিশ্বাসের ফলে নানা ধরনের অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক কথাবার্তা বলে ও আচরণ করে, অস্বাভাবিক অনুভূতির অভিজ্ঞতা লাভ করে ইত্যাদি। ধ্যান, যোগব্যায়াম, বা অন্যান্য ধরনের শারীরিক বা মানসিক নানা কষ্টকর, দীর্ঘস্থায়ী অভ্যাসের ফলে এরা বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে এবং সেগুলিকে ঈশ্বর-দত্ত ক্ষমতা বলে চালায়। যেমন, জলের উপর ভেসে থাকা, অনেকক্ষণ শ্বাস বন্ধ করে থাকা, আগুনে হাঁটা, আগুন খাওয়া ইত্যাদি।

☆ ☆ ☆

বোম্বাই-এর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা একবার জানাল যে, একটি পুতুলের মাথায় চুল গজিয়েছে। পুতুলটি ছিল এক জাপানী মেয়ের। মেয়েটি বছর কয়েক আগে মারা গেছে। তার আত্মাই নাকি পুতুলে ভর করেছে এবং এরই ফলে এই ঘটনা ঘটেছে। পত্রিকাটি আরো জানাল যে, কয়েকজন বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়েছেন যে পুতুলের মাথার চুল মানুষের চুলই।

কোথাও চুল গজাতে গেলে সেই জায়গায় অবশ্যই রক্ত সঞ্চালন প্রয়োজন, প্রয়োজন আরও নানা জৈব শর্তের। একটা নির্জীব পুতুলের মাথায় চুল গজানোর ব্যাপারটা তাই একেবারে ধাপ্পা। আর যদি চুল থাকে এবং সেটি মানুষের চুল হিসাবে প্রমাণিত হয়, তবেও ব্যাপারটিকে চুল গজানোর ঘটনা বলা হাস্যকর। বাইরে থেকে সুকৌশলে আঠা দিয়েও চুল লাগান যায়। ডঃ কোভুর মন্তব্য করেছেন, "ভেড়ার লোমের তৈরী একটি কম্বল পরীক্ষা করে যদি দেখা যায়, লোমগুলি ভেড়ারই এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন যদি বলা যায়, কম্বলে ভেড়ার লোম গজাচ্ছে, তাহলে ব্যাপারটা যেমন নির্বোধের মত উক্তি হবে, তেমনি পুতুলের মাথায় চুল গজানোর কথা বলাটাও নির্বোধের মত কথাবার্তা।”

একইভাবে একবার জাকার্তা (ইন্দোনেশিয়া)-র এক মুসলমান মহিলার গর্ভস্থ শিশু কোরান আবৃত্তি করছে বলে রটান হয়। কয়েকজন ডাক্তার নাকি তা সমর্থনও করে। শেষ অব্দি ইন্দোনেশিয়ারই এক গবেষক অনুসন্ধান করে দেখেন যে, মহিলাটির গর্ভস্থ শিশুটি আসলে তার পেটে বাঁধা একটি বালিশ এবং ওর ভেতরে লুকনো ছিল একটি টেপ রেকর্ডার।

এই ধরনের তথাকথিত সব অলৌকিক ঘটনার পেছনে রয়েছে একইভাবে কিছু বুজরুকি বা বাস্তব কিছু কারণ। মানুষ যুক্তিবোধহীনতার বশবর্তী হয়ে তা বিশ্বাস করে এবং অবৈজ্ঞানিক চিন্তাসম্পন্ন অথচ সমাজে বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত কিছু লোক এসব সমর্থন ক'রে এই অন্ধ বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে।

শ্রীলংকায় ভারতের প্রাক্তন হাই কমিশনার শ্রী কে. পি. কেশব মেনন এ ধরনের অন্ধ বিশ্বাসীদের একজন। লেখক, দেশপ্রেমিক ও সাংবাদিক হিসেবে তিনি ভারতে বিখ্যাত। তিনি একবার লিখেছিলেন, “নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একজন মানুষের বিশ্বাস রূপ পায়। একই অনুভূতির আমার না হয়ে যদি অন্য কারো হয় তবে কি আমি তার এই অনুভূতির অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করতে পারি? আমি অন্ধ, তাই রাত্রে আকাশের দিকে তাকালে কোন নক্ষত্র দেখতে পাই না। আমার পাশে বসে যদি একজন আকাশের লক্ষ তারকার সৌন্দর্যের বর্ণনা করে তবে কি আমি তাঁকে মিথ্যেবাদী বলতে পারি?...একজন সাধারণ মানুষের স্যাণ্ডো বা জো লুই-এর মত শারীরিক শক্তি থাকে না। আবার এঁদের রামানুজন বা আইনস্টাইনের মত বুদ্ধি নেই। তাই যদি হয়, তবে অন্যদের তুলনায় কয়েকজনের বেশী আধ্যাত্মিক শক্তি থাকা ও অধিকতর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হওয়া কি সম্ভব নয়? অনুরূপভাবে অন্যরাও যদি অন্য কোন ধরনের বিশ্বাসের জন্য সুখশান্তি পায়, তবে আমি কেন তাদের বিশ্বাসে নাড়া দেবো?”

শুধু শ্রী মেনন নয়, অন্ধবিশ্বাসী অনেকেই এ ধরনের যুক্তি দিয়ে থাকেন। কথাগুলি একদিকে যেমন খুবই যুক্তিপূর্ণ মনে হয়, অন্যদিকে তেমনি বিভ্রান্তিকর। বিভিন্ন মানসিক অনুভূতি ও নানা অভিজ্ঞতা মোটামুটি দু'ধরনের—বস্তুবাদী ও ভাববাদী। আকাশে নক্ষত্র দেখা একটি বাস্তব ঘটনা এবং যে কেউই তা পরীক্ষা করে সঠিক বলে দেখে নিতে পারেন। কেউ আবার টেলিস্কোপ দিয়ে অনেক বেশী নক্ষত্র দেখতে পারেন। সাধারণভাবে খালি চোখে ঐসব নক্ষত্র দেখতে না পাওয়া গেলেও তাদের অস্তিত্ব বাস্তব,— কারণ যে কেউই তা টেলিস্কোপ দিয়ে দেখে নিতে পারেন। অন্যদিকে ভাববাদী অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা সবসময় যে মিথ্যে হবেই তার কোন মানে নেই, কিন্তু তা বাস্তব ঘটনাভিত্তিক না-ও হতে পারে এবং যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না-ও হতে পারে।

মনে করা যাক একটি বাচ্চা প্রতিরাত্রে গভীর ঘুমের ঘোরে বিছানায় প্রস্রাব করে ও ভোরে উঠে বকুনি খায়। এক রাত্রে বাচ্চাটি বিছানায় প্রস্রাব করার পর যদি বাড়ীর কেউ তার গভীর ঘুমের মধ্যে ভেজা বিছানা পাল্টে শুকনো কাঁথা ইত্যাদি রেখে দেয় তবে পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বাচ্চাটি দেখবে যে সে বিছানা ভেজায় নি এবং আনন্দে, জোর দিয়ে চেঁচিয়ে উঠবে যে, আগের রাত্রে সে আর বিছানায় প্রস্রাব করেনি। বাস্তব ঘটনা যদিও তা নয়, তাহলেও বাচ্চাটি কিন্তু জ্ঞানতঃ মিথ্যে কথা বলছে না। তার অনুভূতিতে সে সত্যি কথাই বলেছে। বিভিন্ন ধরনের তথাকথিত আধ্যাত্মিক বা অলৌকিক অভিজ্ঞতা, যার কথা শ্রী মেনন-দের মত ব্যক্তিরা বলেন, সেগুলিও অনেক সময় এভাবেই ঘটে যদিও তাদের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। আগে আলোচনা করা হয়েছে কিভাবে তথাকথিত অবধূত, অবতার বা সাধুবাবাদের দল জেনেশুনেই সাধারণ মানুষকে ঠকানর জন্য নিজেদের নানা অলৌকিক ক্ষমতার কথা প্রচার করে এবং দক্ষ ম্যাজিসিয়ানদের মত নানা ধরনের কায়দা দেখিয়ে ওগুলিতে অলৌকিকত্ব আরোপ করে আর সরল বিশ্বাসী অন্ধ ভক্তদের বিভ্রান্ত করে। এ ধরনের বুজরুক ছাড়া আরো কিছু ব্যক্তি রয়েছেন যাঁদের নানা ধরনের অবাস্তব অস্বাভাবিক মানসিক অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা হয় এবং আজন্মলালিত ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এই অস্বাভাবিক ব্যাপারগুলিকে অলৌকিক বা আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা বলে বিশ্বাস করেন। এটি এক ধরনের মানসিক রোগ বা ভারসাম্যহীনতার লক্ষণ মাত্র। এটি মূলতঃ তিন ধরনের হতে পারে—ভ্রমাত্মক অনুভূতি (illusion), মতিভ্রম (hallucination) ও ভ্রান্ত অন্ধ বিশ্বাস (delusion)।

Illusion হচ্ছে কোন বস্তু প্রকৃত পক্ষে যা তাকে সেইভাবে উপলব্ধি না করা। Hallucination হচ্ছে অস্তিত্বহীন কোন কিছু সম্পর্কে অনভূতি লাভ করা। Delusion হচ্ছে বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা। মেঝেতে পড়ে থাকা একটি দড়িকে সাপ ভাবাটা illusion বা ভ্রমাত্মক অনুভূতি। কিছুই নেই অথচ মেঝেতে সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে ধারণা হওয়াটা hallucinationবা মতিভ্রম। দড়িকে মন্ত্রবলে সাপ করে দেওয়া যায় এ ধরনের দৃঢ় বিশ্বাস delusion বা ভ্রান্ত বিশ্বাস। একজন সাধারণ মানুষকে দেখে কৃষ্ণঠাকুর বলে ভাবাটা illusion ; কিছুই নেই অথচ সামনে যে কৃষ্ণঠাকুর বা কোন দেবতা-ভগবান এসে দাঁড়িয়েছে এ ধরনের অনুভূতি hallucination ; ঠাকুর-দেবতা আছেই, এ ধরনের অন্ধ বিশ্বাস delusion.

প্রথমে illusion -এর কথাই ধরা যাক। পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপর ভিত্তি করে ভ্রান্ত অনুভূতিও পাঁচ ধরনের হতে পারে—ভ্রমাত্মক দর্শনানুভূতি (visual illusion), ভ্রমাত্মক শ্রবণানুভূতি (auditory illusion), ভ্রমাত্মক ঘ্রাণানুভূতি (olfactory illusion), ভ্রমাত্মক স্পর্শানুভূতি (tactile illusion) ও ভ্রমাত্মক জিহ্বানুভূতি (taste illusion)। Hallucination-ও এই ভাবে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি মরুভূমিতে যে জলাশয় বা মরূদ্যান দেখে সেই মরীচিকা দৃষ্টি সংক্রান্ত মতিভ্রম বা ভ্রান্ত অনুভূতি। একজন সরল বা ছিটগ্রস্থ লোক ছোট বেলা থেকে কালীঠাকুর বা ভগবানে গভীরভাবে বিশ্বাস করতে করতে (delusion) ও এ নিয়ে ভাবতে ভাবতে এক রাত্রে কালীমূর্তি বা ভগবানকে দেখতে পারে, দৈববাণী শুনতে পারে, ঠাকুর তাকে ছুঁয়ে দিল বলে মনে হতে পারে বা ভ্রান্তভাবে হঠাৎ ধূপ-ধুনোর গন্ধ পেয়ে ঠাকুরের পুজো হচ্ছে বলে ধারণা করতে পারে—এ সবই বিভিন্ন ধরনের মতিভ্রম। একইভাবে হঠাৎ কাউকে দেখে তাকে ঈশ্বর হিসেবে দেখা, পাতার খসখসানি বা বাতাসের আওয়াজকে ঠাকুরের পদধ্বনি ইত্যাদি হিসেবে শোনা, গায়ে কিছু ঠেকলে তাকে ঠাকুরের ছোঁয়া বলে মনে হওয়া, সাধারণ চাল-কলার প্রসাদকে দারুণ মিষ্টি বলে বা সুস্বাদু অমৃত বলে মনে করা ইত্যাদি নানা ধরনের ভ্রমাত্মক অনুভূতি।

বামাক্ষ্যাপা, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ, যীশুখ্রীষ্ট ইত্যাদি সরল, অন্ধবিশ্বাসী ব্যক্তিরা এইভাবে ভ্রমাত্মক অনুভূতি ও মতিভ্রমের ফলে যে সব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি লাভ করেছেন বা করেন সেগুলিকে তাঁরা বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রকাশ করেন এবং একই সঙ্গে কিছু মানবিক, আধ্যাত্মিক ও যুগোপযোগী সংস্কারমূলক কথাবার্তাও বলেন। ফলে ক্রমশঃই বহু সংখ্যক মানুষ এঁদের চারপাশে জড়ো হয়। নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ)-এর মত কিছু বুদ্ধিমান, সমাজ সচেতন ও কিছুটা মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন সুকৌশলী ব্যক্তিও এঁদের দ্বারা সম্মোহিত বা প্রভাবিত হয়ে (অথবা ইচ্ছে করেই) নানা আধ্যাত্মিক কথাবার্তা বলতে শুরু করেন এবং তৎকালীন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে উঠতেও পারেন না। তাঁদের এই সব অভিজ্ঞতার বাস্তব কোন ভিত্তি না থাকলেও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে বলতে গেলে এঁরা কিন্তু, রাত্রে প্রস্রাব করা আগের ঐ বাচ্চার মত মিথ্যে কথা বলেন না এবং সাঁইবাবাদের মত বুজরুকও নন।

একইভাবে আলো-আঁধারিতে ভূত দেখা, রাত্রে কোন আওয়াজে ভূতের বা নিশির ডাক শোনা ইত্যাদিও নানা ধরনের মতিভ্রম বা ভ্রান্ত অনুভূতি। ঈশ্বর ইত্যাদিতে অন্ধবিশ্বাস থাকার কারণে পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে ঈশ্বর-ভক্তরা যেমন নিজেদের নানা ভ্রান্ত অনুভূতি বা অভিজ্ঞতাকে বৈজ্ঞানিকভাবে যাচাই করার প্রয়োজন বোধ করেন না, তেমনি এই ক্ষেত্রেও ভূত-প্রেতে দৃঢ়মূল বিশ্বাস ও ভীতির কারণে ভীতু ব্যক্তিরা ভূত-প্রেত সম্পর্কিত ভ্রান্ত এই সব অভিজ্ঞতা লাভের পর ভয়েই পালিয়ে আসে, কাছে গিয়ে দেখার সাহস হয় না। প্রাণপণে জোর করে যদি কেউ যায়ও, অনেক সময় সে হয়তো ভয়েই অজ্ঞান হয়ে যায়, আর রটে যায় ভূতেই তাকে ঘায়েল করে দিয়েছে।

কৃত্রিম ভাবেও বিভিন্ন ধরনের মতিভ্রম (hallucinatin) ঘটান যায়। সুইজারল্যাণ্ডের ডঃ ওয়ালটার হেজ, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জে. ডেলগাডো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জেমস্ ওলডস্ মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্নায়বিক কেন্দ্রকে বিদ্যুতের সাহায্যে (physical stimulus) উত্তেজিত করে ভয়, প্রেম, ঘৃণা, উদ্বেগ, আনন্দ ইত্যাদি নানা অনুভূতি যে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা সম্ভব তা প্রমাণ করেছেন। এমন কি এইভাবে আধ্যাত্মিক নানা অস্বাভাবিক অনুভূতিও সৃষ্টি করা যায়। এই ধরনের কোন অনুভূতি বাস্তবে না ঘটলেও তা যে কৃত্রিমভাবে ঘটানো সম্ভব তা প্রমাণিত। দীর্ঘক্ষণ ধরে ছন্দে ছন্দে ঢাক-ঢোল-কর্তাল ইত্যাদির আওয়াজ, মন্ত্রোচ্চারণ, গান বা কীর্তন করা, পুনঃ পুনঃ চোখে আলো ফেলা ও নেভান, কোন ছবি বা চক্রের দিকে অথবা আলো বা অন্য কিছুর দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকা ইত্যাদি ঘটনা কোন ব্যক্তির মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্নায়ুকে কৃত্রিমভাবে উত্তেজিত করে একইভাবে নানা ধরনের অস্বাভাবিক অনুভূতির সৃষ্টি করতে পারে যা সম্মোহিত হওয়ারও অন্যতম উপায়।* এইভাবে হওয়া অস্বাভাবিক অনুভূতিকেও মুনি-ঋষি বা ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা অলৌকিক বা ঐশ্বরিক মহিমা বলে মনে করেন। (যেমন বহুক্ষণ ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে দুই ভুরুর মাঝামাঝি তাকিয়ে থাকলেও উজ্জ্বল আলো দেখা যায়—এটিও এক ধরনের মতিভ্রম, কিন্তু সাধারণ অনেক মানুষের মধ্যে এটি 'চন্দ্রদর্শন' নামে পরিচিত।)

আফিং, গাঁজা, চরস, এল এস ডি, অ্যামিট্যাল সোডিয়াম, ম্যাণ্ড্রেক্স, ধুতুরা, ইত্যাদি নানা পদার্থ খেয়ে বা শরীরে ইনজেক্শান করেও নানা ধরনের হ্যালুসিনেশান সৃষ্টি করা সম্ভব। এগুলি রাসায়নিক উত্তেজক (chemical stimulus) হিসেবে কাজ করে। এর ফলে দেবদর্শন, দৈববাণী শোনা, তুরীর আনন্দ, নানা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (Extrasensory Perception বা E.S.P)ইত্যাদি বহু ভ্রান্ত অবাস্তব ও বিকৃত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। ঈশ্বর-অনুরাগীরা এগুলিকেও ঐশ্বরিক বা অলৌকিক অনুভূতি, ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়া ইত্যাদি হিসেবে বলে থাকে। আধুনিক বা প্রাচীন মুনি-ঋষি সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে গাঁজা, ভাঙ, ধুতুরা ইত্যাদির প্রচলন বেশ রয়েছে বা ছিল। এগুলি এক ধরনের বিকৃত মানসিক আনন্দ দেয় ও নেশার সৃষ্টি করে। অনেক ধর্ম ব্যবসায়ী অবতার বা সাধু সন্ন্যাসীরা সরল ভক্তদের

* যেমন মনে করা যাক, "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।" অথবা "শিবদুর্গা শিবদুর্গা দুর্গা দুর্গা শিব শিব। শিবকালী শিবকালী কালী কালী শিব শিব।" ইত্যাদি জাতীয় কথাগুলি সুললিত ছন্দে ও গভীর বিশ্বাস নিয়ে বারংবার আবৃত্তি করে গেলে এক ধরনের মানসিক আবিষ্ট অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে এবং এর থেকে নানা ধরনের অস্বাভাবিক বা খ্যাপামির সৃষ্টি হয়। সরলবিশ্বাসী ধার্মিকেরা একেই ভাবাবেশ, নামগান মাহাত্ম্য, 'কলিযুগে নামগানই ভরসা' ইত্যাদি হাবিজাবি বলে বিশ্বাস করে। সরলবিশ্বাসী কোন ব্যক্তি যদি "বাবলা গাছে বাঘ বসেছে" বা "twinkle twinkle little star" জাতীয় কথার অর্থ না জানেন এবং তাঁকে এগুলিকে ঈশ্বরের নাম বলে বোঝান যায়, তবে তিনি এইগুলিই বারবার আবৃত্তি করলে তাঁরও আগের মতই ভাবাবেশ হতে পারে। কারণ উভয়ের কর্মপদ্ধতি একই। তথাকথিত ধর্মগুরুরা একেও নামমাহাত্ম্য বলতে পারেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রসাদ, চরণামৃত ইত্যাদির মাধ্যমে এই সব খাইয়ে, তাদের মধ্যে এইভাবে নানা হ্যালুসিনেশনের সৃষ্টি করে। যেমন তামিলনাড়ুর বালাগি মন্দিরের প্রসাদ খেয়ে ভক্তরা এক অনির্বচনীয় আনন্দের অনুভূতি পেত—মন্দিরের পুরোহিতরা একে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের আনন্দ, পরমাত্মাকে অনুভব করার আনন্দ, ইত্যাদি নানা গালভরা নাম দিয়ে সরল ভক্তদের প্রতারিত করত। ১৯৬৩ সালের ৭ই মে এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকে ৩৯৬০ গ্রেন গাঁজা রাখার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়। অনুসন্ধানে দেখা যায় প্রসাদের সঙ্গে গাঁজা মেশান হত আর এইভাবেই ভক্তদের নানা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা (অর্থাৎ হ্যালুসিনেশান) দেওয়া হত।

এল. এস. ডি খেয়ে কেমন লাগে তা দেখার পর ডঃ আলবার্ট হফম্যান বলেছেন, "আমি দেখলাম আমার আত্মা আমার শরীর থেকে বেরিয়ে গিয়ে শূন্যে ঝুলে রইল। আমি আমার মৃত দেহটির দিকে তাকিয়ে উচ্চৈস্বরে কাঁদতে থাকলাম।" অর্থাৎ এল. এস. ডি-র প্রভাবে হ্যালুসিনেশানের জন্য অস্তিত্বহীন আত্মার অস্তিত্বের অনুভূতি লাভ করা গেল। ডঃ হফম্যান কিন্তু মিথ্যে কথা বলেননি, এটি তাঁর মতিভ্রম মাত্র। কিন্তু কেউ যদি একেই আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে বলতে থাকেন তবে তা স্পষ্টতঃই হাস্যকর। এইভাবে তথাকথিত ধার্মিক ব্যক্তি বা অবতার-সাধু-সন্ন্যাসীরাও গাঁজা ইত্যাদি খেয়ে নানা তথাকথিত আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেন এবং তাকেই ঈশ্বর ইত্যাদির অস্তিত্বের স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে দাঁড় করান।

সিজোফ্রেনিয়া নামে এক মানসিক রোগের রোগীরাও একইভাবে নানা ভ্রান্ত ধারণায় ভোগে বা অভিজ্ঞতা লাভ করে ; কেউ ভাবে তার চারপাশে পোকা ঘুরছে, তাকে কেউ মারতে চাইছে বা ভালবাসছে ইত্যাদি। এই ধরনের মানসিক রোগেরই ভিন্নতর রূপ হল কোন এক দেবতা তাকে খুব ভালবাসে বলে ভাবা (যেমন কালী ঠাকুর তার মা, কৃষ্ণ তার স্বামী ইত্যাদি), কোন ভূত বা পিশাচ তার ক্ষতি করতে চাইছে ইত্যাদি। সিজোফ্রেনিয়ার রোগীর রক্তে ও মস্তিষ্কে এল. এস. ডি. (Lysergic acid diethylamide)-এর অনুরূপ, হ্যালুসিনেশান সৃষ্টি করতে সক্ষম নানা রাসায়নিক দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। ডঃ কোয়াস্টেল ও ডঃ হুটট্লে ধর্মোন্মাদ ব্যক্তিদের শরীরেও এই ধরনের জিনিসের সন্ধান পেয়েছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, "সেই সব অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি সম্পন্ন বা অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা, সাধু সন্ন্যাসী বা ভক্তরা যারা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বা প্রেত-নৃত্যের সময় বিভিন্ন ধরনের অস্বাভাবিক আচরণ করে বা তাদের নানা হ্যালুসিনেশন হয়, তাদের সকলের ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা ঘটে শরীরে কিছু কিছু রাসায়নিক পরিবর্তনের কারণে" এবং এগুলির পেছনে কোন ঈশ্বর, ঐশ্বরিক আশীর্বাদ, অলৌকিক বা আধ্যাত্মিক ব্যাপার আদৌ নেই। গভীর ধ্যানমগ্ন কোন যোগী-ঋষি ব্যক্তির শারীরিক পরীক্ষা করে দেখা গেছে ধ্যানের সময় তার নাড়ীর গতি, রক্তচাপ, রক্তে ল্যাক্টেটের পরিমাণ কমে যায়। রক্তে অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রারও অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে। মস্তিষ্কের তড়িৎ পরীক্ষায় (E.E.G.) আলফা, বিটা, ডেল্টা ও থিটা তরঙ্গের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্বাভাবিকত্ব ধরা পড়ে। ডঃ কোভুরের ছোট ভাই ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ বেহানন কোভুর এ নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। দেখা গেছে ধ্যান ইত্যাদির সময় রক্তে কার্বনডাই-অক্সাইড অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ার জন্য মস্তিষ্কের কর্মপদ্ধতি অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। তড়িৎ পরীক্ষায় মস্তিষ্কের বিভিন্ন তরঙ্গসহ নানা কিছুর এই সব অস্বাভাবিকত্ব সিজোফ্রেনিয়া বা অন্যান্য নানা মস্তিষ্ক-বিকৃতির ক্ষেত্রেও একইভাবে দেখা যায়।

জৈব (biological) কারণেও নানা অস্বাভাবিক মানসিকতা ও নানা ধরনের হ্যালুসিনেশান তথা আধ্যাত্মিক অনুভূতি হতে পারে। ক্রোমোজোমের গণ্ডগোলের ফলেও বংশানুক্রমিকভাবে এটি ঘটতে পারে।

[সিজ্রোফ্রেনিয়া, পাগলামি, নানা ধরনের মানসিক বিকৃতি, বিভিন্ন হ্যালুসিনেশান অনুভব করার প্রবণতা ইত্যাদি নানা ধরনের মানসিক অস্বাভাবিকত্ব বংশানুক্রমিকভাবে ছড়াতে পারে। বহু শত বছর ধরে পুরুষাণুক্রমে ঈশ্বর-দেব-দেবী ভূত-প্রেত তথা অলৌকিক আধ্যাত্মিক ব্যাপারগুলিতে অন্ধ বিশ্বাস করার ফলেই মানবজাতির বৃহত্তর অংশের মধ্যে এই সব অন্ধ ও ভ্রান্ত বিশ্বাস (delusion) হয়তো বংশানুক্রমিক কারণেই এখনো টিকে আছে। তাই হয়তো মানুষের মধ্য থেকে এসব ভ্রান্ত বিশ্বাস রাতারাতি দূর করা সম্ভব নয়—এর জন্য ক্রমশঃ অধিকতর সংখ্যার মানুষের বৈজ্ঞানিক সচেতনতা প্রয়োজন বেশ কয়েক প্রজন্ম ধরে।]

ভিটামিন বি-ওয়ান বা থায়ামিনের অভাবে যে বেরিবেরি রোগ হয় বা আরেকটি ভিটামিন নিকোটিনিক অ্যাসিড-এর অভাবে যে পেল্লাগ্রা রোগ হয়—সেই সব রোগেও নানা মানসিক গণ্ডগোল ও আস্বাভাবিক মানসিক অনুভূতি ইত্যাদি হয়ে থাকে। কয়েকটি হরমোন (যেমন গলার কাছে থাকা প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড-নিঃসৃত প্যারাথাইরক্সিন)-এর অভাবে প্রচণ্ড হ্যালুসিনেশান ঘটতে পারে। ডঃ কোভুরের এক ভাইঝি-র একবার ভীষণ মনে হতে লাগল যে, সে যখনই আকাশের দিকে তাকায় তখনি ডঃ কোভুরের মৃতা মায়ের ভূতকে দেখতে পায়। সবাই যখন ভূতের জন্য সন্ত্রস্ত, তখন ডঃ কোভুর ভাইঝিকে পুরো ডাক্তারি পরীক্ষা করালেন এবং দেখলেন তার প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড-এর অসুখ করেছে। অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম-ঘটিত লবণ ইত্যাদি দিয়ে যথোপযুক্ত চিকিৎসা করে মেয়েটির সামনে থেকে তার ঠাকুমা'র 'প্রেতাত্মা' অন্তর্হিত হল। যদি এ পরীক্ষা না করা হত, তবে প্রেতাত্মার প্রভাব বলেই ব্যাপারটি চলত দীর্ঘকাল, প্রচুর শান্তিস্বস্ত্যয়ন প্রেতপূজা ইত্যাদি করা হত এবং অবশেষে অকালে, অস্বাভাবিক ভাবে মেয়েটি মারা যেত। ব্যাপক অজ্ঞতার কারণে আমাদের চারপাশে এই ধরনের বহু রোগীই ভুগছেন এবং ব্যাপারটিকে দেবতা বা অপদেবতার প্রভাব বলে অজ্ঞ আত্মীয়স্বজন ভেবে নিজেদের ও রোগীর জীবনকে বিড়ম্বিত করছেন।

মানসিক (psychological) নানা কারণেও মতিভ্রম হতে পারে। মানুষের মনকে নানা ধরনের কথাবার্তা, পুনঃপৌনিক কাজকর্ম বা নানা প্রস্তাব (suggestion)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

-এর মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরে সম্মোহিত করা যায়। এই সম্মোহিত অবস্থায় তার নানা ধরনের হ্যালুসিনেশান হতে পারে। ছোটবেলা থেকে নানা ধর্মীয় ও অলৌকিক বিষয়ে, ভূতপ্রেত ইত্যাদি সম্পর্কে কথাবার্তা শুনতে শুনতে আমাদের প্রায় সবাই-ই একটি দীর্ঘকালীন, ধীর গতি প্রক্রিয়ায় এক ধরনের প্রায়-সম্মোহিত অবস্থাতেই পৌঁছে যাই। এই অবস্থায় সামান্য কারণেই আমাদের মধ্যে অনেকেই নানা ধরনের হ্যালুসিনেশানের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বারংবার মন্ত্র উচ্চারণ করা, প্রার্থনা বা ধ্যান করা, খোল করতাল বাজিয়ে নাচ ইত্যাদি সম্মোহন-আত্মসম্মোহনেরই এক একটি প্রক্রিয়া। এইভাবে সম্মোহিত হয়ে নানা অস্বাভাবিক আচরণ, অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা হয়,— যা এল. এস. ডি., গাঁজা, চরস ইত্যাদি খেয়েও হয়ে থাকে। তাই এইসব মাদক দ্রব্য যে কারণে নিষিদ্ধ করা উচিত, সেই কারণে এই ধরনের তুরীয় বা অন্য কোন ধরনের ধ্যান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদিকেও নিষিদ্ধ করা উচিত—মনের উপর উভয়েরই বিরূপ প্রতিক্রিয়া একই ধরনের। যারা দাবি করে যে ধ্যানের মাধ্যমে তারা নতুন জ্ঞান বা পরম জ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তি, অলৌকিক ও অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা ইত্যাদি লাভ করেছে, তারা মনোরোগ বিশেষজ্ঞের আদর্শ রোগী। প্রাচীনকালের মুনি-ঋষি থেকে শুরু করে বর্তমান কালের বহু অবতার ইত্যাদিরাও এই ধরনের দাবি করে। কেউ তুরীয় ধ্যান (transcedental meditation বা T. M.)-এর বিভিন্ন কেন্দ্র খুলে ব্যবসা ফেঁদে বসে আছে। মহর্ষি মহেশ যোগী নামক ব্যক্তিটি এ ব্যবসায় বেশ সাফল্য অর্জন করেছিল। এই ব্যবসা পাশ্চাত্যের যান্ত্রিক বস্তুবাদী সভ্যতার কুফলে ভোগা ব্যক্তিদের মধ্যে এবং প্রাচ্যের কিছু ব্যক্তির মধ্যেও গাঁজা, চরস ইত্যাদির বিকল্প হিসেবে 'তুরীয় ধ্যান' নামক মাদকতার সুযোগ করে দিয়েছে। ডঃ কোভুর এল. জি. হিউয়েজ নামক এক অধ্যাপকের কথা বলেছেন, যিনি ধ্যানের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের স্বপক্ষে প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন। ডঃ কোভুর প্রস্তাব রেখেছেন, ব্যাপারটি যদি সত্যি হয় তবে পৃথিবীর সর্বত্র স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি ও গবেষণাকেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দেওয়া হোক আর এগুলির জায়গায় ধ্যানের কেন্দ্র খোলা হোক। এবং এসব কেন্দ্রে মহর্ষি মহেশ যোগীদের মত ব্যক্তিদের লাগান যেতে পারে—মিছিমিছি গবেষক-অধ্যাপক-শিক্ষকদের মাইনে দিয়ে কি হবে!*

* নিজের ফাঁদে টেনে আনার জন্য মহর্ষি মহেশ যোগী টাকার টোপও ফেলে এবং ধ্যানের সাহায্যে সৃজনশীল ক্ষমতা অর্জনের পদ্ধতি শেখানোর শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কথা ঘোষণা ক'রে বিজ্ঞাপন দেয়। এরকম একটি বিজ্ঞাপনে সে বলেছে, "Brilliant young men and women are invited to be trained as teachers of the Science of Creative Intelligence and Transcendental Mediation and to join a programme to bring strength, integrity and coherence to the national life under the guidance of the founder of the science, His Holiness Maharisi Mahesh Yogi...Trainees will receive a stipend of Rs. 500 per month. Free board and lodging will be provided, Salary after successful training will start at Rs. 1000 per month". ইত্যাদি। ভারতের মত গরীব দেশের বেকার যুবকদের এভাবে বিভ্রান্ত করা ও ধর্মের নাম করে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করার এ ধরনের ষড়যন্ত্র আর কতকাল চালিয়ে যাওয়া হবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিড়বিড় করে কোন মন্ত্র আউড়ে ধ্যান করা যে পাগলামির লক্ষণ বা তা যে কাউকে পাগলে পরিণত করতে পারে তার উদাহরণ ডঃ কোভুর দিয়েছেন। শ্রীলঙ্কার বাসিন্দা এক তামিল ভাষী ভদ্রলোক তামিল ভাষায় লেখা 'যোগ ধ্যান' নামের একটা বইতে পড়ল যে, পদ্মাসনে বসে ১০৮ বার 'ওম হ্রীং জয়মনশক্তি' কথাগুলি আবৃত্তি করলে মনশ্চক্ষুর উন্মেলন ঘটে এবং অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ও সর্বজ্ঞান লাভ করা যায়। একদিন রাত্রে অন্ধবিশ্বাস নিয়ে সে পদ্মাসনে বসে এই কাজ শুরু করল। ৫০-৬০ বার কথাগুলি বলার পরই সে হঠাৎ "মুরুগা, মুরুগা" (এক দেবতার নাম) বলে চেঁচাতে চেঁচাতে ঘরের মধ্যে চার পাশে ছুটে বেড়াতে শুরু করে। এর পর থেকেই তার মধ্যে পাগলামির সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। বহু ঝাড়-ফুঁক-স্বস্ত্যয়ন করে কোন লাভ হয়নি। শেষে তার স্ত্রী তাকে ডঃ কোভুরের কাছে নিয়ে আসে সম্মোহন চিকিৎসা (hypnotherapy)-র জন্য।

মনোরোগ চিকিৎসার বিভিন্ন বইতে ধর্মের কারণে সৃষ্ট এ ধরনের নানা মানসিক রোগের উদাহরণ রয়েছে। ধ্যান আসলে আত্মসম্মোহনের একটি প্রকৃষ্ট প্রক্রিয়া। কোন জিনিস নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে ভাবতে অর্থাৎ ধ্যান করতে করতে ঐ বিষয়ে নানা ধরনের বিভ্রান্তিকর অভিজ্ঞতা হয় যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি আধ্যাত্মিক অনুভূতি বলে বর্ণনা করে। নির্জন জায়গায় কালী বা শিব বা অন্য কোন দেবতার ক্যালেণ্ডারে বা অন্য কোথাও দেখা কোন ছবি একমনে দীর্ঘসময় ধরে কল্পনা করতে থাকলে এক সময় মনে হবে যেন সামনে কালী বা শিবঠাকুর এসে দাঁড়িয়েছে, সে যেন কাঙ্খিত বরও দিল—এর ফলে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে সে কিছু অভূতপূর্ব কাজও করে ফেলতে পারে উৎসাহের চোটে। এ ধরনের ঘটনার উদাহরণ প্রাচীন পুরাণ বা ধর্মগ্রন্থে হামেশাই পাওয়া যায়। ব্যাপারটি আসলে আত্মসম্মোহনের ফলে সৃষ্ট মতিভ্রম (hallucination) ছাড়া আর কিছুই না। ধ্যান ইত্যাদির দ্বারা মনঃ সংযোগ, মানসিক উত্তেজনা প্রশমন, পুরনো স্মৃতির উদ্ধার ইত্যাদি ব্যবহারিক ফল লাভও সম্ভব হয় যা সম্মোহন চিকিৎসা(hypno-therapy)-র সাহায্যেও করা হয়ে থাকে।*

---

* যদি কৃষ্ণ ও অর্জুনের অস্তিত্ব সত্যিই কোনদিন থেকে থাকে, তবে অর্জুন কর্তৃক কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন সম্মোহনের ফলেই সম্ভব হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মৃত্যুর আগে বিবেকানন্দকে স্পর্শ করে যে উজ্জ্বল আলো ইত্যাদি দেখিয়েছিলেন বলে বলা হয় তাও সম্মোহনের সাহায্যে করা সম্ভব। অনেক ধর্মগ্রন্থে এই ধরনের উদাহরণ রয়েছে। এই সব 'অবতারগণ' প্রকৃতপক্ষে সুদক্ষ সম্মোহন চিকিৎসক (hypno therapist) বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞের মত কিছু দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছিলেন। সম্মোহনের সাহায্যে নানা মানসিক রোগ সারান যায় এটি পরীক্ষিত সত্য। সম্মোহনের সাহায্যে বিছানায় শায়িত একজনকে শুধু মুখে বলে বলে সিঁড়ি বেয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা অর্জন করান যায় এবং পরীক্ষা করে দেখা গেছে, শায়িত অবস্থাতেও ব্যক্তিটির শরীরে সিঁড়ি বেয়ে ওঠার পরিশ্রমের লক্ষণ প্রকাশ পায় যেমন নাড়ির গতি ও শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়, রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি। সম্মোহনের সাহায্যে এইভাবে আরো নানা ধরনের হ্যলুসিনেশানের অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করা যায়। আত্মসম্মোহনের সাহায্যে নিজের শরীরেও নানা পরিবর্তন ঘটান যায়। যেমন দূরে অন্য কাউকে মার খেতে দেখলে এইভাবে নিজের শরীরে কালশিটে পড়ে যেতে পারে বলে মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের ধর্মগুরুদের মতবাদের বিভিন্নতার অন্যতম কারণ সংশ্লিষ্ট ধর্মগুরুদের বিভিন্ন ধরনের হ্যালুসিনেশানের অভিজ্ঞতা। যেমন কারো মনে হয়েছে সে রাম ও কৃষ্ণের যুগ্মরূপ অথবা কৃষ্ণের স্ত্রী, নাচতে নাচতে কারোর রাধা-ভাব উদয় হয়েছে ইত্যাদি। এই বিভিন্নতার কারণে একজন খ্রীস্টান ধ্যানে বসলে সে হয়তো দেখবে স্বর্গে জিহোবা বসে আছে, তার ডান দিকে যীশুখ্রীস্ট বসে আছে, আর চারপাশে দেবদূতেরা নাচানাচি করছে। হিন্দু বা বৌদ্ধ হয়তো তার পূর্বজন্ম বা পরজন্মের কাণ্ড কারখানা দেখতে পাবে। মুসলিম দেখবে চরম বিচারের সময় আল্লা তার বিচার করছে ইত্যাদি। গাঁজা, চরস, এল. এস.ডি. ইত্যাদি বিভিন্ন মাদকদ্রব্যের প্রভাবেও এ ধরনের অনুভূতি লাভ করা যায়।

ঈশ্বর ও বিভিন্ন দেবদেবী, ভূত-প্রেত-শাকচুন্নি-ব্রহ্মদৈত্য ইত্যাদির অস্তিত্ব এবং বিভিন্ন অলৌকিক, অতিপ্রাকৃতিক বা আধ্যাত্মিক শক্তি ও ঘটনাবলীতে অন্ধ দৃঢ় বিশ্বাসকে একধরনের delusion বলা যায়। এইব ভ্রান্তবিশ্বাসগুলি একেবারে শৈশব থেকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাবে (শিক্ষাব্যবস্থা, বয়স্কদের গালগল্প , প্রচার যন্ত্র ইত্যাদি) মানুষ অর্জন করে এবং তার মনের মধ্যে সেগুলি দৃঢ়মূল হয়ে যায়। এ ধরনের মানসিক রোগ কিছুটা বংশানুক্রমিকভাবেও পাওয়া সম্ভব। এইসব ভ্রান্তবিশ্বাসকে মানুষের মন থেকে রাতারাতি দূর করা খুবই শক্ত; চিরতরে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলির প্রভাব থেকে জনগণকে মুক্ত করার জন্য বহুজনকে দীর্ঘদিন ধরে এগুলির বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংগ্রাম করতে হবে এবং এগুলির ভ্রান্ত, অবৈজ্ঞানিক ও ক্ষতিকর দিকগুলির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবোধ ও সচেতনতাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে। অন্যথায় delusion-এর দ্বারা প্রভাবিত বহু মানুষই নানা ধরনের illusion-hallucination-এর শিকার হতে থাকবে, শিকার (অর্থাৎ ভক্ত) হতে থাকবে তথাকথিত অবতার ও অধ্যাত্মবাদীদের,—যা সামগ্রিকভাবে সমগ্র মানব-সমাজের প্রগতিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে।

নিজেদের অন্ধ বিশ্বাসের ফলে একজন সুখশান্তি বা তুরীয় আনন্দ পেতে পারে,—শ্রী মেনন-এর মত ব্যক্তিরা এ ধরনের কথা বলেন। গাঁজা, চরস, এল. এস.ডি.-র সাহায্যেও এই ধরনের আনন্দ পাওয়া যায়। কিসের কারণে এই আনন্দ হচ্ছে সেটি প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে এই আনন্দের বাস্তব ভিত্তি কতটুকু? শ্রীমেনন (এবংতাঁর মত আরো কিছু তথাকথিত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিও, হয় সুপরিপল্লিতভাবে অথবা অসচেতনভাবেই) আরো বলেছেন, "অন্যরাও যদি অন্য কোন ধরনের বিশ্বাসের জন্য সুখশান্তি পায়, তবে আমি কেন তাঁদের বাধা দেব?" ভ্রান্ত বিশ্বাসের দ্বারা

দেখেছেন (যেমন নাকি ঘটেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে)। এ ধরনের ঘটনাকে বলা হয় stigmatization যা এক ধরনের hysteria অর্থাৎ মানসিক রোগের লক্ষণ। এসবের মধ্যে অলৌকিকত্ব বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা কিছুই নেই। নির্দিষ্ট শারীরতাত্ত্বিক নিয়মেই এসব ঘটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাস্তব ও সাময়িক সুখ-শান্তি লাভের ফলে মানব-সমাজ যে দীর্ঘস্থায়িভাবে ঈশ্বর-অলৌকিকত্বের উপর নির্ভরতার জড়ত্ব অর্জন করে এবং আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভর হয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা ও সামাজিক নানা সমস্যার সমাধান করতে পারে না, তা আগে বলা হয়েছে। তাই সচেতন ব্যক্তিদের জরুরী দায়িত্ব হচ্ছে মানুষকে তাদের দুঃখকষ্ট লাঘবের প্রকৃত পদ্ধতি ও স্থায়িভাবে "সুখ শান্তি" পাওয়ার উপায় সম্পর্কে সচেতন করা—তাই "আমি কেন তাঁদের বাধা দেব" বলে ছেড়ে দেওয়ার অর্থ "তাদের" স্থায়িভাবে দুঃখ-কষ্ট-দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলে রাখার ব্যবস্থা করা; এক কথায় মানুষ হয়ে সমগ্র মানবজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা এবং শাসকশ্রেণীর শোষণ-অত্যাচারকে টিকে থাকতে সাহায্য করা।

কিছু ব্যক্তি সম্মোহন-আত্মসম্মোহন তথা নানা ধরনের ধ্যানের মাধ্যমে ক্রিপ্টেস্থেশিয়া (Cryptesthesia; Cryptos—গোপন, Asthesis—অনুভূতি) নামক এক মনোবিকৃতির শিকার হয়। এতে এক ধরনের নির্বোধ ধারণা হয় যে, নানা গোপন, রহস্যময় বা অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা লাভ করা গেছে। সাধারণ বা নিরক্ষর মানুষ এই ধারণা অনুযায়ী কাজ করলে তাকে প্রায়শঃই পাগলা গারদে পাঠান হয়, যদি না সে খুব দক্ষতার সঙ্গে এসবের সঙ্গে নানা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কথাবার্তা ও আচার-আচরণের খিচুড়ি করতে পারে। অন্যদিকে শিক্ষিত ও সুযোগ সন্ধানী বুদ্ধিমান লোকেরা এ ধরনের ধারণাকে পরমজ্ঞান, পরমাশক্তিলাভ, ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব, আত্মোপলব্ধি ইত্যাদি নানা গালভরা আগডুম-বাগডুম নাম দিয়ে খ্যাতি অর্জন করে।

অধ্যাপক হিউয়েজ ও আরো অনেকেই (যেমন, মি. করাঞ্জিয়া,—তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) দাবি করেন যে, ধ্যানমগ্ন ব্যক্তি শরীর থেকে এক ধরনের জ্যোতি বেরোয়। অধ্যাপক হিউয়েজ বলেছেন, এই জ্যোতি ধ্যানমগ্ন ব্যক্তিই শুধু অনুভব করতে পারেন, আমি-আপনি দেখতে বা বুঝতে পারব না এবং "অনেক যুক্তিবাদী শিক্ষিত ব্যক্তিরা যেহেতু নিজেরা দেখতে পান না, তাই ব্যাপারটিতে অবিশ্বাস করেন।" বক্তব্যটি হাস্যকর। বৈজ্ঞানিক চেতনাসম্পন্ন যুক্তিবাদীরা নিজেদের চোখে অবলোহিত বা অতিবেগুনী রশ্মি, অক্সিজেন বা হাইড্রোজেনের অণু-পরমাণু ইত্যাদি না দেখলেও তা অস্বীকার করেন না, কারণ উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় এগুলির অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব। অন্যদিকে ধ্যানমগ্ন ব্যক্তি নিজের শরীর থেকে যে জ্যোতি নির্গমনের কথা বলে তা তার একান্ত নিজস্ব মতিভ্রান্ত অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্যাপারটি সিজোফ্রেনিয়া ইত্যাদি মানসিক রোগীদের বক্তব্যের মতই ভিত্তিহীন। ধ্যানমগ্ন একজন ব্যক্তি ও সিজোফ্রেনিয়া জাতীয় মনোরোগের রোগীদের মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক ক্রিয়ার মধ্যে যে মিল রয়েছে তা আগেই জানান হয়েছে। অধ্যাপক হিউয়েজ দুই আমেরিকান মহিলার লেখা 'সাইকিক ডিসকভারিজ বিহাইণ্ড দি কার্টেন' নামক বইটি থেকে ছবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখিয়েছেন কিভাবে একজন মানুষের শরীর থেকে জ্যোতি বেরুতে পারে। আসলে ঐ ছবিগুলি অবলোহিত পদ্ধতিতে (infrared photography) তোলা; এই পদ্ধতিতে ছবি তুললে যে কোন জীবিত বস্তুর শরীর থেকে (সে প্রাণী বা উদ্ভিদ যাই হোক না কেন), জ্যোতি বেরুতে দেখা যাবে। এটি আসলে ঘটে তাপমাত্রার তারতম্যের জন্য। উল্লেখিত বইতে গাছের পাতা বা ফুলের কুঁড়ির চারপাশেও যে জ্যোতির্বলয় দেখান হয়েছে তার উল্লেখ অধ্যাপক হিউয়েজ সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন। তাহলে কি বলতে হবে ঐ সব পাতা বা কুঁড়িগুলিও ধ্যান করছিল ?

[অধ্যাপক হিউয়েজদের মত কিছু তথাকথিত শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি এইভাবে নানা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও তথ্যের বিকৃত ব্যবহার করে অবাস্তব ব্যাপারগুলোকে বৈজ্ঞানিক বলে চালাতে চান। আত্মার অস্তিত্বের স্বপক্ষে যেমন করেছেন স্বামী অভেদানন্দ (নবম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।]

অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (Extrasensory Perception বা ESP)

[সাধু-অবতার-অধ্যাত্মবাদীসহ বহু বুজরুকই এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, বা ক্ষমতার কথা বলে অতীতে বা এখনও ব্যবসা চালায় এবং অবাস্তব অলৌকিকত্বের স্বপক্ষে প্রচার করে। এটি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন—

(১) ভবিষ্যৎ দৃষ্টি (Precognition)— ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা বলে দেওয়ার ক্ষমতা। প্রায় সব অবতার বা জ্যোতিষী ইত্যাদিই নিজেদের এই ক্ষমতার অধিকারী বলে জাহির করে। আসলে প্রায়শঃই বুদ্ধিমান এ ধরনের লোকেরা পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী ও বাস্তব অবস্থার সঠিক বিশ্লেষণ করে কয়েক বছর পরে কি ঘটতে পারে তার আভাস দেয়; কোন কোন সময় তা মিলেও যায়। এটিকেই তারা তাদের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় বলেও জাহির করতে চায়। আসলে সেটি বাস্তব অবস্থার উপর ভিত্তি করে বিশেষ ঐ ব্যক্তির মস্তিষ্কের বিশ্লেষণী ক্ষমতার ফল—অলৌকিক অবাস্তব কোন কিছু নয়।

(২) দূরচিন্তা (telepathy; tele—দূর, pathos—অনুভূতি) —দূর থেকে মনের কথা বা চিন্তাকে জানতে পারার ক্ষমতা। বাস্তবতঃ এটিও সম্ভব নয়।

(৩) অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি (clairvoyance)—এর সাহায্যে দূরের কোন জিনিস দেখতে পাওয়া যায় বলে দাবি করা হয়। অর্থাৎ আমেরিকার বসে ভারতে বিশেষ এক ব্যক্তি কি করছে বা তার মৃত্যুদৃশ্য ইত্যাদি দেখতে পাওয়া। মহাভারতে সঞ্জয় যেমন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বর্ণনা দিয়েছিলেন বলে বলা হয়েছে। টেলিভিশন জাতীয় যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া এ ধরনের কোন ক্ষমতার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। Precognition বা telepathyর মত এই ধরনের ক্ষমতার তথাকথিত পরিচয় যারা দেয়, তারা নিজেদের বুদ্ধিদীপ্ত অনুমান ও বিশ্লেষণের ফলে কিছু কিছু খবর বলে মাত্র—এগুলির কয়েকটি মিলেও যেতে পারে—কিন্তু ব্যাপারটির মধ্যে অলৌকিক বা ঐশ্বরিক কোন ব্যাপার নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(৩) **মনোগতিশক্তি (Psychokinesis)**—এই 'অলৌকিক' ক্ষমতার বলে কোন জড় বস্তুকে গতিশীল করা, কোন ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করা বা কোন বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন করা যায় বলে বলা হয়। এটিও সম্পূর্ণ মিথ্যা দাবি। কোন কোন ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দাবিদার ব্যক্তি ম্যাজিসিয়ানসুলভ কিছু দক্ষতা ও কারসাজির সাহায্যে সাধারণ মানুষের বোকা বানায় এবং সেটিকেই তার অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় বলে জাহির করে। সৎ ম্যাজিসিয়ান বা যাদুকররাও একই উপায়ে কাজ করেন—কিন্তু তাকে নিজেদের অলৌকিক ক্ষমতা হিসেবে প্রচার করেন না।]

আজকাল প্রাচীন এইসব কুসংস্কারকে নতুন মোড়কে হাজির করার কথা বেশ শোনা যাচ্ছে। পরামনোবিজ্ঞান (parapsychology)-এর মত একটি অপবিজ্ঞানের চর্চাও শুরু হয়েছে এর জন্য। আমেরিকার নর্থ-ক্যারোলিনার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জে. বি. রাইনে ও তাঁর স্ত্রী ডঃ লুইসা ই. রাইনে এর ওপর নানা পরীক্ষানিরীক্ষা, 'গবেষণা' করেন এবং বেশকিছু 'গবেষণালব্ধ' বিভ্রান্তিকর পুস্তিকাও প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে ডঃ রাইনে ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরামনোবিজ্ঞান বিভাগের ডাইরেক্টর হন। সারা পৃথিবী জুড়ে আলোড়ন শুরু হয়। টেলিপ্যাথি, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, তুরীয় ধ্যানলব্ধ জ্ঞান ('creative knowledge through transcedental meditations') ইত্যাদি নানা ভ্রান্ত ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তার স্বপক্ষে বহুজন কাজ করতে থাকেন। এইভাবে একসময় পৃথিবীতে সবচেয়ে বিপজ্জনক সাম্রাজ্যবাদী দেশ আমেরিকা তার যান্ত্রিক বস্তুবাদী সভ্যতার তথা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি পর্যায়ে মানবসমাজের পক্ষে ক্ষতিকর অপবিজ্ঞানের বিভ্রান্তিকর চিন্তার জন্ম দিল।

ডঃ রাইনের মত অনেকে সম্পূর্ণ ভুল তথ্যের উপর ভিত্তি করে ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে এই ধরনের অবৈজ্ঞানিক চিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু ডঃ কোভুর-এর মত পৃথিবীর আরো বহু বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিই এই ভ্রান্ত পরা-মনোবিজ্ঞান তথা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উপর কাজ করতে গিয়ে দেখেছেন, ডঃ রাইনে বা তাঁর সমর্থকরা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথাই বলেছেন। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কেনেডির মতে, "কোন সত্য প্রতিষ্ঠার বৈজ্ঞানিক নিয়ম হচ্ছে, গবেষণাগারে পরীক্ষাগুলি পুনরায় করে দেখলে ফলাফল হবে একই। আমরা ১০০ জন ছাত্রের ওপর ডঃ রাইনের করা পরীক্ষাগুলি করেছিলাম। এবং আমাদের ফল হয়েছে আলাদা।" আরো নানা গবেষক অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সমর্থনে করা ডঃ রাইনের পরীক্ষা ও ফলাফলগুলিকে যাচাই করে দেখেছেন যে সেগুলি একেবারেই মিথ্যা। অতীন্দ্রিয় অনভূতির সাহায্যে একজন ব্যক্তি যে-সব ভবিষ্যদ্‌বাণী করে বা যা কিছু বলে সেগুলি যে সম্ভাব্যতার নিয়মের (Law of chance বা possibility) ঊর্ধ্বে নয় তা প্রমাণিত।

[যেমন কোন ব্যক্তি বা জ্যোতিষী হয়তো কারোর ভবিষ্যৎ জীবনের উপর কিছু কথা ভবিষ্যদ্‌বাণী করল,—সম্ভাব্যতার নিয়মে ও একটু মাথা খাটিয়ে এসব বললে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদের কিছু মিলতে বাধ্য। যে কোন পাঠকই তা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। এসব কথার যে দু'চারটি হঠাৎ মিলে যায় সেইগুলি প্রচারই হয়। বাকীগুলি কিন্তু চাপা পড়ে যায়—আর এইভাবে ভবিষ্যদ্‌বক্তার অলৌকিক ক্ষমতা ভ্রান্ত ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়।]

ডঃ রাইনের গবেষণা কাজের অবৈজ্ঞানিক দিকটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় এক সময় তাঁর 'গবেষণাকাজ' বন্ধ করে দেয়। অবশেষে ডঃ রাইনে নর্থ ক্যারোলিনার ডারহাম-এ পরামনোবিজ্ঞান-এর প্রতিষ্ঠান (Institute of Parapsychology) প্রতিষ্ঠা করে। এর ডাইরেক্টর হয় তারই মত এক ধাপ্পাবাজ ওয়াল্টার লেভি। শেষ অব্দি কিন্তু এরও চালাকি ধরা পড়ে যায়। একবার লেভি জানাল যে, অতীন্দ্রিয় মানসিক শক্তির সাহায্যে সে শতকরা ৫৪ ভাগ শতকরা সঠিকতার কথা বলতে পারবে এবং এর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেবে গবেষণাগারে, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে। কিন্তু তার সহকর্মীরা সন্দিগ্ধ হয়ে গবেষণাগারে লুকিয়ে থাকে এবং দেখে যে লেভি গোপনে গবেষণাগারে ঢুকে যন্ত্রপাতিতে কারিকুরি করে রাখছে। ঘটনাটি ঘটে ১৯৭৪ সালের অগাষ্ট মাসে। এরপর অপ্রস্তুত লেভি ডঃ রাইনেকে আরো অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে পালিয়ে যায়।

অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি

১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে সিংহলের একটি পত্রিকা 'সিলুমিনা' অ্যাসিলিন নামে এক মেয়ের কথা জানায় যার নাকি অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি রয়েছে। সে নাকি কাঠের বা লোহার একটি বাক্সের ভেতরে রাখা টাকার নোটের নাম্বার সঠিকভাবে পড়ে দিতে পারে। ডঃ কোভুর যোগাযোগ করে মার্চের ১৯ তারিখে তাকে পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু অন্যান্য ধাপ্পাবাজ অতীন্দ্রিয়বাদীদের মত অ্যাসিলিন বা তার এজেন্ট কেউই ঘটনাস্থলে আসতে সাহস করেনি। আসলে ওয়াল্টার লেভির মত এরও কোন ধরনের চালাকি ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় ছিল।

সিংহলের পাপ্পু নামে তথাকথিত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন আর এক ব্যক্তির কাছে ডঃ কোভুর নিজেই গিয়েছিলেন ও তার দাবিকে মিথ্যা প্রমাণ করেছিলেন। ১৯৬৩ সালের ২০ শে এপ্রিল 'সিলোন ডেলি নিউজ' সংবাদপত্রে একটি খবর বেরোয়, কিভাবে অলৌকিক দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে কিডন্যাপ করা এক মেয়েকে খুঁজে পাওয়া গেছে—যে গাড়ীতে করে মেয়েটিকে নিয়ে পালান হচ্ছিল, সে গাড়ির নাম্বার সঠিকভাবে ঐ লোকটি তার অতীন্দ্রিয় অলৌকিক দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে দেখতে পেয়েছিল ও জানিয়ে দিয়েছিল। ডঃ কোভুর খোঁজ করে পাপ্পু নামে এই লোকটির কাছ গেলেন। আসলে সে ছিল সিংহলী—কিন্তু যেহেতু সাধারণ সিংহলীদের মধ্যে ধারণা আছে যে, মালয়ালীদের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যভাবে অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে, তাই সে নিজেকে 'মালয়ালী' বলে পরিচয় দিত। যে ভদ্রলোকের মেয়ে কিডন্যাপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল তিনিও ছিলেন মালয়ালী। ডঃ কোভুর পাপ্পুর 'আশ্রমে' গেলেন। পাপ্পু নিজেকে 'প্রফেসর পাপ্পু' নামে পরিচিত করাত। সে ডঃ কোভুরকে জানাল যে, সে কৃষ্ণ পানিক্কার, কুমার প্যানিক্কার, দামোদর পানিক্কার ও গোবিন্দ প্যানিক্কার—কেরলের এই চার বিখ্যাত গুরুর শিষ্য। সে তার অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির সাহায্যে বহু সমস্যার অলৌকিক সমাধান করেছে। একটি ছোট 'অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন' বাক্সের গায়ের ফুটোয় চোখ দিয়ে সে সঠিক দৃশ্য বা উত্তর নাকি দেখতে পায়। ডঃ কোভুর পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে মুঠো করে ধরলেন, পাপ্পুকে বললেন ওর নম্বর বলতে। পাপ্পু তার অলৌকিক বাক্সের ফুটোয় চোখ দিয়ে, ধীরে ধীরে নাম্বার বল্ল—বি/৪৫-৯০২৮৩। ডঃ কোভুর মুঠো খুলে নোটের আসল নাম্বারটি দেখালেন—জি/৫১-৩৯৪৮১। পাপ্পুর বলা নম্বর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নির্বাক পাপ্পু আর তার ভক্তবৃন্দের সামনে বাক্সের ফুটোয় চোখ দিয়ে ডঃ কোভুর দেখলেন বাক্সের ভেতরে একটি নোট রাখা আছে। আসলে অলৌকিক ক্ষমতা-টমতা বাজে কথা, ঐ নোটের নাম্বার দেখেই মরিয়া হয়ে পাপ্পু একট নাম্বার বলেছে। না হলে নোটের নাম্বার যে ঐভাবে লেখা থাকে সেটিও তার পক্ষে বলা সম্ভব হত না।

এর পর ডঃ কোভুর কিডন্যাপ করা গাড়ীর নাম্বার বলার ব্যাপারে অনুসন্ধান করলেন। যে পুলিশ অফিসার মেয়েটিকে খুঁজে বের করেছেন তিনি জানালেন কেউ তাঁকে কোন গাড়ীর নাম্বার দেয় নি, খবর পেয়ে সন্দেহভাজন কয়েকটি গাড়ী অনুসরণ করে অপহরণকারীদের ধরা হয়েছে। জানা গেল, নিজেকে মালয়ালী বলে পরিচয় দেওয়া পাপ্পুই যে ট্যাক্সির নাম্বারটি বলেছে সেটি উকিলকে আসলে জানিয়েছিলেন কিডন্যাপ হওয়া মেয়েটির বাবা। হঠাৎ তিনি কেন এই মিথ্যে কথা বল্লেন তার উত্তরে মেয়েটির বাবা, ঐ মালয়ালী ভদ্রলোক, ডঃ কোভুরকে জানালেন, "স্যার, মালয়ালীর পেছনে লাগা যে কত বিপজ্জনক তা স্থানীয় সিংহলীদের বুঝিয়ে দেওয়ার এই ছিল সবচেয়ে ভাল উপায়।"

ডঃ কোভুর যদি ব্যাপারটির অনুসন্ধান না করতেন তবে আরো সব তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতা ও ঘটনার মত এটিও অলৌকিকত্বের অন্যতম ঘটনা হিসাবে পরিচিত হয়ে থাকত।

যে ঘোড়ার টেলিপ্যাথির ক্ষমতা ছিল

রাস্তা-ঘাটে বা অন্যত্র আমরা প্রায়ই দেখি পাখি, ছাগল, ঘোড়া বা অন্য কোন জীবজন্তু 'অলৌকিক ক্ষমতাবলে' নানা কাজ করছে। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ও telepathy-র সাহায্যে কোথাও টিয়াপাখি বাক্স থেকে কার্ড টেনে মানুষের ভাগ্য বলে দিচ্ছে—কোথাও বা ছাগল মাথা নেড়ে নানা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমেরিকার ভার্জিনিয়া প্রদেশের রিচমণ্ডে শ্রীমতী সি. ডি. ফণ্ডা নামে এক মহিলার এই ধরনের একটি ঘোড়া ছিল—তার নাম ছিল লেডি ওয়াণ্ডার (অর্থাৎ শ্রীমতী বিস্ময়)। ঘোড়াটি নাকি মাথা নেড়ে নেড়ে বিভিন্ন অক্ষর সাজিয়ে নানা প্রশ্নের উত্তর দিত অদ্ভুতভাবে। শ্রীমতী ফণ্ডা বলতেন ঘোড়াটির অলৌকিক ক্ষমতা (telepathy) আছে, তাই সে প্রশ্নকর্তার মনের প্রশ্ন ও উত্তর জানতে পারে। ঘোড়াটির সাহায্যে তিনি বিপুল অর্থের মালিক হয়ে উঠেছিলেন। অসংখ্য সাধারণ মানুষই শুধু নয়, ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বোক্ত ডঃ জে বি রাইনে ও তাঁর স্ত্রী (শ্রীমতী) লুইসা ই. রাইনের মত তথাকথিত বিজ্ঞানী তথা অপবিজ্ঞানীদের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও ঘোড়াটির উপর পরীক্ষা করে নিঃসংশয় হয়েছিলেন যে, ঘোড়াটির টেলিপ্যাথির ক্ষমতা রয়েছে— সে প্রশ্ন শুনে প্রশ্নকর্তার মনের কথা বুঝতে পারে ও এক ধরনের অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারে। এঁরা এ নিয়ে প্রবন্ধও লেখেন। ঘটনাটি ১৯২৯ সালের। সারাবিশ্বে ব্যাপারটি আলোড়ন তোলে ; 'লাইফ', 'চ্যালেঞ্জ' ইত্যাদির মত বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকায় ঘোড়াটির ওপর লেখা ছাপা হয়। যারা অলৌকিক ক্ষমতার অস্তিত্বের কথা প্রচার ক'রে ব্যবসা চালায় তাদের এতে বেশ সুবিধা হয় এবং রাইনের মত লোকদের আশীর্বাদ করতে থাকে।

নিউজার্সির অধ্যাপক জন স্ক্যার্নের কানে ঘোড়াটির খ্যাতি এসে পৌঁছায়। তিনি গেলেন ব্যাপারটি পরীক্ষা করার জন্য। ঘোড়াটির সামনেই পরপর সাজান ছিল ২৬টি ইংরেজী অক্ষরের কাঠের ব্লক। শ্রীমতী ফণ্ডা একটি চাবুক হাতে দাঁড়িয়েছিলেন পেছনে, কখনোই তিনি ঘোড়ার সামনে আসেনি। একজন পুলিশ অফিসার জিগ্যেস করলেন সম্প্রতি ঘটা একটি ব্যাংক ডাকাতির ডাকাতেরা তখন কোথায় রয়েছে। ঘোড়াটি নাক দিয়ে অক্ষর সাজিয়ে জানাল 'CHI'—অর্থাৎ চিকাগো। এরপর অধ্যাপক স্ক্যার্ন জিজ্ঞেস করলেন তিনি কিভাবে এখানে এসেছেন। ঘোড়াটি আগের মতই জানাল—CAR অর্থাৎ নিজের গাড়ীতে করে। এর পর শ্রীমতী ফণ্ডাকে জিগ্যেস করলেন যে, তাঁর প্রশ্নটি মুখে না বলে কিভাবে তিনি উত্তরটি পাবেন—কারণ ঘোড়াটির যদি অলৌকিক টেলিপ্যাথির ক্ষমতা থাকেই তবে তো সে তাঁর মনের প্রশ্নটির কথাও জানতে পারবে! এ শুনে শ্রীমতী ফণ্ডার মুখ শুকিয়ে গেল—ব্যাপারটি তাঁর বা ঘোড়াটির পক্ষে সুবিধাজনক নয়। তবু আমতা আমতা করে তিনি বল্লেন প্রশ্নটি কাগজে লিখে দিতে। ঘোড়া বা শ্রীমতী ফণ্ডা কাউকেই না দেখিয়ে অধ্যাপক স্ক্যার্ন কাগজে লিখলেন, "আমি কোথায় থাকি ?" কিন্তু না, অক্ষরগুলোর কাছে কয়েকবার মুখ নিয়ে গেলেও ঘোড়াটি কোন নির্দিষ্ট উত্তর দিতে পারল না। এরপর অধ্যাপক স্ক্যার্ন তাঁর সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলার ভান করে কাগজটি এমনভাবে রাখলেন যাতে শ্রীমতী ফণ্ডা সেটি দেখতে পান, কিন্তু হাবভাবে প্রকাশ করলেন যেন তিনি তা বুঝতে পারেন নি। আর এর পরেই ঘোড়াটি আবার ধীরে ধীরে অক্ষর সাজাল ; উত্তর দিল—NEW YORK. উত্তরটি ভুল এবং অধ্যাপক স্ক্যার্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রীমতী ফণ্ডার চালাকিটা বুঝতে পারলেন।

আসলে ঘোড়াটিকে বেশ ভালভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। শ্রীমতী ফণ্ডা ঘোড়ার শরীরের সঙ্গে ৬০ ডিগ্রি কোণ করে আড়াই ফুট পেছনে একটি চাবুক হাতে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রশ্নটি শুনে তিনিই উত্তরটি ঠিক করে নিতেন। তারপর ঘোড়াটি এক একটি অক্ষরের কাছে নাক নিয়ে যেতে যেতে সঠিক অক্ষরটির কাছে এলে শ্রীমতী ফণ্ডা চাবুকটি ঈষৎ নেড়ে ঘোড়াটিকে নির্দেশ দিতেন—তখন ঘোড়াটি নাক দিয়ে অক্ষরটি ঠেলে দিত। ঘোড়ার দৃষ্টিক্ষেত্র (field of vision) পেছনের দিকেও প্রসারিত*—এ ব্যাপারটি খেয়াল না রাখলে শ্রীমতী ফণ্ডার ব্যাপারটি বোঝা মুশকিল, কারণ স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে শ্রীমতী ফণ্ডা যেহেতু পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন তাই তিনি আর কিভাবে ঘোড়াকে নির্দেশ দেবেন। শ্রীমতী ফণ্ডা প্রশ্নটি না জানালে ঘোড়াটিও উত্তর দিতে পারত না, কারণ ঘোড়াটি সামনের দিকে মুখ করে থাকলেও তার পেছনের দিকে প্রসারিত দৃষ্টিক্ষেত্রের জন্য শ্রীমতী ফণ্ডা ও তাঁর নির্দেশকেই সে ট্রেনিং-এর ফলে অনুসরণ করত।

ডঃ জে. বি. রাইনে-দের মত একজন জীববিজ্ঞানী ঘোড়ার চোখের অবস্থান জেনেও যেভাবে এ ধরনের একটি অবৈজ্ঞানিক ঘটনা ও চাতুরীকে সমর্থন করলেন তা তথাকথিত বৈজ্ঞানিকদের বোকা বানানোর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শুধু এই ক্ষেত্রেই নয়, আরো নানা ক্ষেত্রে, আরো নানা ধরনের চাতুরীর সাহায্য দিয়ে বিজ্ঞানী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বোকা বানিয়ে অবাস্তব অলৌকিক ঘটনাবলীর সমর্থনে তাদের বিবৃতি আদায় করা হয় এবং সেটি ফলাও করে প্রচার করে অলৌকিকত্বের ব্যবসা চালান হয়।

সার্কাসেও এইভাবে ঘোড়া বা অন্যান্য জন্তু জানোয়ারদের ট্রেনিং দিয়ে নানা অদ্ভুত কাজ করান হয়। অবতাররা ম্যাজিসিয়ানদের মত কিছু হাতসাফাই-এর কাজ ক'রে সেগুলিকে নিজেদের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় বলে চালায় আর সাধারণ সরল বিশ্বাসী মানুষদের প্রতারিত করে; ম্যাজিসিয়ানরা কিন্তু তাঁদের হাত সাফাই-এর কাজকে অলৌকিক ক্ষমতা বলে বলেন না, ম্যাজিক বলেই বলেন এবং এখানেই বুজরুক অবতার ও দক্ষ ম্যাজিসিয়ানদের পার্থক্য। একইভাবে সার্কাসে জীবজন্তুদের ট্রেনিং দেওয়ার পরে তাদের অদ্ভুত নানা কাজকে কখনোই অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় হিসাবে বলা হয় না,— এখানেই শ্রীমতী ফণ্ডাদের সঙ্গে সার্কাস পার্টির তফাত।

*যে কারণে ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানরা ঘোড়ার চোখের পাশে ঠুলি পরিয়ে রাখে যাতে ঘোড়াটি শুধু সামনের জিনিসই দেখে এবং পাশের বা পেছনের কোন কিছু দেখে চমকে গিয়ে দুর্ঘটনা না ঘটায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঋষি অরবিন্দের ভবিষ্যদ্দৃষ্টি

একদা বিপ্লবী, পরে অধ্যাত্মবাদী ঋষি অরবিন্দের জনৈক ভক্ত অরবিন্দের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে একটি দাবী করেছিলেন। তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। ডঃ কণকরত্নম নামে এই ভক্তটি জানিয়েছিলেন যে, ১৯৪৬ সালের ১৫ই আগস্ট তিনি পণ্ডিচেরীর অরবিন্দ আশ্রমে ঋষি অরবিন্দের দর্শনের আশায় গিয়েছিলেন। ঢোকার মুখে দেখলেন, কাঁচে ঢাকা একটি বোর্ডে লেখা রয়েছে, "১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে।" এক বছর আগেই নাকি এই অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি ঋষি অরবিন্দ তাঁর অলৌকিক ভবিষ্যদ্দৃষ্টি (Precognition) -এর সাহায্যে করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ডঃ কোভুর ঘটনাটির সত্যতা যাচাই-এর চেষ্টা করতে থাকেন। তিনি বলেছেন, "অরবিন্দ আশ্রমের সাধারণ সম্পাদক শ্রী এম. পি. পণ্ডিত মাঝেমাঝেই শ্রীলঙ্কা আসেন—তাঁর ভ্রান্তবিশ্বাসগুলি প্রচার করে এখানকার লোকেদের মনকে বিষিয়ে তোলার জন্য। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারীতে শ্রীলঙ্কা থিওসোফিক্যাল সোসাইটি অনুমোদিত একটি সভায় বক্তৃতা দেওয়ার পর, আমি তাঁর কাছে অরবিন্দ আশ্রমের গেটে লেখা ঐ ভবিষ্যদ্বাণীটি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। সরাসরি উত্তর দিতে তিনি প্রথমে রাজি হননি। পরে চাপে পড়ে জানালেন যে, ঐ ভবিষ্যদ্বাণীটি উনি কখনো দেখেননি, তবে লেখক হয়তো তাঁর মনশ্চক্ষুতে ব্যাপারটি দেখেছেন। আমাদের পাশে প্রবন্ধ লেখক (অর্থাৎ ডঃ কণকরত্নম) বসেছিলেন। তাসত্ত্বেও আমাকে এই অপ্রিয় মন্তব্যটি করতে হল যে, তাহলে এই লেখককে তো মানসিক রোগ চিকিৎসার জন্য কোন মানসিক হাসপাতালে পাঠান উচিত।"*

---

*একদা ইতিহাস সৃষ্টিকারী সশস্ত্র বিপ্লবী ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী ব্যক্তিত্বময় পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ কিভাবে এক সময় পরম নিষ্ক্রিয় ভাববাদী ধর্মগুরু বা অবতার হয়ে উঠলেন সে সম্পর্কে নানা বিতর্কিত মতামত রয়েছে। যাই হোক না কেন, তাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে যে সব অলৌকিক ঘটনা ও ক্ষমতার কথা বলা হয় তা অন্যান্য অবতারদের তথাকথিত অলৌকিকত্বের মতই ভিত্তিহীন। যে কারণে তাঁকে নিষ্ক্রিয় ও অধ্যাত্মবাদী করে তোলা হয়েছিল বা হয়ে যেতে হয়েছিল, এই ধরনের মিথ্যা প্রচার হয়তো তারই একটি অংশ,—শ্রীঅরবিন্দ ঘোষেরও হয়ত সেটিতে সায় ছিল, নিজের ইচ্ছেতে বা চাপে পড়ে—যেভাবেই হোক না কেন। শ্রীঅরবিন্দের সাধন-সঙ্গিনী হিসেবে হাজির হওয়া শ্রীমা (মীরা রিশার)-এর জীবনেও নাকি নানা অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। এরকম একটি হাস্যকর ঘটনা (বা রটনা) হচ্ছে এই রকম।— একবার শ্রীমা আলজেরিয়া থেকে জাহাজে ফিরছিলেন। এমন সময় প্রচণ্ড ঝড় এল। শ্রীমা নিজের কেবিনে ঢুকে সূক্ষ্মদেহে সমুদ্রে নেমে গেলেন। ওখানে দেখলেন শয়তান অশরীরীরা তাণ্ডব করে বেড়াচ্ছে। শ্রীমা তাদের শান্ত করে এলেন, ঝড় থেমে গেল। এইভাবে এঁদের দুজনকে নিয়ে আরো বহু গাঁজাখুরি গল্প রয়েছে—যা অন্যান্য সব অবতারদের সম্পর্কেও সংকীর্ণ স্বার্থে বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে রটান হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাবমেরিন টেলিপ্যাথি

এক জায়গায় বসে দূরবর্তী কোন ব্যক্তির মনের কথা জানতে পারা বা তার মধ্যে নিজের চিন্তাকে আরোপ করতে পারার মত অস্বাভাবিক ও অবাস্তব ক্ষমতার কথা অনেকে বলে থাকেন। এই টেলিপ্যাথির ক্ষমতার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করে অনেকে এরকমও বলেন যে, ভবিষ্যতে মহাশূন্যে ভাসমান মহাকাশযানের যাত্রীদের সঙ্গে এই ভাবে যোগাযোগ করা সম্ভব হবে।

১৯৫৯ সালে টেলিপ্যাথির সাফল্য সম্পর্কে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়েছিল যে, ২৫শে জুলাই তারিখে বিখ্যাত পরামনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক জে. বি. রাইনের পরিচালনায় নর্থ ক্যারোলিনার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, টেলিপ্যাথির সাহায্যে ১২০০ মাইল দূরে সমুদ্রের কয়েকশ' ফুট নীচে ডুবে থাকা 'নটিলাস' নামে এক আণবিক ডুবোজাহাজে সাফল্যের সঙ্গে সংবাদ প্রেরণ করা হয়েছিল। খবরটি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে আর টেলিপ্যাথির সমর্থকরা স্বাভাবিকভাবেই তাদের ভ্রান্তবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রচারের স্বপক্ষে শক্ত খুঁটি খুঁজে পায়। কিন্তু ১৯৬৩ সালে আমেরিকার একটি পত্রিকা 'দিস উইক' ব্যাপারটি নিয়ে অনুসন্ধান করে। এর ফলে জানা যায় যে, ঘটনাটি আদৌ ঘটেনি, সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচার। 'নটিলাস'-এর তখনকার ক্যাপটেন উইলিয়াম অ্যাণ্ডারসন জানান, "নটিলাসে টেলিপ্যাথি সম্পর্কে কোন কাজ করা হয় না। টেলিপ্যাথি সম্পর্কিত রিপোর্টটি সম্পূর্ণ মিথ্যা...। আসলে ঐ সময় নটিলাস ছিল পোর্টসমাউথের ডকের উপর, ওটিকে তখন সারান হচ্ছিল।" আমেরিকার বিমানবাহিনীর কলোনেল উইলিয়ম বাওয়ার এই 'সাবমেরিন টেলিপ্যাথির' পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে বলা হয়েছিল। অনুসন্ধানকারীদের কাছে দেওয়া একটি বিবৃতিতে তিনি জানান, (টেলিপ্যাথির) "যে পরীক্ষায় আমি সংশ্লিষ্ট ছিলাম বলে বলা হয়েছিল সেটি আদৌ ঘটেনি।....আসলে ১৯৫৯ সালের ২৫ শে জুলাই তারিখে আমি আলাবামার বিমানবাহিনীর বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিউটিতে ছিলাম এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় কোনভাবেই কোন ধরনের অতীন্দ্রিয় গবেষণা কার্যের সঙ্গে যুক্ত নয়।"

এইভাবে আরো সব অলৌকিক ঘটনা বা ক্ষমতার দাবীগুলির মত টেলিপ্যাথির এই দাবিটিও যে একটি নির্ভেজাল ধাপ্পা ছাড়া আর কিছুই ছিল না, তা প্রমাণিত হয়। টেলিপ্যাথি সম্পর্কে আরও নানা দাবিও পরীক্ষা করে দেখলে এইভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হবে।

সোভিয়েত রাশিয়ার জনৈক অধ্যাপক লিওনিড ভ্যাসিলিয়েভ-এরও দাবি ছিল যে, টেলিপ্যাথির সাহায্যে বহু দূরের যে কোন নারী-পুরুষকে ঘুম পাড়াতে আর জাগিয়ে তুলতে তিনি সক্ষম; টেলিপ্যাথির বাস্তবতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে তিনিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নটিলাস জাহাজের ঘটনাটির উল্লেখ করতেন। স্বাভাবিকভাবে এঁরও দাবি ছিল নিছক ধাপ্পা।

[টেলিপ্যাথির স্বপক্ষে অনেকে বিজ্ঞানের বিকৃত ব্যবহার করে একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হাজির করেন। চিন্তার সময় মানুষের মস্তিষ্ক থেকে যদি এক ধরনের রেডিও-ওয়েভের মত তরঙ্গ বেরোয় এবং দূরবর্তী কোন ব্যক্তির মস্তিষ্কের তরঙ্গের সঙ্গে যদি সঙ্গে যদি তাকে মেলান যায়, তবে ঐ ব্যক্তির সঙ্গে প্রথম ব্যক্তির চিন্তাগত যোগাযোগ গড়ে তোলা বা পরস্পরের মনের কথা জানতে পারা সম্ভব হতে পারে। ব্যাপারটি সম্পূর্ণই কাল্পনিক। এ ধরনের কোন চিন্তা-তরঙ্গের কথা জানা যায়নি। প্রিফ্রন্ট্যাল লোব (Prefrontal lobe) নামে মস্তিষ্কের একটি অংশ মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের সঙ্গে স্বাভাবিক ও জটিল যোগাযোগের মাধ্যমে, প্রাণীর চিন্তা-বৃত্তি, মেধা, বিচারবুদ্ধি ইত্যাদির জন্য দায়ী—তাই একে 'Organ of mind' বলা হয়। অপুষ্টি ও অন্যান্য নানা রোগে এই অংশের অসম্পূর্ণ বিকাশে মানুষের মেধার পরিপূর্ণ বিকাশ না হতে পারে বা নানা মানসিক অস্বাভাবিকত্ব দেখা দিতে পারে। কিন্তু নানা তরঙ্গের অস্তিত্ব জানার জন্য এত সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি এখন অবিকৃত হলেও, কোন গবেষকই এই অংশ থেকে কোন তরঙ্গের নির্গমন সম্পর্কে তথ্য জানতে পারেন নি। এবং বাস্তবতঃ এই ধরনের তরঙ্গের অস্তিত্ব অসম্ভবও। তাই এই অতি কষ্ট কল্পনার উপর নির্ভর করে কোন 'বৈজ্ঞানিক' ব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব নয়। তবে এটিও ঠিকই যে—অন্যান্য নানা অলৌকিক ঘটনাবলীর মতই,—এ ব্যাপারটি নিয়েও আরো গবেষণা চালান যায়। যদি কোনদিন সত্যিই, এ ধরনের কিছু আবিষ্কৃত হয় তবে তাকে সবাই স্বীকার করে নেবেন। রহস্যময় যদি কিছু সত্যিই ঘটে তবে তার বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব ভিত্তি অবশ্যই আছে, যা হয়তো আমাদের জানা নেই, তাই রহস্য বলে তা মনে হয়, কিন্তু তা অলৌকিক বা কোনদিনই জানা যাবে না এটি ঠিক নয়।]

ইউরি গেলারের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা

ইজরায়েলের ইউরি গেলার 'মানসিক শক্তির' (Psychokinesis) সাহায্যে কিছু কাজ করে বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। এই শক্তির সাহায্যে সে নাকি লোহার চামচ ও চাবি বাঁকিয়ে দিয়েছিল, হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী লোকের সঙ্গে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যোগাযোগ করতে পেরেছিল, খামে পোরা একটি ছবির অনুরূপ ছবি এঁকে ফেলেছিল ইত্যাদি। নিউইয়র্কের ডঃ আন্দ্রিজা পুহারিচ নামে এক ব্যক্তি এই সব ঘটনা নিয়ে 'ইউরি' নামে একটি বইও লিখে ফেল্লেন এবং বল্লেন ইউরি গেলার তার অলৌকিক অতীন্দ্রিয় মানসিক ক্ষমতা পেয়েছে "পৃথিবী থেকে কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত" কোন এক মানস (অর্থাৎ পরমাত্মা) থেকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সব চালাকি প্রকাশ হয়, যখন জেম্‌স্‌ র‍্যাণ্ডি নামে একজন 'দি ম্যাজিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অব ইউরি গেলার' নামে বইটি লেখেন। বইটির নাম থেকে বোঝা যায়, ইউরি গেলার যে সব কাজ করে দেখাত এবং বলত সেগুলি তার অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার পরিচয় নয়, সেগুলি আসলে ছিল ম্যাজিসিয়ান সুলভ কিছু চাতুরী মাত্র। ইন্দ্রিয় বহির্ভূত অবাস্তব কোন শক্তি বা ক্ষমতা যেখানে অস্তিত্বহীন সেখানে ইউরি গেলারেরও এধরনের শক্তি বা ক্ষমতা আদৌ ছিল না তা বলা বাহুল্য। ডঃ কোভুরও ইউরি গেলার-এর ওই সব কাজকর্ম কিছু কিছু করে দেখিয়েছেন। বারবেরা ওয়াল্টার্স নামে এক বিখ্যাত মহিলা সাংবাদিক ইউরি গেলারের অলৌকিক ক্ষমতার উপর একটি টেলিভিশন প্রোগ্রাম করেন। ইনি একবার ডঃ কোভুরের সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্যও আসেন। ঐ সময় ডঃ কোভুর তাঁকে এই ধরনের কিছু ম্যাজিক দেখান, যা ইউরি গেলার করত। তিনি আরো জানালেন যে, ইউরি গেলার তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে চায়নি। বারবেরা ওয়াল্টার্স শেষে মন্তব্য করেন, "ডঃ কোভুর তাঁর ম্যাজিক-গুলোকে ম্যাজিক না বলে যদি একটু ধর্মীয় বা অলৌকিক রঙ চড়িয়ে পাশ্চাত্যে যান তবে বিরাট ধনী হয়ে উঠতে পারবেন।"

☆ ☆ ☆

১৯৭৩ সালের ৩-১৭জুন তারিখের মধ্যে 'সানডে স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় শ্রী এস. কে. ত্রিপাঠী নামে একজন ব্যক্তি তিনটি প্রবন্ধে স্বামী রাম নামে এক যোগীর কথা জানায় যে নাকি তার মানসিকশক্তির দ্বারা একটি লোহার দণ্ডকে বাঁকিয়ে দিয়েছিলো, ক্যান্সার সারিয়েছে ইত্যাদি। একই পত্রিকার মাধ্যমে ডঃ কোভুর তার সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যাপারটির বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রস্তাব দেন। কিন্তু না, অন্যান্যদের মত এও আর কোন যোগাযোগ করেনি।

যাঁরা এই মনোগতিশক্তি (Psychokinesis)-এর কথা বলেন তাঁরা এর প্রকৃত অস্তিত্ব সম্পর্কে সহজেই একটি পরীক্ষা করতে পারেন, একটি ঝুলন্ত পেণ্ডুলামকে এই শক্তির সাহায্যে আন্দোলিত করার ব্যবস্থা করে। এ ধরনের ক্ষমতার যে সত্যিই কোন অস্তিত্ব নেই তা এর সাহায্যে প্রমাণ করা যায়, কিন্তু অন্য সব কিছুর মত অন্ধবিশ্বাসীরা এ ধরনের সহজ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে না।

অজানা ভাষায় কথা বলা

একবার এক তরুণ ডাক্তার ডঃ কোভুরকে জানালেন যে, তিনি পৃথিবীর যে কোন ভাষায় কথা বলতে পারেন। সিংহলে ডাক্তারী পাশ করে মাদ্রাজে ডাঃ রাও নামে বিখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের অধীনে প্র্যাকটিশ করার সময়, তিনি ছ'মাস যোগবিদ্যা শিখেছিলেন। তারপর থেকে নাকি তাঁর এই ক্ষমতা অর্জিত হয়েছে। ডঃ কোভুর তাঁকে প্রথমে আরবী ভাষা বলতে বল্লেন। যেহেতু ডঃ কোভুরের ভাষাটি জানা ছিল না, তাই তরুণটি ইংরেজীতে নিজের কথাগুলো অনুবাদ করে বল্লেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর ডঃ কোভুর হিন্দীভাষা শুনতে চাইলেন। সবিস্ময়ে ডঃ কোভুর শুনলেন তাতে দু'একটি মাত্র হিন্দী শব্দ ছিল। সবশেষে তিনি মালয়ালম অর্থাৎ নিজের মাতৃভাষা শুনতে চাইলেন। তরুণ ডাক্তারটি এবারেও অনর্গল "মালয়লাম" বলে গেলেন। ডঃ কোভুর স্পষ্টই শুনলেন তাতে একটিও মালয়ামল শব্দ ছিল না। ডঃ কোভুর বাধ্য হয়েই তরুণ ডাক্তারটিকে জানালেন যে, তিনি যোগশিক্ষার পর অজানা ভাষা শিখতে পেরেছেন বলে একটি ভ্রান্ত ধারণা এবং সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বিকারেরও শিকার হয়েছেন।

এধরনের অবস্থাকে বলা হয় glossolalia. নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান, প্রেত পূজা ইত্যাদিতে অনেক ভক্ত, সাধু অবতাররাও এধরনের বিকারে ভোগে। যদিও প্রকৃতপক্ষে কোন অর্থবহ ভাষা নয়, তা সত্ত্বেও এরা একটি দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলে ও ভাবে অজানা ভাষায় কথা বলছে। যোগ, মন্ত্র পড়া ইত্যাদির পরে আত্মসম্মোহনের প্রক্রিয়ায় ব্যাপারটি ঘটে। ভিন্ন ভাষার উচ্চারণ পদ্ধতি ও কয়েকটি শব্দ সুকৌশলে অনুকরণ করলে সাধারণ মানুষের বিশ্বাসও অর্জন করা সম্ভব হয়। (দশম পরিচ্ছেদে এ ধরনের আরেকটি ঘটনার ব্যাখ্যা আছে, যেটিকে ভূতের ভর ভাবা হয়েছিল।)

ভূ-সমাধি

১৯৭৩ সালে ভারতের এক চিকিৎসাবিজ্ঞান-সংক্রান্ত পত্রিকায় কোঠারি, বোডিয়া ও গুপ্ত নামে তিনজন 'ডাক্তারের' এক 'গবেষণা পত্র' বেরোয়। এতে তাঁরা জানিয়েছিলেন যে, একজন যোগী মাটির নীচে ৮০ দিন ছিল। ঐ সময় তার হৃদপিণ্ডের তড়িৎ পরীক্ষা (E.C.G.) করে দেখা গেছে যে দ্বিতীয়দিন থেকেই তার হৃদপিণ্ড বন্ধ হয়ে গেছিল। ডঃ কোভুর একটি বিজ্ঞান পত্রিকায় এধরনের অবৈজ্ঞানিক তথ্যপূর্ণ লেখা প্রকাশ করার নিন্দা করে মন্তব্য করেছেন, —"ওই তিন বোকা ডাক্তারের এমন একটু সাধারণ বুদ্ধিও মাথায় এল না যে, যোগীটিকে একটি বায়ুরুদ্ধ কাঁচের আধারের মধ্যে রেখে ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি করা দরকার যাতে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় যে, (মাটির নীচে সবার অলক্ষ্যে) লোকটি সুকৌশলে তার শরীর থেকে বিদ্যুতের তার বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল কিনা। আমি ঐ যোগীকে মাত্র তিনগজ রবারের ফিতে দেব এবং তার নাক-মুখ আচ্ছা করে বেঁধে দেব। এর পর ঐ যোগীটি যদি মাত্র ৬ মিনিট বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়, তাকে আমি একলাখ টাকা পুরস্কার দেব—ঐ যোগী ও তিনজন ডাক্তার এ টাকা ভাগাভাগি করে নিতে পারে।"

রাস্তাঘাটে এ ধরনের ভূ-সমাধি দেখিয়ে বা মাটির ভেতরে মাথাটি বেশ কিছুক্ষণ ঢুকিয়ে রেখে পয়সা ভিক্ষে করতে আমরা অনেকেই দেখেছি। তথাকথিত বিভিন্ন যোগী-ঋষিরা এ ধরনের কাজ ক'রে সেগুলিকে তাদের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় বলে থাকে। বিভিন্ন পত্রিকায় এ ধরনের চাঞ্চল্যকর খবর মাঝে মাঝেই দেখা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা মাটি বা জলের নীচে থাকা নিঃসন্দেহে একটি কষ্টকর ক্ষমতা। তা সাধারণ মানুষের সম্ভ্রমও জাগায়। মাটি বা জলের নীচে থাকার সময় কেউ সুকৌশলে বাইরের সঙ্গে নল দিয়ে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে রাখতে পারে—যা বাইরে থেকে সাধারণভাবে বোঝা যায় না। এছাড়া দীর্ঘকাল অধ্যবসায় ও পরিশ্রম করে, কষ্টকর অনুশীলনের মাধ্যমে শরীরের অক্সিজেন ও খাদ্যের প্রয়োজনকে অস্বাভাবিকভাবে কমিয়ে দেওয়া সম্ভব। যে সব জীবজন্তুরা শীতকালে মাটি বা বরফের নীচে দীর্ঘ-সময়ের জন্য চলে যায় (যেমন ব্যাঙ, সাপ ইত্যাদি) তাদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় ঐ সময় তাদের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস, হৃদ্‌পিণ্ডের কাজ, অক্সিজেন ও খাদ্যের প্রয়োজন অনেক কমে যায়। তথাকথিত হঠযোগীরা ও ম্যাজিসিয়ানরা সুদীর্ঘ প্রচেষ্টায় একই ধরনের ক্ষমতা আয়ত্ত করতে পারে, কেউ কেউ হয়তো জন্ম থেকেই অস্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় অবস্থার জন্য এ ধরনের দক্ষতা অর্জন করে থাকতে পারে, কিন্তু এগুলির মধ্যে কোন ধরনের মন্ত্রতন্ত্র, অলৌকিক বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা ব'লে কিছু নেই—যা রয়েছে তা হল মানুষের দক্ষতারই একটি প্রকাশ।

দেবতার ভর ও ভবিষ্যদ্‌বাণী করার অলৌকিক ক্ষমতা

সিংহলের অনুরাধাপুরের কাছাকাছি এক স্থানে বিমলা নামে এক কিশোরী মেয়ের শরীরে বল্লিদেবীর ভর হয়েছিল। মঙ্গলবার ও শুক্রবার ঢাকঢোল পিটিয়ে বল্লিদেবীর পুজো করা হত আর ঐ সময় বিমলার ভর হত। সে অস্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলত। রোগীদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে কপালে পবিত্র তেল মাখিয়ে দিত—এতেই নাকি রোগীরা সুস্থ হয়ে যেত; বহু ডাক্তার ঘুরেও যারা সারেনি বা যাদের দুরারোগ্য রোগ ধরা পড়েছে, তারা বহু দূর থেকে রোগমুক্তির আশায় বিমলার কাছে আসত। একই সঙ্গে বিমলা অদ্ভুত অদ্ভুত ভবিষ্যদ্‌বাণীও করত। এ সবের জন্য প্রণামী ছিল নাম মাত্র—১৪টি পানপাতায় মোড়া দু'টি টাকা। যারা পারত এর বেশীও দিত—আসলে তা ছিল 'বল্লিদেবীর জন্য প্রণামী'। ভোটের সময় বিমলার কাছে ভীড় বেড়ে যেত—নির্বাচন প্রার্থীরা দলে দলে আসত তাদের নির্বাচনের ফলাফল জানতে।

রোগ নিরাময় করা বা ভবিষ্যদ্‌বাণী জানার জন্য যারা আসত তাদের মধ্যে যাদের কোন উপকার হত না বা কথা মিলত না তারা আর বিমলার কাছে আসত না—বরং ছুটতো আরো 'শক্তিশালী অলৌকিক ক্ষমতার' অধিকারী অন্য কারোর কাছে, আর ঘটনাচক্রে বা কাকতালীয়ভাবে যে দু'চারজনের ক্ষেত্রে কাজ হত তাদের কথাটাই আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ত,—এ দিকটিরই প্রচার হত বেশী।

বিমলার খ্যাতি ক্রমশঃই বেড়ে চলে। বল্লিদেবীর পূজার বেদী তৈরী হল। কর্পূর পোড়ানোর সাজসরঞ্জাম আনা হল। ঢাকী, পুরোহিত, শাঁখ ইত্যাদির সংখ্যা বাড়ান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হল। অসুস্থদের মাথায় মাখানর জন্য পবিত্র তেলের কারখানা তৈরী হল। বল্লিদেবীর বাঁধান ছবি রাখা হল বিমলার সামনে। বিমলার ভর বা আবেশের মাত্রাও বাড়তে থাকল—বাড়তে থাকল অন্ধ ভক্তের ভীড়।

সিংহল র‍্যাশন্যালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের শ্রীফার্নাণ্ডো বিমলার মা-বাবাকে চিনতেন। তিনি ওঁদের বোঝালেন যে, ব্যাপারটা বল্লিদেবীর ভর আদৌ নয়, আসলে মেয়েটি একটি মানসিক রোগ, হিস্টেরিয়ায় ভুগছে। খুব তাড়াতাড়ি ওর চিকিৎসা না করালে ও পুরো পাগল হয়ে যাবে। এদিকে নিজের বাপ-মা ও অসংখ্য নির্বোধ ভক্তকে হতাশ করে, ১৯৬৪ সালের ১৯শে এপ্রিল তারিখে বিমলাই হঠাৎ জানাল যে, সে আর বল্লিদেবীর হয়ে কাজ করতে পারবে না, অন্যান্য স্বাভাবিক মহিলার মত সে জীবনযাপন করতে চায়।

ডঃ কোভুর পুরো ব্যাপারটির অনুসন্ধান করেন। জানা গেল বছর দশেক আগে দশ বছর বয়সে বিমলা স্কুলে একবার হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যায়। প্রথমে বদহজম ইত্যাদিকে কারণ হিসাবে বললেও দু'মাস পরে বিমলা আবার অজ্ঞান হয়ে গেলে ডাক্তার একজন মনোরোগবিশেষজ্ঞের কাছে বিমলাকে পাঠালেন। ইনি বিমলার মস্তিষ্কের ক্রিয়ার তড়িৎ বিশ্লেষণ (E.E.G.) ইত্যাদি পরীক্ষা করে কিছু ঘুমের ওষুধ দিলেন। বিমলা বেশ ভালই ছিল, কিন্তু কয়েকমাস পরে ওর আবার ফিট হল। তখন বিমলার বাবা-মা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গে পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন যে, কোন দেবতা বা অপদেবতার আত্মার ভর হয়ে বিমলার এরকম ফিট হচ্ছে। তাই ডাক্তার দেখিয়ে আর সময় নষ্ট না করে ঝাড়-ফুঁক, যাগযজ্ঞ করে এই আত্মাকে তাড়ানর ব্যবস্থা করা হল। এর পরও ফিট্ হল এবং সঙ্গে বিমলা অসংলগ্ন অদ্ভুত অদ্ভুত কথাবার্তা বলতে শুরু করল। তার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হল। কয়েকজনের পরামর্শে তাকে পুত্তালাম জেলার পাহালাগামায় বল্লিদেবীর মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হল ; ওখানে পুরোহিতরা তিন দিন ধরে বিশেষভাবে পুজো করল—খরচ হয় বেশ কয়েক শ' টাকা। কিন্তু তৃতীয় দিন পুজোর সময় বিমলা হঠাৎ উন্মাদনৃত্য শুরু করল এবং আবিষ্ট অবস্থায় জানাল—সে হচ্ছে বল্লিদেবী, পাহালাগামার মন্দিরের অবস্থা ভাল নয়, তাই তিনি আর এখানে না থেকে বিমলার শরীরেই থাকবেন বলে ঠিক করেছেন। মন্দিরে পুরোহিতদের ব্যবসা বন্ধ হল, ছড়িয়ে পড়ল বিমলার খ্যাতি। বিমলা তথা দেবী বল্লি জানাল বাড়ীতে তার পূজা করতে।

ঢাক-ঢোল-কাঁসর ঘন্টা বাজিয়ে বিমলার বাড়ীতে প্রতিদিন বল্লিদেবীর পুজো হতে লাগল এবং পুজোর সময় প্রতিদিনই বিমলার ভর হতে থাকল। কিন্তু প্রতিদিন ভর হওয়াটা বিমলার পক্ষে কষ্টকর হওয়ায় পরে প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার পূজা ও বিমলার ভর হওয়ার ব্যবস্থা করা হল। অজস্র সরল বিশ্বাসী মানুষ রোগমুক্তির আশায় বা ভাগ্য জানতে বিমলার কাছে আসতে লাগল। টানা দশ বছর ধরে চলে এ ব্যবসা। বিমলার বাবা বেশ ধনী হয়ে উঠলেন। অবশেষে বিমলারই একান্ত অনুরোধে সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপার বন্ধ হল। এর পরেও দু'একবার বিমলার ফিট হয়েছিল— কিন্তু বল্লিদেবীর কথাবার্তা আর সে বলেনি। ডঃ কোভুর তাকে সম্মোহিত করে জানতে পারলেন যে, বিমলা বিয়ে করতে ও পড়াশুনা করতে চায়। ডঃ কোভুর সম্মোহন চিকিৎসা (hypnotherapy) -র মাধ্যমে তাকে বোঝালেন যে, বল্লিদেবী তথা কোন দেবতা-অপদেবতার অস্তিত্ব নেই, তাই তাদের ভর করার কোন ব্যাপার হওয়া সম্ভব নয়। ডঃ কোভুরের নির্দেশাদির পর বিমলা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে—ওর আর ফিট হয়নি।

বিমলা প্রথমে ছিল হিস্টেরিয়ার রোগী। মনোরোগবিশেষজ্ঞের কাছে ঠিকমত চিকিৎসা করালে ও হয়তো সুস্থ হয়ে উঠতো। কিন্তু তা না করে বাড়ীর লোকেরা যখন তার ওপর দেবতা বা অপদেবতার ভরের কথা বলল তখন তার নিজের মনে ছোটবেলা থেকেই শেকড় গাড়া বদ্ধমূল ভ্রান্ত বিশ্বাসের ফলে সে ঐ সম্মোহনী প্রস্তাব (suggestion) -এর শিকার হল। এর ফলে তার মানসিক রোগটি আরো জটিল হয়ে ওঠে। সেও নিজেকে বল্লিদেবী বলে ভাবতে শুরু করল। আবিষ্ট অবস্থায় নানা রকম অদ্ভুত অদ্ভুত কথাবার্তা বলতে লাগল, আর সরলবিশ্বাসী মানুষ দুরারোগ্য রোগ সারানর আশায় তার কাছে আসতে থাকল।

দু'একটি ক্ষেত্রে বিমলা হয়তো সফল হয়। এর মূলে বল্লিদেবীর কোন মাহাত্ম্য নেই, যা আছে তা হল সরলবিশ্বাসী ভক্তের মানসিক জোর এবং হয়তো বা তার মালিশ করার তেলের ক্রিয়া। কোন ভবিষ্যদ্‌বাণীও তার পক্ষে অলৌকিকভাবে করা সম্ভব নয়। আন্দাজে বলা অনেক কথার মধ্যে দু'একটি কাকতালীয়ভাবে মিলে গেলে সেটিকে নিয়েই হৈচৈ হয়েছে। যদি সত্যিই অলৌকিক ক্ষমতায় কেউ রোগ সারাতে পারত তবে কয়েক বছরের মধ্যেই তার অলৌকিক চিকিৎসা ব্যবসা বন্ধ হওয়ার কথা নয়-এবং বড় বড় হাসপাতালের শিক্ষিত ডাক্তারদের তাড়িয়ে, তাকেই ঐ পদে বসান হত স্থায়িভাবে। অলৌকিক ক্ষমতায় ভবিষ্যদ্‌বাণী করার ব্যাপারটাও তাই। যদি সত্যিই কারোর এ-ক্ষমতা থাকে তবে সে রেসের আগে কোন্ ঘোড়া জিতবে, লটারিতে কোন্ টিকিটে প্রথম পুরস্কার উঠবে ইত্যাদি আগেই জানতে পেরে এই ধরনের জুয়ার সাহায্যে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ধনী লোক হয়ে উঠতে পারত—পান-পাতায় মোড়া দু'টাকার প্রণামী অথবা এইভাবে চালাকি করে ব্যবসা চালানোর তার কোন দরকারই হত না।

[এই বিমলার মত আরো অনেক মানসিক রোগী বা ধাপ্পাবাজদের কথা প্রায়ই এদিক ওদিক শুনতে পাওয়া যায়। কিছুদিন আগে বীরভূম জেলার রামপুরহাটের কাছে এক গ্রামে এ ধরনের এক শিশু বেশ খ্যাতি লাভ করে—সে-ও নাকি দুরারোগ্য রোগ সারাতে পারত। এখন ওর ব্যবসা পড়ে গেছে। উত্তর ২৪-পরগনার কামদেবপুরে তথাকথিত আরেক ফকির বাবাও নাকি তার 'অলৌকিক' ক্ষমতাবলে এক বিখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেত্রীর লিউকেমিয়া (?) রোগ পর্যন্ত সারিয়েছিল। এই ফকির বাবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকৃত নাম সূর্যকুমার মাইতি—এক সময় দুধ বিক্রি করত, পরে সুকৌশলে ফকিরবাবা সেজে বাড়ী-গাড়ীর মালিক হয় এবং অনুসন্ধানে দেখা গেছে ঐ লিউকিমিয়া সারানর ব্যাপারটিরও আদৌ কোন ভিত্তি নেই। (বর্তমানে এরও ব্যবসা প্রায় বন্ধ।) আর যদি আদৌ এ-ধরনের কোন ঘটনা বাস্তবে ঘটেও থাকে তবে তা কোন অলৌকিক শক্তি বা দেবমাহাত্ম্যে সম্ভব নয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি গাছগাছড়ার কোন ওষুধ বা অন্য কোন দ্রব্য প্রয়োগ করে থাকলে তার ফলেই কোন রোগের নিরাময় ঘটে থাকতে পারে। এছাড়া অন্ধবিশ্বাস জনিত রোগীর অভূতপূর্ব মানসিক অবস্থাও অনেক সময় রোগকষ্ট লাঘবে কাজ করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই মানসিক বিশ্বাসের দ্বারা বহু রোগের লক্ষণ দূর করা বা সৃষ্টি করা সম্ভব। এর কার্যপ্রণালী অনেকটা সম্মোহন চিকিৎসারই মত।]

অলৌকিকভাবে রোগ সারানর আরো কিছু উদাহরণ

১৯৪৭ সালে কলম্বো শহরের জনৈক শ্রীরামনাথনের মেয়ে সরস্বতীর প্রচন্ড মানসিক বৈকল্য দেখা দিল। প্রথমে হল মাথার যন্ত্রণা, তারপর তা কমে গিয়ে শুরু হল খবরের কাগজের একটা শব্দের দিকে তাকিয়ে থাকার ম্যানিয়া। আপনমনে কথা বলে, মাঝেমাঝে হাসতে থাকে। সঙ্গে মানসিক হতাশা। খিদেও চলে গেছে। পড়াশুনো আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—বিয়ের কথা চলছিল। মাঝখান থেকে রোগটি হয়ে সব বানচাল হয়ে গেল।

সরস্বতীর দাদা ডঃ কোভুরের পরিচিত। তার অনুরোধে ডঃ কোভুর মেয়েটিকে দেখে জানালেন যে, বিয়ে দিয়ে দিলে ওর এ ধরনের মানসিক অস্বাভাবিকত্ব দূর হয়ে যাবে। কিছু শ্রীরামনাথন তাঁর এক বন্ধুর পরামর্শে এক বিখ্যাত সাধুর সাহায্য নিলেন। সাধুটি নাকি তার অলৌকিক ক্ষমতাবলে একজন নিখোঁজ ব্যক্তিকে খুঁজে দিয়েছিল।

একদিন সাধুটি এল। গেরুয়া বসন, কপালে চন্দনের ফোঁটা, মাথায় পাকান জটা, লম্বা দাড়ি। সরস্বতীকে দেখে সাধুটি জানাল যে, মেয়েটির এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে মেয়েটিকে তুক করেছে। কোন তরল খাবারের মাধ্যমে সে মন্ত্র পড়ে তাকে বিষ দিয়েছে। সর্পপূজা করলে এ বিষ কেটে যাবে। সরস্বতীর মা এক আত্মীয়ার কথা জানালেন যিনি তাঁদের ছেলের চাকরি ও অন্যান্য উন্নতি দেখে ঈর্ষাপরবশ হয়ে এ কাজ করতে পারেন।

নির্দিষ্ট দিনে সর্পপূজার আয়োজন করা হল। সাধুটি বসল পদ্মাসনে। সামনে কলাপাতায় নারকেল তেলের প্রদীপ, ধুনো, তাম্রপাত্র, তন্ডুল, মুড়ি, ফল, ফুল ইত্যাদি আর একটি মাটির বাটিতে দুধ। সাধুটি তার ঝোলা থেকে সর্পাকৃতি একটি লাঠি বের ক'রে দুধের বাটিতে ঠেস দিয়ে রাখল, সরস্বতী বসল সাধুর সামনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর সাধুটি নানাবিধ সংস্কৃত মন্ত্র পড়তে শুরু করলো। অবশেষে তার দেবতা যে বাণী পাঠিয়েছে সেটি কাগজে হিজিবিজি করে লিখতে শুরু করল। ধুনোর ধোঁয়ার চারিদিক অন্ধকার, মন্ত্রের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই, -সবাই মোহিত। এমন সময় সাধুটি জানাল যে এবার সরস্বতীর পেট থেকে বিষ বের করান হবে।

প্রায় ৩০ ইঞ্চি লম্বা দড়ির একটি প্রান্ত দুধের বাটিতে ডুবিয়ে রেখে আরেকটি প্রান্ত সরস্বতীকে কামড়ে রাখতে বলা হল। উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র পড়তে পড়তে সাধু ধুনুচিটি সরস্বতীর চারপাশে তিনবার ঘোরালো। সর্পাকৃতি লাঠিটিকে সরস্বতীর মাথায় ও দুধের বাটিতে ছোঁয়ানো হল। সবাই সবিস্ময়ে দেখল ধীরে ধীরে বাটির দুধের রঙ নীল হতে শুরু করেছে; পাঁচ মিনিট পরে যখন দুধের রঙ ঘন নীল হয়ে গেছে তখন সাধুটি জানাল যে, সরস্বতীর পেট থেকে মন্ত্রপূত বিষটির সবটুকু বের করে দেওয়া হয়েছে। সরস্বতীর বাবা-মা ভক্তি গদ্‌গদ চিত্তে সাধুর ঝোলায় পঞ্চাশ টাকা প্রণামী দিয়ে দিলেন,—অবশ্য সাধুটি বলেছিল পঁচিশ টাকা দিতে এবং সে নিজের হাতে টাকা ছোঁবে না (পরে টাকাটা খরচ করার সময়ও তা ছোঁবে কিনা তা অবশ্য জানায় নি)। এর পর সাধুটি নির্দেশ দিল—তিন আঙ্গুলে যতটা গোবর ধরবে তা নিয়ে দুধের বাটিতে ফেলতে হবে, তারপর বাগানের মধ্যে একটি গর্ত করে, নীলবর্ণ দুধের বাটিটি দু'হাতে নিয়ে পশ্চিমদিকে মুখ করে ও সূর্যের দিকে তাকিয়ে সবটুকু দুধ ও মাটির পাত্রটি ঐ গর্তে ফেলে দিয়ে পাত্রটি ভেঙে ফেলতে হবে—তারপর মাটি চাপা দিতে হবে। সাধুটি চলে গেল।

এদিকে বাড়ীর চাকর বাটিটি নিয়ে বাগানের দিকে যাওয়ার পথে সরস্বতীর দাদা গোপনে তার কাছ থেকে বাটিটি উদ্ধার করে তালাচাবি দিয়ে একটা আলমারিত রেখে দিল। আর, ডঃ কোভুরকে খবর দিয়ে বাটিটি পরীক্ষা করতে বলল। ডঃ কোভুর বাটিটির দুধ অন্য একটি পাত্রে ধীরে ধীরে ঢাললেন এবং দেখা গেল বাটির তলায় একটি কালির বড়ির ছোট্ট টুকরো তখনো রয়েছে। অর্থাৎ আসলে 'সাধুটি' সবার অলক্ষ্যে কালির একটি বড়ি বাটিতে ফেলে দিয়েছিল এবং এর ফলেই দুধ নীলবর্ণ হয়েছে—কোন অলৌকিক কারণে নয়। গোবর ফেলা, সূর্যের দিকে মুখ করে বাটিটি চাপা দেওয়া ইত্যাদিগুলি আসলে কালির বড়িটি যাতে কেউ না দেখে ফেলে তারই প্রচেষ্টা মাত্র। ডঃ কোভুর জানালেন শুধু এই সাধুটি নয়, -পৃথিবীর সর্বত্রই, যারা এই ধরনের 'অলৌকিক' কাজ করে দেখায়, আসলে সে সব কাজ তারা এই ধরনের নানা চালাকির সাহায্যেই করে থাকে।

শ্রীরামনাথন এরপর খুঁজে খুঁজে সাধুটিকে পাকড়াও করেন এবং এই সব ঘটনা জানিয়ে ও পুলিশের ভয় দেখিয়ে প্রণামীর ৫০ টাকা ফেরত নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অলৌকিক চিকিৎসা—যীশুখ্রীষ্টের গায়ের পেরেক, দলাইমামার পায়খানা ইত্যাদি.......

শ্রীলংকার কুদাগামার এক গীর্জার যাজক একবার ঘোষণা করে যে, যীশুখ্রীষ্টকে যেসব কাঁটা বেঁধান হয়েছিল তার একটি ওর কাছে রয়েছে। এর সাহায্যে আলৌকিকভাবে বহু দুরারোগ্য রোগ সে সারাতে পারে। শত শত হতাশ লোক তার কাছে ভীড় করে। দু'একজন হয়তো ফলও পেয়েছে—কিন্তু তা নিছকই কাকতালীয় অথবা তাদের অন্ধ বিশ্বাস প্রসৃত মানসিক জোরের কারণে। সাধারণ কাঁটাকেই চালাকি করে যীশুখ্রীষ্টের কাঁটা বলে সরলবিশ্বাসী ভক্তদের মধ্যে প্রচার করা হয়েছে। ডঃ কোভুর মন্তব্য করেছেন, "যদি এই তথাকথিত কাঁটাটি বদল করে জঙ্গলের কোন কাঁটাকে রাখা হয় এবং সরল ভক্তরা ব্যাপারটা না বুঝতে পারে, তাহলেও দেখা যাবে ভক্তরা একই ফলাফল লাভ করছে"।

একইভাবে প্রচার করা হয় যে, সাঁইবাবার ছাই, তিব্বতে দলাই লামার পায়খানা ইত্যাদিও নাকি অলৌকিকভাবে রোগ সারায়। দলাই লামা নাকি বুদ্ধের অবতার। এক সময় তার পায়খানা বড়ি করে হতদরিদ্র, অসহায়, অশিক্ষিত ও সরলবিশ্বাসী তিব্বতীদের দেওয়া হত। অতীতে আধুনিক চিকিৎসার কোন সুযোগ এদের ছিল না। তারা সরল এক সময় বিশ্বাসে না জেনে দলাই লামার পায়খানাই খেত ওষুধ জ্ঞান করে। দলাই লামা নিজের অসুখ করলে অবশ্যই কখনো নিজের পায়খানা ওষুধ জ্ঞান করে খেত না। পরে দলাই লামা ভারতে স্বেচ্ছা নির্বাসিত অবস্থায় পালিয়ে এলে তার পায়খানার 'অলৌকিক ক্ষমতা' চলে গেছে। এখানে তার পায়খানার বাজার একেবারেই নেই,—আধুনিক তিব্বতও দলাই লামার মল-এর পরিবর্তে আধুনিক চিকিৎসার সাহায্য নিচ্ছে। ভারতে অবশ্য সাঁইবাবার ছাই বা এই ধরনের অন্যান্য বুজরুকদের নানা হাবি-জাবি'র বাজার এখনো রয়েছে।

যেমন বেশ কয়েকবছর আগে কেরালার চেঙ্গান্দর-এর কালী মন্দিরের পুরোহিত বেশ আর্থিক অসুবিধেয় পড়েছিল। তখন সে ঘোষণা করল যে, তার মন্দিরের কালী ঠাকুরের প্রতিমাসে মাসিক রক্তস্রাব হচ্ছে—এই রক্তে ভেজা ন্যাকড়া বহু রোগ সারিয়ে দেবে। আসলে সে তার স্ত্রী ও মেয়ের মাসিক ঋতুস্রাবের সময় ব্যবহৃত ন্যাকড়াগুলিই খন্ড খন্ড করে নির্বোধ ও অজ্ঞ ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করত আর এইভাবে প্রচুর অর্থ ঐ পুরোহিত উপার্জন করেছে। বেশ কয়েকবছর এ ব্যবসা চলে।

আসলে অলৌকিক গাছের কাঁটা, পবিত্র ক্রশ, পবিত্র জল, পবিত্র ছাই, লামার পায়খানা, পবিত্র গাভী, লিঙ্গ, মাদুলি, পূজা, তীর্থ, প্রার্থনা ইত্যাদি সব কিছুই অন্ধবিশ্বাসী ভক্তদের কাছে একই অর্থ ও ফলাফল প্রকাশ করে। দৈনন্দিন জীবনে নিশ্চয়তাহীন, সমাজের নানা শোষণে বা অত্যাচারে অসহায়, রোগকাতর মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপাত শান্তিলাভের আশায় ও মানসিক জোর অর্জনের জন্য এ সবকিছুকে আঁকড়ে ধরে অবলম্বন হিসাবে এবং দুর্দশার সমাধান খোঁজার অক্ষম চেষ্টা করে।

আগুন খাওয়া, নাড়ী বন্ধ করে রাখা ইত্যাদি

মান্ডাইতিভূ গ্রামটি শ্রীলংকার মূল ভূখন্ড থেকে সমুদ্রের একটি ফাঁড়ি দিয়ে আলাদা করা। ১৯৩২ সালে এপ্রিল মাসের ছুটিতে সামুদ্রিক গাছপালা সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে ডঃ কোভুর ওখানে কয়েকদিন ছিলেন।

ওখানে গিয়ে ডঃ কোভুর শুনলেন একটি বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করা হচ্ছে, কারণ, বেশ কয়েকদিন ধরে নাকি এক প্রেতাত্মার আবির্ভাব ঘটেছে। একদিন এক মহিলা রাত্রে তাঁর রান্নাঘরের পেছনের উঠোনে কি কাজে বেরিয়েছিলেন, এমন সময় দেখেন দূরে এক নারকেল গাছের নীচে এক মহিলা তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তিনি আত্মবিস্মৃত হয়ে তার পেছন পেছন কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ সে মিলিয়ে গেল। কয়েকঘন্টা পরে ভদ্রমহিলা তাঁর স্মৃতি ফিরে পান এবং তারপরেই প্রলাপ বকতে শুরু করেন। এর কয়েকদিন পরে তাঁর ভাই তামাকের ক্ষেত থেকে রাত্রে ফিরছিল। এমন সময় রাস্তার ধারে এক অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়ে তাকে তার বাড়ীতে পৌঁছে দিতে বলে। কিছুদূর যাওয়ার পরই সে মেয়েটিকে আর দেখতে পায় না। ভয় পেয়ে ছেলেটি ছুটে বাড়ী পালিয়ে আসে ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে। আরেক রাত্রে গ্রামের একটি মেয়ে বাড়ীর উঠোনে একটি কুকুর দেখতে পায় ও কুকুরটিকে ঢিল ছোঁড়া মাত্র কুকুরটি মিলিয়ে একটি ভয়ংকর মূর্তির আবির্ভাব ঘটল।

[আসলে এ সবই ঘটেছে illusion a hallucination -এর ফলে। প্রথম ক্ষেত্রে মহিলাটি রাত্রের আলো-আঁধারিতে, হয়তো বা ঘুমের ঘোরে, কোন কিছুকে দেখে সম্মোহিত হয়ে কিছুদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর সম্বিৎ ফিরে এলে স্বাভাবিকভাবেই কাউকে দেখতে পাননি; কিন্তু ভয় পেয়ে গেছেন। এইটি ফলাও করে প্রচার করার পর আশে পাশের লোকেরাও তাদের আজন্মলালিত প্রেতাত্মার বিশ্বাসের প্রভাবে, চক্রবৃদ্ধিহারে 'ভূতের' দেখা পেতে থাকে।]

পরপর এ সব ঘটনায় সন্ত্রস্ত হয়ে নাল্লব নামে এক বিখ্যাত যোগীকে স্থানীয় মানুষ ডেকে আনে প্রেতাত্মাটি দূর করার জন্য। যজ্ঞের আয়োজন করা হল। এর জন্য সবার কাছ থেকে চাঁদা নেওয়া হল। ডঃ কোভুর অবশ্য দেননি। তিনি জানালেন, অস্তিত্বহীন আত্মাকে দূর করার জন্য অর্থব্যয় করতে তিনি রাজী নন, তবে যজ্ঞানুষ্ঠানটি একবার দেখতে চান।

নির্দিষ্ট দিনে একটি ত্রিপলের ছাউনির নীচে খোলা জায়গায় যজ্ঞ শুরু হল; গলায় তিনগাছা রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে ছাই মাখান, দাড়িওয়ালা গম্ভীর যোগী আসনে বসলো। তার সামনে তামার প্রদীপ জ্বলছে আর ছোট ছোট অসংখ্য পাত্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুল-ফল, নানাবিধ শস্য এবং আরো অনেককিছু। যোগী এক ঘন্টা ধরে সংস্কৃত ও তামিল ভাষায় মন্ত্র পড়ল।

এর পর তার এক শিষ্য জ্বলন্ত কর্পূরের একটি টুকরো যোগীর প্রসারিত জিভের উপর রাখল। যোগীর মুখের ভেতর কয়েক মুহূর্ত লকলকে আগুনের শিখা দেখা গেল—তারপর যোগীটি তা ফেলে দিল। এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে সমবেত দর্শক-ভক্তরা সমস্বরে বললো, 'হরি হরোহর'।

তারপর যোগীটি পদ্মাসনে বসে যেন প্রায় ধ্যানমগ্ন হল এবং এক সময় সবাইকে ডেকে জানাল তার নাড়ী বন্ধ হয়ে গেছে। অনেকেই পরীক্ষা করে দেখল, ঠিকই। ডঃ কোভুরও পরীক্ষা করলেন—দেখলেন যোগীর নাড়ী ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল, প্রায় পাঁচমিনিট পরে আবার নাড়ী পাওয়া গেল। আবার আওয়াজ উঠল 'হরি হরোহর'।

এরপর নারকেলের শুকনো ছিবড়ে জ্বালিয়ে তার ওপর একটি সসপ্যান জাতীয় পাত্র বসান হল আর পাঁচ ধরনের তেল এই পাত্রে ঢালা হল। তেল যখন ফুটছে ঐ সময় তিনটে লেবু কেটে তার রস তেলের সঙ্গে মেশান হল। যোগীটি জানাল যারা অপদেবতার প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে চায় তারা যেন একে একে তার কাছে আসে। গ্রামের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি প্রথমে এলেন। সবাই বিস্মিত হয়ে দেখল, যোগী ঐ ফুটন্ত তেলে একটু ফুঁ দিয়ে নিজের ডান হাতের আঙ্গুল ছুঁইয়ে দিল ও দ্রুত আঙ্গুল তুলে নিয়ে ঐ বৃদ্ধের কপালে ঘষে দিল। এক একবার ফুটন্ত তেলে হাত দিয়ে সে পাঁচ-ছয়জনের কপালে তেল ঘষে দিত থাকল। পরের দিক পুরো হাতটাই ফুটন্ত তেলে ডুবিয়ে দিতে লাগল। এই অলৌকিক কান্ড দেখে সবাই আওয়াজ দিল 'হরি হরোহর'।

এরপর যোগীটি একটি মসৃণ ভাবে চাঁছা নারকেল বের করে কায়দা করে বসাল। তার মাথায় বসাল সাতটি ছোট ছোট কড়ি এবং জানাল গ্রামে একটি দু'টি নয়, সাত সাতটি অপদেবতার আবির্ভাব ঘটেছে, তাই এই সাতটি কড়ি। নিজের বোতল থেকে পবিত্র জল সে ঐ কড়িগুলির উপর ফোঁটা ফোঁটা ঢালতে লাগল এবং বলল যে, যদি কড়িগুলো পড়ে যায় তবে বুঝতে হবে অপদেবতারা চলে গেছে, কিন্তু যদি কোন কড়ি না পড়ে তবে বুঝতে হবে এ অপদেবতাটি এখনো থেকে গেছে। মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ধীরে ধীরে ফোঁটা ফোঁটা পবিত্র জল কড়ির উপর ঢালতে লাগল। আর সবাই সবিস্ময়ে দেখল প্রাণহীন কড়িগুলি যেন মন্ত্র আর পবিত্রজলের প্রভাবে প্রাণ পেয়ে ধীরে ধীরে নারকেলের গা বেয়ে পড়তে লাগল। একে একে সবগুলি যখন পড়ে গেল তখন যোগীটি জানাল গ্রাম থেকে সব অপদেবতা চলে গেছে। আবার আওয়াজ উঠল 'হরি হরোহর' এবং 'অপদেবতাদের প্রভাবমুক্ত' সন্তুষ্ট গ্রামবাসীরা যোগীকে প্রচুর উপঢৌকন ও ৫০১ টাকা প্রণামী দিয়ে ভক্তিগদগদচিত্তে বিদায় দিল।

যুদ্ধজয়ের হাসি হেসে গ্রামবাসীরা ডঃ কোভুরকে জিগ্যেস করল এতসব অলৌকিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কান্ড দেখে তাঁর আর অবিশ্বাস আছে কি না। ডঃ কোভুর বললেন, পরের দিন তিনি নিজেই এই সব 'অলৌকিক' কাজ করে সবাইকে দেখাবেন। পরের দিন বিকেল ৫টা, গ্রামবাসীরা সবাই জড়ো হয়েছে। একে একে ডঃ কোভুর নিজের মুখের ভেতর লকলকে কর্পূরের আগুন গ্রহণ করলেন, দীর্ঘক্ষণ নিজের নাড়ী বন্ধ করে রাখলেন। যোগীটির মত একইভাবে ফুটন্ত তেলে হাত ডোবালেন এবং সবশেষে একটি মসৃণ নারকেলের ওপর, সমুদ্র সৈকত থেকে ঐদিনই সংগ্রহ করা ৭টি কড়ির উপর দু' এক ফোঁটা জল ঢেলে সেগুলিতে 'প্রাণ' দিলেন; কড়িগুলি সচল হয়ে নারকেলের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। উপস্থিত গ্রামবাসীদের মুখে আর আওয়াজ নেই। তারা ধরে দিল ডঃ কোভুরেরও অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে।

তখন ডঃ কোভুর ওই সব অলৌকিক কান্ডগুলিকে একে একে ব্যাখ্যা করলেন। কর্পূর প্রচন্ড উদ্বায়ী (volatile) জিনিস, তাই এটি ভীষণভাবে জ্বলনশীল। যোগী ও কোভুর—দু'জনকেই জ্বলন্ত কর্পূর জিভের ওপর নেওয়ার আগে লালা দিয়ে ঠোঁট ও জিভ ভালভাবে ভিজিয়ে নিতে হয়েছিল। তারপর কর্পূর জ্বালিয়ে জিভে নেওয়ার পর ক্রমাগত ফুঁ দিয়ে যেতে হয়েছে যাতে জ্বলন্ত কর্পূরের সামান্য অংশও শ্বাসনালীতে না যায়। প্রচন্ড উদ্বায়ী কর্পূর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে গেছে। কিন্তু ভুল করে ঐ কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যদি একবারও শ্বাস নেওয়া হত তবে তা ঐ 'যোগীপুরুষ' বা ডঃ কোভুর— দু'জনের পক্ষেই হত মারাত্মক ও প্রাণঘাতী।

ফুটন্ত তেলের তাপমাত্রা অনেক বেশী—ফোস্কা না ফেলে তাতে হাত দেওয়া যায় না। কিন্তু লেবুর রস দেওয়ার ফলে কিছু জল তাতে মেশান হল এবং যতক্ষণ ঐ জল থাকবে ততক্ষণ তার তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের ওপরে উঠবে না,-বরং কিছুটা কমেও যাবে। এ অবস্থায় তেলে একটু ফুঁ দিয়ে তাতে আঙ্গুল ছোঁয়ানটা কষ্টকর নয়। শুধুমাত্র মুহূর্তের জন্য ছোঁয়ানর ফলে ফোস্কা ইত্যাদিও পড়ে না। (বাড়ীর গিন্নীরাও এইভাবে গরম কিছু জিনিসকে দ্রুত তুলে ফেলেন। যাঁরা হুঁকোয় তামাক খান তাঁরাও জ্বলন্ত কাঠকয়লা হাতের চেটোয় নিয়ে নাড়িয়ে নাড়িয়ে কল্কিতে তোলেন—ফলে ফোস্কা পড়ে না।) বাঁ হাতে ঘষে নেওয়ার ফলে কাজটা আরো সহজ হয়। পরে ধীরে ধীরে তাপটা সয়ে গেলে পুরো হাতটাই ডোবানো যায়—ততক্ষণে তেলের তাপমাত্রাও কমে যায়।

সমুদ্রের কড়ি ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে তৈরী। যোগীপুরুষটি বা ডঃ কোভুর দুজনেই পবিত্র জলের নাম করে যা ওদের ওপরে ঢেলেছিলেন তা আসলে ছিল পাতলা করা লেবুর রস—সাইট্রিক অ্যাসিড। কড়ির ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সঙ্গে এই অ্যাসিডের ক্রিয়ায় কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈরী হয়। ছোট্ট ছোট্ট বুদ্বুদের আকারে এই গ্যাস কড়ির নীচে সৃষ্টি হয় এবং ক্রমাগত ফাটতে থাকে, যা কাছে গিয়ে খুব ভাল করে না দেখলে বোঝা যাবে না; এরই ফলে কড়িগুলি নড়াচড়া করতে থাকে এবং নারকেলের চকচকে গা বেয়ে নীচে নামতে থাকে। এসব ঘটনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনকিছুর মধ্যে কোন ধরনের অলৌকিকত্ব বা অপদেবতার ব্যাপার নেই—যা আছে তা নিছকই ম্যাজিসিয়ানসুলভ চালাকি বা হাত সাফাই।

[কয়েক মিনিট নাড়ী বন্ধ করে রাখার ব্যাপারটা ডঃ কোভুর তাঁর কোন বইয়েতে কোথাও ব্যাখ্যা করেননি। সম্ভাব্য ও সহজ একটি পদ্ধতি এইরকম। আমাদের বগলের পাশ দিয়ে ও বাহুর ভেতরের দিক দিয়ে হাতের প্রধান ধমনীটি (Brachial artery) নীচের দিকে নামে এবং কনুই-এর কাছে দ্বিধাবিভক্ত হয়। এর বাইরের ভাগটিকেই (Radial artery) কব্জির একটু ওপরে পুরোবাহুর বাইরের হাড় রেডিয়াস-এর সামনে নাড়ী হিসেবে অনুভব করা হয়। শ্মশ্রুগুম্ফযুক্ত অথবা চাদর বা জামাকাপড় গায়ে অথবা খালিগায়েই কেউ যদি কৌশলে বগলের ভেতরে কাপড়ের ছোট্ট পুঁটলি বা পাথরের টুকরো ইত্যাদি লুকিয়ে রাখে এবং ধীরে ধীরে বাহুকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে, তবে একসময় স্থানীয় ধমনীটি (Brachial artery) বন্ধ হয়ে যাবে—ফলতঃ Radial artery- তেও আর নাড়ী পাওয়া যাবে না। কিছুদিন অভ্যাস করলে সবার চোখে ধুলো দিয়ে যে কেউ এভাবে 'নাড়ী বন্ধ' করার খেলা দেখাতে পারবেন।]

পায়ে পেরেক বিঁধিয়ে ঝোলা

AMARBOI.COM

অনেক ভক্ত বিভিন্ন ধর্মীয় মেলায় (যেমন চড়কের সময়) বা অন্য উৎসব উপলক্ষে দু'পায়ে বা গায়ে পেরেক ফুটিয়ে শূন্যে ঝুলে থাকে। অলৌকিক ক্ষমতাবলে বা দেবতার বরে এ সম্ভব হয় বলে সরল ভক্তরা মনে করেন। এ ধরনের ভক্তদের শ্রীলঙ্কায় কাবাডি (Kabadi) বলে। ডঃ কোভুর একজন মেডিক্যাল ছাত্রের কথা বলেছেন, যে নাকি অনুসন্ধান করে মন্তব্য করেছে যে, এইভাবে ঝুলে থাকা অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। তার কারণ, সাধারণ ব্যাপার হলে এটি হত প্রচন্ড বেদনাদায়ক এবং এর ফলে রক্তচাপ দ্রুত কমে গিয়ে শক্ ও মৃত্যু পর্যন্ত হত, প্রচন্ড রক্তপাত হত, জীবাণু আক্রমণ হয়ে টিটেনাস, গ্যাংরিন, ঘা ইত্যাদি হত এবং সবচেয়ে বড় কথা মাংস ছিঁড়ে বেরিয়ে আসত।

ডঃ কোভুর একে একে এ সম্ভাবনাগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথমতঃ ব্যথার ব্যাপারটা। ব্যথার দুটি দিক রয়েছে—একটি হচ্ছে অনুভূতির মাত্রা এবং অন্যটি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটির ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া (subjective reaction to pain)। এই দ্বিতীয়টিই প্রধান দিক। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রচন্ড ব্যথাও আমরা অনুভব করি না বা কম অনুভব করি। কোন বিশেষ ব্যক্তি আবার স্বাভাবিকভাবে অথবা দীর্ঘকালীন অভ্যাসের ফলে প্রচন্ড ব্যথা সহ্য করতে পারেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যরা উত্তেজনার মুহূর্তে প্রচন্ড আঘাতও অনুভব করে না বা অগ্রাহ্য করতে পারে। আবার ঐ একই সৈন্য শান্ত পরিবেশে সামান্য ইনজেকশানে ভয় পায়, যথেষ্ট ব্যথা অনুভব করে, এমনকি অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারে (vasovagal attack) । অনুরূপভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভক্তরাও প্রচন্ড জেদ ও অন্ধভক্তি নিয়ে, ধর্মোন্মত্ত অবস্থায় স্বেচ্ছায় পায়ে বা গায়ে পেরেক বেঁধায়; এক্ষেত্রে তার ব্যথার প্রতি প্রতিক্রিয়া প্রায় থাকেই না, এবং স্বাভাবিকভাবে শক্ও হয় না।

রক্তপাত না হওয়ার কারণ সেটি দ্রুত বন্ধ হয়ে যায়। রক্ত জমাট বাঁধার জন্য (clotting) আশেপাশের ক্ষতিগ্রস্ত কলা (tissue) থেকে নিঃসৃত একটি পদার্থ (Tissue thromboplastin) একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। পেরেক বেঁধানোর পরেও একই ব্যাপার ঘটে। কিন্তু কোন ভক্তের যদি রক্ত জমাট বাঁধার রোগ থাকে তবে তার ক্ষেত্রে বাস্তব কারণেই প্রচুর রক্তপাত হবে। এছাড়া উত্তেজনার জন্য প্রচুর অ্যাড্রেনালিন বেরোয় যা রক্তবহনালীকে সংকুচিত করে দেয়। আর পেরেকের ঊর্দ্ধমুখী চাপও তার ওপরের রক্তবহনালীগুলিকে বন্ধ করে রাখে।

চিকিৎসকেরা টিটেনাস-গ্যাসগ্যাংরিন ইত্যাদির প্রতি অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করেন তার কারণ একবার এগুলি হলে তা মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এগুলি খুব বিরল ক্ষেত্রেই ঘটে। টিটেনাস, গ্যাংরিন বা ঘা হওয়ার জন্য বিশেষ ধরনের ক্ষতিকর জীবাণু প্রচুর পরিমাণে শরীরে ঢোকা প্রয়োজন, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও অত্যন্ত কম হওয়া দরকার। এ দু'টি হয় না বলেই আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে নানা আঘাত কাটা-ছেঁড়ার সম্মুখীন হই তার থেকে এসবে আক্রান্ত হই না, —একই কারণে ভক্তদের মধ্যেও টিটেনাস ইত্যাদি ঘটে না। সেটি কোন অলৌকিক ক্ষমতাবলে নয়।

আর মাংস ছিঁড়ে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত চাপ দরকার। একটি স্প্রিং ব্যালেন্সে ১০ কে. জি. ওজন চাপালে ব্যালেন্সে ১০ কে.জি. ওজনই পাওয়া যাবে। কিন্তু ঐ একই ওজন পাশাপাশি দুটি স্প্রিং ব্যালেন্স থেকে বোঝালে প্রতিটিতে চাপ পাওয়া যাবে ৫ কে.জি. করে। অনুরূপভাবে পেরেকে ঝোলা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটিও কমপক্ষে ৬টি পেরেক বা হুক বিঁধিয়ে ঝুলে থাকে। এক্ষেত্রে তার ওজন যদি ৫০ কে.জি.-ও হয় তবে প্রতি পেরেকে চাপ পড়বে মাত্র ৮ কে. জি.। এতে মাংস ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার কথা নয়। এছাড়া বারবার অভ্যাসের ফলে স্থানীয় চামড়া মোটা-ও হয়ে যায়। তবু নিঃসন্দেহে এ ধরনের অভ্যাস একটি কষ্টকর প্রক্রিয়া।

ডঃ কোভুর শ্রী এম. সি. জয়সুরিয়ার কথা বলেছেন, যিনি এইভাবে পেরেক-ঝোলার মধ্যে যে কোন অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপার নেই তা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে নিজেই পায়ে পেরেক বিঁধিয়ে ঝুলে দেখিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটির সাহস, দক্ষতা, ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতা ইত্যাদির জন্য তাঁর প্রশংসা করা উচিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটিও মনে রাখতে হবে, গাজনের মেলায় চড়ক বা অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ভক্তরা এই ধরনের যে সব কান্ড করেন তার পিছনে শিবঠাকুর বা অন্য কারোর অলৌকিক মহিমার কোন ব্যাপার নেই—রয়েছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটিরই বাস্তব ও মানবিক দক্ষতার পরিচয়। জিভে পেরেক ফোটান,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেরেকের ওপর হাঁটা, আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা সত্যি। পয়সা উপার্জন করার জন্য বা নিজেদের বাহাদুরী দেখানর জন্য অথবা দেবমাহাত্ম্য প্রচারের অর্থহীন উদ্দেশ্যে অনেকেই দীর্ঘদিন অভ্যাস ও অনুশীলন ক'রে এসব কাজ করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারেন। আর যুক্তিবুদ্ধিহীন অন্ধবিশ্বাসী সরল মানুষ একে অলৌকিক দেবমাহাত্ম্য ভেবে ভক্তিতে গদ্গদ্ ও বিভ্রান্ত হয়।

আগুনের উপর হাঁটা

পৃথিবীর নানা দেশে বিশেষতঃ ভারতের মত দেশগুলিতে, নানা ধর্মীয় মেলায় এই 'অলৌকিক খেলা' দেখান হয়। প্রকৃতপক্ষে এটিও কোন অলৌকিক ব্যাপার নয়—সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটির সাহস ও দক্ষতারই পরিচয়।

১৯৩৫ ও ১৯৩৭ সালে লন্ডনের একটি সংস্থার (University of London Council for Psychical Investigations) পরিচালনায় কয়েকজন বিজ্ঞানী ভারতের খোদাবক্স ও আহমেদ হোসেন নামে দু'জন আগুনে-হাঁটা ব্যক্তির ওপর গবেষণা করেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যেভাবে করা হয় ওইভাবে একটি আয়তাকার নীচু জায়গাকে গনগনে কাঠ কয়লা ইত্যাদির আগুনে ভর্তি করা হয়। তার তাপমাত্রা ছিল কয়েক শ' ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ ফুটন্ত জলের তাপমাত্রার চেয়েও বহুগুণ বেশী। সাধারণ মানুষের পক্ষে এর উপর হাঁটা অকল্পনীয় একটি ব্যাপার। অন্যদিকে খোদাবক্স, আহমেদ হোসেন-এর মত ব্যক্তিরা অনায়াসে এর ওপর হেঁটে যান। পরীক্ষা করে দেখা গেল, আগুনের উপর দিয়ে দ্রুত হেঁটে যাওয়ার ফলে আগুনের সঙ্গে আধ্সেকেন্ডেরও কম সময় তাঁদের পায়ের সংস্পর্শ ঘটে। এত কম সময় সংস্পর্শে থাকার কারণে ফোস্কা পড়ে না। থার্মোকাপল যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে আসলে পায়ের তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড-এরও কম বেড়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে গরম জিনিষ চামড়ায় প্রয়োগ করলেই কেবল ফোস্কা পড়ে এবং এর পেছনে থাকে শরীরের গভীরতর কলা থেকে জলীয় প্লাজমার চুঁইয়ে আসা।

['সায়েন্স টুডে' পত্রিকার নভেম্বর, ১৯৮১ সংখ্যায় হায়দ্রাবাদ গান্ধী মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ শংকর রাও একটি প্রবন্ধে বলেছেন, আরো কয়েকটি শর্তও সংশ্লিষ্ট আগুনে হাঁটা ব্যক্তির পা-কে রক্ষা করে, যেমন— বারবার আগুনে হাঁটার ফলে পায়ের চামড়া শক্ত হয়ে যাওয়া, ধর্মীয় অনুষ্ঠানটির আগে স্নান করে আসার ফলে পায়ের নীচে সামান্য হলেও কাদা লেগে থাকা, ভেজা কাপড় থেকে জল চুঁইয়ে পড়া ইত্যাদি। তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন দ্রুত হাঁটার ফলে পায়ের পাতা মাত্র ০.৩-০.৫ সেকেন্ড আগুনের সংস্পর্শে থাকে। এতে ফোস্কা পড়ার কথা নয়। উপবাস ইত্যাদির কারণে ব্যক্তিটির কম ওজন, দ্রুত হেঁটে যাওয়ার দক্ষতা ও সাহস—এগুলিও অতিরিক্ত সুবিধা এনে দেয়। সব মিলিয়ে এটি পরিষ্কার যে, কোন পূজা-আচ্চা-মন্ত্র-দেবাশীর্বাদ ইত্যাদি কারণে নয়, আগুনের ওপর হাঁটা নিছকই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি মানবিক দক্ষতার পরিচায়ক ঘটনা—অলৌকিকত্বের সামান্যতম ছোঁয়া এর মধ্যে নেই—তার একটিই কারণ অলৌকিক- অবাস্তব-দৈব বলে কোন কিছুর অস্তিত্বই নেই।]

মন্ত্রের গুণ কাটান

একবার ডঃ কোভুর সস্ত্রীক শ্রীলংকার কাটুনায়েকেতে একটি সরকারী নারকেল দড়ি কারখানার ম্যানেজার জনৈক শ্রীপালের বাড়ীতে ছুটি কাটাচ্ছিলেন। ওখানে থাকাকালীন তাঁরা জানতে পারলেন, শ্রীসেনা নামে কারখানার এক কর্মীকে কেউ নাকি মন্ত্র পড়ে গুণ করেছে,—ঐ মন্ত্র কাটানোর ব্যবস্থা হচ্ছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেল, শ্রীসেনা নামে কারখানার ঐ কর্মী একদিন কারখানায় যাবে বলে বেরিয়ে যায়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের বহু পরেও সে আর ফিরে এল না। তার স্ত্রী মেরি ও ভাই প্রেমরত্ন হন্যে হয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার হদিস পায় নি। অবশেষে তারা এক জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হয়। জ্যোতিষী গণনা করে জানালো যে, শ্রীসেনা সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু সমুদ্রের ধারে কাছে বহু খোঁজ করেও তার মৃতদেহ পাওয়া গেল না। তার প্রেতাত্মা যাতে আর কোন ঝামেলা না বাধায় তাই মেরি স্বামীর শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা করল। হঠাৎ কয়েকমাস পরে একদিন ভোরবেলায় মেরি দরজা খুলে দেখল, শ্রীসেনা বাড়ীর উঠোনে শুয়ে আছে। কিন্তু তার তীব্র আনন্দ ছিল ক্ষণস্থায়ী। দেখা গেল শ্রীসেনা বদ্ধ উন্মাদ—তার কোন কথারই জবাব সে দেয় না।

মেরি 'অত্যন্ত ক্ষমতাশালী' এক মহিলা জ্যোতিষীর কাছে গেল। সব শুনে এই মহিলা-জ্যোতিষী জানাল যে, এক মালয়ালী গুণিন শ্রীসেনাকে মন্ত্রবলে তুক করেছে। তবে এর চেয়েও শক্তিশালী এক মালয়ালী গুণিনের সন্ধান সে দেবে, যে শ্রীসেনার শরীর থেকে এই মন্ত্রের গুণ কাটিয়ে দেবে, কিন্তু এর জন্য শ' তিনেক টাকা খরচ পড়বে। ৩০ টাকা অগ্রিম দিয়ে মেরি সব ব্যবস্থা পাকা করে। ঘটনাচক্রে ডঃ কোভুর যখন ওখানে ছিলেন ঐ সময়েই একদিন মন্ত্র কাটানর অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। ডঃ কোভুর ও শ্রীপাল অনুষ্ঠানের জায়গায় গেলেন।

তখন প্রায় মধ্য রাত্রি। জায়গাটি লোকে লোকারণ্য। মাঝে চুনের দাগ দিয়ে ঘেরা একটি জায়গায় তামার প্রদীপ জ্বলছে, তার পেছনে পদ্মাসনে গুণিনটি বসে। সামনে অসংখ্য পাত্রে ফল, ফুল, খই, নারকেলকোরা, ধান ইত্যাদি। পাশে একটি বিরাট শাঁখ ও পা-বাঁধা মুরগী। প্রচন্ডভাবে ঢাক-ঢোল বাজছে। গুণিন ও তার দুই সঙ্গী একটি জীর্ণ পুঁথি থেকে কি সব পড়ছে। হঠাৎ রাত একটা নাগাদ গুণিনের নির্দেশে আকস্মিকভাবে ঢাক-ঢোল-শাঁখ বন্ধ করে দেওয়া হল। শ্রীসেনা সহ যারা ঘুমোচ্ছিল তারা সবাই ধড়মড় করে উঠে বসল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুণিনটি ঘোষণা করল, "বাড়ীর পাঁচ পা পশ্চিমে, একটি কলাগাছের তিন পা উত্তরে মন্ত্রপূত আধারটি পোঁতা রয়েছে।" একটি কোদাল নিয়ে গুণিন, তার দুই সঙ্গী এবং অন্যান্য লোকজন ঐ জায়গায় গেল। ডঃ কোভুরও গেলেন। জায়গাটি নির্দিষ্ট করে তার দশ ফুটের মধ্য থেকে গুণিন, তার দুই সঙ্গী ও ঢাকওয়ালা ছাড়া বাকী সবাইকে সরিয়ে দেওয়া হল।

নতুন করে ঢাক-ঢোল বাজান শুরু হল। শ্রীসেনাকে বসান হল সামনে। গুণিনের এক সঙ্গী মাটি খোঁড়া শুরু করল। ডঃ কোভুর এক দৃষ্টিতে মাটি খোঁড়া দেখতে লাগলেন। দু'একবার ব্যর্থ হওয়ার পর গুণিনের নির্দেশে নতুন আরেকটা জায়গা খোঁড়া শুরু হল। হঠাৎ গুণিনটি উঠে শ্রীসেনার চারপাশে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী করে উন্মাদের মত নৃত্য করতে শুরু করল। প্রচন্ড জোরে ঢাক-ঢোল-শাঁখ বাজান হচ্ছে, সবাই নৃত্যরত গুণিনের দিকে তাকিয়ে তার অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ দেখছে—ডঃ কোভুরের চোখ কিন্তু মাটি খোঁড়ার দিকে। একসময় তিনি দেখলেন, গুণিনের যে সঙ্গীটি মাটি খুঁড়ছে তার চাদরের ভাঁজ থেকে কি যেন একটা গর্তের মধ্যে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে মাটি চাপা দেওয়া হল। দু'চার মিনিট পরেই গুণিন বলল মাটি খোঁড়া থামাতে। পা বাঁধা মুরগীটাকে চেঁচানর বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়ে কেটে ফেলা হল এবং গর্তের মধ্যে তার রক্ত ছড়ান হল। একটি লেবু কেটে তার রসও ঢালা হল। এরপর গুণিন শ্রীসেনার ভাই প্রেমরত্নকে বল্লো পবিত্র জলে হাত ধুয়ে গর্তটি খুঁড়ে ফেলতে। প্রেমরত্ন তাই করল। হঠাৎ তার হাতে ঠেকল মর্তমান কলার আকারে একটি বস্তু। গুণিনটি লাফিয়ে উঠে প্রেমরত্নের হাত থেকে জিনিসটি নিয়ে জানাল যে, এটিই সেই মন্ত্রপূত আধার যা সব গন্ডগোলের মূলে, অন্ততঃ আট মাস আগে এটিকে শয়তানি করে কেউ পুঁতেছে।

বস্তুটি ছিল তামার তৈরী একটি বড় মাদুলী,—৫" x ২"। অনেক কষ্টে তা খোলা হল। ভেতর থেকে বেরুল কয়েক টুকরো হাড়, মানুষের একটি দাঁত, হিজিবিজি লেখা কয়েকটি তামার পাত, পাকানো চুল, তামার পয়সা ও পাখির ঠোঁট। সবাই এই অলৌকিক রোমাঞ্চকর কান্ড দেখে শিউরে উঠল। গুণিনটি জানাল, এবার সব ঠিক হয়ে যাবে, সে এসব জিনিস নষ্ট করে ফেলবে এবং বাড়ীতে পুজো করবে। আর এই জায়গাটিতে পরপর তিনদিন কর্পূর পোড়াতে হবে। গুণিনকে বাকী ২৭০ টাকা দিয়ে দেওয়া হল।

তখন রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শ্রীসেনার ওপর কোন এক গুণিনের মন্ত্র পড়া ও আরেক গুণিনের সেই মন্ত্রের গুণ কাটানর এই অদ্ভুত ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখে সমবেত ক্লান্ত জনতা একটি অনির্বচনীয় রোমাঞ্চ নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল বিশ্রামের জন্য। গুণিন ও তার সঙ্গীরাও একটি উপযুক্ত আশ্রয় খুঁজছিল। ডঃ কোভুর তাদের শ্রীপালের কারখানার একটি ছাউনীর নীচে বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন।

এরপর ডঃ কোভুর একান্তে গুণিনটির সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন। তিনি এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভান করলেন যেন তিনিও এ ধরনের মন্ত্র-তন্ত্রের কাজ করে থাকেন এবং সমস্ত আঁটঘাটই জানেন। গুণিনের সঙ্গীটির চাদর থেকে ঐ তথাকথিত মন্ত্রপূত আধারটি গর্তে ফেলে দেওয়ার ঘটনাটির কথাও জানালেন। তাঁর নিপুণ ও চতুর অভিনয়ে ভুলে গিয়ে গুণিনটি ধীরে ধীরে অনেক কিছু জানিয়ে দিল।

জানা গেল, গুণিনটি মালয়ালী, তার দু'জন সঙ্গী সিংহলের লোক, প্রতিরাত্রে ৫ টাকা হারে ওদের ভাড়া করা হয়েছিল। এরা এ ধরনের কাজের সঙ্গে পরিচিত। ঐ মহিলা-জ্যোতিষীও তার সঙ্গে যুক্ত; পাওনা টাকার দশ ভাগের এক ভাগ তাকে দিতে হবে। এই গুণিনটির ২৫টি এ ধরনের তামার তৈরী আধার রয়েছে যার ভেতর সে ঐ সব হাবিজাবি পুরে রেখেছে ও নিজের বাড়ীর বাগানে পুঁতে রেখেছে। কাছাকাছি কোথাও মন্ত্র কাটানর ডাক পড়লে সে ঐগুলির একটি তুলে নিয়ে গোপনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটির বাস্তুভিটার কোথাও পুঁতে দেয় এবং কায়দা করে সকলের সামনে তা বের করে সবাইকে হতবাক করে দেয়। আর দূরে কোথাও ডাক পড়লে, -যেমন এক্ষেত্রে, সে সঙ্গে করে একটি নিয়ে আসে এবং এই ভাবে গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে কৌশলে তার ভেতর ফেলে দেয়।

মন্ত্র পড়ে গুণ করা বা তুক করা ব্যাপারটিই মিথ্যে—তাকে কাটানটা তো আরো মিথ্যে। আসলে শ্রীসেনা হয় কোন দুর্ঘটনায় পড়ে অথবা ইচ্ছে করে বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে কোন দুর্ঘটনায় স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল। মানসিক বা মস্তিষ্কের বিভিন্ন আঘাতে এ ধরনের লক্ষণ দেখা দেয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় এটির নিরাময়ও প্রায় ক্ষেত্রেই করা সম্ভব। কিন্তু তা না করে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মেরী বা প্রেমরত্ন যে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আশ্রয় নিল তার ফলে গুণিনটির চালাকির জন্য অর্থব্যয় তো হলই, উপরন্তু শ্রীসেনার অবস্থাও থাকল অপরিবর্তিত।

আমাদের চারপাশে এধরনের ঘটনা এখনো ঘটে চলেছে।

☆ ☆ ☆

[**হাতচালা, বাটিচালা, কুলোচালা ইত্যাদি**—কোন জিনিস হারিয়ে গেলে তার অবস্থান জানার জন্য এ ধরনের ভ্রান্তপদ্ধতি অবলম্বন করার উদাহরণ পাওয়া যায়। হাত-চালা'তে গুণিন জাতীয় ব্যক্তিটি সাধারণতঃ বাড়ীর কোন বাচ্চা বা তরুণ-তরুণীকে বেছে নেয় এবং তাকে উবু করিয়ে একটি হাতের কানায় ভর দিয়ে বিশেষ একটি ভঙ্গীতে বসায়। বাটিচালা'তে হাতের নীচে একটি কাঁসার বাটি রাখা হয়। কুলোচালা'তে বাড়ীর কাউকে দু'হাতে কুলো ধরতে বলা হয়। হাতচালার সময় গুণিন মন্ত্র পড়ে দেয়—এবং তারপর যেন হাতটি আপনা আপনি চলতে থাকে; যেদিকে যায় বা যেখানে থামে ঐদিকে বা ঐখানে যেন জিনিষটি আছে,—বাটি চালার ক্ষেত্রেও তাই। কুলোচালার ক্ষেত্রে কুলোটি যেন ধরে থাকা ব্যক্তিটিকে হারান জিনিসটির দিকে (গ্রামের দিকে হারিয়ে যাওয়া গরু ইত্যাদি খোঁজার ক্ষেত্রেও একে কাজে লাগান হয়) টানতে থাকে। প্রকৃত পক্ষে হাত, বাটি বা কুলোর এই গতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন অলৌকিক শক্তিবলে ঘটে না, ঘটা সম্ভবও নয়। বসে থাকার বিশেষ ভঙ্গীর কারণেই হাত বা বাটিটি নাড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা আসে, এর সঙ্গে যোগ হয় সংশ্লিষ্ট গুণিনের সম্মোহিনী কথার প্রভাব—অর্থাৎ সব মিলিয়ে যার হাত চালান হচ্ছে বা যার মাধ্যমে বাটি বা কুলোচালান হচ্ছে সে-ই হাতটাকে নাড়ায়। সচেতন ও সংস্কারমুক্ত কাউকে দিয়ে এইভাবে 'চালান' সম্ভব নয়। কোন ক্ষেত্রেই হারান জিনিষটির সঠিক সন্ধানও মেলে না। কাকতালীয়ভাবে খুব বিরল ক্ষেত্রে হারান জিনিষটির হদিশ পাওয়া গেলে, সেটিই প্রচণ্ড প্রচার লাভ করে। আর ব্যর্থ হলে বলা হয় যেদিকে হাত, বাটি বা কুলো গেল সেদিকেই কোথাও জিনিষটি রয়েছে। কোন কোন সময়, গুণিনটি সব ঘটনা শুনে কেউ জিনিষটি লুকিয়েছে বলে সন্দেহ করলে বা যে ঐ জিনিষটি সন্ধান জানে বলে মনে করা হয়, তাকে দিয়ে হাত, বাটি বা কুলো চালায়—ভয়ে বা ভক্তিতে সেই ব্যক্তি তখন সচেতন বা অবচেতনভাবেই নিজেরই লুকিয়ে রাখা ঐ জিনিষটির প্রতি হাত, বাটি বা কুলো নিয়ে যায়। মাহাত্ম্য বাড়ে গুণিন বা হাত চালার অলৌকিকত্বের। ব্যাপারটি এমনই ভাঁওতা।

কিন্তু আরো বিপজ্জনক হল, যখন সাপের বিষ ঝাড়ার জন্যও হাত চালানর প্রয়োগ দেখা যায়। এর জন্য মন্ত্র পড়া হয়। এধরনের একটি মন্ত্র হল এইরকম—

হাত চালান, হাত চালান্
আতালে পাতালে বাঁশরী চালান
চল্ হাত চল্
যেখানে বিষ থাকে সেখানে চল্
বিষ থুয়ে এদিকে ওদিকে যাস
ঈশ্বর মহাদেবের (স্থানান্তরে 'মনসার') জটা খাস
ভূ-মস্তকে খসে পড়।

এইভাবে মন্ত্রের সাহায্যে, হাত চালিয়ে শরীর থেকে সাপের বিষ দূর করাটাও অসম্ভব ব্যাপার এবং প্রচেষ্টাটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। বিষাক্ত সাপের কামড়ে উপযুক্ত পরিমাণ (lethal dose) বিষ শরীরে ঢুকলে আদৌ এভাবে, সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ছাড়া, রোগীকে বাঁচান অসম্ভব। অনেক সময় যা ঘটে, বিষহীন সাপ কাউকে কামড়ালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রচণ্ড ভয়েই কাহিল হয়ে পড়ে। কিংবা বিষাক্ত সাপ কামড়ালেও হয়তো উপযুক্ত পরিমাণ বিষ শরীরের ভেতরে ঢালতে পারেনি। এসব ক্ষেত্রে মন্ত্র ও হাত চালানর প্রভাবে রোগী এসবের প্রতি অন্ধবিশ্বাস ও আস্থার কারণে মানসিক শক্তি ফিরে পায়, কিছু সময়ও কাটে এবং ধীরে ধীরে রোগী আরোগ্য লাভ করতে পারে। তাই এগুলির অলৌকিক শক্তিতে নয়, নিছক মানসিক প্রভাবেই প্রকৃত উপকারটি হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নখদর্পণ

অনেক সময় হারান জিনিস খোঁজার জন্য, চোর ধরার জন্য অথবা তথাকথিত কোন অপদেবতার উৎপাত ঘটলে তাকে চেনার জন্য এপদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এটিও নিছকই একটি ধোঁকা। এ পদ্ধতিতে, সাধারণতঃ একটি শিশু বা একজন মহিলার বুড়ো আঙ্গুলের নখে ওঝা বা গুণিন চকচকে করে তেল সিন্দুর মাখিয়ে দেয় এবং মন্ত্র পড়ে দেয়। তারপর বলা হয় ঐ আয়নার মত চকচকে নখে সে কি দেখছে তা বর্ণনা করতে। বিশ্বাস, কে কিভাবে কি জিনিস চুরি করে কোথায় রেখেছে ইত্যাদি খুঁটিনাটি দেখা যাবে এবং এভাবে চোর তথা হারান জিনিষ খুঁজে পাওয়া যাবে। ব্যাপারটি যে এভাবে সম্ভব নয় তা বলাই বাহুল্য। তা হলে টেলিভিশন জাতীয় যন্ত্রের আবিষ্কার করার আর প্রয়োজন হত না। আসলে নারকেল তেলের সঙ্গে সিন্দুর, কোথাও বা কাজল (স্থানান্তরে ভিন্নতর পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়) চকচকে করে নখে মাখালে নখটি একটি উত্তল আয়না (convex mirror) -এর মত কাজ করে। যে কেউই পরীক্ষা করে এটি দেখে নিতে পারেন। এতে নিজেরই ঝুঁকে পড়া মুখের বা আশপাশের লোকজন-গাছপালার ঝাপসা, বিকৃত ছায়া দেখা যায়। নখদর্পণ করা ওঝা বা গুণিনের নির্দেশ, নিজের মিথ্যা বিশ্বাস, অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে নখের দিকে ঘাড় ঝুঁকিয়ে তাকিয়ে থাকা, চারপাশে উদ্‌গ্রীব মানুষের ভীড় ইত্যাদি কারণে এই বিকৃত ছায়া দেখেই দৃষ্টি-ভ্রম (illusion) ঘটতে পারে। এই জাতীয় ভিত্তিহীন পদ্ধতির উপর ব্যাপক মানুষ দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বাস করে আসছে—তার অন্যতম কারণ কাকতালীয়ভাবে কোন কোন সময় কিছু কিছু মিলে যায়। ভাবপ্রবণ বাচ্চা ও মহিলাদের সহজে সম্মোহিত করা যায়—তাই তাদের দিয়ে অনেক কিছু বলিয়ে নেওয়া যায়। এই কারণে সাধারণতঃ এদের নখেই এটি করা হয়। কারোর বাড়ীতে কিছু চুরি হলে সাধারণতঃ বাড়ীর লোক কাউকে সন্দেহ করে কিন্তু প্রমাণাভাবে তাকে ধরা যায় না। গুণিন বা ওঝার সঙ্গে যোগসাজসে বা যার হাতের নখে নখদর্পন করা হচ্ছে তার সঙ্গে যোগসাজসে (সাধারণতঃ এ বাড়ীরই কেউ হয়)—ঐ সন্দেহভাজন ব্যক্তিটিকে যেন নখে দেখা যাচ্ছে বলে বলা হয় অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি দৃষ্টিবিভ্রম (illusion)-এর বশে সন্দেহভাজন ব্যক্তির কথাই বলে। তারপর তাকে চাপ দিলে সে ভয়ে ও নখদর্পণের প্রতি অন্ধবিশ্বাসে সব স্বীকার করে। শুধু সন্দেহের বশে বাড়ীর লোককে আর তাকে অভিযুক্ত করার দায়িত্ব নিতে হল না, অথচ চোরও ধরা পড়ল। এর মধ্যে অলৌকিকত্ব বা অতি প্রাকৃতিক কোন কিছু নেই। যা রয়েছে তা হল এক ধরনের চালাকি বা কৌশল, যা এই ধরনের আরো নানা পদ্ধতিতেই দেখা যায়। এবং এগুলির সাহায্যে কোন কোন সময় উদ্দিষ্ট কাজও সিদ্ধ হয়। এসবের মধ্যে মানুষের বুদ্ধিমত্তারই নানা ধরনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বুদ্ধির সঙ্গে অলৌকিকত্বের প্রতি বিশ্বাস মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়ে বহু শত বছর ধরে বহু বিচিত্রভাবে বিবর্তিত হয়ে আসছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাণ মারা

এতে নাকি মন্ত্র পড়ে অলৌকিকভাবে নানা কাণ্ড ঘটান হয় যেমন দূরের কাউকে অসুস্থ করে দেওয়া, দুগ্ধবতী গাই-এর দুধ বন্ধ করে দেওয়া বা দুধের সঙ্গে রক্তস্রাব ঘটান, হাঁড়িতে সেদ্ধ হওয়া পিঠেকে কাঁচা করে রাখা, গাছের ফল নষ্ট করে দেওয়া, আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। বাস্তবে মন্ত্রবলে আদৌ এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটান সম্ভব নয়। বাণমারার তথাকথিত কোন ঘটনাই বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করা যায়নি। সাধারণতঃ গ্রামে, বা আদিবাসী, অশিক্ষিতদের মধ্যে এ ধরনের বিশ্বাস বেশী থাকে। অনেক সময় শত্রুস্থানীয় কেউ বদমায়েসি করে এ সব করে এবং তাকে বাণমারার ঘটনা বলে মনে হয়। যেমন পুকুরের জলে কিছু মিশিয়ে দিয়ে কোন পরিবারকে অসুস্থ করে দেওয়া যায়, গাছের গোড়ায় অতিরিক্ত ক্ষার বা বিষাক্ত রাসায়নিক ঢেলে গাছটিকে নষ্ট করে দেওয়া যায়, চিতিগাছের পাতা খাইয়ে গাই-এর দুধ বন্ধ করে দেওয়া যায় ইত্যাদি। অসহায় গরীব মানুষ আবার ছেলেমেয়ের বা নিজেদের দুরারোগ্য কোন রোগকে বাণমারার ঘটনা (বা ডাইনির নজর) বলে ভাবে এবং উপযুক্ত চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় ঝাঁড়-ফুঁকের আশ্রয় নেয়।

☆ ☆ ☆

এইভাবে তথাকথিত বিভিন্ন অবতার, সাধুবাবা, ওঝা গুণিনরা যেসব 'অলৌকিক' কাজকর্ম ক'রে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে ও যুক্তিবুদ্ধিহীন অন্ধ ধর্মবিশ্বাসী সরল মানুষের ঠকায় সেই সব কাজ গুলিকে যুক্তিদিয়ে ও বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সেগুলি আদৌ অলৌকিক বা দৈব কোন ব্যাপার নয়—সবগুলিরই রয়েছে বাস্তব কোন ভিত্তি। কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ সব কাজগুলি বুজরুকদের ম্যাজিয়ানসুলভ চাতুরি, লোক ঠকিয়ে ব্যবসা ও প্রতিপত্তির জন্য ; আবার কখনো তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নানা ধরনের মানসিক রোগ ও বিভ্রমের জন্য ঘটে, —সে হয়তো ইচ্ছে করে লোক ঠকানোর চেষ্টা করে না, নিজের মিথ্যা বিশ্বাসের জন্যই মিথ্যা বা ভিত্তিহীন কাজকর্ম করে।

পৃথিবী বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন কিছুই বস্তুর বাইরে নয়। সবকিছুরই রয়েছে বাস্তব ভিত্তি। হয়তো এমন কিছু ব্যাপার রয়েছে যা আমরা আমাদের বর্তমান জ্ঞানে এখনো ব্যাখ্যা করতে পারছি না; কিন্তু ভবিষ্যতে অবশ্যই তা পারা সম্ভব হবে। বস্তু-লোক-প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে অবাস্তব-অলৌকিক অতিপ্রাকৃতিক কোন কিছুর অস্তিত্ব অসম্ভব।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গঙ্গাজল ইত্যাদির তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতা

হিন্দুদের কাছে গঙ্গানদীর জল একটি অতি পবিত্র জিনিস এবং অত্যাশ্চর্য অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। সমস্ত ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ, শ্রাদ্ধশান্তি, পূজা -পার্বণ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদিতে গঙ্গাজল অবশ্য প্রয়োজনীয় অন্যতম উপকরণ। ধর্মপ্রাণ কোন কোন গবেষক এরকম প্রমাণও করেছেন যে গঙ্গাজলে নাকি জীবাণু জন্মায় না ইত্যাদি এবং এটি সম্ভব গঙ্গাজলের অলৌকিকত্বের কারণে। স্বয়ং মহাদেবের জটা নাকি গঙ্গার উৎস।

[আসলে হিমালয় পর্বতমালার কৈলাস নামক পর্বত থেকে গঙ্গার উৎপত্তি। আরো অনেক নদীর মত, পাহাড়ে জমা বরফ গলে গিয়ে সেই জল এবং তার সঙ্গে বৃষ্টি, গতিপথের নানা খাল ইত্যাদির জল মিশেই গঙ্গার সৃষ্টি। পার্বত্য অঞ্চল ছেড়ে প্রায় ১৫০০ মাইল বয়ে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে এই নদী। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে গঙ্গাজলে বিভিন্ন জীবাণুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় অন্যান্য সাধারণ জলের মতই। অর্থাৎ যাঁরা বলেন পবিত্র গঙ্গা জলে পোকা বা জীবাণু হয় না, তাঁরা নিছকই মিথ্যা দাবী করেন। ২২.১২.৮১ তারিখের দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবর অনুযায়ী, "কলকাতার গঙ্গায় স্যামোনেলা জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেছে। নাগপুরের জাতীয় পরিবেশ ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণা ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকেরা জানিয়েছেন" ইত্যাদি। এই জীবাণু নদীর জলে থাকা বিপজ্জনক, কারণ এর মাত্রা খুব বৃদ্ধি পেলে টাইফয়েডের মত ভয়াবহ রোগ মহামারীরূপে দেখা দিতে পারে। তবে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব-রসায়ন বিভাগের গবেষকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, সাধারণভাবে গঙ্গাজলে যে সব রোগজীবাণু, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি থাকে সেগুলির বংশবৃদ্ধি সীমিতহারে ঘটে থাকে। তাঁরা দেখেছেন এর কারণগুলি এই রকম—

(১) গঙ্গাজলে ব্যাকটেরিওফেজ (Bacteriophage) নামে এক ধরনের ভাইরাস রয়েছে—এটি বিভিন্ন জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে। এই ভাইরাস অবশ্য শুধু গঙ্গাজলে নয় অন্যান্য নদী বা পুকুরের জলেও থাকে। (২) গঙ্গাজলে Dellovibrio parasite bacteria রয়েছে যারা জীবাণুকুলের শত্রু। (৩) গঙ্গাজলে কিছু ধরনের বিশেষ জীব-অণু থাকে যারা বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক—অর্থাৎ জীবাণু-ধ্বংসকারী পদার্থ তৈরী করে। (৪) গঙ্গাজলের প্রতিনিয়ত প্রবহমানতাও এতে ব্যাপক হারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোগ-জীবাণু সৃষ্টি হতে ও জমতে দেয় না। (৫) চারপাশের কলকারখানার বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদিও নানা জীবাণু মেরে ফেলে। (এছাড়া তার উপর রোদ পড়ার ফলেও এই একই ব্যাপার ঘটে। এ কারণে খোলামেলা বড় দীঘি, পুকুর বা সাধারণ নদীর জলেও জীবাণুর সংখ্যা সীমিত থাকে।)

অর্থাৎ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বা 'গবেষকদের' দাবী অনুযায়ী গঙ্গাজলের অলৌকিকত্বের জন্য নয়—এই সব বাস্তব কারণেই গঙ্গাজলে জীবাণুর সংখ্যা সীমিত। একই শর্তাধীনে অন্যান্য বড় নদীর জলেও জীবাণুর সীমিত সংখ্যা প্রমাণিত। গঙ্গাজলে অন্যান্য সাধারণ জলের মত শুধু জীবাণু বা পোকা মাকড়ই থাকে না, আরো নানা দূষিত ও বিষাক্ত পদার্থও থাকে, যা এই ধরনের অন্যান্য নদীর ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। ১৯৮১ সালের ডিসেম্বরে প্রেস ট্রাস্ট অব্ ইণ্ডিয়া পরিবেশিত একটি সংবাদ অনুযায়ী, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ বি. ডি. ত্রিপাঠী হিসেব করে দেখেছেন, গঙ্গায় যে সব দূষিত পদার্থ মেশে তার পরিমাণ এই রকম—(১) বছরে ১৪০-২০০টন ওজনের মৃতদেহ। (২) কলকারখাড়া থেকে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণ নোংরা জল,—কেবলমাত্র রাজঘাটেই প্রতি ঘণ্টায় ৩০০ গ্যালন নোংরা জল গঙ্গায় মেশে। (৩) বছরে ২০০—৩০০ টন ছাই।(৪) বছরে প্রায় ৬০০০ জীবজন্তুর মৃতদেহ। সব মিলিয়ে স্থান বিশেষে গঙ্গাজল পবিত্র বা অলৌকিকশক্তির অধিকারী আদৌ তো নয়ই বরং বিপজ্জনক—বিভিন্ন ধরনের পেটের রোগ, টাইফয়েড ইত্যাদির উৎসস্বরূপ।

আসলে গঙ্গা-নদী ভারতের বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতের, জনজীবন, সংস্কৃতি, কৃষি-শিল্প ইত্যাদির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে আসছে শতশত বছর ধরে। অতি উপকারী এই গঙ্গা নদীকে আশপাশের সাধারণ মানুষ কৃতজ্ঞতা ও সম্ভ্রম জানিয়েছে। ধীরে ধীরে হিন্দু ধর্মমত বিকাশের পর্যায়ে এই সম্ভ্রম ধর্মীয় আচার ও বিশ্বাসের সঙ্গে মিশে গেছে—গঙ্গা স্থান পেয়েছে লোক-কথায়, লাভ করেছে মানুষী-রূপ, কল্পিত হয়েছে দেবী রূপে। প্রকৃতির জড় বস্তুতে জীবত্ব আরোপের (animism) আদিম চিন্তারও পরিচায়ক এটি। এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে তা সৃষ্টি করেছে নানা কুসংস্কারের। এছাড়া প্রাচীনকালে যখন কলকারখানার অস্তিত্ব ছিল না, পরিবেশ ছিল সুস্থ, তখন গঙ্গাজলও পূর্বোল্লেখিত বিভিন্ন কারণে আশপাশের ছোট নদীর বা পুকুরের জল অপেক্ষা ছিল সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর, অপেক্ষাকৃত রোগজীবাণু মুক্ত। নিজেদের অভিজ্ঞতায় এ সত্যটি উপলব্ধি করে মানুষ গঙ্গাজলকে অধিকতর মর্যাদার আসনে বসিয়েছে—বহু শত বছর আগে এর বেশী কিছু ভাবার সুযোগও ছিল না। কিন্তু আজ মুক্তমনা হয়ে আমাদের জানা উচিত যে, অলৌকিক বা দেবমাহাত্ম্য জাতীয় কোন ব্যাপারের অস্তিত্ব যখন নেই তখন গঙ্গাজলেরও কোন অলৌকিক মাহাত্ম্য থাকা সম্ভব নয়। গঙ্গানদী ও এর জল আর পাঁচটা সাধারণ বড় নদী ও তাদের জলের মতই। গঙ্গা নদী ও এর জলের যা কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান-এর জন্যই। তাই গঙ্গাস্তোত্র আওড়ান, গঙ্গাজলে শরীর পবিত্র করা বা পাপস্খালন করা ইত্যাদি হাস্যকর ভ্রান্ত সংস্কার ছাড়া কিছুই নয়।]

গঙ্গাজলের অলৌকিক মাহাত্ম্য যে আদৌ নেই তার প্রমাণ ডঃ কোভুর হাতে নাতেই পেয়েছেন।

ডঃ কোভুরের কেরালার বাড়ীর আশেপাশে যে সব হিন্দুরা থাকতেন, তাঁরাও গঙ্গাজল (তাঁদের ভাষায় 'তীর্থম্')-কে অন্যান্য হিন্দুর মত পরম পবিত্র অলৌকিক গুণসম্পন্ন বস্তু হিসাবে মনে করতেন। কিন্তু গঙ্গা বহু দূরে হওয়ার জন্য গঙ্গাজল তাঁদের কাছে দুষ্প্রাপ্য ছিল। আব্রাহাম কোভুর ও তাঁর ভাই বেহনান কোভুর ১৯২১-২৪ এই তিন বছর কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে পড়াশুনা করেন। গঙ্গার ধারে কলকাতায় থাকার এই সুযোগকে কেরালার প্রতিবেশীরা পরম সৌভাগ্য বলে মনে করতেন এবং তাঁদের অনুরোধ করতেন বাড়ী আসার সময় সঙ্গে কিছু গঙ্গাজল আনতে ।

ঐ সময় কোভুরদের কেরালার বাড়ী তিরুভাল্লা থেকে কলকাতা আসতে সময় লাগত ৫ দিন। তাই তাঁরা বছরে মাত্র একবার, গরমের ছুটিতে বাড়ী আসতেন। বাড়ী থেকে কলকাতা ফেরার সময়, প্রতিবেশী হিন্দুরা দলবেঁধে তাঁদের বাড়ী যেতেন,— আশীর্বাদ করতেন, গঙ্গাতীরবর্তী কলকাতা গঙ্গাস্নানের দূর্মূল্য পুণ্য অর্জনের জন্য তাঁদের মোক্ষলাম যে সুনিশ্চিত বিষয়ে মত প্রকাশ করতেন। প্রতিবেশীদের বাড়ীতে বাড়ীতে আদর-যত্ন-সম্মানে ছুটি কাটাবার পর প্রত্যেকের জন্য গঙ্গাজল আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোভুররা কলকাতায় ফিরে আসতেন। পরের বছর কলকাতা থেকে বাড়ী ফেরার সময় একটি বড় পাত্রে বেশ কিছু গঙ্গাজল নিয়ে ফিরতেন এবং ভাগ করে প্রতিবেশীদের দিতেন।

আর শুনতেন আগের বছর এনে দেওয়া গঙ্গাজলে কি কি অলৌকিক সব কাণ্ড ঘটেছে। কেউ জানাত—এক চামচ গঙ্গাজল, একটু মধুর সঙ্গে খেয়ে কিভাবে কলেরা সেরে গেছে। কোন মহিলা মাথার যন্ত্রণায় প্রচণ্ড কষ্ট পেতেন, কিন্তু একটু গঙ্গাজল কপালে মেখে নেওয়ার পর ঐ যন্ত্রণা প্রায় হয়ই না। আরেক মহিলা আগের দু'টি সন্তান প্রসবের সময়, প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছিলেন। কিন্তু এবার তৃতীয় বাচ্চাটির জন্মের সময়, প্রসব যন্ত্রণা শুরু হওয়ার ঠিক আগে একটু গঙ্গাজল খেয়ে নেওয়ার ফলে নির্বিঘ্নে প্রসব হয়েছে। একজন তো রীতিমত গবেষণা করেছেন। তিনি একই আমগাছ থেকে একই সময়ে দু'টি কলম করা চারা বাগানে লাগিয়েছিলেন। একটি চারার গোড়ায় তিনি কিছু গঙ্গাজল সিঞ্চন করেছিলেন। দেখা গেছে মুকুল আসার সময় এই গাছে অজস্র মুকুল এসেছে—অন্য গাছটিতে নাম মাত্র। আরেকজন তো তাঁর পরিবারের সবাইকে নিয়মিত একটু একটু গঙ্গাজল খাইয়ে রেখে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেখেছেন—অথচ অন্যান্য বছর বাড়ীতে প্রায়ই নানা রোগ লেগে থাকত। এমনি ধারা আরো নানা অলৌকিক ঘটনা!

যাই হোক, একবার কলকাতায় থাকাকালীন আব্রাহাম কোভুর গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছিলেন। ডুব দিয়ে ওঠার সময় তাঁর মাথায় কি যেন একটা পিচ্ছিল জিনিস লাগল। দেখলেন সেটি একটি মড়ার পচে যাওয়া হাত। বমি চেপে, ঘেন্নায় কোভুর গঙ্গা ছেড়ে উঠে এলেন। কয়েকদিন ভাল করে খেতেও পারেননি। এখন বেআইনি হলেও ঐ সময় মৃত ব্যক্তিটির আত্মীয়রা মৃত ব্যক্তিটির আত্মার সরাসরি স্বর্গারোহণ সুনিশ্চিত করতে মৃতদেহ 'পুণ্যসলিলা' গঙ্গায় ফেলে দিত। কোভুর ঠিক করলেন এই দূষিত গঙ্গার জল তিনি আর সজ্ঞানে প্রতিবেশীদের দেবেন না।

তাই পরের বারে যখন কোভুররা বাড়ী গেলেন তখন আর গঙ্গাজল নিয়ে গেলেন না। কোভুরদের বাড়ী তিরুভাল্লার সবচেয়ে কাছের রেল স্টেশনটি ঐ সময় ছিল কোট্টারাক্কারা। তাঁরা এই স্টেশনে নেমে গঙ্গাজল রাখার বিরাট পাত্র স্টেশনের কলের জলেই ভরে নিলেন। স্টেশন থেকে ৩৬ মাইল বাসে গিয়ে তাঁদের বাড়ী। বাসে প্রচণ্ড ভিড় হত, কিন্তু বাস কণ্ডাকটাররা যেই জানতে পারত কোভুরদের কাছে গঙ্গাজল রয়েছে অমনি তারা ঐ ভীড়ের মধ্যেও বাসের সামনের দিকের সীটে তাঁদের সসম্ভ্রমে বসিয়ে দিত, গঙ্গাজলের পাত্রটিকে রাখত সাবধানে। বাস থেকে নেমে বাসের কণ্ডাকটর-ড্রাইভারদের একটু একটু দিতে হত। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না।

বাড়ী পৌঁছে কোট্টারাক্কারা স্টেশনের কলের জলকেই তাঁরা গঙ্গাজল বলে প্রতিবেশীদের মধ্যে বিতরণ করলেন। আর ছুটির মেয়াদ শেষ হতে যথারীতি কলকাতায় ফিরে এলেন।

পরের বারে বাড়ী ফেরার সময়ও আগের বারের মতই স্টেশনের কল থেকে 'গঙ্গাজল' ভরে নিলেন। এবং বাড়ী গিয়ে শুনলেন আগের বছরে এনে দেওয়া 'গঙ্গাজল'-এর নানা ধরনের অলৌকিক মাহাত্ম্য, আগেকার মতই। ঐ জল খেয়ে অলৌকিকভাবে কারো রোগ সেরে গেছে অথবা ঐ জলের প্রভাবে অলৌকিক ভাবে গাছের ফলন বেড়ে গেছে ইত্যাদি,—যদিও আদৌ সেটি গঙ্গাজল ছিল না, ছিল স্রেফ কলের জল।

দেখা গেল গঙ্গাজল ভেবে অন্ধ সরল বিশ্বাসে কলের যে জল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা ব্যবহার করলেন তার ফলও সেই একই রকম হল।

অর্থাৎ গঙ্গাজল-এর অলৌকিক মাহাত্ম্য বলে কিছু নেই—যা কিছু 'মাহাত্ম্য' ঐ অন্ধ বিশ্বাসেরই। আর গাছে ফলন বাড়ার মত ঘটনার অন্য কোন বাস্তব ভিত্তি রয়েছে অথবা ঘটছে কাকতালীয়ভাবে।

গঙ্গাজলের অলৌকিক মাহাত্ম্যে (তথা বিভিন্ন সাধু-ঋষি, অবতার দেব-দেবী,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূজা প্রার্থনা ইত্যাদিতে এবং মন্ত্র-মাদুলির মত জিনিস গুলিতেও) মানুষের অন্ধ বিশ্বাস অতি প্রাচীন। এই ধরনের অন্ধ বিশ্বাস মানসিক যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তা শরীরের নানা রোগকষ্ট লাঘব করা, এমনকি শরীরের নানা পরিবর্তন, অন্ততঃ সাময়িকভাবে ঘটাতে পারে। গভীর বিশ্বাসের কারণে এই শারীরিক প্রতিক্রিয়ার চাক্ষুষ উদাহরণও ডঃ কোভুর দিয়েছেন। শ্রীলংকার জাফনা কেন্দ্রীয় মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপক থাকাকালীন তাঁর এক সহকর্মী একবার অফিসঘরে রাখা কুঁজো থেকে জল খেয়েছিলেন। একটু পরেই তিনি জানতে পারলেন যে, ঐ কুঁজোর ভেতর থেকে একটি মরা সাপ বেরিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পেটে অসহ্য যন্ত্রণা ও বমি শুরু হল। ওষুধপত্রেও কোন কাজ হয় না। শেষে ডঃ কোভুর পাশের আরেকটি কুঁজো দেখিয়ে অনেকক্ষণ বুঝিয়ে তাঁকে নিশ্চিন্ত করলেন যে ভদ্রলোক পাশের কুঁজো থেকে জল খেয়েছেন, যেটি থেকে সাপ বেরিয়েছে ওটি থেকে নয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের বমি পেটব্যথা কমে গেল।

[গ্যাসট্রিক আলসার, হাঁপানি, আলসারেটিভ কোলাইটিস, মেয়েদের মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার বয়সের নানা কষ্ট (menopausal syndrome), পুরুষদের যৌনদুর্বলতা, হিস্টেরিয়া, খিঁচুনি বা ফিট ইত্যাদি নানা রোগের বিভিন্ন কষ্টের অন্যতম প্রধান কারণ যে মানসিক তা আজ চিকিৎসা-বিজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত। নিম্নোক্ত ঘটনাটি এ দিক থেকে উল্লেখযোগ্য—"একজন ক্যানসার রোগীর (malignant lymphosarcoma) ক্ষেত্রে সান্ত্বনাদায়ী ওষুধ* -এর নাটকীয় প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা ক্লপ্‌ফার করেছেন। রোগীটির জ্বর হত, অক্সিজেন দিতে হত এবং একদিন অন্তর তার বুকের ভেতর থেকে ১-২ লিটার পুঁজের মত ঘোলাটে জল বের করতে হত। গলা, বগল, কুঁচকি, বুক ও পেটে বড় বড় গ্ল্যাণ্ড (অথাৎ enlarged lymph node) ছিল, প্লীহা ও যকৃৎ ছিল বেশ বড়। কোন চিকিৎসাতেও তার কোন কাজ হয় নি। রোগী সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিল এবং সে বড় জোর আর কয়েকদিন বা দু-এক সপ্তাহ বাঁচবে এধরনের অনুমান করা হয়েছিল। কিন্তু রোগী তার জীবনের আশা ছাড়েনি। সে খবরের কাগজে পড়েছিল ক্রেবায়োজেন (krebiozen) নামে ক্যানসারের একটি নতুন ওষুধ বাজারে এসেছে যা কার্যকরী। সে ঐ ওষুধটি তার উপর প্রয়োগ করার জন্য পীড়াপীড়ি করে। ওষুধটি আসলে তখনো ছিল পরীক্ষামূলক। তাই অনিচ্ছা ও দুর্ভাবনা নিয়েই রোগীকে ওষুধটি দেওয়া হল।

কিন্তু রোগীর প্রতিক্রিয়া হল বিস্ময়কর। একদিন চিকিৎসার পরেই তার বড়

* (placebo—যে ওষুধ শরীরের মধ্যে রোগের বিরুদ্ধে সত্যিকারের কোন কাজ করে না, কিন্তু রোগীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য দেওয়া হয় এবং তাকে বোঝান হয় যে, আসল ওষুধটিই দেওয়া হচ্ছে।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় গ্ল্যাণ্ডগুলি অর্দ্ধেক ছোট হয়ে গেল। দশদিনের মধ্যে তার রোগের সব লক্ষণই প্রায় চলে গেল। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে গেল, এবং তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল। পরের দু'মাস সে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। কিন্তু ঐ সময় ক্রেবায়োজেনের নৈরাশ্যজনক ফল সম্পর্কে খবর বেরোয়। সেটি পড়ে রোগীটি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং পুনরায় তার কষ্টগুলি দেখা দিল। কিন্তু ডাক্তারেরা রোগীর আশা পুনরায় জাগিয়ে তুললেন। মিথ্যে করে তাঁরা তাকে বোঝালেন যে, খবরের কাগজে যা বলেছে তা হল দীর্ঘদিন ওষুধটিকে ফেলে রাখলে তার কার্যকারিতা হারিয়ে যায়; এখন ওষুধটিকে একটি অতি সক্রিয় ও স্থায়ী (superfined, double strength) রূপে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। তাকে স্রেফ জল (water for injection) ইনজেকশান করা হল কিন্তু বলা হল ঐ অতি সক্রিয় ওষুধটিই দেওয়া হল। এবার আগের চেয়েও নাটকীয়ভাবে ফল পাওয়া গেল। এবং দু'মাসেরও বেশী সে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকল। এই সময় আমেরিকার মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশান ঘোষণা করল যে সারা দেশজুড়ে ক্রেবায়োজেনকে প্রয়োগ ও পরীক্ষা করে দেখা গেছে এটি ক্যানসারের চিকিৎসায় আদৌ কার্যকরী নয়। রোগী তা জানতে পারার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পুরনো লক্ষণ ও কষ্টগুলি একইভাবে দেখা দিল। এবং ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই সে মারা গেল।" (সুত্র: Sharpio A.K., Psychological Aspects of Medication—Lief, Lief & Lief Eds,—The Psychological Basis of Medical Practice, New York. Harper & Row. 1963; p 167) একইভাবে, প্রচণ্ড যন্ত্রণা নিয়ে যেসব রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয় তারা হয়তো ঘুমের ইনজেকশান ছাড়া রাত্রে ঘুমুতেই পারে না—কিন্তু ঘুমের ইনজেকশানের বদলে স্রেফ জীবাণুমুক্ত জল ইনজেকশন করে এবং রোগীকে সেটি ঘুমের ইনজেকশান হিসেবে বুঝিয়ে, দেখা গেছে তাদের অর্ধেকই ঘুমিয়ে পড়েছে।

এইভাবে সকলের ক্ষেত্রে না হলেও, বিশেষ শারীরিক ও মানসিক গঠনযুক্ত, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্রেফ অন্ধবিশ্বাসজনিত মানসিক প্রভাব অদ্ভুতভাবে কাজ করে। এইটিকেই সাধারণ মানুষ অলৌকিক হিসেবে ধরে নেন। আর তাই দেখা যায় যে, গঙ্গাজল হোক, কোন অবতার সাধুসন্ন্যাসীর দেওয়া ওষুধ হোক, পূজা-প্রসাদ-প্রার্থনা-চরণামৃত আশীর্বাদ ইত্যাদি যাই হোক না কেন তার প্রতি অন্ধ বিশ্বাসে ভক্তরা অভূতপূর্ব ফল পায়। অন্যকে মার খেতে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরে আঘাতের চিহ্ন ফুটে ওঠা থেকে শুরু করে গঙ্গাজল খেয়ে সুপ্রসব হওয়ার মত সমস্ত ঘটনার (যদি আদৌ ঘটনাগুলি ঘটে থাকে) পেছনেই রয়েছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিশেষ মানসিক ও শারীরিক গঠনপ্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য যা অতি জটিল এবং যা সম্পূর্ণ জানা যায় নি কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতিক কোন ব্যাপার নেই।]

এই প্রসঙ্গে ডঃ কোভুর মন্তব্য করেছেন, "মানসিক হাসপাতালের রোগীদের অধিকাংশ পাগলামির সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস থেকে। মনস্তত্ত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের শেখায় যে, বাতিকগ্রস্ত লোকেরা মানসিক পীড়নের কারণেই যন্ত্রণা ও দুর্দশায় ভোগে। মূলতঃ সরল, দুর্বল চরিত্রের মানুষদের মধ্যে এটি ঘটে।..... হিসেব করে দেখা গেছে যে, একই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে খ্যাপামি শুরু হয় তাদের নিয়মিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস ও কাজকর্মের ফলে। আবার একই সম্প্রদায়ের পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যে এই মানসিক ভারসাম্যহীনতা বেশী। উন্নততর শিক্ষাদান আর কঠোর পর্দাপ্রথার বিলোপসাধনই এদের মধ্য থেকে এই ভারসাম্যহীনতা হঠাতে পারে।"

হিন্দুদের মত মুসলমানদেরও পবিত্র জল রয়েছে। সেটি হচ্ছে কোন জলের পাত্রকে মক্কার পবিত্র কাবা পাথরে ছুঁইয়ে দেওয়ার পরে ঐ পাত্রের জল। স্পষ্টতঃই কোন একটা পাথরে জলভরা পাত্রটিকে ছুঁইয়ে দিলেই জলের মধ্যে অলৌকিকত্ব আরোপ হওয়ার ব্যাপারটা ভিত্তিহীন, তা হয়ও না। যেহেতু অলৌকিক বলে কোন ব্যাপারই থাকতে পারে না, তাই এক্ষেত্রেও ঐ ধরনের কিছু ঘটতে পারে না।

খ্রীস্টানদের ক্ষেত্রে লোর্ডস্ (Lourds) -এর জল পবিত্র। (লোর্ডস হচ্ছে ফ্রান্সের একটি রোমান ক্যাথলিক গীর্জা।) এই জলে স্নান করে বা খেয়ে কারোর দীর্ঘদিনের বাত সেরে গেছে, কেউ ক্যান্সার-রোগমুক্ত হয়েছে ইত্যাকার নানা গালগল্প চালু আছে। ডাঃ ডি. জে. ওয়েস্ট নামে একজন 'ডাক্তার' তো এ নিয়ে 'লোর্ডসের এগারটি অলৌকিক কাহিনী' (Eleven Lourds Miracles) নামে একটি বইও লিখে ফেলেছিলেন। বইটির সবকটি ঘটনাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, বৈজ্ঞানিকভাবে এগুলিকে প্রমাণ করা যায় না। যে মহিলার পেটের ক্যান্সার সেরে গিয়েছিল ও টিউমার চলে গিয়েছিল বলা হয়েছে, পরীক্ষা করে দেখলে বোঝা যেত তাঁর পেটের টিউমার আসলে ছিল দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা ও পাথরের মত শক্ত হয়ে যাওয়া মল (faecolith)। ভদ্রমহিলা নিয়মিত আফিং খেতেন। আফিং অন্ত্রের সঞ্চালন কমিয়ে দেয় ও কোষ্ঠবদ্ধতার সৃষ্টি করে। তাই তাঁর ঠিকমত পায়খানা হত না। তাঁকে লোর্ডস্-এর জল ইনজেকশান করা হয়েছিল ও আফিং বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। শেষোক্ত কারণেই তাঁর কোষ্ঠবদ্ধতা চলে গিয়ে শক্ত মল বেরিয়ে গেছে—তাঁর ক্ষুধা ইত্যাদি স্বাভাবিক হয়ে তিনি সুস্থ হয়েছেন এবং ঐ 'টিউমারটি' মিলিয়ে গেছে। লোর্ডস্-এর অলৌকিকত্ব এতে কিছু নেই। ডাঃ ওয়েস্ট কিন্তু কোন ঘটনাকেই চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেননি।

গঙ্গাজল, কাবাছোঁয়ান জল বা লোর্ডস-এর জল সহ অলৌকিক ক্ষমতাযুক্ত যে সমস্ত জিনিসের অলৌকিক মাহাত্ম্যকে যারা প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তারা কোন সময়েই বৈজ্ঞানিক যুক্তির ধারকাছ দিয়ে যায় না—ভাববাদী কল্পনা ও অন্ধ বিশ্বাস প্রসূত যুক্তিহীন একগুঁয়েমির সঙ্গে বাস্তবের কিছু মিশ্রণ ঘটিয়ে সরল মানুষদের সামনে বিশ্বাসযোগ্যভাবে ব্যাপারগুলিকে হাজির করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জ্যোতিষের জালিয়াতি

গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান, ঠিকুজী, কুষ্ঠি, হাতের রেখা ইত্যাদি বিচার করে মানুষের ভাগ্য, ভূত-ভবিষ্যৎ, চরিত্র ইত্যাদি বলে দেওয়ার ব্যাপারটা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অবৈজ্ঞানিক তা যে কোন যুক্তিবাদী ব্যক্তিই একটু তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন। মহাকাশের অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে ন'টি গ্রহ ও ২৭টি নক্ষত্র নাকি মানুষের জীবনে অসাধারণ প্রভাব ফেলে। জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান যখন ছিল খুবই সীমিত ও অসম্পূর্ণ, এবং অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্তও, তখন থেকেই জ্যোতিষবিদ্যার সৃষ্টি। স্বাভাবিকভাবে এই জ্যোতিষবিদ্যাও যে বিভ্রান্তিকর হবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।*

ঠিকুজী-কুষ্ঠি তৈরী করা হয় কারোর জন্মের সময়, ১২টি রাশিচক্রের কোথায় কোন্ তথাকথিত গ্রহ বা নক্ষত্র রয়েছে সেগুলির অবস্থান এবং মানুষের শরীর ও জীবনে তাদের প্রভাব বিচার করে। কিন্তু জ্যোতিষবিদ্যা বা হস্তরেখাবিদ্যায় যে নবগ্রহের কথা বলা হয় তার মধ্যে রাহু ও কেতুর কোন অস্তিত্বই বাস্তবে নেই, সূর্য ও চন্দ্র কোন গ্রহই নয়—যথাক্রমে একটি নক্ষত্র ও উপগ্রহ। আর পাঁচটিরই গ্রহ হিসেবে প্রকৃত অস্তিত্ব রয়েছে—বুধ, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও শুক্র!

গ্রহ হিসেবে রাহু ও কেতুকে কল্পনা করা হত মহাশূন্যের দৈত্য হিসেবে। পরে যখন জানা গেল এদের অস্তিত্ব নেই তখন জ্যোতিষীরা বলতে শুরু করল,—আসলে ওরা মানুষের চোখে অদৃশ্য, অন্ধকার গ্রহ—যদিও তাদের প্রভাব রয়েছে মানুষের

*পাশাপাশি এটিও মনে রাখা দরকার যে আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পূর্বসূরী ছিল এই জ্যোতিষবিদ্যা। সূর্য, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি বহুদিন ধরে পর্যবেক্ষণ করে প্রাচীন ভারতীয়, চৈনিক, ব্যাবিলনীয়, মিশরীয় পণ্ডিতেরা অনেক তথ্যই জানতে পারেন যা অনেকাংশে সঠিক ছিল। চাষাবাদ, দূরযাত্রা ইত্যাদির জন্য ঋতুপরিবর্তন, সময় গণনা ইত্যাদির বাস্তব প্রয়োজনে প্রাচীন ক্যালেণ্ডার-পঞ্জিকাদির সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রাচীন মানুষের দেব-দেবতায় ভ্রান্তবিশ্বাসও এর সঙ্গে মিশে গিয়েছে। যেমন, ব্যাবিলনে বৎসর (৩৬০ দিন), মাস (৩০ দিন), সপ্তাহ (৭ দিন) ইত্যাদি বিভাজনের কৃতিত্বের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল সপ্তাহের ৭টি দিনের উপর ৭টি দেবতার প্রভাবের ব্যাপারটি— শনিবারে মড়কের দেবতা নিনিব, বৃহস্পতিবারে রাজদেবতা মার্দুক, মঙ্গলবারে যুদ্ধদেবতা নের্গাল, রবিবারে ন্যায়ের দেবতা শামাশ, শুক্রবারে প্রেমের দেবতা ইসতার, বুধবারে লিখনের দেবতা নাবু, চন্দ্রবারে অর্থাৎ সোমবারে কৃষির দেবতা সিন। প্রাচীন ভারতীয়রাও মহাকাশের বহুবিধ তথ্য সঠিকভাবে উদ্‌ঘাটন করেছিলেন ব্যাবলনীয়দের মতই—৭টি গ্রহের অস্তিত্ব, সূর্যের গতিপথ নির্ণয় ইত্যাদি এদের অন্যতম। কিন্তু সেই সঙ্গে মানুষের ভাগ্য নির্ণয়ের মত প্রচেষ্টাও এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছিল। (সূত্রঃ বিজ্ঞানের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান ফর দি কাল্‌টিভেশান অব সায়েন্স ; ১৯৫৫)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপর ; সূর্য-চন্দ্রের গতিপথের ছেদবিন্দুতে এদের অবস্থান। কিন্তু যেহেতু সূর্য চন্দ্র থেক বহু লক্ষ মাইল দূরে তাই এদের গতিপথের ছেদবিন্দুর কোন বাস্তব ও কার্যকরী অস্তিত্ব নেই, যেমন অস্তিত্ব নেই গ্রাণ্ড ট্র্যাংক রোড ধরে যাওয়া একটি বাসের গতি পথের সঙ্গে আকাশের একটি এরোপ্লেনের গতিপথের ছেদবিন্দুর। এই অস্তিত্বহীন দুটি 'গ্রহের' প্রভাবও যে অবাস্তব সেটি বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। জ্যোতিষীরা কিন্তু এখনো ঐসব ভ্রান্ত ধারণার ভিক্তিতে নানা গালগল্প বলে চলেছে। তারা হয়তো জানে না যে, রাশিচক্রের ঘরগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক, মহাশূন্যে এধরনের কোন স্থানবিভাগ নেই—পৃথিবীতে বসে রাশিচক্র বিচার করা হয়, এই কাল্পনিক স্থানবিভাগের ভিত্তিতে ও ঐ সময় চোখে দেখা গ্রহ-নক্ষত্রাদির আপাত অবস্থান বিচার করে। মহাশূন্যে ভ্রাম্যমান এক মহিলা নভোচারিণীর সদ্যোজাত শিশুর কুষ্ঠি তাহলে কিভাবে তৈরী হবে? প্রাচীনকালের জ্যোতিষবিদ্যার জনকরা এও জানতেন না যে, তাঁরা মহাশূন্যের রাশিচক্রের যে বারটি ঘরের কথা বলেছেন সেগুলির এক একটি নক্ষত্র পৃথিবী থেকে বহু শত আলোকবর্ষ দূরে।

[সূর্যের আপাতগতিপথকে অনুসরণের জন্য রাশিচক্র ও তার ১২টি বিভাগকে প্রতীকী নাম দেওয়া হয়েছে— মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। Celestial sphere-এ সূর্য-চন্দ্রের পরিক্রমণ পথ প্রায় একই বৃত্ত হওয়ায় এই রাশিচক্রের অন্তর্গত ২৭টি নক্ষত্রের সাহয্যে চন্দ্রের গতিও নির্ণয় করা হত। এই ২৭টি নক্ষত্র হল—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব-ফল্গুনী, উত্তর-ফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যৈষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী।]

এই সব নক্ষত্রের কোনটি যদি এই মুহূর্তে লুপ্ত হয়ে যায় তবু আমরা তাকে আরো তত বছর দেখতে পাব, যত আলোকবর্ষ দূরে নক্ষত্রটি পৃথিবী থেকে অবস্থিত। এক্ষেত্রে এখন যে শিশুর কুষ্ঠিবিচারে ঐ নক্ষত্রের প্রভাবকে গণ্য করা হচ্ছে সে নক্ষত্রটির অস্তিত্ব আদৌ এখন নাও থাকতে পারে। আবার জ্যোতিষবিদ্যায় ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো এই তিনটি গ্রহ এবং গ্রহাণুপুঞ্জের প্রভাবের কথা বলাই হয় না। তার একটি কারণ, অতীতে সীমিত জ্ঞানের জন্য এদের অস্তিত্ব গ্রহ হিসাবে জানা ছিল না, যদিও তাদের অস্তিত্ব ছিল। এসব অসঙ্গতি অস্বাভাবিকও নয়, যেখানে কল্পনার সঙ্গে সীমিত ও কিছু কিছু ভ্রান্ত জ্ঞানকে মিলিয়ে কিছু তত্ত্ব দাঁড় করান হয়েছে। কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থিত কোন নক্ষত্রের পক্ষে মানুষের জীবনকে, শরীরকে, এবং এমনকি অনাগত ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করাটাও হাস্যকরভাবে অসম্ভব। সূর্য ও চন্দ্র তুলনা-মূলকভাবে পৃথিবীর খুব কাছে—তাই এদের পক্ষে বড় জোর পৃথিবীর আবহাওয়াকে প্রভাবিত করা সম্ভব হয়।

জ্যোতিষবিদ্যার সাহায্যে মানুষের ভাগ্য, চরিত্র ইত্যাদি নির্ণয় করার চিন্তা জন্ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হওয়ার মূলে এই ধারণা কাজ করেছে যে পৃথিবী একটি অর্ধগোলাকার চাকতি, এর ওপরে রয়েছে আকাশ বা দেবতাদের বাসস্থান; মানুষের চরিত্র ও জীবন এই অদৃশ্য দেবতা, পরমাত্মা বা পরম শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যে শক্তি আবার এই মহাকাশের বিভিন্ন গ্রহনক্ষত্র-নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধিকেও নিয়ন্ত্রণ করে। এই ভ্রান্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে কার্যকারণ সূত্রে অবৈজ্ঞানিক ধারণাই করা হয়েছে যে নক্ষত্রাদির অবস্থান দেখে ঐ দেবতা বা পরমাত্মার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে জানা সম্ভব, এবং ঐ অনুযায়ী পৃথিবীতে একজন মানুষের জীবন ও চরিত্র সম্পর্কেও ঐ সব দেবতা বা পরমাত্মার ইচ্ছাকে অনুমান করা সম্ভব। কিন্তু যেহেতু কোন দেবতা বা পরমাত্মার অস্তিত্ব নেই, গ্রহ-নক্ষত্রাদি চলে প্রকৃতিরই নিজস্ব নিয়মে এবং একজন মানুষের জীবন অলৌকিক ও অস্তিত্বহীন কোন কিছুর ইচ্ছা-অনিচ্ছায় নয়, প্রকৃতি ও সমাজের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়—তাই জ্যোতিষবিদ্যা-হস্তরেখাবিদ্যা ইত্যাদির মূল ভিত্তিটিই ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত।

[হাতের রেখার সঙ্গেও গ্রহাদি তথা মানুষের চরিত্র ও জীবনযাত্রার কোন সম্পর্ক নেই। গর্ভাবস্থায় শিশুর মুষ্টিবদ্ধ হাতের বিশেষ অবস্থানের ফলে এই সব ভাঁজ বা রেখার উৎপত্তি হয়। বিবর্তনের পর্যায়ে, হাতের আঙুলিগুলির উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় নাড়াচাড়ার জন্য, হাতের ছোট ছোট গাঁট, পাশের মাংসপেশী ও ঐ সবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চামড়ায় ভাঁজের সৃষ্টি হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে এর সঙ্গে সূর্য, চন্দ্র, বৃহস্পতি, শনি, বুধ অথবা অস্তিত্বহীন রাহু-কেতুর কোন সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয় এবং এই সব ভাঁজকে মস্তিষ্ক রেখা, হৃদয় রেখা, আয়ুরেখা, ইত্যাদি কাল্পনিক নাম দেওয়াটা আরো হাস্যকর।]

বজ্র-বৃষ্টি, জোয়ার-ভাঁটা, ঘূর্ণিবাত্যা ইত্যাদি নানা পার্থিব ঘটনাকে পৃথিবীর বাইরের কোন শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে প্রাচীনকালের মানুষ অনুভব করেছে। বাস্তবতঃ সূর্য-চন্দ্র এক্ষেত্রে কিছুটা ভূমিকা গ্রহণ করে—কিন্তু আদিম মানুষ অপার্থিব শক্তির উপর মহাশক্তিধর এক ব্যক্তিত্বও আরোপ করেছে। সভয়ে এ সিদ্ধান্তও টেনেছে যে তাদের জীবনের খুঁটিনাটিও এই মহাশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। হিন্দুধর্মের মত কিছু কিছু ধর্মমতে তাই মানুষের প্রতিটি কাজকর্মকে (ভ্রমণ, অধ্যয়ন, জীবিকা, বিবাহ, এবং এমনকি কোন্ সময়ে যৌনসঙ্গম করতে হবে, কোন্ সময় লাউবেগুন-কুমড়ো খাওয়া উচিত ইত্যাদি) এই মহাশক্তি বা তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত গ্রহাদির অবস্থান অনুযায়ী অর্থাৎ জ্যোতিষবিদ্যা ও পঞ্জিকার অনুশাসনে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এর উদ্দেশ্য একটি—বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ও প্রকৃতির কাছে অসহায় মানুষের অনিশ্চিত জীবনটাকে কিছুটা নিশ্চিন্ত ও সুরক্ষিত করা। এই সঙ্গে মানুষ আরো চেষ্টা করেছে তার অনাগত এবং হয়তো বা ভয়াবহ ভবিষ্যৎকে আগে থেকে জেনে নিয়ে সম্ভাব্য দুঃখকষ্টকে লাঘব করতে। এ সবই তার দুর্বলতা ও অসহায়তারই পরিচায়ক।

[এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একটি মন্তব্য প্রণিধান যোগ্য। আধ্যাত্মিকতা, হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য, ঈশ্বর ইত্যাদি সম্পর্কে আজন্মলালিত অবচেতন মনের সংস্কারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বশবর্তী হয়, সমসাময়িক যুগ ও দেশের প্রভাব ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থেকে নিজেকে মুক্ত না করতে পেরে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মত একজন সরল ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিত্বের অস্বাভাবিক সম্মোহনী কথাবার্তা ও কাজকর্মে সম্মোহিত হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ নানা ধরনের পরস্পর বিরোধী কাজকর্ম করেছেন বা কথাবার্তা বলেছেন। কিন্তু অন্যদিকে তিনি ছিলেন মানবতাবাদী, কিছুটা গোঁড়ামিমুক্ত ও যুক্তিবাদী ব্যক্তি। এরই একটি উদাহরণ জ্যোতিষবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য। তিনি বলেছেন,—"মানুষ নিজের ভাগ্যবিধাতা। জ্যোতিষের খুঁটিনাটির প্রতি মনোযোগ হচ্ছে হিন্দুদের অত্যন্ত ক্ষতিকারক কুসংস্কারগুলির মধ্যে একটি। তুমি দেখবে জ্যোতিষ বা ঐ ধরনের সব রহস্যময় ব্যাপারে আস্থা সাধারণতঃ দুর্বল চিত্তের লক্ষণ। অতএব যখনই ঐ সব বিষয় আমাদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করবে তখনি আমাদের উচিৎ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া,—ভাল, খাদ্য, আহার ও বিশ্রাম গ্রহণ করা।" (উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা। ১০ম খণ্ড ; ১ম সংস্করণ, ১৩৬৯ ; পৃঃ ১৯৪-৫।)

স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে তাঁর আরেকটি সর্বজনীন উক্তিও প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেছেন, "যদি সামাজিক কোন আচারের পরিবর্তন ঘটাইতে হয়, তাহা হইলে ঐ আচারের মূলে কি আবশ্যকতা আছে, সেইটি প্রথমে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে এবং সেইটি পরিবর্তন করিয়া দিলেই উক্ত আচারটি আপনা হইতে নষ্ট হইয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন নিন্দা বা স্তুতির দ্বারা কাজ হইবে না।" (ঐ ; অষ্টম খণ্ড ; পৃঃ ২৩) ধর্ম-ঈশ্বর-অলৌকিকত্বের উপর মানুষের বিশ্বাস ও নির্ভরতা এবং জ্যোতিষবিদ্যা-আত্মা-প্রেতাত্মা ইত্যাদিতে বিশ্বাস—এই সব গুলির ক্ষেত্রেই এটি সত্য। দৈনন্দিন জীবনের অসহায়তা, অনিশ্চয়তা, জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও বিশেষ ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের উদ্ভব ইত্যাদিই ঐ ধরনের ভ্রান্তবিশ্বাস ও কুসংস্কারের সৃষ্টিদাতা। এগুলি দূর না হলে এবং সামাজিক প্রয়োজনীয়তা শেষ না হলে এই সব বিশ্বাস ও সংস্কার ভ্রান্ত ও অবৈজ্ঞানিক হলেও ব্যাপক মানুষের মন থেকে পুরোপুরি দূর হবে না, দূর হবে না এদের উপর নির্ভর করার প্রবণতা। এসব দূর করার অন্যতম শর্ত আবার এ-সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সচেতনতা। অর্থাৎ দুটি দিকই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এ ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দের মত ব্যক্তিরা বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতেই বিশেষ মূল্যবান ভূমিকা পালন করেছেন—যদিও সামগ্রিকভাবে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের অনেকের কথাবার্তা ও কাজকর্ম ছিল পরস্পরবিরোধী।]

নিজের দুঃখ দারিদ্র্যের পেছনে সমাজ বা নিজের কোন ভূমিকা বা ভ্রান্তি দায়ী নয়, দায়ী ধরা ছোঁয়ার বাইরে কোন শক্তি বা গ্রহাদি—এটি ভেবে এক ধরনের আত্মতৃপ্তি লাভ করা যায়, সমাজসম্পর্কে ও নিজের ত্রুটি সম্পর্ক অবচেতন থেকে একটি নিশ্চেষ্ট চেতনার আলস্যও উপভোগ করা যায়। এধরনের কুসংস্কার টিকে থাকার অন্যতম বাস্তব ভিত্তি এগুলিই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরীক্ষায় ফেল করলে নিজের গাফিলতির দিকটি এড়িয়ে গিয়ে, হাতের রেখাতেই এ দুর্ঘটনার কথা বলা আছে অথবা তখন শনির দশা চলছিল তাই ব্যাপারটি ঘটেছে—এ ধরনের মিথ্যা স্তোকবাক্যে নিজের দোষস্খালন করাটা বেশ নিরাপদ। একইভাবে গরীব চাষী ঋণের দায়ে জমি হারালে জমিদার তাকে বোঝায়—এ তার কপালের লিখন অথবা হতাশ চাষী জ্যোতিষের কাছে গেলে জ্যোতিষ তাকে বোঝায় এখন তার ওপর শনি বা রাহুর কোপ পড়েছে—এইভাবে জমিদার জাতীয় শোষক শ্রেণীর স্বার্থ-পুষ্ট করা যায়। আর এসবের প্রতিকারের জন্য ভাল করে পড়াশুনা করা বা বৈজ্ঞানিকভাবে শোষকদের উচ্ছেদ করা নয়,—গ্রহাদির শান্তি-স্বস্ত্যয়নের উপদেশ দেওয়া হয় বা বিশেষ গ্রহকে শায়েস্তা করার জন্য কিছু মূল্যবান ধাতু বা মাদুলি ইত্যাদি ধারণ করতে বলা হয়—যা আবার পুরোহিত ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থপুষ্ট করে। এইভাবে শোষক-শ্রেণী ও কুসংস্কার হাত ধরাধরি করে চলে। এই বিংশ শতাব্দীতে ভারতের মত অনুন্নত দেশগুলিতে এই শোষণ ও দারিদ্র্য টিকে থাকার অন্যতম প্রধান কারণ এই সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার ও সম্পর্ক।

প্রাচীন কালে যাঁরা জ্যোতিষবিদ্যার সৃষ্টি করেছেন, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে অনেককিছু পর্যবেক্ষণ করে, কাকতালীয়ভাবে ঘটা নানা ঘটনার সন্নিবেশ করে একটি সিদ্ধান্ত টেনেছেন। উদাহরণস্বরূপ ধূমকেতুর কথা বলা যায়। আকাশে ধূমকেতুর আবির্ভাব এবং ঐ সময় পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ, মহামারী বা ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি ঘটনা ঘটার ব্যাপারটা দু'একবার হয়তো কাকতালীয়ভাবে ঘটেছে। ধূমকেতুর মত একটি অস্বাভাবিক আকারের বিরল বস্তুর আকস্মিকভাবে আকাশে মাঝে মাঝে আবির্ভাবের ব্যাপারটা মানুষের মনে একটি ভীতি ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেই। সবমিলিয়ে ধূমকেতুর সঙ্গে অমঙ্গল ও সামাজিক-প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্পর্ক টানা হয়েছে। একইভাবে আকাশে বিশেষ নক্ষত্রপুঞ্জের (তথা রাশির) আবির্ভাবের সঙ্গে কিছু কিছু ঘটনার বা ঐ সময়ে জন্মগ্রহণ করা কিছু ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যকে মিলিয়ে ঐসব নক্ষত্রাদির উপরও বিশেষ গুণ আরোপিত হয়েছে। অথচ ধূমকেতুর আবির্ভাব না ঘটলেও যে নানা প্রাকৃতিক-সামাজিক বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধবিগ্রহ ঘটেছে, এগুলির পেছনে যে প্রকৃতি ও সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত কারণ রয়েছে, এগুলি জানা ছিল না বা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। একইভাবে এড়িয়ে যাওয়রা হয়েছে সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে মানুষের জীবনযাত্রা ও চরিত্রের উপর সমাজব্যবস্থা ও প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক প্রভাবকে।

জ্যোতিষবিদ্যা প্রথমের দিকে পুরোহিতশ্রেণীর দ্বারা রাজারাজড়ার জীবন ও ভাগ্যকে নির্ধারণ করার স্বার্থেই প্রযুক্ত হতো। প্রাচীন অনুসন্ধিৎসু ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে এ কাজ করেছেন এবং জ্যোতিষবিদ্যা, হস্তরেখাবিদ্যা জাতীয় অপবিদ্যার জন্ম দিয়েছেন। অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের সঙ্গে, সীমিত জ্ঞান সত্ত্বেও একটি কার্যকরী পদ্ধতিতে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ; কিন্তু মনে রাখতে হবে মানুষের জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এগুলিকেও বিকশিত করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচিত—এগুলি অনড়, অচল বা চূড়ান্ত কিছু নয়। এ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়তো হয় বা করা উচিতও—কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে তা পৌঁছায় না। অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও সংকীর্ণতার অন্ধকারে আবদ্ধ মানুষের মধ্যে ঐ সব বহুযুগব্যাপী ভ্রান্ত ধারণাগুলিই সনাতন ভিত্তিলাভ ক'রে এখনো তাদের অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও সংকীর্ণতাকে বজায় রেখেছে। আঘাত করা উচিত এরই মূলে।

বিজ্ঞানের নিয়মেই জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। আধুনিক রসায়নবিদ্যার জনক অ্যালকেমি—কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এর সব কিছু পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক ছিল না। তখন দক্ষ অ্যালকেমিষ্টরা অন্যান্য বহু গবেষণার পাশাপাশি বহু বছর ধরে মৃতসঞ্জীবনী সুধা, অমৃত, পরশপাথর ইত্যাদি তৈরী করার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন। কিন্তু সফল হননি। তাঁদের এই পরিশ্রম ও গবেষণা থেকে ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞান। অনুরূপভাবে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার আগে ছিল ডাইনিবিদ্যা, ঝাড়ফুঁক, টোটকা ইত্যাদি। এবং একইভাবে আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার পূর্বসূরী ছিল জ্যোতিষবিদ্যা। এখন থেকে ৫০০০ বছর আগেকার জ্যোতিষীরা ক্যালেণ্ডার, রাশিচক্র ইত্যাদি তৈরী করেছেন। টেলিস্কোপের সাহায্য ছাড়া দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণ থেকে সিদ্ধান্ত টেনেছেন। এসবের অনেক কিছু এখন ভ্রান্ত প্রমাণিত, আবার অনেক কিছু সঠিক বলেও জানা গেছে।

খ্রীস্টপূর্ব ৩০০০ বছরেরও আগে থেকে মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলন, চ্যালডিয়া, চীন ও ভারতের প্রাচীন সভ্যতাগুলিতে জ্যোতিষবিদ্যার বিকাশ ঘটেছে। ব্যাবিলন থেকে তা ছড়িয়েছে আসিরিয়া, গ্রীস, মিশর ও রোমে ; ভারত থেকে আশেপাশের অঞ্চলে। জ্যোতিষবিদ্যার যতগুলি প্রাচীন বই-এর কথা জানা গেছে, তাদের মধ্যে 'টেট্রাবিব্লিয়াস' নামে প্রাচীনতমটির লেখক ছিলেন মিশরের ক্লডিয়াস টলেমিয়াস। ভারতেও 'হোরাশাস্ত্র' নামে বইটি লেখা হয়েছিল। প্রাচীনকালে জ্যোতিষবিদ্যা ও ধর্ম ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, কারণ উভয়েরই ভিত্তি ছিল আপার্থিব শক্তির প্রতিফলন ; পরবর্তীকালে খ্রীস্টান ও ইসলামী দেশগুলিতে ও চীনে এ দু'টি পৃথক হয়ে যায়। কিন্তু ভারতে তা হতে পারেনি ; এমনকি বুদ্ধদেবের পক্ষেও তা সম্ভব হয়নি। ভারতের বাইরে এই পৃথকীকরণের ফলশ্রুতি হিসেবেই জ্যোতিষবিদ্যা বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্বিদ্যার জনকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পেরেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অ্যালকেমি বা ডাইনীবিদ্যা ইত্যাদি দূর হয়েছে (যাদের মধ্যে বা যেখানে এই বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিকাশ ঘটেনি তাদের মধ্যে পুরনো ভ্রান্ত সংস্কার এখনো রয়েছে), তেমনি জ্যোতির্বিদ্যার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষবিদ্যাকেও বিজ্ঞানীরা বর্জন করেছেন।*

---

*নিউইয়র্কের 'দি হিউম্যানিষ্ট' (সংখ্যা ৩৫, ১৯৭৫) ও লন্ডনের 'নিউ হিউম্যানিষ্ট' (সংখ্যা ৯১, ১৯৭৫) পত্রিকায় ১৮ জন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সহ ১৮৬ জন বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানীর একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়, যেটিতে তাঁরা পরিষ্কারভাবে বলেন যে, জন্ম-মুহূর্তে গ্রহ-নক্ষত্রের আকর্ষণ বলের ক্রিয়া জাতকের ভবিষ্যত নিয়ন্ত্রণ করেছে—এরকম ভাবা পেছনে কোন যুক্তি নেই। এও সত্য নয় যে, ওই বহু দূরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু—টলেমির এই চিন্তার বিরোধিতা করে কোপার্নিকাস ১৬শ শতাব্দীতে গবেষণা করে জানালেন—পৃথিবী নয়, সূর্যই এই সৌরমন্ডলীর কেন্দ্র ; এবং এমনি রয়েছে আরো অসংখ্য সূর্য অর্থাৎ নক্ষত্র। এটি হল জ্যোতষবিদ্যার উপর প্রথম চরম আঘাত। গ্যালিলিও, জিওরদানো ব্রুনো প্রমুখ ব্যক্তিরা অনেক ত্যাগ স্বীকার করে ও অত্যাচার সহ্য করে এই আঘাতকে শক্তিশালী করেছেন। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বও একই কাজ করেছে।

অনেক জ্যোতিষী নিজেদের ও জ্যোতিষবিদ্যার সমর্থনে প্রচার করে যে, কেপলার-গ্যালিলিও-নিউটন প্রমুখ বিজ্ঞানীরাও জ্যোতিষবিদ্যার চর্চা করতেন। কিন্তু জোহান্নেস কেপলার যদি ঐ যুগে গভীরভাবে জ্যোতিষবিদ্যার ব্যবসা করতেন তবে তাঁকে কপর্দকহীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করতে হত না। গ্যালিলিও টাসক্যানির ডিউক ফার্নিন্যান্ডের কুষ্ঠি তৈরী করে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন, ফার্নিন্যান্ড আরো বহু বছর বাঁচবেন—এর কয়েক সপ্তাহ পরেই ফার্নিন্যান্ডের মৃত্যু গ্যালিলিওর কুষ্ঠিকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে। নিউটনের জ্যোতিষবিদ্যা চর্চার কোন প্রমাণই নেই। ভোল্টেয়ারকে দু'জন তৎকালীন বিখ্যাত জ্যোতিষী বলেছিলেন, তাঁর আয়ু মাত্র ৩২ বছর; ৮৪ বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ভোল্টেয়ার জ্যোতিষবিদ্যার ভ্রান্তি প্রমাণ করেছিলেন! তাই তো ফ্ল্যামেরিয়ানের মত বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ জোর দিয়ে বলেছেন "গ্রহ-নক্ষত্র আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে, এ সম্পর্কে কোন প্রমাণই নেই"। আর কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি নিজের অবৈজ্ঞানিক চিন্তার কোন কিছুর সমর্থনে কিছু বল্লেই তাকে যুক্তিসঙ্গত ভাবাটা ঠিক নয়, যেমন ঠিক নয় মোরারজি দেশাই-র মত লোক যেহেতু বিশ্বাস করে যে নিজের প্রস্রাব খেলে অসুখ সারে, অতএব এটিই ঠিক এবং পৃথিবীর সকলেরই ওষুধপত্রের বদলে প্রস্রাব খাওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে এটিও জানা উচিত যে যদি কিছু সত্যিই ঘটে যার ব্যাখ্যা এখন করা যাচ্ছে না, তবে তার পেছনে কোন বাস্তব, গবেষণাযোগ্য কারণ অবশ্যই রয়েছে।

কোন মানুষের ভবিতব্য কি তার জন্ম সময়ের উপর আদৌ নির্ভর করে? না। মানুষ আজ সিজারিয়ান অপারেশন করে এক একজনের জন্মকে ত্বরান্বিত করতে পারে। জন্ম সময়ের উপর ভবিতব্য নির্ভর করলে সিজারিয়ান অস্ত্রোপচারকারী সার্জেনই

গ্রহনক্ষত্রদের অবস্থান কোন বিশেষ দিন বা সময়কে কোন বিশেষ কাজের পক্ষে সুবিধাজনক করে তুলেছে, কারণ "গ্রহ নক্ষত্রগুলির অবস্থান পৃথিবী থেকে এত দূরে যে তারা পৃথিবীর উপর মহাকর্ষ বা অন্যান্য অভিঘাতজনিত যে বল বা শক্তি প্রয়োগ করে তার পরিমাণ অতি নগণ্য।" তাঁরা আরো বলেন," মানুষ নিজের অসহায় অবস্থায় ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক বহিঃশক্তির উপর নির্ভর করতে চায়। ভাবতে চায়, পৃথিবী-বহির্ভূত কোন অলৌকিক শক্তি বুঝি তাদের ভবিষ্যত নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে বাঁচতে হবে। এটা বোঝা দরকার, আমাদের ভবিষ্যত নিজেদের উপর নির্ভর করছে, কোন গ্রহনক্ষত্রের উপর নয়।"

তাঁরা দ্ব্যর্থহীনভাষায় ঘোষণা করেন, "জ্যোতিষ চর্চার ধ্বজাধারীদের ভন্ডামীর বিরুদ্ধে সরাসরি দৃঢ়ভাবে চ্যালেঞ্জ জানানোর সময় এসেছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবেন মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা—কারণ তিনি শুভ সময় ও লগ্ন দেখে কারোর জন্ম ঘটাতে পারবেন এবং এর বিনিময়ে মোটা ফি দেবেন। অনেকে আবার গর্ভাধানের মুহূর্তটিকে কুষ্ঠি তৈরীর সময় হিসেবে গণ্য করে। প্রাচীন ব্যাবিলন ও গ্রীসে, জন্ম সময় থেকে পিছিয়ে গিয়ে গর্ভাধানের সময় নির্ণয় করা হত এবং ঐ অনুযায়ী কুষ্ঠি তৈরী হত। এখানেও জন্ম সময়ের গুরুত্ব থেকে যাচ্ছে যা ভিত্তিহীন, কারণ জন্ম-সময় সিজারিয়ান অপারেশন সহ মায়ের ও শিশুর শারীরিক গঠন, চিকিৎসকের হস্তক্ষেপ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে প্রভাবিত হতে পারে। হিন্দুপুরাণে পুষ্পনম বলে একজনের কথা বলা হয়েছে যার জন্ম হয়েছিল এক ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীর ঔরসে এবং ঐ ব্রাহ্মণের অপরিচিতা এক মহিলার গর্ভে। ধান্দাবাজ ব্রাহ্মণটি মহিলাকে বোঝায় যে,'একটি পবিত্র মুহূর্ত আছে যে সময়ে যৌনসঙ্গম করলে এর ফলে যে শিশু জন্মাবে সে ঐশ্বরিক গুণাবলী পাবে।'

একজন নারী গর্ভবতী হয় যখন পুরুষের পুংজনন কোষ নারীর ডিম্বকোষকে নিষিক্ত করে। এই নিষিক্তকরণের কাজটি সঙ্গে সঙ্গে ঘটে যায় না—ঘটে যৌনমিলনের কয়েক ঘন্টা পরে এবং যদি ঐ বিশেষ সময়ে নারীর ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বকোষ বেরোয় তবেই, কারণ পুরুষের বীর্যে সব সময় লক্ষ লক্ষ পুংজনন কোষ থাকলেও, স্বাভাবিকভাবে একজন নারীর প্রতি ২৮ দিনে (মাসিক ঋতুতে) দু'টি ডিম্বাশয় থেকে একটি মাত্র ডিম্বকোষের নিঃসরণ ঘটে। প্রাচীন জ্যোতিষীরা এসব ব্যাপার জানত না—তাই তাদের ধারণা ছিল যৌনসঙ্গমের মুহূর্তই একটি ভ্রূণাকার শিশুর প্রথম মুহূর্ত অর্থাৎ গর্ভাধানের সময়। এইভাবে একটি অবৈজ্ঞানিক ধারণা আরো বহু অবৈজ্ঞানিক ও ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দেয়। একইভাবে একটি বৈজ্ঞানিক সত্য আরো বহু বৈজ্ঞানিক চিন্তার পথ প্রশস্ত করে।

মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্র মানুষ বা অন্য প্রাণীর ভ্রূণকে অথবা তার শরীরকে জ্যোতিষবিদ্যার ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রভাবিত আদৌ করে না। আকাশের বহুশত-সহস্রকোটি গ্রহ-নক্ষত্রের আকর্ষণ-বিকর্ষণ-তড়িচ্চুম্বকীয় শক্তি, বিকীর্ণ রশ্মি ইত্যাদির সার্বিক প্রভাব পৃথিবীতে মানুষ, গরু-বাছুর, বটগাছ, খেজুরগাছ ইত্যাদি সব ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর অবশ্যই পড়ে। কিন্তু এই প্রভাব এমন নয় যে তা মানুষ, গরু-বাছুর ইত্যাদির ভবিষ্যৎ, চরিত্র ও স্বভাব ইত্যাদিকেও নিয়ন্ত্রণ করবে।

অনেকে বলেন পূর্ণিমা-অমাবস্যার বাত-ব্যথা বাড়ে এবং এ জাতীয় ঘটনাকে অনেকে মানুষের শরীরে গ্রহাদির প্রভাব তথা জ্যোতিষবিদ্যার স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানর চেষ্টা করেন। পৃথিবীর নিকটবর্তী উপগ্রহ ও নক্ষত্র হিসেবে চন্দ্র ও সূর্যের প্রভাব সমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটা করে। কিন্তু মানুষের রক্ত ও দেহরসের উপরও এধরনের কোন প্রভাব পড়ে কিনা বা সত্যিই পূর্ণিমা ইত্যাদিতে ব্যথা বাড়ে কিনা এটি বৈজ্ঞানিকভাবে ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নয়, যদিও এটি জানা গেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে সমুদ্রের জলের সঙ্গে মানুষের রক্তের রাসায়নিক কিছু মিল রয়েছে।* আর মহাকর্ষের নিয়মে কাছের উপগ্রহ বা নক্ষত্র হিসেবে যদি অতি সামান্য কিছু প্রভাব থাকেও তবে তা অতি নগণ্য এবং এটিও হাস্যকরভাবে অসম্ভব যে, তা মানুষের ভবিষ্যৎ জীবন, সুখ-দুঃখ, বিবাহ সন্তান, চাকুরী, দারিদ্র্য, দুর্ঘটনা, আচার ব্যবহার ইত্যাদি সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করবে। আর জ্যোতিষবিদ্যা বা হস্তরেখাবিদ্যায় শুধু চন্দ্র-সূর্যের কথা বলা হয় না, আরো বহু গ্রহনক্ষত্রাদির কথাও বলা হয় যার সঙ্গে জোয়ার-ভাঁটা বা বাতের প্রকোপের (?) মত ঘটনার সরাসরি যোগাযোগ দেখা যায় না।

সম্পূর্ণ অনুমাননির্ভর ভবিষ্যদ্‌বাণীর চেয়ে জ্যোতিষবিদ্যা-হস্তরেখাবিদ্যার অধিকতর বিশ্বাসযোগ্যতা ও সঠিকতা আদৌ নেই। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে জ্যোতিষী ও হস্তরেখাবিদের ভবিষ্যদ্‌বাণী শতকরা ৬ ভাগ সঠিক হয়। একজন স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও অনেক সময়ই এর চেয়ে বেশী সঠিক ভবিষ্যদবাণী করতে পারেন, যদি সে সব দিক বিবেচনা করে সতর্কভাবে কথাগুলি বলে। সম্ভাব্যতার নিয়মেই এটি ঘটতে বাধ্য। এতে জ্যোতিষবিদ্যার অভ্রান্ততার কোন ব্যাপার নেই। কিন্তু পৃথিবীতে নির্বোধ সরলবিশ্বাসী লোকেদের অস্তিত্ব এবং তাদের অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ও যুক্তিবোধহীনতার অস্তিত্ব যতদিন থাকবে (এটি আবার সামাজিক অর্থনৈতিক অসহায়তার উপর নির্ভর করে) ততদিন ধর্ম-ঈশ্বর-অলৌকিকত্বের মত জ্যোতিষবিদ্যা ইত্যাদির অস্তিত্বও থাকবে,—এবং সমাজের প্রতিকূল শক্তির কাছে অসহায় মানুষ চেষ্টা করবে এই সবের সাহায্যে নিজেকে সন্তুষ্ট করতে, অনাগত ভবিষ্যৎকে সুখী করার চেষ্টা করতে, একান্ত অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে জানতে এবং সান্ত্বনা পেতে। জ্যোতিষবিদ্যার মত অপবিজ্ঞানের যে সামান্য অংশ সম্ভাব্যতার নিয়মে মিলে যায়, সাধারণ মানুষ এবং জ্যোতিষীরা সেটিকেই বড় করে দেখে ও সেগুলিই প্রচার পায়। ব্যর্থতাকে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা সকলেরই রয়েছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক চেতনাসম্পন্ন সচেতন মানুষের উচিত প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরা।

ডঃ কোভুর একাজ করেছেন। তিনি জ্যোতিষী ও হস্তরেখাবিদ্‌দের দাবীকে প্রমাণ করার জন্য চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন (২য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। যে অসংখ্য জ্যোতিষী লম্বাচওড়া ডিগ্রীর ল্যাজ নিয়ে বা জ্যোতিষবিদ্যার অধ্যাপক সেজে, রাস্তাঘাটে বা সুসজ্জিত চেম্বার সাজিয়ে কমবেশী ফি নিয়ে অসংখ্য মানুষকে গম্ভীরভাবে প্রতারণা করে ও নিষ্ঠুর ব্যবসা চালায় তারা কিন্তু ডঃ কোভুরের এ চ্যালেঞ্জে সাড়া দিয়ে জেতার চেষ্টা করেনি। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি কয়েকটি টাকার জন্য এই সব

*Life evolved in the sea water..... Although blood has departed a long way from its primitive ancestor, yet in its inorganic composition, it still maintains a close resemblance with sea water. (Human Physiology : C.C. Chatterjee ; 1969 ; p. 72)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্যোতিষীরা পরিশ্রম (?) করে চলে—কিন্তু তারা যদি স্থির নিশ্চিত থাকত যে তাদের তথা জ্যোতিষবিদ্যার ক্ষমতায় কোন ফাঁকি নেই তবে কি তারা ডঃ কোভুরের চ্যালেঞ্জের এক লক্ষ টাকা জেতার সুযোগ হারাত? না। তারা নিজেরাও ভালভাবেই জানে যে তারা লোক ঠকাচ্ছে এবং তাদের জ্যোতিষবিদ্যা আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়। তাই ডঃ কোভুরের পরীক্ষায় চালাকি ও জ্যোতিষবিদ্যার ভিত্তিহীনতা প্রমাণিত হয়ে যাবে—এই ভয়েই তারা ডঃ কোভুরের মুখোমুখি হয় নি। আর যে দু'একজন সাহস করে এগিয়ে এসেছিল তারা করুণভাবে পরাজিত হয়েছে।

ডঃ কোভুর এ ব্যাপারে নিজেই নিজের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন ডঃ কোভুর ২ বছর 'হোরাশাস্ত্র' নিয়ে গভীর পড়াশুনা করেন। ১৯২৭ সালে তাঁদের ছেলে হল; তিনি তার কুষ্ঠি বিচার করেন। তার লগ্ন যেহেতু ছিল মেষ (Aries), তাই তার নাম রাখা হল অ্যারিস। ঐ কুষ্ঠিতে তিনি 'ভবিষ্যদ্‌বাণী' করেন যে, অ্যারিসের আর কোন ভাই-বোন হবে না। এই বাণী ভবিষ্যতে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এটিকে ডঃ কোভুর নিজের কুষ্ঠি বিচারের সাফল্য হিসেবে প্রচার করেন নি,—বরং করতে পারেননি, কারণ অ্যারিসের জীবন সম্পর্কিত অন্যান্য সব ভবিষ্যদ্‌বাণীই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। আর সত্যি কথা বলতে কি অ্যারিসের আর ভাই-বোন না হওয়ার ব্যাপারটি ডঃ কোভুর ও তাঁর স্ত্রীর সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করেই হয়েছে, অ্যারিসের জীবনে 'প্রভাববিস্তারকারী' গ্রহ-নক্ষত্রের জন্য নয়।

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে ডঃ কোভুর সস্ত্রীক দক্ষিণ ভারতের ত্রিচি শহরের রাস্তায় হাঁটছিলেন। হঠাৎই চোখে পড়ল এক জ্যোতিষীর 'চেম্বার'। এ ব্যক্তিটির কাছে পৃথিবীর সব মানুষের, শত সহস্র কুষ্ঠি রয়েছে—যা নাকি আগেভাগেই লিখে রেখে গেছেন প্রাচীন মুনিঋষিরা। লোকটি কোন খদ্দেরের কুষ্ঠি বাছে তার তোতাপাখির সাহায্যে। পাখিটি অলৌকিকভাবে ঐ ঠিকুজী-কুষ্ঠির স্তূপ থেকে খদ্দেরের কুষ্ঠিটিই নাকি বের করে আনে। ডাঃ কোভুর এক টাকা 'ফি' দিয়ে তাঁর কুষ্ঠিটি বের করে দিতে বল্লেন। তোতাপাখিটি এনে দিল ৩৭ নং কার্ড। লোকটি ৩৭ নং কুষ্ঠিটি বের করে ডঃ কোভুরকে দিলে জানাল এটিই তাঁর কুষ্ঠি। তামিল ভাষায় লেখা। ডঃ কোভুর এ ভাষা জানেন না, তাই জ্যোতিষীটিই পড়ে বুঝিয়ে দিতে গেল। ডঃ কোভুর তাকে বারণ করলেন। এবং লোকটিকে হতবাক করে দিয়ে আরেক টাকা 'ফি' দিয়ে বল্লেন আগের কার্ড ও কুষ্ঠিটি যথাস্থানে রেখে দিয়ে আরেকবার তোতাপাখিটিকে দিয়ে তাঁর কুষ্ঠি বেছে দিতে। নিরুপায় জ্যোতিষী আবার তোতাপাখিটিকে ছাড়ল। এবার এল ১০৯ নং কার্ড অর্থাৎ ১০৯ নং কুষ্ঠি। একই লোকের একাধিক কুষ্ঠি! হাতে নাতে ধরা পড়ল চালাকিটি। মুনি-ঋষিদের দ্বারা এক একজনের জন্য এক একটি কুষ্ঠি লিখে রেখে যাওয়া বা অলৌকিকভাবে তোতাপাখির কুষ্ঠি বাছাই—সবই ধাপ্পা। পাখিটি তার ইচ্ছেমতোই কার্ড অর্থাৎ কুষ্ঠি বাছে। লোকটি তাকেই খদ্দেরের কুষ্ঠি বলে চালায় এবং বুদ্ধিমানের মত বলা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুমান নির্ভর কিছু কথা খদ্দেরের জীবনের সঙ্গে মেলেই। সরল ও অন্ধবিশ্বাসী খদ্দের এটিকেই জ্যোতিষবিদ্যা তথা অলৌকিকত্বের প্রমাণ হিসাবে বিশ্বাস করে। আর কেউই চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য একাধিকবার কুষ্ঠি বাছাই করে না। জ্যোতিষীরা এই ধরনের বিভিন্ন কৌশলেই বোকা লোকেদের ঠকিয়ে ব্যবসা চালায়।

শ্রীলংকার এক জ্যোতিষীর নাকি লন্ডনে ভবিষ্যদ্বক্তা হিসাবে রমরমা ব্যবসা ছিল। ঘানার প্রেসিডেন্টের হাত দেখে সে নাকি বলে দিয়েছিল তাঁর দেশের কোথায় মাটির নীচে তৈল-সম্পদ রয়েছে। এধরনের কিছু জ্যোতিষীর সাহায্য নিলে তো, ভূবিদ্যাচর্চার কোন প্রয়োজনই থাকবে না—সারা পৃথিবীতে এই ধরনের জ্যোতিষীকে কাজে লাগালে মাটির নীচের বিভিন্ন সম্পদ তথা আরো নানা তথ্যই জানা সম্ভব হবে! আধুনিক বিজ্ঞানের তাহলে আর প্রয়োজন কেন, কেন বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণার জন্য এত অর্থব্যয় ও পরিশ্রম ?

১৯৭৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী শ্রীলংকার থার্স্টান কলেজের হলে এই জ্যোতিষীদের চ্যালেঞ্জ দিয়ে জ্যোতিষবিদ্যার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা গ্রহণ করার ব্যবস্থা করেন ডঃ কোভুর। তথাকথিত জ্যোতিষবিদ্যা শেখানর কলেজের অধ্যাপকসহ দেশবিদেশের বহু জ্যোতিষীকে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু পরিপূর্ণ হলঘর থেকে মাত্র একজন জ্যোতিষীই সাহস করে উঠে এল চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে! স্থানীয় পুলিশ ও বিশিষ্ট লোকেদের দ্বারা অনুমোদিত দশটি হাতের ছাপ জ্যোতিষীকে দিয়ে বলা হল সংশ্লিষ্ট ছাপটি পুরুষ কি মহিলার, জীবিত কি মৃত ব্যক্তির তা বলতে। এরপর একজন সাধারণ দর্শককে বলা হল এই একই কাজ করতে। দু'জন সাংবাদিক এঁদের সিদ্ধান্ত বিচার করলেন। দেখা গেল জ্যোতিষী শতকরা ৩০ ভাগ ও ঐ সাধারণ দর্শক ভদ্রলোক শতকরা ২০ ভাগ সঠিক উত্তর দিয়েছিলেন। জ্যোতিষীর ক্ষমতা যে আদৌ নির্ভরযোগ্য নয় তা এর থেকেই বোঝা যায়। নেহাতই সম্ভাব্যতার নিয়মে ও কাকতালীয় ভাবে জ্যোতিষীটি সামান্য বেশী সঠিক উত্তর দিয়েছেন। অন্য কোন ব্যক্তিকে দিয়ে পরীক্ষা করালে তিনি হয়তো আরেকটু বেশী সঠিক উত্তর দিতে পারতেন।

জ্যোতিষবিদ্যায় আগ্রহ ও বিশ্বাস ব্যাপক মানুষেরই রয়েছে। নিজেদের জীবনের অনিশ্চয়তা, সামগ্রিকভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব ইত্যাদি কারণ ছাড়া জ্যোতিষবিদ্যার অপবিজ্ঞানসুলভ ধোঁকাটিও সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের নাম, তাদের অবস্থান সম্পর্কে জটিল অঙ্ক ও হিসাব-নিকাশ, নানা ধরনের ছক কাটা ও গম্ভীর কথাবার্তা—সব মিলিয়ে সাধারণ বিচার-বুদ্ধির একজন মানুষ জ্যোতিষবিদ্যাকে বেশ একটি বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপার-স্যাপার বলে ধরে নেন। ঠিক একইভাবে তথাকথিত গুণিন, ওঝা, পুরোহিত, অবতার ইত্যাদিরা নানা আগড়ুম বাগড়ুম কথাবার্তা ও জটিল কাজকর্ম করে সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্যোতিষীর উপর দেশের নেতারাও আস্থা প্রকাশ করেন—যা সামগ্রিক অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রতিফলন। শ্রীলংকার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী এস. ডব্লু. আর. ডি. বন্দরনায়েক তাঁর পারিবারিক জ্যোতিষীর পরামর্শে পূর্ব নির্দিষ্ট সময়কে পিছিয়ে ৩০ মিনিট পরে শপথগ্রহণ করেন। কিন্তু এই 'পুণ্য' মুহূর্তে শপথ নেওয়া সত্ত্বেও নিজের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তাঁকে খুন হতে হয়। ভারতবর্ষের প্রয়াতা প্রধানমন্ত্রী তো কথায় কথায় জ্যোতিষীর পরামর্শ নিতেন এবং বেশ কিছু কাল এ ধরনের কাজ করে গেছেন। এখনকার রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী-মন্ত্রীরাও তাই-ই করেন। সাধারণ মানুষ এ ধরনের বিশিষ্ট লোকেদের দেখেও বিভ্রান্ত হয়—ভাবে, এতবড় একজন মানুষ যা করছেন তা কি কখনো ফ্যালনা ?

কাকতালীয়ভাবে কিছু কিছু মিলে যাওয়া ছাড়া, জ্যোতিষীদের সুকৌশল কথাবার্তার ফলেও সাধারণ মানুষ অনেক কিছু সঠিক বলে মনে করেন ! বিভিন্ন পত্রিকায় দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক রাশিফল বোরোয়। পাঁজির তো কথাই নেই। এই সব রাশিফলে বিখ্যাত জ্যোতিষীরা বলে, "শরীর আশানুরূপ ভালো চলবে না", "আর্থিক সুরাহা কিছুটা হলেও ব্যয়াধিক্য চলবে," ইত্যাদি। এ ধরনের কথাবার্তা প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই কোন না কোনভাবে মিলে যায়—অর্থাৎ এই ধরনের ধোঁয়া ধোঁয়া কথার নানা ধরনের অর্থ করা যায়। সাধারণ মানুষ বাস্তব ঘটনার সঙ্গে নিজের মত করে এগুলিকে মেলান, জ্যোতিষীরাও বেশ নিরাপদ অনুভব করে। এই ধরনের ভাষা ব্যবহার করে যে কোন সতর্ক মানুষই বহু 'সঠিক ভবিষ্যদ্‌বাণী' করতে পারেন,— তথাকথিত জ্যোতিষবিদ্যা না জেনেই।

মূল ব্যাপার হল, জনগণের জীবনের অনিশ্চয়তা ও বহমান সমস্যার স্রোত জ্যোতিষবিদ্যা, হস্তরেখাবিদ্যা ইত্যাদি টিকে থাকার প্রধান একটি কারণ। সমাজের প্রতিটি মানুষই যদি নিশ্চিত থাকতেন যে তাঁদের জন্ম, বেড়ে ওঠা, পরিণত বয়সে কষ্টহীন মৃত্যু, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকুরী বা দৈনন্দিন স্বাচ্ছন্দ্য, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান, যৌনজীবন ইত্যাদি সবকিছুই সমস্যামুক্ত হবে, তবে আর এভাবে সহজ উপায়ে অনাগত ভবিষ্যৎকে জানার ও তার খন্ডনের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করতে না। তাই অবৈজ্ঞানিক বা ভ্রান্ত হলেও জ্যোতিষবিদ্যা ও জ্যোতিষীর মত বুজরুকরা মানুষের মধ্যে টিকে থাকবে যদ্দিন না মূল সমস্যার সমাধান হয়। একইভাবে টিকে আছে ঈশ্বর, ধর্ম, অবতারত্ব, অলৌকিকত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত ভ্রান্ত বিশ্বাস ও এদের উপর অসহায় নির্ভরতা।

শ্রী ভি.ভি. ভুজলে বলে একজন 'টাইম্‌স অব্ ইন্ডিয়া'তে জ্যোতিষবিদ্যার সমর্থনে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি বলেছেন, "জ্যোতিষবিদ্যা তার জনপ্রিয়তা পুনরায় অর্জন করেছে। পাশ্চাত্যের শিক্ষিত লোকেরা, বিশষতঃ যুক্তরাষ্ট্রে, পরস্পরের জন্মলগ্ন সম্পর্কে খোঁজ নেন।...এটি অস্বীকার করা যায় না যে, অনেক বিজ্ঞানী ও গবেষকরা জ্যোতিষবিদ্যার তথ্য সংগ্রহ ও পরীক্ষা করছেন। জ্যোতিষবিদ্যা তার ঐতিহ্যময় প্রাচীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপ থেকে আধুনিকতায় রূপান্তরিত হবে—ও সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কার্ল জুং জ্যোতিষবিদ্যার ঘটনাবলীর সত্যতায় বিশ্বাসী। যে সব বিজ্ঞানী জ্যোতিষবিদ্যাকে কুসংস্কার ছাড়া কিছুই বলেন না, তাঁদের চেয়ে অধ্যাপক জুং কুসংস্কারের সৃষ্টি ও স্বরূপ সম্পর্কে বেশীই জানেন।...জ্যোতিষবিদ্যা যে কুসংস্কার তা প্রমাণ করতে কোনদিনই বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়নি।...জ্যোতিষবিদ্যাকে হতমান করার আগে এর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে উপযুক্ত গবেষণা হওয়া উচিত।" (আরো অনেকেই এই জাতীয় কথাবার্তা বলে এখনো মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছেন।)

জ্যোতিষবিদ্যার মত প্রাচীন অপবিজ্ঞানের অবশেষগুলির উপর ডঃ কোভুরের মত আরো অনেকেই ক্রমশঃ বেশী বেশী করে গবেষণা করেছেন এবং তাই এর ওপর পড়াশুনা করছেন। এর অর্থ জ্যোতিষবিদ্যার সঠিকতা বা ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তা নয়। পাশ্চাত্য দেশগুলির যান্ত্রিক বস্তুবাদী সভ্যতার কুফলে এবং ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে সম্পদের মধ্যে দারিদ্র্য, বিলাসের মধ্যে হতাশা, এবং প্রাচুর্যের মধ্যে জীবনের অনিশ্চয়তা ও ক্ষোভ ইত্যাদি ক্রমবর্দ্ধমান। এ সবের ফলেও ঐ সব দেশের কিছু কিছু ব্যক্তি (এদের মধ্যে কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিও আছেন) জ্যোতিষবিদ্যার মত রহস্যময় অপবিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকেছে। একইভাবে এরা শুরু করেছে নানা অবতারের আরাধনা, কৃষ্ণ ইত্যাদির পূজা, তুরীয় ধ্যান (T.M.) ও আরো নানা আগড়ুম বাগড়ুম (এ সম্পর্কে আগেই আলোচনা রয়েছে)। এগুলি জ্যোতিষবিদ্যার তথা ঈশ্বর, প্রাচীন ধর্ম, তুরীয় ধ্যান, কৃষ্ণ মাহাত্ম্য ইত্যাদির বৈজ্ঞানিক ভিত্তির আদৌ কোন প্রমাণ নয়। জুং-এর মত কেউ বল্লেও নয়—যেখানে গ্রহাদির প্রভাব সম্পর্কিত মূল ভিত্তিটিই অবৈজ্ঞানিক ও ভিত্তিহীন।

ডঃ কোভুরের মত অনেকেই মত প্রকাশ করেন (স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য ও বিজ্ঞানীদের বিবৃতি দ্রষ্টব্য) যে, জ্যোতিষবিদ্যা ভ্রান্ত ছাড়া কিছুই নয়। এ নিয়ে গবেষণা আরো চালানো উচিত। কিন্তু তা হওয়া উচিত প্রকৃত সত্যকে বৈজ্ঞানিকভাবে জানার জন্য, সুকৌশলে অপবিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নয়। প্রাচীন অ্যালকেমিষ্টরা একইভাবে একসময় অমৃত, পরশপাথর ইত্যাদি খোঁজা বন্ধ করেছিলেন, পাশাপাশি আবিষ্কার করেছিলেন আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি, ফসফরাস এবং আরো অনেক কিছু। সৎ জ্যোতিষীদেরও উচিত ভ্রান্ত বিশ্বাসকে আঁকড়ে রেখে সাধারণ মানুষের আর সর্বনাশ না করে, জ্যোতির্বিদ্যা (astronomy)-র বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে বলীয়ান হয়ে মানবজাতিকে সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করে তোলা।

[বিভিন্ন 'গ্রহকে সায়েস্তা' করার জন্য অনেক জ্যোতিষী আবার গ্রহরত্ন ধারণের পরামর্শ দেয় এবং ব্যবসা চালায়। বাত, হাঁপানি, মৃগী, মানসিক রোগ ইত্যাদির জন্যও গ্রহরত্নের প্রেস্ক্রিপ্শান করে ওরা। ব্যাপারটিও নিতান্তই ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। সব 'গ্রহরত্নই' নিছক রাসায়নিক কিছু পদার্থ ছাড়া অন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু নয়। যেমন হীরা হচ্ছে কার্বন; চুনি ও নীলা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (অল্প পরিণাম লোহা, টাইটেনিয়াম অথবা ক্রোমিয়াম অক্সাইডের উপস্থিতির জন্য বিভিন্ন রঙ হয়—যেমন পীতাম্বর নীলা, রক্তমুখী নীলা ইত্যাদি); পান্না হচ্ছে বেরিলিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট; বৈদূর্যমণি বা cat's eye হচ্ছে বেরিলিয়াম ও অ্যালুমিনিয়ামের মিশ্র অক্সাইড; গোমেদ হছে ক্যালসিয়াম, ম্যাঙ্গানীজের এবং লোহা, ক্রোমিয়াম বা অ্যালুমিনিয়ামের মিশ্র সিলিকেট; পোখরাজ হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট ইত্যাদি। এরা সবই খনিজ পদার্থ। প্রবাল বা পলা হচ্ছে সমুদ্রজ ক্যালসিয়াম কার্বনেট।

কোন বিশেষ রোগে এই সব রাসায়নিক যৌগের জ্যোতিষবিদ্যা-নির্দেশিত কোন প্রভাব আদৌ প্রমাণিত নয়। আঙ্গুলে ঐসব আংটি করে পরলে কোন ভাবেই সেটি শরীরের উপর প্রভাব ফেলে না, চামড়া দিয়ে শরীরের ভেতরেও যায় না। ঐগুলির একমাত্র প্রভাব, নির্বোধের মত পয়সা খরচ করে পাথর (রত্ন!) কিনে আত্মতৃপ্ত হওয়া এবং বুজরুক রত্নব্যবসায়ীর উপর সন্দেহের অতীত আস্থার কারণে মানসিক সাহস অর্জন —সব মিলিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সব সময় নিজের অর্থ অপচয় ও বোকামির যুক্তি খোঁজার, নিজেকে চালাক প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। যে দু' একটি ক্ষেত্রে রোগী কিছু ফল পায় তা বৈজ্ঞানিকভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, তা কাকতালীয়ভাবে, অন্যান্য চিকিৎসার ফলে, রোগীর মানসিক আস্থা ও জোরের কারণে ইত্যাদি কোনভাবে ঘটেছে।

অনেক জ্যোতিষী এমনকি 'বিজ্ঞানে শিক্ষিত' ব্যক্তিও গ্রহরত্নের নিদারুণ ক্ষমতার প্রমাণ দেন এইভাবে,—গ্রহরত্নের উপর (যেমন গোমেদ, পলা ইত্যাদি) একটি কাপড় টানটান করে বেঁধে তাতে আগুন লাগান এবং দেখান যে কাপড়টি পুড়ছে না—অর্থাৎ ঐ তেজী গ্রহরত্ন আগুনের তাপও শুষে নিচ্ছে। আসলে মসৃণ 'রত্নের' উপর টানটান করে কাপড় বেঁধে একদিকে আগুন দিলে উল্টোদিক থেকে অক্সিজেনের অভাবের জন্যই কাপড়ের দহনকার্যটি সম্পন্ন হয় না। মসৃণ কাঁচের বা পাথরের গুলিতেও একই ভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে কাপড়ে আগুন লাগে না। এতে গ্রহরত্নের বিশেষ কোন ক্ষমতার ব্যাপার বিন্দুমাত্র নেই।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবম পরিচ্ছেদ

আত্মা, পুনর্জন্ম ও জন্মান্তরবাদ

পৃথিবীর প্রায় সব ধর্মেই প্রাণীর শরীরের ভেতর আত্মার অস্তিত্ব এবং শারীরিক মৃত্যুর পর এই আত্মার অন্যরূপে অন্য স্থানে পুনর্জন্ম লাভের ব্যাপারটার কথা বলা হয়। হিন্দু ধর্ম সহ বহু ধর্মেই এ নিয়ে বহু গাঁজাখুরি গল্পও প্রচলিত রয়েছে। গৌতমবুদ্ধ অনাত্মার কথা বল্লেও তাঁর প্রচলিত ধর্মেও পুনর্জন্মের গালভরা সব গল্প জাতকের কাহিনী হিসেব প্রচারিত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে অনেক 'গবেষক অনুসন্ধানী'ও নাকি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এমন অনেক শিশু বা ব্যক্তির খোঁজ পেয়েছেন যারা তাদের পূর্বজন্মের নানা স্মৃতি ও কাহিনী অদ্ভুতভাবে বলতে পেরেছে। শুধু শ্রীসত্যজিৎ রায়ের 'সোনার কেল্লার' গল্প নয়, ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর অন্যান্য দু-একটি-স্থানের 'পরামনোবিজ্ঞান গবেষণা' সংস্থাও নাকি দেখেছে যে পূর্বজন্ম-পুনর্জন্ম-জন্মান্তরবাদ কোন মিথ্যা ব্যাপার নয়। 'পরোমনোবিজ্ঞান গবেষণা সংস্থা' সহ যারা এইসব ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলো ভাঙ্গিয়ে খায় তাদের কাজকর্ম তো বটেই, কিন্তু আরো দুঃখবহ হল যখন শ্রীসত্যজিৎ রায়ের মত শ্রদ্ধেয় ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরাও সচেতন বা অসচেতন ভাবে এই সব ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলো ব্যবসায়িক কারণে প্রচার করেন। বিপুল সংখ্যক কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী ও মানুষের মনের মধ্যে এইসব দক্ষ প্রচার কুসংস্কারের শেকড়কে গভীরভাবে পুঁতে দেয়।

আসলে পূর্বজন্ম-পুনর্জন্মের স্বপক্ষে তথাকথিত গবে   ফলাফলগুলো হয় চমক লাগানোর জন্য ইচ্ছা করেই মিথ্যা প্রচার অথবা ভ্রান্ত ভাবে অনুসন্ধান করে পাওয়া ভ্রান্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে নেওয়া ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত।

[এ প্রসঙ্গে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা, বিজ্ঞান-আচার্য সত্যেন্দ্র নাথ বসু নিজের জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন—

"...জন্মজন্মান্তরের কথার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদের সমন্বয় কি সম্ভব? বিজ্ঞানী স্মরণ নেন দার্শনিকের—দার্শনিকরা একটু হাসেন মাত্র। বিজ্ঞানীরা মনে করেন তাঁদের বলা উচিত,—এই শাস্ত্র, দর্শন, জ্ঞান কি ধর্ম এসব এমন কিছু নয়। মানুষ প্রত্যহ যে কাজ করার প্রেরণা পাচ্ছে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে এ সবের প্রভাবে। যদি বলা যায়, যাই করো আর তাই করো—শেষে যা দাঁড়াবে সবই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগে থেকে লেখা আছে—তাহলে তো কারুর কাজ করার চেষ্টাই হবে না। আজকের দিনে যা মনে করছি—আমরা আজ যার জ্বালায় জ্বলছি—সে জ্বালা নিবারণ করতে কারোর চেষ্টা হবে না। তার জন্য তারকেশ্বরে বা কালীঘাটে ধন্না দিলেই হবে! জন্মান্তরবাদ বিজ্ঞানীদের কাছে প্রকান্ড রহস্য। এর মর্ম ভেদ করতে অনেক বিজ্ঞানী মাথা কুটছেন। আমার মনে আছে একদিনের ঘটনা। এক সাধুর কাছে গিয়ে এই প্রশ্নের অবতারণা করেছিলাম। তাঁকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম—বন্ধুবর বিধুভূষণ রায়ও তাঁকে শক্তিশালী মহাপুরুষ বলে বিশ্বাস করতেন, কারণ সায়েন্স কলেজে মারাত্মক রোগে তিনি যখন হতজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, সেই সময় ঐ সাধুর করুণায় তিনি বেঁচে উঠেছিলেন বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সাধুকে একদিন সুযোগ মতো আমরা দু'জনে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাবা জন্মান্তর কি সত্য ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ।' কিন্তু আমরা দু'জনে কেউই মনকে মানাতে পারছি না। তাঁকে বারবার জিজ্ঞাসা করছি, 'আচ্ছা আপনি বলছেন যে জন্মান্তর আছে, এ কি আপনি নিজে জেনেছেন ?' তিনি উত্তর দিলেন, তাঁকে বলেছেন আরেকজন যোগী। এতে কি বিধুভূষণ, কি আমি কেউই সন্তুষ্ট হলাম না। বারবার ঐ একই প্রশ্ন, নানাভাবে। শেষ অবধি তিনি একটা গান ধরলেন, ভাবে তন্ময় হয়ে তাঁর চোখের জল পড়তে লাগলো। গানের ভাবার্থ—'মা তুমি আমাকে কোথায় ফেললে ? এই অরণ্যে কাঁটাবনে আমার সারা অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল—মা তুমি আমাকে কোলে তুলে নাও।' সেদিন বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এলাম।" (সপ্ততিতম জন্মদিবসে; সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন; বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ; ১৩৮৭) জন্মান্তর বাদ, ধর্ম, ঈশ্বর ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্নগুলি এইভাবে সাধু-ফকিররা সুকৌশলে এড়িয়ে যায় এবং বেশী প্রশ্ন করলে চোখের জল ফেলে, গান গেয়ে বা নানা ধরনের আবেগপূর্ণ কথাবার্তা বলে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। সত্যেন্দ্রনাথ বসুরা 'বিফলমনোরথ' হলেও সরল মানুষেরা কিন্তু ভক্তি গদ্‌গদ্ চিত্তে বাবার পায়ে লুটিয়ে পড়ত এবং হয়তো মূঢ় প্রশ্নের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিত! (শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্রনাথ বসুও যে ধর্ম ঈশ্বর ইত্যাদি সম্পর্কিত নানাবিধ ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে পুরোপুরি মুক্ত ছিলেন তা অবশ্য বলা যায় না)।]

পৃথিবীর (এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোথাও যদি প্রাণের অস্তিত্ব থাকে তবে সেখানকারও) সমস্ত প্রাণীর প্রাণশক্তির মূলে রয়েছে বহুবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া,—কোন আত্মা নয়। মানুষের শরীরে শ্বাসপ্রক্রিয়ায় যে অক্সিজেন গ্রহণ করা হয় তার সাহায্যে, শরীরের নানা রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়ায়, গৃহীত খাদ্যের জারণে যে শক্তি উৎপন্ন হয় সেটি শরীরকে কর্মচঞ্চল রাখে। একটি বাতি জ্বালালে দহন-ক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হয়, নিভিয়ে দিলে তা বন্ধ হয়ে যায়, আবার জ্বালালে আবার তাপশক্তি নির্গত হয়। এই মোমবাতি নিভিয়ে দেওয়ার সময় যেমন কোন আত্মা তার থেকে বেরিয়ে যায় না, শুধু রাসায়নিক ক্রিয়াই বন্ধ হয়ে যায়, তেমনি কারোর মৃত্যুর অর্থ তার শারীরিক নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া—আত্মা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেরিয়ে যাওয়া নয়। একজন মানুষের শরীর থেকে যখন হাত-পা কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হয় তখন তার শরীরের মোট আত্মার কিছু অংশও ঐ কাটা হাত-পায়ের সঙ্গে চলে যায় না। শরীরের মূল অংশের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে নিরন্তর পুষ্টি-রক্ত-অক্সিজেন ও স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির অভাবে কোষগুলি নষ্ট হয়ে যায় মাত্র। অনুরূপভাবে জন্মের পর থেকেই একজন মানব শিশুর শরীরের মৃত্যু শুরু হয়। নিরন্তর বহু কোষ নষ্ট হয়ে যায় ও কোষ বিভাজনে নতুন কোষ সৃষ্টি হয়। জীবনের প্রথমের দিকে নতুন কোষ সৃষ্টির হার অনেক বেশী বলে শরীরের বৃদ্ধি ঘটে, তারপর কোষ নষ্ট হওয়ার হার বেশী হয়ে শরীরের ক্ষয় হয়। এই অসংখ্য জীবন্ত কোষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মোট আত্মার যে অংশ কোষগুলির মধ্যে রয়েছে সেগুলিও বেরিয়ে যায় না অথবা নতুন কোষে ঢুকে যায় না। ব্যাপারটি সম্পূর্ণই জৈব প্রক্রিয়া। অনুরূপভাবে, একজন পুরুষ ও নারীর পুং ও স্ত্রী জননকোষের মিলনে যে ভ্রূণের সৃষ্টি হয় সেটি বিভাজিত হয়ে বৃদ্ধি পেতে পেতে মানব শিশুর জন্ম দেয়। এই মানবশিশুর শরীরে তার মা ও বাবার তথাকথিত আত্মার কিছু কিছু এসে ঢুকে যায় না—যা আসে তা হল জননকোষের ক্রোমোজোমের মাধ্যমে বাবা-মায়ের গুণাবলী।* এই ক্রোমোজোমের সঙ্গেও আত্মার কোন সম্পর্ক নেই—সেটি কার্বন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি নানা মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরী ডিঅক্সিরাইবো-নিউক্লিক অ্যাসিড ইত্যাদিতে গঠিত। মানুষ যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তখন এই শেষ নিঃশ্বাসে কোন আত্মা বেরিয়ে যায় না—অন্য সাধারণ নিঃশ্বাসের মতই কার্বন ডাই অক্সাইড, জলীয়বাষ্প ইত্যাদি বেরোয়। সাধারণ ধারণা হচ্ছে আত্মার অস্তিত্ব হৃদয়ে। হৃদয় বা হৃদপিণ্ড একটি মাংসল কুঠরি—রক্তে পরিপূর্ণ। তার কোষগুলি বিশেষ জৈব-রাসায়নিক ক্ষমতায় নিরন্তর সংকোচনও প্রসারণশীল। এর ভেতরে আত্মা নামে কোন জিনিস নেই, যদিও হৃদয় সম্পর্কে এই ভ্রান্ত ও আদিম ধারণা থেকেই হৃদয়বান, হৃদয়হীন ইত্যাদি ধরনের কথা সব ভাষাতেই চালু হয়েছে। 'প্রেয়িং মেন্টিস' নামে এক ধরনের পোকা রয়েছে যেটি এই জাতীয় আরো কিছু পোকামাকড়ের মত দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পরও সেই খণ্ডগুলি বেশ কিছুদিন জ্যান্ত থাকে। এর অর্থ এই নয় যে তার মূল আত্মাটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল।

আত্মা নামে কোন পদার্থ আদৌ নেই। প্রাণীর প্রাণধারণের মত একটি অত্যদ্ভুত ঘটনার উপযুক্ত ব্যাখ্যা না পেয়ে মানুষ প্রাচীনকালে (এখন থেকে প্রায় ৬০,০০০ বছর আগেকার নিয়ানডার্থাল মানুষ) এই আত্মাকেই প্রাণের কারণ হিসেবে কল্পনা করে নিয়েছে, এইভাবে মানুষ তার সদা অনুসন্ধিৎসু মনকে সন্তুষ্ট করেছে।

---

*যদি যমজ শিশু হয় তবে তারা মূল আত্মার অর্দ্ধেক অংশ পায় না। পায় বাবা-মায়ের কাছ থেকে সমসংখ্যক ক্রোমোজোমই। (এক ধরনের যমজদের ক্ষেত্রে বাবা ও মায়ের দু'টি করে জনন কোষ নিষিক্ত হয়, আরেক ধরনের ক্ষেত্রে একটি করে জননকোষ নিষিক্ত হয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেবেছে—কেউ মারা গেলে তার আত্মা বেরিয়ে যায় এবং আরেক নবজাত শিশুর শরীরে ঢুকে যায়। এইভাবেই এসেছে পুনর্জন্মের ধারণা। এই সব আত্মার উৎসস্বরূপ এক পরমাত্মার কথাও ভাবা হয়েছে এবং পুরো ব্যাপারটাই এক সময় ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে মিশে গেছে।

কিন্তু আজ মানুষ জানতে পেরেছে—আত্মা নয়, বিভিন্ন বস্তুর রাসায়নিক ক্রিয়াই প্রাণশক্তির মূলে ; তা সত্ত্বেও বহু লোক এখনো ধর্ম, ঈশ্বর, অলৌকিক শক্তি, জ্যোতিষ ইত্যাদির মত জন্মান্তরবাদে তথা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। এদের মধ্যে তথাকথিত অনেক গবেষক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিও রয়েছে যারা ধর্মগুরু, ওঝা, গুণিন, জ্যোতিষী, অবতার ইত্যাদিদের মতই ব্যাপক মানুষের মন কলুষিত করে চলেছে।

প্রথমতঃ, জন্মান্তরবাদ যে বৈজ্ঞানিক নয় তার কারণ আত্মার কোন অস্তিত্বই নেই—সুতরাং নবজাত শিশুর শরীরে তার ঢুকে যাওয়ারও কোন প্রশ্নই নেই। দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞানের সব নিয়মের মত এ ব্যাপারটিও আদৌ সর্বজনীন নয়, হঠাৎ হঠাৎই এক একজনের ক্ষেত্রে এ ধরনের গাঁজাখুরি গল্প ছড়ানো হয়।

কেউ কেউ বলে যে, জন্মান্তরে আগের জন্মের কিছু শারীরিক চিহ্নও থেকে যায় যেমন কারোর জড়ুল, আঁচিল ইত্যাদি। তাহলে এটি চক্ষুদানকারী বা কিডনী-দানকারী মানবতাবাদী ব্যক্তিদের এই মহৎ দানকার্য থেকে বিরত করবে, তার কারণ মৃত্যুর আগে এগুলি দান করে দিলে পরের জন্মে চক্ষুহীন বা কিডনী-হীন অবস্থায় জন্মলাভের ভয় থাকবে। কারোর শরীরের জন্মগত কোন বৈশিষ্ট্য বা বিকৃতির মূলে মূলতঃ রয়েছে জেনেটিক কারণসমূহ—পূর্বজন্মের কর্মফল বা এই ধরনের কোন কারণ নয়। জন্মান্তরবাদ যদি সত্যি হয় তবে উন্নত ধরনের গাই-মহিষ-ঘোড়া বা অন্যান্য উপকারী জীবজন্তু অথবা উচ্চ ফলনশীল ধান গাছ ইত্যাদির সৃষ্টি ও বংশ বৃদ্ধির জন্য কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজন নেই, কারণ একবার এ ধরনের জীবজন্তু বা গাছপালা সৃষ্টি করলে এগুলির আত্মাই বার বার আরো এ ধরনের প্রাণী বা উদ্ভিদ সৃষ্টি করে যাবে।

জন্মান্তরে পূর্বজন্মের স্মৃতি, জ্ঞান, চিন্তাধারাও লাভ করা যায় বলে বলা হয়। এটি যদি সত্য হয় তবে এখনকার কোন বিখ্যাত অঙ্কবিদ যদি পরের জন্মে গাধা হয়ে জন্মায় তবে তার মধ্যেই অঙ্কের বিপুল জ্ঞান থাকবে এবং এই ধরনের গাধা খুঁজে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক করে দেওয়া যায়। আসলে স্মৃতি-জ্ঞান-চিন্তা তথা মন বা মানস্ ইত্যাদির অশরীরী ও বস্তু-বহির্ভূত কোন অস্তিত্ব নেই। জীবন্ত স্নায়ুকোষের ক্রিয়ার ওপরই এটি নির্ভর করে। মৃত্যুর পর স্নায়ুকোষ আর বেঁচে থাকে না—তাই কোন মৃত মানুষের কোন চিন্তাভাবনাও থাকে না। এই চিন্তাভাবনা আত্মা মারফত পরজন্মে প্রবাহিত হয়—এটি ভাবাটা হাস্যকর,—যেমন হাস্যকর মৃত্যুর মুহূর্তে কেউ মুরগীর মাংস খেতে খেতে বিষম খেয়ে মরলে পরের জন্মে জন্মানর সঙ্গে সঙ্গেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে তার আধখাওয়া মুরগীটি খেতে চাইবে। স্মৃতি ও চিন্তাকে ধারণ করার মত জীবন্ত শরীর এবং সৃষ্টি করার জন্য জীবন্ত স্নায়ু-কোষ যদি না থাকে তবে এগুলির কোন অস্তিত্ব থাকবে না অর্থাৎ এগুলি একান্তভাবেই বস্তু তথা জীবন্ত শরীর ও জীবন্ত কোষ নির্ভর। মৃত ব্যক্তির চিন্তাভাবনা, স্মৃতি ইত্যাদি হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে অন্য কোন শিশুর শরীরে বা গর্ভস্থ ভ্রূণে ঢুকে যেতেও কোনভাবেই পারে না। জ্বালানি ছাড়া যেমন আগুন জ্বলে না তেমনি পুষ্টি, অক্সিজেন ইত্যাদি যুক্ত শরীর ছাড়াও কোন প্রাণ, স্মৃতি ও চিন্তা থাকতে পারে না। অশরীরী আত্মা ইত্যাদির মত কথাগুলি নির্বোধ ব্যক্তির ভ্রান্ত প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়— তা সে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম ইত্যাদি যে ধর্মে যেভাবেই বলা হোক না কেন। অনুরূপভাবে চিরন্তন জীবন বা আত্মার নিত্যতা বা অমরত্বের কথাগুলিও নিছকই ভুয়ো কথা।

অনেক তথাকথিত গবেষক বিজ্ঞানের নাম করে জন্মান্তরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চান। এদেরই একজন হলেন ভারতের ডঃ এইচ. এন. ব্যানার্জী, আমেরিকার প্রফেসর আয়ান স্টিভেনসন ইত্যাদি। অধ্যাপক স্টিভেনসন শ্রীলংকা ও ভারতের নাকি ১৫টি জন্মান্তরের ঘটনার সন্ধান পেয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে 'নির্ভরযোগ্য' ঘটনাটি হল জ্ঞানতিলক নামে এক মেয়ের ঘটনা। ডঃ ব্যানার্জী-ও এ 'কেসটিকে' পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হয়েছে। সবাই এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, শ্রীলংকার তালাওয়ালাকালের তুরিন তিলকরত্ন নামের ছেলেটি ১৩ বছর ৯ মাস বয়সে মারা যাওয়ার পাঁচ মাস পরে কোটমালে নামক স্থানে জ্ঞানতিলক নামের মেয়ে হিসেবে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে ; ১৯৬০ সালে অনুসন্ধান চালানর সময় মেয়েটির বয়স ছিল প্রায় ছ'বছর।

অনুসন্ধানকারীরা বলেছেন, মৃত তিলকরত্ন নামের ছেলেটি বয়ঃসন্ধির সময়েই মেয়েদের মত আচরণ করেছিল, নেলপালিস ব্যবহার করত, মেয়েদের সঙ্গই তার ভাল লাগত ইত্যাদি। এ ছাড়া এ বয়সের একটি মেয়ে একই বয়সের ছেলের তুলনায় দ্রুত শরীরিক বিকাশ লাভ করে—তিলকরত্নের ক্ষেত্রেও সে ঘটনা ঘটেছে। তিলকরত্নের পরজন্মে মেয়ে হিসেবে জন্মানর আভাস ও যৌক্তিকতা এ থেকে নাকি বোঝা যায়। কিন্তু এ দু'টিই অবৈজ্ঞানিক ধারণা। কোন ছেলের যৌন পরিবর্তন তার দু-একটা আচার ব্যবহার থেকে শুধু বোঝা যায় না—অনেক ছেলেই ছোটবেলা থেকে মা বা দিদিদের দেখাদেখি নেলপালিশ ব্যবহার করে, মেয়েলি ব্যবহার করে। অনেক ছেলেই বয়ঃসন্ধিতে দ্রুত শারীরিক বিকাশলাভ করে। এই বয়সে অনেক ছেলে গাইনিকোমাস্টিয়া নামক রোগের শিকার হয় যাতে তাদের স্তনস্ফীতি ঘটে—যকৃতের গণ্ডগোল ইত্যাদি নানা কারণেই এটি ঘটে থাকে। পরবর্তী জীবনে সে স্বাভাবিকভাবেই পুরুষের মত জীবন যাপন করতে পারে। সব মিলিয়ে অনুসন্ধানকারীদের এসব কোন যুক্তিই বৈজ্ঞানিক যুক্তি নয়। আর তিলকরত্নের আত্মা ও স্মৃতি তার মৃত্যুর পরে পাঁচ মাস হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে জ্ঞানতিলকের শরীরে ঢুকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেল অথবা জ্ঞানতিলকের গর্ভবতী মায়ের পেটে চলে এল এ ব্যাপারটি হাস্যকরই। অবশ্য একজন অনুসন্ধানকারীর মতে—কেউ মারার যাওয়ার ঠিক পরে তার আত্মা সঙ্গে সঙ্গে নাকি মানুষ হিসেবে জন্মায় না, প্রথমে পোকামাকড় হিসেবে জন্মায়—তারপর আবার সেটি মরে গিয়ে মানুষ হিসেবে জন্মাতে পারে। অর্থাৎ তিলকরত্ন মারা যাওয়ার পরের পাঁচ মাসে মশা, মাছি, ব্যাকটেরিয়া, আমাশার জীবাণু বা অন্য কোনরূপে বেঁচেছিল। তাহলে জ্ঞানতিলকের মধ্যে এই অন্তর্বর্তী জন্মের কোন স্মৃতি থাকলো না কেন, কেন অনুসন্ধানকারীরা শুধু তিলকরত্নের স্মৃতির উপরই জোর দিয়েছেন? একটিই কারণ, জ্ঞানতিলককে বুঝিয়ে মশার স্মৃতিকথা আওড়ান মুস্কিল, এই পোকামাকড়ের স্মৃতিকে কৌশল করে প্রমাণ করাও যাবে না।

অনুসন্ধানকারীরা জ্ঞানতিলককে জিগ্যেস করেছেন—

—তুমি কি সমুদ্র দেখেছ?

—হ্যাঁ।

—সমুদ্র লাল, তাই না?

—না, এটি সবুজ ও নীল।

—সমুদ্রের ধারে গাছ রয়েছে?

—হ্যাঁ।

—চা ও রবারের গাছ?

—না, না, শুধু নারকেল গাছ।

—আর কি আছে?

—সাদা বালি।

অনুসন্ধানকারীদের মতে যেহেতু ৬ বছরের মেয়ে জ্ঞানতিলক কখনো সমুদ্র দেখেনি, তাই তার এ উক্তি আসলে তিলকরত্ন হিসেবে পূর্বজন্মেরই স্মৃতি। কিন্তু ৬ বছরের মেয়েকে তার বাবা, মা বা অন্য কেউ সমুদ্রের গল্প বলতে পারে বা তার ছবি দেখিয়েও থাকতে পারে—এ সহজ সম্ভাবনাটি এই 'বৈজ্ঞানিক' গবেষকদের মাথায় আসেনি।

১৯৬০ সালের ১লা নভেম্বর জ্ঞানতিলককে জিগ্যেস করা হয়েছিল—

—তুমি কোথায় ছিলে?

—তালাওয়াকালে।

বাড়ীতে, স্কুলে, মায়ের কাছে ইত্যাদি হাজার স্বাভাবিক উত্তর সত্ত্বেও মেয়েটি অস্বাভাবিকভাবে বাড়ীর জায়গাটিই বলল—অর্থাৎ অনুসন্ধানকারীদের মনের মত।

—এখান থেকে কোথায় গেছিলে?

—শ্রীপদে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানেও অজস্র উত্তর থাকলেও 'ঠিক' কথাই বলল মেয়েটি।

—তালাওয়ালাকালেতে তোমার বাড়ীর আশেপাশে কি ছিল ?

—চায়ের কারখানা। আরো কারখানা, আরো বাড়ী ছিল। আমার বাড়ী পাহাড়ের ওপর।

কিন্তু ওখানে নিয়ে গেলে সে আর বাড়ীঘরগুলি চিনতে পারে নি। কারণ সে বললো—"এখানকার কিছু বাড়ী ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।"

এটিও সত্যি—কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বাড়ীগুলি ভাঙ্গা হয়েছে মাত্র আড়াই বছর আগে—অর্থাৎ জ্ঞানতিলকের বয়স যখন সাড়ে তিনবছর এবং তিলকরত্নের জীবিত বয়সে বাড়ীগুলি ছিল। তাহলে তিলকরত্নের স্মৃতিচারণ করে জ্ঞানতিলক পুরনো অবশিষ্ট বাড়ীগুলি চিনতে পারল না কেন ? অনুসন্ধানকারীরা ঐ দিকটিকে এড়িয়ে গেছেন। আসলে, বাড়ী ভাঙ্গার কথা জ্ঞানতিলককে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল অথবা সে নিজেই দেখেছিল ও আবছা মনে ছিল।

প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটি আরো জানাল, আগের জন্মে সে পয়সা জমিয়ে একটি নীল শাড়ি কিনেছিল, আলমারির ভেতর শাড়ীটি রয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল তিলকরত্ন একটি নীল পাজামা কিনেছিল—অর্থাৎ উত্তর প্রায় মিলে গেল। সেটি আলমারির ভেতর রয়েছে। কিন্তু তিলকরত্ন মারা যাওয়ার সময় সেটি আলমারিতে ছিল না। তাহলে জ্ঞানতিলককে যখন জিগ্যেস করা হয়, তখন সে কিভাবে জানল সেটি ঠিক আলমারিতেই রয়েছে ?

জ্ঞানতিলক আরো জানাল, জলরঙ দিয়ে সে অনেক ছবি এঁকেছে—আলমারির ওপর সেগুলি রয়েছে। সত্যিই ছিল। কিন্তু বাড়ীঘর ভেঙ্গে ফেলে নতুন করে তৈরী করার পরেও এতবছর কিভাবে তিলকরত্নের বাড়ীতে ঠিক আলমারির ওপরেই ছবিগুলি থাকল ? আসলে এগুলোও সবই সাজানো ব্যাপার, শেখানো কথা।

জ্ঞানতিলককে অনেক কিছু যে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার আরেকটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় যখন সে জানায় যে আগের জন্মে সে রাণীকে দেখতে গেছিল। আরো অনেককেই সে দেখেছে কিন্তু যেহেতু রাণীর আগমনের ব্যাপারটা প্রমাণ করা যায়, তাই ঠিক এটিই তাকে শেখান হয়েছে।

এইভাবে ৬০টি প্রশ্নের উত্তরে জ্ঞানতিলক যা সব বলেছে তার মধ্যে ৪৬টি 'সত্যি', ৪টি অর্দ্ধেক সত্য, ২টি ভুল, ৪টি সম্ভবতঃ ঠিক, ২টি সম্ভবতঃ ভুল এবং ২টির যাচাই করা যায়নি বলে জন্মান্তরবাদের সমর্থনকারী অনুসন্ধানীদল বিবৃতি দিয়েছেন।

৪৬টি 'সত্যি' উত্তরের কয়েকটি হল (১) "আমার মা ছিল" (২) "আমার বাবা ছিল," (৩) "আমার একটি বোন ছিল" (৪) "আমি যখন ছোট ছিলাম তখন বোন আমাকে মেরেছিল" (৫) "আমি স্কুলে গেছিলাম" (৬) "আমি পোস্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অফিসে গেছিলাম” ইত্যাদি। সত্যই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বটে! এগুলোতো যে কোন শিশুই বলবে! আরো কয়েকটি সঠিক উত্তর ছিল এ-রকম “আমার মায়ের গায়ের রঙ ছিল ফর্সা” (সব শিশুই তার মাকে সুন্দর বলে থাকে) ইত্যাদি।

অনুসন্ধানকারীরা তাঁদের বইতে তিলকরত্নের একটি ডেথ সার্টিফিকেট দিয়েছেন। এতে লেখা আছে—নাম পুরো জানা যায়নি, তবে আবানায়েকের জনৈক জি. তিলকরত্ন, বয়স ১৬, বাবা-মা'র নাম জানা যায়নি, হাসপাতালের কবরখানায় তাকে কবর দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি। একটু সচেতন হলেই জানা যাবে যে, এটি আদৌ তালাওয়ালাকালের তিলকরত্নের ডেথ সার্টিফিকেট নয়, এ মারা গিয়েছিল ১৩ বছর ৯ মাস বয়সে, এর বাড়ীর অবস্থা ছিল ভালই,—জি. তিলকরত্নের মত অনাথ অবস্থায় হাসপাতালের কবরখানায় একে কবর দেওয়া হয়নি।

এই মিথ্যে ডেথ সার্টিফিকেটের মত পুরো ব্যাপারটিই ছিল মিথ্যে। অনুসন্ধানকারীরা জন্মান্তরবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই নানা কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন। অন্যান্য যাঁরা পুনর্জন্ম ইত্যাদির সমর্থনে কথা বলেন তাঁদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই—কোথাও বা তাঁরা এ সম্পর্কে নিজেদের বদ্ধমূল ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাপ্ত তথ্যাবলীকে ইচ্ছে করে বা অবচেতনভাবে মনের মত সাজিয়ে নেন এবং জন্মান্তরবাদকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন।

ডঃ কোভুর এ ব্যাপারে আরো একটি উদাহরণ দিয়েছেন। শ্রীলংকার তিনটি সংবাদপত্রে—'দি সান্‌', 'উইক এণ্ড' ও 'দি রিবিরেস'-এ, ১৯৭৭-এর এপ্রিলে একটি কাহিনী বের হয়। এই কাহিনী অনুযায়ী মা'তারা কাছেরীর প্রাক্তন কেরানী শ্রীফ্রান্সিস কোদিতুয়াক্কু মা'তারার কান্দাগোদায় তিনবছরের এক শিশুরূপে পুনর্জন্ম লাভ করেছে। ১৯৭৩-এর ১৬ই এপ্রিল ৫২ বছর বয়সে ফ্রান্সিস মারা যায়। কিছু বৌদ্ধ সন্ন্যাসীসহ বহু গবেষক ও অনুসন্ধানী ব্যক্তি নাকি ব্যাপারটিকে পরীক্ষা করে ফেলেছেন এবং ঐ শিশুটির সবগুলো উত্তরই তার পূর্বজন্মের (অর্থাৎ ফ্রান্সিসের) সঙ্গে নাকি মিলে গেছে।

খবরটি পড়ে শ্রীলংকা র‍্যাশনালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অনুসন্ধান চালান হয়। মৃত ফ্রান্সিসের স্ত্রী ও পুত্র, সহকর্মী ও বন্ধু-বান্ধব এবং শিশুটির বাবার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। অবশেষে বাচ্চাটির সঙ্গে কথা বলা হয়—

—তোমার নাম কি?

—ফ্রান্সিস কোদিতুয়াক্কু। (অর্থৎ 'পূর্বজন্মের' নাম)

—তোমার বয়স কত?

—৪৯ (কিন্তু ফ্রান্সিস মারা যায় ৫২ বছর বয়সে এবং বাচ্চাটির বয়স তখন ছিল ৩ বছর ৬ মাস)।

—তোমার বিয়ে হয়েছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—হ্যাঁ।

—তুমি কি করে জানলে যে তোমার বয়স ৪৯ ?

—আমি জানি না।

—তোমার ছেলেমেয়ে আছে ?

—হ্যাঁ।

—ছেলে বেশী না মেয়ে ?

—মেয়ে (ফ্রান্সিসের ছিল তিন ছেলে, তিন মেয়ে)।

—ছেলে ক'জন ?

—অনেক।

—তাদের নাম কি ?

—লুসিথা, পাটিয়া।

—কে সবচেয়ে ছোট ?

—জানি না।

—তোমার স্ত্রী নাম কি ?

—জানি না। (পরে আবার বলেছে।)

—তুমি কি চাকরি করতে ?

—জানি না, পরে জানাব।

—তোমার মায়ের নাম কি ?

—এভলিন ওয়াদিসিন্হা (এটি বাচ্চাটিরই মায়ের নাম, ফ্রান্সিসের নয়)।

—মাইনে পেয়ে কি করতে ?

—হারিয়ে ফেলতাম।

—অফিসে কিসে যেতে ?

—আমার একটি মটর সাইকেল ছিল।

—কোন্ কোম্পানির ?

—জানি না, পরে জানাব।

—কোন্ স্কুলে পড়েছিলে ?

—জানি না, পরে জানাব।

—কি পরতে ?

—বেল বটম।

—এ সময় তোমার কি খেতে সবচেয়ে ভাল লাগত ?

—আঙুর।

—ফ্রান্সিস কোদিতুয়াক্কুর বাবার নাম কি ?

—জানি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—আগের জন্মে কি খেতে সবচেয়ে ভাল লাগত?

—আরাক (এক ধরনের মদ)।

—পয়সা কোথায় পেতে?

—লোকেরা দিত।

—কোন্ কোন্ বন্ধুরা তোমার সঙ্গে মদ খেত?

—জানি না।

—কাছেরিতে তোমার বন্ধু ছিল?

—হ্যাঁ।

—ওদের নাম কি?

—জানি না। পরে বলব।

—কাছেরিতে তোমার প্রিয়তম বন্ধু কে ছিল?

—জানিনা। পরে বলব।

—ফ্রান্সিস কোদিতুয়াক্কুর ধর্ম কি ছিল?

—জানি না।

—ওর স্ত্রী নাম কি ছিল?

—সুমনাবতী।

ছেলেটিকে ফ্রান্সিসের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হল। সম্প্রতি সে এ বাড়ীতে প্রায়ই যাতায়াত করত। তাই ফ্রান্সিসের স্ত্রী ও দুই ছেলে ইত্যাদিদের চিনতে পারল এবং একটি ছবি থেকে ফ্রান্সিসকেও চিনিয়ে দিল। এ ছবি সে আগেই অনেকবার দেখেছে।

এরপর র‍্যাশন্যালিস্ট অ্যাসোসিয়েশানের সদস্যরা ছেলেটিকে ফ্রান্সিস ও তার অফিসের সহকর্মীদের একটি গ্রুপ ফটো যোগাড় করে দেখালেন। এ ছবিটি সে আগে কখনো দেখেনি। ছেলেটি ঐ ছবির কাউকেই চিনতে পারল না, ফ্রান্সিসকেও না। এরপর ধর্মদাস নামে ফ্রান্সিসের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে নিয়ে যাওয়া হল—তাকেও চিনতে পারল না। অনুরূপভাবে আরো তিনজনকেও সে চিনতে পারল না—যারা ফ্রান্সিসের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। ফ্রান্সিস একবার তীর্থে গিয়েছিল—এটির স্মৃতি তার একেবারেই 'মনে ছিল' না। এইভাবে ফ্রান্সিসের জীবনের আরো কয়েকটি ঘটনা সংগ্রহ করা হল—যেগুলি সম্পর্কে আগে ছেলেটিকে ওয়াকিবহাল করা হয় নি বলে বোঝা গিয়েছিল; ছেলেটি এগুলির কোনটির সম্পর্কেই কিছু বলতে পারল না। সর্বমোট যে ৭০টি প্রশ্ন তাকে করা হয়েছিল—তার মধ্যে মাত্র চারটি ছিল সঠিক। আদালতে মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ার মত অনেক ইতস্ততঃ করে ছেলেটি উত্তর দিচ্ছিল।

এইভাবে পুনর্জন্মের এই ঘটনাটি যে সম্পূর্ণ সাজান ও মিথ্যা তা ভাল করেই বোঝা গেল। হিন্দুধর্ম অনুযায়ী পুনর্জন্মের ব্যাপার, বৌদ্ধ ধর্ম অনুযায়ী মৃতব্যক্তির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ চিন্তা অনুসারে পুনর্জন্ম ঘটার নির্বোধ ধারণা ও অন্যান্য নানা ধর্মের এ ধরনের চিন্তা বিলকুল ভুল। কিন্তু মিথ্যা সাক্ষ্যের মত পুনর্জন্মকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যও কাউকে কাউকে তৈরী করে দেওয়া যায়। এসব ক্ষেত্রেও যদি সংশ্লিষ্ট বাচ্চাগুলিকে আরো ট্রেনিং দেওয়া হত তবে এই চালাকিটি ধরা আরো শক্ত হয়ে দাঁড়াত।

অনেকে দাবি করে যে সম্মোহনের সাহায্যে কাউকে তার পূর্বজন্মে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। কোন বয়স্ক ব্যক্তির মনে সম্মোহনের সাহায্যে তাঁর পুরনো দিনের স্মৃতিকেও নাকি জাগিয়ে তোলা যায়। এইভাবে ৫০ বছর বয়সের কাউকে হয়তো সম্মোহিত করলে তিনি তাঁর দশবছর বয়সের নানা ঘটনা বলতে পারেন, যা স্বাভাবিক অবস্থায় তাঁর আদৌ মনে নেই। কিছু সম্মোহনবিদ্ এই ব্যাপারটাকে আরো পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় বলে দাবি করে, বলে এইভাবে বয়সটাকে পিছোতে পিছোতে শূন্যতে তারপর আরো কম—অর্থাৎ আগের জন্মে চলে যাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক সম্মোহনবিদ্যার নাম করে—এই অবৈজ্ঞানিক, হাস্যকর কথাবার্তা চালু করা ও তা বিশ্বাস করার মত লোকেরও অভাব নেই।

শ্রীমতী ভার্জিনিয়া টাই নামে এক ভদ্রমহিলাকে এইভাবে নাকি সম্মোহিত করে তাঁর আগের জন্মে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ঐ জন্মে তিনি নাকি ব্রিডী মার্ফি নামে এক আইরিশ মেয়ে হিসেবে জন্মেছিলেন। ঐ পুরনো দিনের আয়ারল্যাণ্ডের অনেক নিখুঁত বর্ণনা তিনি সম্মোহিত অবস্থায় করেছিলেন। এ ঘটনাটি সারা পৃথিবী জুড়েই বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু পরে অনুসন্ধানে জানা গেল যে, ভদ্রমহিলা ছোটবেলায় এক আইরিশ মহিলার সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তিনি ছোটবেলায় তাঁর কাছ থেকে পুরনো আয়ারল্যাণ্ডের অনেক গল্প ও বর্ণনা শুনেছিলেন। সম্মোহিত অবস্থায় ঐসব গল্পের স্মৃতিচারণ করাটা অস্বাভাবিক নয়,—পূর্বজন্মে ফিরে যাওয়ার জন্য সম্মোহনকারীর প্রস্তাব (suggestion) পূর্বজন্মের সঙ্গে মিলিয়ে পুরো ব্যাপারটির বর্ণনা করতে তাঁকে সাহায্য করেছে।

শ্রীলংকার শ্রীঅমঋষি বীররত্ন নামে এক ভদ্রলোক অনুরূপভাবে কয়েকটি গাঁজাখুরি গল্প শুনিয়েছেন। যেমন—

(১) মার্কাস ফার্নেণ্ডো নামে এক ভদ্রলোক খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে রাজা ডুলুগেমুনুর সৈন্যবাহিনীর একজন ছিলেন ; আরেক জন্মে ছিলেন একজন দেবতা।

(২) হার্বার্ট নামে একজন ছাত্র ছিল কানাডার পাইলট।

(৩) শ্রীবীররত্নেরই এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া পূর্বজন্মে গডউইন বীরসিংহ নামে এক পুরুষ ছিলেন। ১৮৪৮ সালে কমলা পেরেরা নামের একজন মহিলার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়, উপালি ও নন্দসিরি নামে দুজন ছেলেও হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীবীররত্ন কোনটিকে যাচাই করে না দেখেই এগুলিকে অভ্রান্ত বলে প্রচার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সম্মোহিত অবস্থায় তাদের পূর্বজন্মের কাহিনী হিসেবে এই সব তথ্য দিয়েছে, তার কারণ পূর্বজন্ম সম্পর্কে তাদের স্থির বিশ্বাস সম্মোহনকারী ব্যক্তির এ সম্পর্কে প্রস্তাবের সাহায্যে আরো সুদৃঢ় হয়েছে এবং একদা শোনা কোন কথা বা পড়া কোন গল্প সম্মোহিত অবস্থার কথাবার্তায় প্রতিফলিত হয়েছে। শ্রীবীররত্ন পূর্বোক্ত অধ্যাপক আয়ান স্টিভেনশনের বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, যে ইনিও তাঁকে সমর্থন করেছেন। এটিও ভুল—স্টিভেনশন সরাসরি কখনোই শ্রীবীররত্নকে সমর্থন করেননি ; আর করে থাকলেও সেটিও আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ স্টিভেনশন তিলকরত্নের যে- ঘটনাকে অভ্রান্ত বলেছিলেন সেটি যে ভ্রান্ত তা আগেই আমরা দেখেছি।

আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই ; তাই এর পুনর্জন্ম গ্রহণ করারও কোন প্রশ্ন আসে না।*

[স্বামী অভেদানন্দ তাঁর 'Life Beyod Death' (বঙ্গানুবাদ 'মরণের পারে') বইটিতে আত্মার অস্তিত্বের স্বপক্ষে তথাকথিত বহু 'বৈজ্ঞানিক তথ্য' ও যুক্তির উল্লেখ করেছেন। আত্মার অস্তিত্বে আস্থাবান ব্যক্তিরাও প্রায় এসব তথ্য ও যুক্তিকেই হাজির করেন। বইটির বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই—তবু প্রাসঙ্গিকভাবে এর কিছু 'বৈজ্ঞানিক তথ্যের' আলোচনা করা যেতে পারে। অভেদানন্দ 'মরণের পারে' বইটির প্রথম অধ্যায়েই (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ প্রকাশিত দশম সংস্করণ, পৌষ, ১৩৮৭) পরলোকতত্ত্ব, প্রেততত্ত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে উইলিয়াম ক্রুক্‌স, ডি. ডি. হোম ইত্যাদি অনেক বিদেশীদের 'গবেষণার' উল্লেখ করেছেন। ডি. ডি. হোম-এর চালাকির কথা আগেই আলোচিত হয়েছে (Theosophy অংশ দ্রষ্টব্য)।

যাই হোক, অভেদানন্দ বলেছেন, "একটি মুরগীর মাথা কেটে ফেলে তার হৃদযন্ত্র বার করলে দেখা যাবে, মরণের পরও অনেকক্ষণ সেটা বেঁচে থাকে। এ থেকে বোঝা যায়, দেহের অংশগুলির স্বতন্ত্র সত্তা আছে, দেহের মৃত্যুর পরও সেগুলি বেঁচে থাকতে পারে। এভাবে দেখানো যেতে পারে, দেহের জীবকোষ এবং টিস্যুগুলিরও স্বকীয় প্রাণ আছে। ব্যক্তির মৃত্যু হলে তার সত্তা থেকে যায়।" (পৃষ্ঠা২২) কি অদ্ভুত ভাবে একটি বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিকৃত ব্যাখ্যা করে "ব্যক্তির মৃত্যু হলে

* আত্মার যেহেতু কোন অস্তিত্ব নেই তাই কেউ মারা গেলে তার আত্মার শান্তির জন্য শ্রাদ্ধ-শান্তির ব্যাপারটাও একটি ভ্রান্ত ভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আদিম মানুষ জীবনীশক্তির পিছনে রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার রহস্য কিছুই জানতো না ; তারা ভাবতো নিশ্চয়ই কোন অদৃশ্য শক্তি শরীরকে চালু রাখে। মৃত্যু হলে এই শক্তি শরীর ছেড়ে চলে যায় এবং অসন্তুষ্ট হলে নানা অঘটন ঘটাতে পারে। এই ভুল ধারণাই তার মধ্যে ভূত প্রেতের ভয়ের জন্ম দিয়েছে এবং এই অস্তিত্বহীন শক্তিকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যেই পিণ্ডদান, মৃতের আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা বা মন্ত্রোচ্চারণ ইত্যাদি, এবং কৃচ্ছ্রসাধন করে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্মের প্রচলন করেছে। এগুলি বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের তথাকথিত বিভিন্ন ধর্মের অঙ্গীভূতও হয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার সত্তা থেকে যায়" এই সিদ্ধান্তে চলে আসা হল। শরীর-বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোষগুলি পুষ্টির যোগান, উপযুক্ত পরিবেশ ইত্যাদি কারণে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ নাও করতে পারে। হিমায়নের সাহায্যে এগুলিকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়েও রাখা যায়। কিন্তু মৃত্যুর পরেও তার 'সত্তার' অস্তিত্ব এতে কিভাবে প্রমাণ হয় ?

বলা হয়েছে, মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচার করে 'মন' বা আত্মা নামক কোনো বস্তুকে খুঁজে না পেলেই এর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। "....কেন না তুমি যা জানছো মনের বা আত্মার সত্তা নেই—তাও জানছো মন দিয়ে এবং সেই মন নিশ্চয়ই আর একটা কিছু জিনিস, অর্থাৎ সেই মন যে মস্তিষ্ককে অস্ত্রোপচার করেছে তার মন। ....যদি বলো যে, মনের বা আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই, তবে সেটা কেমন—যেমন এখুনি যদি বলো যে তোমার জিহ্বা নেই।" (পৃঃ ১০১)। 'মন' আর 'আত্মা'কে এক করে দিয়ে কি অপূর্ব গোঁজামিল! মন ও চিন্তা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকোষের জটিল রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ারই ফল অর্থাৎ তা সম্পূর্ণই বস্তু নির্ভর। অপুষ্টি, আঘাত, বংশগতি ইত্যাদি নানা কারণে মস্তিষ্কের উপযুক্ত বিকাশ না ঘটলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চিন্তা করার ক্ষমতাও উপযুক্তভাবে বিকশিত হয় না—মস্তিষ্কের grey matter, বিশেষতঃ frontal lobe- এর grey matter এই চিন্তা, মেধা, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির জন্য দায়ী। স্নায়ুযুক্ত যে কোন প্রাণীই চিন্তা করতে সক্ষম তা সে যতই প্রাথমিকভাবেই হোক না কেন। বহু লক্ষ বছর ধরে অসংখ্য ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের বিশেষ বিন্যাসে স্নায়ুর সৃষ্টি—এটিই স্নায়ুযুক্ত প্রাণীকে এবং এদের বিবর্তিত সর্বোচ্চ রূপ, মানুষকে, একটি বিশেষ ক্ষমতা এনে দিয়েছে। এছাড়া, বাইরের পরিবেশের বাস্তব ভিত্তির ওপর নির্ভর করেও মন বা চিন্তা গড়ে উঠে। জন্মের পর থেকে হাজারো দৃশ্য, শব্দ ও অন্যান্য অনুভূতি মস্তিষ্কে প্রতিক্রিয়া করে, পরে অক্ষর ও ভাষাজ্ঞান এর সঙ্গে যুক্ত হয়। একসময় একটি শিশু তার ভাষায়—প্রায় সবসময়েই যা তার মাতৃভাষা,—চিন্তা করতে পারে। এই মনকে মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করে যে পাওয়া যাবে না—সেটিই স্বাভাবিক, কারণ মন কোন বস্তু নয়, মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ফল হচ্ছে মন। একইভাবে তামার একটি টুকরোকে কাটলে তার মধ্যে 'তুঁতে তৈরী করতে পারার ক্ষমতা' নামক কোন বস্তুকে পাওয়া যাবে না, কারণ তামা বিশেষ রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়েই তুঁতে সৃষ্টি করে। তাই বলে বিজ্ঞানীরা—তামার এই গুণ নেই তা বলেন না।

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, বিশেষ সূক্ষ্ম যন্ত্র দিয়ে আত্মাকে (অর্থাৎ মনকে) নাকি ওজন করা যায়। "তার ওজন প্রায় অর্ধেক আউন্স বা এক আউন্সের তিন ভাগ"(পৃষ্ঠা ২৮)। বিশালবপু ব্যক্তির আত্মা ও ক্ষুদ্র শিশু বা রুগ্ন ব্যক্তির আত্মার ওজনের তারতম্য হয় কিনা তা অবশ্য তিনি বলেন নি; দুর্ঘটনার কারোর হাত-পা কাটা গেলে আনপাতিক হারে আত্মার কতটা চলে যায়, তাও তিনি বলেন নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারটা হাস্যকরভাবেই অসম্ভব।

বলা হয়েছে লস এঞ্জেল্‌স্‌-এর এক বাচ্চা মেয়ে নাকি তার সদ্যমৃত ভাই-এর শরীর একটি কুয়াশাময় পদার্থে ঢেকে যেতে দেখেছিল। তাঁর মা অবশ্য এটি দেখতে পাননি (পৃষ্ঠা ২৮)। তবে স্বামী অভেদানন্দ নাকি প্ল্যানচেটের আসরে দু'একবার জিনিসটি দেখেছেন। ব্যাপারটি—কল্পনাপ্রবণ বাচ্চা মেয়েটির বা স্বামীজীর মতি-ভ্রম(hallucination) ছাড়া আর কিছুই না। কেউ মারা গেলে যদি তার শরীর থেকে কুয়াশার মত জিনিস বেরোয় তবে পৃথিবীর আরো বহু ব্যক্তির তা দেখার কথা—ক্যামেরাতে ধরা পড়ারও কথা, ট্রেন দুর্ঘটনা ইত্যাদির মত ঘটনায় যখন কয়েকশত ব্যক্তি এক সঙ্গে মারা যায় তখনও চারপাশ কুয়াশায় ঢেকে যাওয়ার কথা। কোনটিই হয় না, হওয়া সম্ভবও নয়। তার কারণ ঐ কুয়াশা ধরনের কিছু কখনো মৃত শরীর থেকে বেরোয় না। স্বামী অভেদানন্দ জানিয়েছিলেন এই কুয়াশাময় পদার্থকে নাকি বৈজ্ঞানিকেরা ectoplasmবলেন। এটিও গ্যাঁজা। Ectoplasmবলতে বিজ্ঞানীরা কোষের (cell) বাইরের দিকের অংশকে বোঝান।

একই রকম হাস্যকরভাবে মন্তব্য করা হয়েছে, "আমাদের দেহের কোন অংশ যদি এক্স-রে বা রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখি তবে দেখব—হাতের বা দেহের অংশটি কুয়াশাময় পদার্থ কণিকায় পরিপূর্ণ এবং চারিদিকে যেন তা ঝুলছে। সুতরাং যে দেহকে আমরা জড় পদার্থ বলি আসলে সে জড় নয়, তা মেঘের বা কুয়াশার মতো এক পদার্থবিশেষ" (পৃষ্ঠা ৩২)। এ আরেকটি অর্বাচীন অপযুক্তি। শরীরের হাড়, তরুণাস্থি, মাংস ইত্যাদি বিভিন্ন গঠন ও ঘনত্বের বিভিন্ন অংশকে রঞ্জনরশ্মি কতটা ভেদ করতে পারে তার ওপর এক্স-রের ছবিতে শরীরের বিভিন্ন অংশকে ঘন বা হাল্কা সাদা রঙে দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ এটি আদৌ প্রমাণ করে না যে, "আমাদের শরীর জড় নয়, তা মেঘের বা কুয়াশার মত পদার্থ বিশেষ।" ছবি তোলা(photography)-র রাসায়নিক ভিত্তি সম্পর্কে সামান্য কিছুটা জানা থাকলেই স্বামীজির অজ্ঞতা বা মিথ্যা ভাষণ ধরা যাবে।

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, "আমরা মনে করি যে জন্মের সময় আমাদের আত্মা পরমেশ্বর থেকে বিচ্ছুরিত হন।...সুখ-দুঃখ আমাদের অতীত জীবনেরই ফলস্বরূপ। অদৃষ্টও আমরা নিজেরাই তৈরী করি।" (পৃঃ ১৯৪)। ঝুলি থেকে এবার আসল বেড়ালটি বেরুল। শাসকশ্রেণীর স্বার্থপুষ্টকারী ভাববাদীদের এ সেই চিরন্তন ধোঁকা! জনগণের দারিদ্র্য-দুর্দশার জন্য সামাজিক বৈষম্য, সাম্রাজ্যবাদী তথা শাসক শ্রেণীর শোষণ ইত্যাদি নয়, দায়ী জনগণই (অর্থাৎ তাদেরই পূর্বজন্মের কর্মফল তথা তাঁদের আত্মা)—এই হীন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তত্ত্ব কিভাবে ধর্ম, জাতীয় ঐতিহ্য, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি গালভরা বুলির খোলসে অসহায় মানুষকে গেলান হয় ও তাঁদের বিপথে চালিত করা হয়, তা এই ধরনের তথাকথিত স্বামীজি, মহাত্মা ও ধর্মগুরুদের এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতীয় হাবিজাবি মন্তব্য থেকে সহজেই বোঝা যায়। এই ধরনের সর্বনাশা মন্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য অনেক আপাতমধুর বক্তব্যও সঙ্গে খিচুড়ির মত মিশিয়ে দেওয়া হয়; যেমন "স্বর্গ বা নরক আসলে মানুষেরই চিন্তার পরিণতি, মানুষের লক্ষ্য হয় তার অন্তরের দেবত্বের বিকাশ সাধন করা—তার পবিত্র অন্তরাত্মার অনুভূতি লাভ করা।" (পৃঃ ১৯৫)। গম্ভীর কথাবার্তার কি অপূর্ব কৌশল!

আত্মা সম্পর্কিত ক্ষতিকর ধারণাটি বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে টিকে থাকার অন্যতম কারণ এটি তাঁদের দুঃখ-শোকের কিছুটা লাঘব করে। প্রিয়জন মারা গেলে তার 'আত্মা' একেবারে ছেড়ে চলে যায় নি, আশেপাশে রয়েছে—এ বিশ্বাস ভ্রান্ত হলেও, শোকাহত ব্যক্তির শোক লাঘবে সাহায্য করে ও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা থেকে রক্ষা করে।

নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য ও শব্দের বিকৃত প্রয়োগ ঘটিয়ে বইটিতে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, মানুষের শরীরে আলাদা সত্তা আছে, এই সত্তা অক্ষয়-অব্যয়, এর জন্মান্তর সম্ভব ইত্যাদি। যুক্তিগুলো কত ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিকৃত তা এই কয়েকটি উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে।

এই ধরনের বহু বইতে আরো নানা তথ্য রয়েছে—সবগুলির স্বরূপ উদ্ঘাটন ও ব্যাখ্যা করা, কয়েকজন ব্যক্তি সারাজীবন ধরে চেষ্টা করলেও তার সময় পাবেন না। তবে তাদের ভ্রান্তি, উদ্দেশ্য ও চরিত্র উপরোক্ত কয়েকটি উদাহরণ থেকেই বোঝা যাবে।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশম পরিচ্ছেদ

ভূত-পেত্নি-দত্যি-দানো

আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে মিথ্যে ধারণা থেকেই ভূত ইত্যাদির ধারণার সৃষ্টি। মানুষ মরে গেলে (এমন কি অন্যান্য প্রাণী মারা গেলেও) তার আত্মা নাকি শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যায়— এই বিদেহী আত্মাই ভূত বা প্রেতাত্মা; মহিলার আত্মা হয় পেত্নি বা শাঁকচুন্নি, ব্রাহ্মণের আত্মা হয় ব্রহ্মদৈত্য ইত্যাদি এবং ভূতপ্রেতের কাল্পনিক জগতে আরো অনেক কাল্পনিক শ্রেণীবিভাগ রয়েছে। এই আত্মা হয় পরে পুনর্জন্ম লাভ করে অথবা ক্ষেপে গেলে, অতৃপ্ত থাকলে বা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্য কারোর শরীরে ভর করতে পারে। এসব যদি কোনটা না-ই করে তবে সে এমনি ঘুরে বেড়াতেও পারে—জনশূন্য স্থানে, বেল, শ্যাওড়া বা অন্য কোন গাছে, ভাঙ্গা বাড়ীতে ইত্যাদি নানা জায়গায় আশ্রয় নয়। তারা নাকি লোহা, রামনাম, সর্ষে বা লংকা পোড়া ইত্যাদিতে ভীষণ ভয় পায়। এই ধরনের নানা তথ্য রয়েছে ভূতের ওপর। অনেকে তাদের আবছা আবছা শরীরও নাকি দেখতে পায়, তাদের নানা কাজকর্মের প্রমাণ তো পায়ই।

আত্মা যেমন অস্তিত্বহীন তেমনি ভূত-প্রেতও অস্তিত্বহীন। আদিম মানুষের অসম্পূর্ণ জ্ঞান, ভ্রান্ত বিশ্বাস বা মিথ্যা সংস্কারের ধারাবাহিকতায় এখনো টিকে আছে ভূত-প্রেতের ধারণা। কোন শিশু যখন জন্মায় তখন সে ভূতের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস নিয়ে জন্মায় না। কিন্তু পরে ঠাকুমাদের গল্পে, গল্পের বইতে বা স্কুলপাঠ্যে আত্মা তথা ভূত-প্রেত সম্পর্কে ভীতি ও বিশ্বাস তার মনে ঢোকান হয়। অধিকাংশ শিশুর মনেই এ সম্পর্কে একটি বদ্ধমূল মিথ্যা ধারণা (delusion) সৃষ্টি হয়। এরই বশবর্তী হয়ে পরবর্তীকালে তার নানা মতিভ্রম (hallucination) ঘটে—এটি এক ধরনের অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থাই; শারীরিক দুর্বলতা, উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, দুর্বল মানসিকতা ইত্যাদি কারণে বিশেষ কারোর ক্ষেত্রে এটি প্রকটভাবে দেখা দেয়। এছাড়া অশিক্ষিত ও বৈজ্ঞানিক চেতনাহীন মানুষ বিভিন্ন আশ্চর্যজনক ঘটনা, আকস্মিক কোন রোগ ইত্যাদির সহজ ব্যাখ্যা না করতে পেরে অলৌকিক কোন শক্তি বা প্রেতাত্মাকে এর জন্য দায়ী করে। এ ধরনের সব ঘটনাগুলিকেই বৈজ্ঞানিকভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এদের পেছনে কোন বাস্তব কারণ রয়েছে—হয় কোন মানুষ, তার মানসিক রোগ, বদমায়েসি বা অন্য কোন কারণে অস্বাভাবিক আচরণ বা অন্য কোন কিছু—কিন্তু কোন আত্মা বা প্রেতাত্মা আদৌ নয়। একই ভাবে প্ল্যানচেট জাতীয় কাজের দ্বারা অস্তিত্বহীন আত্মা বা প্রেতাত্মাকে আহ্বান করাটাও হাস্যকরভাবে ভিত্তিহীন। ডঃ কোভুর এ ধরনের বহু ঘটনার বিশ্লেষণ করে প্রেতাত্মার অস্তিত্বহীনতা ও বাস্তব কারণের অস্তিত্ব দেখিয়েছে।

☆ ☆ ☆

স্ত্রীর প্রেতাত্মার আবির্ভাব—শ্রীলংকার জাফনার জেলাজজ শ্রীসাইমন রোড্রিগোর স্ত্রী মারা যান। প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি খুবই ভেঙে পড়েন। যে বৌদ্ধধর্মে অনাত্মার কথা বলা হয় সেই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েও তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করার বাসনা নিয়ে আত্মা ও পরলোক সংক্রান্ত বহু বই পড়তে শুরু করলেন। এরপর মনিপে নামক এক জায়গায় জনৈক ভদ্রলোকের তিনি দেখা পান, যিনি প্রেতাত্মার ভর হওয়ার অর্থাৎ প্ল্যানচেটের মিডিয়াম হওয়ার 'ক্ষমতা' অর্জন করেছিলেন। শ্রীরোড্রিগোর সঙ্গে ডঃ কোভুরের আলাপ হয় ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে। একদিন তিনি ডঃ কোভুরকে জানালেন যে মৃতা স্ত্রীর সঙ্গে ঐ ভদ্রলোকের মাধ্যমে তিনি একঘন্টা ধরে কথা বলেছেন—৭ দিন পরে আবার কথা বলার দিন ঠিক হয়েছে। প্রিয়তমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারার অনির্বচনীয় আনন্দে তিনি অভিভূত।

ডঃ কোভুর মনিপের ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। জানা গেল ভদ্রলোকেরও স্ত্রী মারা যান১৯২৬ সালে। এরপর দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেও প্রথমা স্ত্রীর মধুর স্মৃতিকে তিনি ভুলতে পারেন নি। তাই রোড্রিগোর মত তিনিও তাঁর মৃতা স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য সচেষ্ট হন। লন্ডনের সোসাইটি ফর সাইকিক্যাল রিসার্চ-এর সভ্য হয়ে যান এবং এ সম্পর্কে বহু বই পড়েন। এই সংস্থার জনৈক সাহেব ফটোগ্রাফার ভদ্রলোকের মৃত শ্বশুর ও মৃতা স্ত্রীর ছবি তুলে তাঁকে দেন—এটি ছিল এঁদের 'আত্মার' ছবি, কারণ তাঁরা অনেক আগেই মারা গিয়েছিলেন। শ্বশুর ও স্ত্রীর ঐ ঝাপসা ছবির সঙ্গে তাঁদের প্রকৃত চেহারার যে মিল নেই তা তিনি স্বীকার করলেন। কিন্তু তবুও তিনি সরল বিশ্বাসে, পরম যত্নে ছবিটি রক্ষা করেছেন। দিনের পর দিন, একাগ্রতার সঙ্গে মৃতা স্ত্রীর আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে করতে অবশেষে ১৯৩৪ সালে তিনি 'সফল' হলেন। এরপর থেকে আবিষ্ট অবস্থায় মাঝে-মাঝেই তিনি একাজ করতে থাকেন। যদিও 'স্ত্রীর প্রেতাত্মার' বলা অনেক তথ্যে ভুল পাওয়া যায়, কিন্তু বেশ কিছু তথ্য অদ্ভুতভাবে নাকি মিলেও যায়। মৃতা ঐ পত্নী একটি কন্যাসন্তান রেখে গিয়েছিলেন—তার মায়ের আত্মার সঙ্গে কথাবার্তা বলেই নাকি এর বিয়ে ঠিক করা হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরপর ডঃ কোভুর ভদ্রলোককে একদিন বাড়ীতে নিয়ে এসে তাঁর নির্জন লাইব্রেরী ঘরে সব দরজা-জানালা বন্ধ করে প্রেতাত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করলেন। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে উল্টোদিকের দেওয়ালের দিকে তাকাবার পর ভদ্রলোকের 'ভর' হল। ঐ দেওয়ালে টাঙ্গান ছিল ডঃ কোভুরের মৃত পিতার বিশাল ছবি। ভদ্রলোক ঐ ছবি দেখিয়ে বললেন, ঐখানে তাঁর স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন। পেছনে ? না, দেওয়াল নয়,—রয়েছে বিশাল নীলাকাশ। ঐ ছবি ও দেওয়াল দেখা যাচ্ছে কিনা জিগ্যেস করলে তিনি জানালেন যে, ওসব কিছুই নেই, আকাশ আর মেঘের মাঝে তাঁর স্ত্রী-ই দাঁড়িয়ে আছেন। জানালেন এখন তাঁর স্ত্রীকে (অর্থাৎ ডঃ কোভুরের বাবার ছবিকে) ছোঁওয়া উচিত নয়। এরপর আবিষ্ট অবস্থাতেই ভদ্রলোক ডঃ কোভুরের নানা প্রশ্নের উত্তর স্ত্রীর কাছ থেকে জেনে নিলেন। জানা গেল, "খ্রীস্টধর্মই হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম। পুনর্জন্ম বা অবতার বলে কিছু নেই। এই পৃথিবীতে জন্মানোর আগের কোন জীবন সম্পর্কে আত্মাদের (অর্থাৎ ভূতেদের) কোন ধারণা নেই। আত্মাদের জগতেও পানাহার রয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন নেতার অধীনে আত্মারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে থাকে। জীবিতদের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি এই নেতার কাছ থেকে নিতে হয়। আত্মাদেরও স্ত্রী-পুরুষ ভাগ আছে। আমার (অর্থাৎ ঐ ভদ্রলোকের) মৃত্যুর পর তাঁর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর জীবন কাটাতে চান। আত্মারা সাদা ঢিলেঢালা জামাকাপড় পরে। ইতর প্রাণীদের কোন আত্মা হয় না। অন্যান্য গ্রহে মানুষ রয়েছে। পৃথিবীতে থাকার সময়ে যে চেহারা থাকে আত্মারা ঐ চেহারাই বজায় রাখে। আত্মাদের জগৎ থেকে তাঁরা ক্রমশ উন্নততর জীবনে যায় এবং অবশেষে ঈশ্বরের জগতে প্রবেশ করে। আত্মাদের জগতেও হুইস্কি-সোডা রয়েছে। সব আত্মারাই ইংরেজীতে কথা বলে।"

এরপর ভদ্রলোকের ভর কেটে গেল। তিনি জানালেন, স্ত্রীর কথা গভীরভাবে ভাবতে ভাবতেই তিনি এক সময়ে সামনে উজ্জ্বল আলো ও মূর্তি দেখতে পান। স্ত্রী ছাড়া আরো অনেকের আত্মার সঙ্গেই তিনি কথা বলেছেন। ভর কেটে যাওয়ার পর তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তেষ্টা পায়, ঘুম পায়।

এই ক্লান্ত হয়ে পড়া, ঘুম পাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারটা আসলে দীর্ঘ সময় ধরে গভীরভাবে স্ত্রীর সম্পর্কে ভাবার জন্য মস্তিকের স্নায়ুকোষগুলির ক্লান্তির জন্যই ঘটে—যেমন দীর্ঘ সময় ধরে গভীরভাবে পড়াশুনা করলে একসময় ক্লান্তি আসে। প্রকৃতপক্ষে একাগ্রভাবে স্ত্রীর কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর মতিভ্রম (hallucination) হয়—যার ফলে মনে হয়, স্ত্রীর মূর্তি দেখা যাচ্ছে, কথা বলছে ইত্যাদি। এসবই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তাভাবনা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই ঘটে। তাই ইংরেজীভাষী, পানাহারী, খ্রীস্টান ভদ্রলোক শোনেন খ্রীস্টধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, প্রেতাত্মার জগতে পানাহার রয়েছে, ওরা সবাই ইংরেজীতে কথাবার্তা বলে ইত্যাদি। একইভাবে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীরা হ্যালুশিনেশানের বশবর্তী হয়ে নিজেদের মত করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভিন্ন কাল্পনিক দৃশ্য দেখেন বা শোনেন—অনেকটা স্বপ্নের মত, অলীকভাবে। তাই রামকৃষ্ণ দেখেন কালীমূর্তি বা শোনেন কালী মায়ের কথা, গোঁড়া বৌদ্ধ দেখেন করুণাঘন বুদ্ধমূর্তি, খ্রীস্টান দেখেন দেবদূত ও যীশুখ্রীস্টকে, মুসলিম শোনেন আল্লার নির্দেশ ইত্যাদি। একইভাবে ভূতে যারা বিশ্বাস করে তারাও ফাঁকা মাঠে বা রাস্তায় ভূত-প্রেতের দেখা পায়। গাছে ঝোলা ছেঁড়া নেকড়াকে মনে হয় পা ঝুলিয়ে বসে থাকা ভূত, গাছের পাতার ফাঁকে বাতাসের শব্দকে মনে হয় ভূতের নাকিসুরের আওয়াজ ইত্যাদি, অর্থাৎ illusion-এর সৃষ্টি হয়।

ভূত দেখা

কবরখানার ভূত—শ্রীলংকার যানবাহন সংস্থার পত্রিকা 'দি রেকর্ড'-এ একটি ঘটনার কথা বেরিয়েছিল। দাদাল্লা কবরখানার কাছে এক গাড়ির মালিকের চাকর ভূত দেখেছিল। গাড়িটি ভর্তি থাকায় চাকরটি বসেছিল পেছনে মালপত্র রাখার জায়গার ওপর। গাড়ী থামার পর চাকরটি আসছে না দেখে পেছনে দিয়ে ভদ্রলোক দেখলেন সে অজ্ঞান হয়ে গেছে। জল ঢেলে তার জ্ঞান ফেরান হল। সে জানাল, চলন্ত গাড়ীর পেছনে একটি ভূত তাড়া করেছিল—একবার সে ছোট হয়ে যাচ্ছিল, একটু পরেই বড় হচ্ছিল।

বারবার পরীক্ষা করে দেখা গেল, গাছের অপসৃয়মান ছায়া ও আবার একটি গাছের ছায়া—এইভাবে ছায়ার খেলাকেই সে ভূত বলে ভেবেছে। কবরখানার কাছে ভূত থাকে—এই বিশ্বাসের সঙ্গে গাড়ীর পেছনে একা বসে থাকার ভীতি মিশে গিয়ে এই কান্ড।

সিংহলের লীচ গেটে ক্যানেট কবরখানার কাছে ট্যাক্সি দুর্ঘটনায় এক বিদেশিনী মারা গিয়েছিলেন। তারপর থেকে অনেক ট্যাক্সিওয়ালা ঐ রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় নাকি দেখেছে ঐ বিদেশিনী ট্যাক্সি থামিয়ে সওয়ারী হয়েছে। তারপর রোসমীড প্লেসের এক ঠিকানায় যেতে বলেছে। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেখা গেছে বিদেশিনী প্যাসেঞ্জারটি আর গাড়ীতে নেই।

ব্যাপারটি গাঁজাখুরি গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। একে কবরখানায় ভয়, তার ওপর একজন ট্যাক্সিওয়ালার হাতেই এক বিদেশিনীর মৃত্যু—সব মিলিয়ে ঐ অভিশপ্ত জায়গায় না যাওয়ার এক অজুহাত দাঁড় করানর ইচ্ছে থেকে এটি হয়েছে। তাছাড়া অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ট্যাক্সিওয়ালাদের কেউ কেউ আতংকে বিদেশিনীর প্রেতাত্মাও হয়তো দেখেছে মতিভ্রমের ফলে। ডঃ কোভুর প্রশ্ন করেছেন, বিদেশিনীটি যদি উলঙ্গ অবস্থায় ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দেখা দিয়ে থাকে তবে সে কি করে উলঙ্গ মহিলাকে ট্যাক্সিতে তুলল ? আর যদি মহিলাটি পোশাক পরেই থাকে তবে বুঝতে হবে, সে মারা যাওয়ার পর তার শরীরের আত্মা যেমন 'ভূত' হয়ে গেছে, তেমনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার নির্জীব পোশাক-আশাকও নিশ্চয়ই প্রেতাত্মা হয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। ব্যাপারটি এমনই হাস্যকর ও অবাস্তব। আসলে সবই ট্যাক্সি-ড্রাইভারদের কল্পনা মাত্র।

কবরখানা, শ্মশান, গোরস্থান ইত্যাদির আশেপাশে নাকি প্রেতাত্মারা বেশী ঘোরাফেরা করে। আত্মার কল্পনা থেকে যেহেতু প্রেতাত্মার ধারণা এসেছে তাই এই ধারণার সৃষ্টি—যেখানে মৃতদেহগুলি শেষ পর্যন্ত তাদের অন্তিম অবস্থা লাভ করছে তার আশেপাশে দেহমুক্ত আত্মাগুলি থাকবে এতে আর বিচিত্র কি!

পেত্নির তাড়া—পূর্বোক্ত দাদাল্লা কবরখানার পাশের রাস্তাতেই এক পেত্নি নাকি সোমরত্ন নামে এক স্থানীয় ব্যক্তিকে তাড়া করেছিল। একদিন সন্ধ্যে সাতটার সময় সোমরত্নের বৌ বলল কেরোসিন তেল নিয়ে আসতে। রান্না তখনো শেষ হয়নি, তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়েই ওকে বেরুতে হল ভয়ে ভয়ে। কেরোসিনের দোকানে যেতে হলে ঐ কবরখানার পাশের রাস্তাটা পেরোতে হবে। সোমরত্ন একটি মশাল জ্বালিয়ে দোকানে গেল। দোকানের মালিক আবদুল কাদের আবার একটু বেশী থাকে। সোমরত্ন তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসার ধান্দায় ছিল—কিন্তু কাদের তাকে ইনিয়ে বিনিয়ে শোনাল কিভাবে একটু আগে তার ছেলে কবরখানার পাশ দিয়ে আসার সময় ভূতের তাড়া খেয়ে গর্তে পড়ে গিয়ে পা মচকেছে। ভীতু সোমরত্ন আরো ভয় পেয়ে কাদেরের দোকান থেকে একটা লোহার পেরেক চেয়ে দাঁতে কামড়ে ধরল—লোহাকে যে ভূত-প্রেত ভয় পায় এ কে না জানে! রাস্তায় একটু এগুতেই সোমরত্নের মনে হল পেছনে যেন কার পায়ের আওয়াজ। সে ভয় পেয়ে জোরে পা চালাল—পেছনের আওয়াজও দ্রুততর হল। একবার সোমরত্ন থামল—পেছনের আওয়াজও থেমে গেল। ভয়ে ভয়ে সে একবার পেছনের দিকে তাকাল—আবছা অন্ধকারে সে স্পষ্ট দেখল মাত্র গজ পনের দূরে এক নারীমূর্তি। প্রাণপণে ছুটে বাড়ী এসে সোমরত্ন বারান্দায় আছড়ে পড়ল! একটু পরে সম্বিৎ ফিরে পেতেই সে পাগলের মত প্রলাপ বকতে শুরু করল। রাত্রে কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়ল—কিন্তু মাঝরাতে প্রচন্ড চীৎকার করে জেগে উঠল। প্রতিবেশী এক ছেলের মৃতা স্ত্রী, লীলাবতী নামে সে নিজের পরিচয় দিল। তারপর থেকে সে পুরো পাগলই হয়ে গেল—অফিসে যাওয়া বন্ধ হল। ডাকা হল ওঝাকে। প্রচুর টাকা নিয়ে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে ও সোমরত্নকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ওঝা রায় দিল লীলাবতীর প্রেতাত্মাই সোমরত্নের ওপর ভর করেছে। ওঝা নাকি তাকে রাজি করিয়েছেন চলে যাওয়ার জন্য। একটি মুরগী বলি দেওয়া হল। কিন্তু না, এত সবেও কিছু হল না। সোমরত্নের কথাবার্তা একটু কমলেও ছটফটানি, শূন্য দৃষ্টি আর অনিদ্রা দূর হল না।

সোমরত্নের বাড়ীর কাছাকাছি থাকতেন শ্রী জয়সিংহী নামে এক ভদ্রলোক। তাঁর বড় ছেলে সিরিল জয়সিংহ রিচমন্ড কলেজে ডঃ কোভুরের ছাত্র ছিলেন। ওঁর কাছ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে সোমরত্নের ব্যাপারটি শুনে ডঃ কোভুর ওদের বাড়ী গেলেন। সবকিছু শুনলেন। দুপুরে সিরিলের বাড়ীতে খেতে বসে ওঁর মায়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে সোমরত্নের ব্যাপারটি বিস্তারিতভাবে বলছিলেন। সবশুনে সিরিলের মা বলে উঠলেন, "আরে। কি হয়েছে বুঝতে পারছি, ও পেত্নি নয়—আমাদের লিলি। ও বলেছিল বটে একদিন সোমরত্নের পেছনে পেছনে সন্ধ্যেবেলা এসেছিল।" ধীরে ধীরে সব ব্যাপারটি জানা গেল। লিলি সিরিলদের বাড়ীতে রান্না করে। ঐ দিন বাড়ী থেকে বাসে করে সে ফিরেছিল—রাত হয়ে গেছে, কবরখানার পাশ দিয়ে আসতে হবে, তাই একা একা বেশ ভয় করছিল। এমন সময় দেখল সোমরত্ন যাচ্ছে। পরপুরুষের পাশাপাশি তো যাওয়া যায় না, তাই ও একটু দূরত্ব রেখে ওর পিছন পেছন আসছিল এবং সোমরত্নের মুখোমুখি পড়ে যাওয়া এড়ানর জন্য সোমরত্ন থেমে গেলে লিলিও থেমে যাচ্ছিল ; আবার সোমরত্ন তাড়াতাড়ি হাঁটলে ও তাড়াতাড়ি হাঁটছিল যাতে বেশী পিছিয়ে না পড়ে।

লিলিকে ডেকে সোমরত্নের সামনে সবকিছু বলান হল। ডঃ কোভুরও সোমরত্নকে বোঝালেন। তারপর থেকেই সোমরত্ন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।

বান্ধবীর ভূত—কলম্বোর মেসেঞ্জার স্ট্রীটের মি. আহমেদ-এর ১২ বছরের মিষ্টি মেয়ে নুনিয়া ১৯৬৪ সালের ৩১শে জুলাই রাতে ভূত দেখল। ওর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী, প্রায় সমবয়সী জারিনা ঐ বছর ১৮ই মে হাসপাতালে মারা যায়। ১৫ই জুলাই রাতে নুনিয়ার ছোটভাই বাথরুমে যেতে গিয়ে দেখল অন্ধকার এক কোণে একটি ভূত দাঁড়িয়ে আছে—ওর চেঁচামেচিতে ছুটে এসে ওর মা দেখলেন শুকোতে দেওয়া একটা শায়াকে ও আবছা অন্ধকারে ভূত মনে করেছে। এ নিয়ে সবাই হাসাহাসি করলেও নুনিয়ার হাবভাবে এর পর থেকে একটা পরিবর্তন দেখা দিল। ৩১শে জুলাই রাত্রে ও বাথরুমে যাওয়ার পথে অন্ধকারে জারিনার ভূত দেখতে পেল ; ও জানাল, জারিনা নাকি ওকে ডাকছে, নুনিয়া না যেতে চাইলে গলাটিপে মারবে বলেছে। এরপর প্রায়ই ও গলা অব্দি সাদা কাপড়ে ঢাকা জারিনার ভূত দেখতে থাকল! এর সঙ্গে শুরু হল খিঁচুনি, চীৎকার, অসংলগ্ন কতাবার্তা, বাড়ী থেকে ছুটে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা, কখনো বা যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে।

বাড়ীর লোকেরা স্বাভাবিকভাবেই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। নানা ওঝাগুণিনকে ডাকা শুরু হল ভূতটিকে তাড়ানর জন্য। এরা বহু মন্ত্র পড়ে, মাদুলি পরিয়ে নানা যাগযজ্ঞ করে করে ভূত তাড়ানর ব্যবস্থা করল। এক মুসলিম গুণিন নুনিয়ার চারপাশে ধোঁয়া দিয়ে ভূত তাড়ানর চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না! নুনিয়ার ভূত দেখা আর অস্বাভাবিক আচরণ বরং ক্রমশঃ বাড়ছে। এদিকে পরপর ৬ জন ওঝার পেছনে প্রচুর টাকাও খরচ হয়ে গেল।

শেষে মিঃ আহমেদের এক শিক্ষিত আত্মীয়ের পরামর্শে তাঁরা ডঃ কোভুরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ডঃ কোভুর নুনিয়ার সম্মোহন চিকিৎসা (hypnotherapy) করা-কালীন জানতে পারলেন জারিনা নুনিয়ার কি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল এবং ওর মৃত্যুতে নুনিয়া কি আঘাত পেয়েছে। মানসিক চিকিৎসার সাহায্যে ডঃ কোভুর নুনিয়াকে নিশ্চিন্ত করলেন যে, ভূত-প্রেত বলে কিছু নেই, সুতরাং জারিনার ভূতের অস্তিত্বও থাকা সম্ভব নয় ইত্যাদি। এরপর নুনিয়া আর ভূত দেখেনি। ওর খিঁচুনি, অসংলগ্ন কথাবার্তা ইত্যাদিও চলে গেল।

আসলে ছোটবেলা থেকেই অন্যান্য বাচ্চার মত নুনিয়ার মনেও ভূত-প্রেত সম্পর্কে একটি মিথ্যা বিশ্বাস (delusion) ঢোকান হয়েছিল। জারিনার মৃতদেহটা ও লুকিয়ে দেখেছে, সেটি ছিল গলা অব্দি সাদা কাপড়ে ঢাকা। তাই জারিনার ভূতকেও ও দেখেছে গলা-অব্দি সাদা কাপড়ে ঢাকা অবস্থায়। ওর ভাই শায়াকে ভূত ভেবেছে (ভ্রমাত্মক দর্শনানুভূতি বা visual illusion)। সবাই এ নিয়ে হাসাহাসি করলেও নুনিয়ার কোমল মনে এটি সংক্রমিত হয়েছে এবং অতি প্রিয় খেলার সাথীকে হারানর বেদনার সঙ্গে প্রেতাত্মায় বিশ্বাস মিশে ওর মনে হয়েছে ঐ অন্ধকার কোণে জারিনা আছে প্রেতাত্মা হয়ে। ফলে বারবার তার ভ্রমাত্মক নানা অনুভূতি (illusion) ও মতিভ্রম হয়েছে, ধীরে ধীরে মানসিক অস্বাভাবিকত্ব সৃষ্টি হয়েছে। এটি চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে খিঁচুনি, ছুটে বেরিয়ে যাওয়া, গুম হয়ে বসে থাকা ইত্যাদিতে—এটি মানসিক রোগ hysteria-এর অনুরূপ।

AMARBOI.COM

আগুনে-ভূত—১৯৫১ সালের ঘটনা। সিংহলের এক জমিদার তিকিরি সেনার বিশাল খামারবাড়িতে প্রতিদিন রাত এগারোটার সময় একটি আগুনে-ভূত দেখা দিতে থাকল। তিকিরি সেনার বাড়ীতে থাকতেন তিনি ও তাঁর স্ত্রী—এছাড়া দু'জন চাকর চাকরানি ছিল,— ওরা স্বামী-স্ত্রী। জমিদারবাড়ীর বিশাল বাগানের এককোণে কুঁড়েতে ওরা থাকত ; তাছাড়া যেদিন থেকে ভূত দেখা গেল ঐ দিন তিকিরি সেনার ২০ বছর বয়সী ছেলেটি স্কুলের গরমের ছুটিতে হস্টেল থেকে বাড়ী এসেছিল। রাত এগারোটা নাগাদ বাইরে একটা চীৎকার, চেঁচামেচি শোনা গেল। ভূত-প্রেত-জ্যোতিষে গভীর বিশ্বাসী, ভীতু তিকিরি সেনা সঙ্গে সঙ্গে সব দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে শুরু করে দিলেন—সারারাত ঘুম প্রায় হলই না। পরের দিন ভোরে ঝি-চাকররা এসে জানাল যে, জমিদারবাড়ীর কিছু দূরে গতকাল রাত এগারোটার সময় বিশাল একটি আগুনকে মাটি থেকে বেশ কিছুটা ওপরে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে। ব্যাপারটি যে ভৌতিক তাতে আর সন্দেহ নেই। কেউ কেউ বলল এ দেবতার আগুন। যাই হোক, ঝি-চাকররা কেউ আর ওদিন থেকে সন্ধ্যের পর থাকতে চাইল না। আগে মেয়েরা চলে যেত সন্ধ্যের সময়, কিন্তু চাকর দু'জন সব কাজ সেরে রাত দশটায় বাড়ী যেত। এখন সন্ধ্যে হতে না হতেই ওরা সকলে বাড়ী চলে গেল। ভূত-প্রেতের ব্যাপার—জমিদার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবুরা না-ও বলতে পারেন না। এদিকে ওঁরা ছিলেন ঝি-চাকরদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল—তাই তাঁরা খুবই অসুবিধেয় পড়লেন। এরপর প্রতিদিনই রাত এগারোটার সময় ঐ আগুনে ভূতটিকে দেখা যেতে লাগল। চারিদিকে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়েছে। সন্ধ্যের পর কেউ আর বাইরে থাকে না—দরজা-জানালার ফাঁক দিয়ে শুধু দেখে কখন ভূত বেরুচ্ছে।

তিকিরি সেনা ডঃ কোভুরের খোঁজ পেয়ে একদিন তাঁর শরণাপন্ন হলেন। ডঃ কোভুর তিকিরি সেনার খামারবাড়ীতে গেলেন এপ্রিল মাসে। রাত্রে তিনি জেগে থাকলেন। রাত এগারোটার সময় জানালার ফাঁক দিয়ে যথারীতি ঐ ভুতুড়ে আগুন দেখা দিল। তিকিরি সেনা ফিসফিস করে বললেন, "ঐ সেই আগুন"। ডঃ কোভুর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে যেতে চাইলে তিকিরি সেনা আঁতকে উঠে পিছিয়ে গেলেন। অগত্যা ডঃ কোভুর একটি ছড়ি নিয়ে একাই বাইরে গেলেন এবং ধীরে ধীরে ঐ আগুনটির দিকে এগিয়ে গেলেন। অন্ধকার নিস্তব্ধ রাত—মাটি থেকে প্রায় ৬ ফুট উঁচুতে ঐ আগুন এদিক ওদিক নড়ছে। একসময় দেখা গেল আগুনটি ডঃ কোভুরের থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। ডঃ কোভুর জোরে হাঁটতে লাগলেন। আগুনটি থেকে তিনি যখন মাত্র ৫০ গজ দূরে তখন আগুনটি স্থির হয়ে গেল, একটু পরেই ডঃ কোভুরের দিকে এগিয়ে আসলে লাগল। তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়লেন। একটু কাছে আসতেই দেখা গেল, আগুনের নীচে মানুষের চেহারার মত কিছু দেখা যাচ্ছে। হঠাৎই দেখা গেল ভুতুড়ে আগুনটি মাটিতে আছড়ে পড়ল এবং কে একজন যেন ছুটে পালাতে লাগল। ডঃ কোভুর সঙ্গে সঙ্গে তার পেছন পেছন ছুটলেন। নারকেল গাছ লাগানোর জন্য বাগানে যে গর্ত করা হয়েছিল ঘটনাচক্রে লোকটি ঐ গর্তে হঠাৎ পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ডঃ কোভুর তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। লোকটি তাঁর পা জড়িয়ে ধরল। ডাঃ কোভুর সবিস্ময়ে দেখলেন, লোকটি তিকিরি সেনারই একজন চাকর। সে কাঁদতে কাঁদতে যা জানাল তার সারমর্ম এই। ছেলেটি এই কিছুদিন হল বিয়ে করেছে। তার অল্পবয়সী সুন্দরী বৌ-ও তিকিরি সেনার বাড়ীতে কাজ করে। সে সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরে আসে—তার স্বামী আসে রাত দশটার পরে। আর এই ফাঁকে তিকিরি সেনার ছেলে আগের ছুটিতে বাড়ী এসে মেয়েটিকে একা পেয়ে বিরক্ত করেছে, তার সঙ্গে ফস্টিনস্টি করেছে। এবারও প্রথমদিন এসেই সে ঐ কান্ড করেছে। জমিদারপুত্রের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ করার অর্থ মারধোর খাওয়া, চাকরি যাওয়া এবং এমনকি প্রাণনাশের সম্ভাবনাও। তাই ঘুরিয়ে এই পথই তাকে নিতে হয়েছে। ভুতুড়ে আগুনের ভয়ে জমিদারের ছেলেও বেরোবে না আর এর জন্য চাকর-বাকররাও সন্ধ্যের মধ্যেই বাড়ী ফিরতে পারবে। এই ভাবে চাকরটি তার বৌকে বাঁচানর চেষ্টা করেছে। সে ডঃ কোভুরকে বার বার মিনতি করল যাতে তিনি তার ব্যাপারটি জমিদারকে না জানান।

ডঃ কোভুর যদি সাহসের সঙ্গে পুরো ব্যাপারটি না দেখতেন তবে এ রহস্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাধান হত না। স্থানীয় লোকেরা পুরুষাণুক্রমে ঐ অঞ্চলে এই ভুতুড়ে আগুনের কথা বলে যেত।

আগুনে-দৈত্য—১৯৩০ সালে ডঃ কোভুর যখন জাফনা সেন্ট্রাল কলেজে পড়ান, তখন তিনি একবার কয়েকজনের সঙ্গে এক জঙ্গলে শিকারের জন্য গিয়েছিলেন। ওখানে স্থানীয় শিকারীরা জানাল ওলুমাদু নামে ওখানকার একটি জঙ্গলে শিকার করতে যাওয়া বারণ,—ওখানে জঙ্গলের দৈত্য কাদেরী তার বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে। ওদের শরীর আগুনের। দিনের বেলায় ওরা এদিক ওদিক বেড়াতে যায়। কিন্তু রাত্রি হলেই জঙ্গলে ফিরে আসে আর কয়েকটি 'পালু' গাছে (বকুলজাতীয় গাছ) ভর করে থাকে। দূর থেকেও দেখা যায় গনগনে আগুনের মত বিশাল চেহারা। বহু বছর ধরে স্থানীয় লোকেরা এই আগুনে-দৈত্যকে দেখে আসছে। যত দিন যাচ্ছে কাদেরীর ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়ছে। একবার চারজন সাহেব বারণ না শুনে রাত্রে ওখানে শিকার করতে ঢুকেছিল। পরের দিন সকালে ওদের মৃতদেহগুলিকে পাওয়া গেছে—পাশে বন্দুকগুলি পড়ে। কাদেরী যে ক্রুদ্ধ হয়ে এদের মেরে ফেলেছে তাতে আর সন্দেহ নেই—বন্দুক সেখানে কোন কাজে লাগে না! অন্যদের আপত্তি সত্ত্বেও ডঃ কোভুর ওখানে যেতে চাইলেন। শেষে ঠিক হল, বন্দুক না নিয়ে খালি হাতে দূর থেকে দৈত্যদের দেখতে যাওয়া হবে। রাত্রে তাঁরা জঙ্গলে গিয়ে দেখেন—সত্যিই বিশাল একটা গনগনে আগুনের স্তম্ভ—এই হল প্রধান দৈত্য—কাদেরী! আশে পাশে ছোটবড় নানা আকারে আরো কয়েকটি—কাদেরীর বৌ-ছেলেমেয়ে! সবাই ফিরে এলেন। পরের দিন সকালে লুকিয়ে ডঃ কোভুর আবার গেলেন ওলুমাদুর ঐ জঙ্গলে। খুঁজে খুঁজে ঐ পালুগাছগুলি তিনি বের করলেন, যেগুলিতে কাদেরী তার 'ফ্যামিলি' নিয়ে রাত্রে থাকে। বড় গাছটি সম্পূর্ণ মৃত, অন্যগুলিও প্রায় মরমর। ওদের গায়ের রঙ ঈষৎ হলুদাভ। ডঃ কোভুর ছুরি দিয়ে প্রত্যেকটি গাছের বাকলের এক একটি টুকরো তুলে নিলেন।

বাড়ী ফিরে রাত্রে দেখেন অন্ধকারে ঐগুলো জ্বলছে—একটি স্নিগ্ধ আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে ঐ টুকরো বাকল থেকে। ঠাট্টা করে স্ত্রীকে বললেন, 'ঐ যে, কাদেরী আর তার বৌ-ছেলেমেয়েরা।' পরে কলেজের পরীক্ষাগারে আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় দেখা গেল বাকলগুলির গায়ে এক ধরনের ছত্রাক (fungus) রয়েছে অসংখ্য। গাছের মরা বাকলের গভীরে তারা ঢুকে আছে,—অর্থাৎ এই ছত্রাকগুলি মৃতজীবী (saprophytic)। এখানে যে ছত্রাকটি পাওয়া গেছে তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার শরীরে এক ধরনের জৈব আলো সৃষ্টিকারী পদার্থ রয়েছে (bio-luminous variety of fungus)। দিনের বেলায় সূর্যের আলোয় এই আলো আলাদা করে চোখে পড়ে না—যেমন আকাশের নক্ষত্রগুলিকে দিনের বেলায় দেখা যায় না। কিন্তু রাত্রে তাদের স্নিগ্ধ আলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পালুগাছের মরা বাকলে ছত্রাকটি আশ্রয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়েছে—যত দিন গেছে আশে পাশের গাছে আরো ছড়িয়েছে। একেই স্থানীয় লোকেরা ভেবেছে কাদেরী নামক আগুনে-দৈত্য রাত্রে জঙ্গলে ফিরে আসছে এবং যতদিন যাচ্ছে ততই তার ছেলেমেয়েদের সংখ্যা বাড়ছে। সাহস করে যদি কেউ কাছে গিয়ে দেখত অথবা ডঃ কোভুরের মত কেউ বাকলটি বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করত তবে আগেই আসল ব্যাপারটা ধরা পড়ত। কিন্তু তা হয়নি—তাই বহু বছর ধরে কাদেরী ভূতের ব্যাপারটা স্থানীয় মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে গেছে। স্থানীয় মানুষের কারোরই ছত্রাক বা জৈব আলোর সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই—তাই এ ধরনের সম্ভাবনার কথাই কারোর মাথায় আসে নি। ফলতঃ রহস্যময় ঐ আলোর প্রতি একটি ক্রমবর্ধমান ভীতি গেড়ে বসেছে এবং তাকে ঘিরে নানা কল্পনার ডালপালা গজিয়েছে। সাহেবদের মৃত্যু নিছক ভয়েই হতে পারে। প্রচন্ড উত্তেজনায় বা ভীতিতে শরীরের মধ্যে অতিরিক্ত অ্যাড্রেনেলিন (adrenaline) জাতীয় পদার্থের ক্ষরণ হয়ে হৃৎপিন্ড বন্ধ হয়ে যায়। যিনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে, ভূত-প্রেত-দৈত্য জাতীয় কোন অলৌকিক ব্যাপার নেই এবং যিনি জানেন, যাই ঘটুক না কেন সবকিছুরই পেছনে রয়েছে বাস্তব কিছু কারণ—কেবলমাত্র তিনিই সাহস করে প্রকৃত সত্যের আবিষ্কার করতে সমর্থ হন।

(এই ছত্রাক বলে শুধু নয়, আরো বিশেষ কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণীর শরীর থেকেই এক ধরনের জৈব আলো বিচ্ছুরিত হয়। লুসিফেরিন জাতীয় একটি পদার্থ এর পেছনে রয়েছে। মেলানিন জাতীয় একটি রাসায়নিক দ্রব্য যেমন আমাদের গায়ের চামড়ার কালোরঙের জন্য দায়ী, এবং আবহাওয়া, বংশগত কিছু কারণ ইত্যাদির জন্য যেমন কারোর বা কোন মানবগোষ্ঠীর গায়ের রঙ হয় কালো বা সাদা আর এর জন্য যেমন কোন দেবতার অনুগ্রহ বা আশীর্বাদ নেই,—ঠিক তেমনিই, এই লুসিফেরিন জাতীয় রাসায়নিক পদার্থও বিশেষ কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণীর শরীরে বিবর্তনগত বা অন্য কোন কারণে, জৈব প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয়েছে,—এটিও কোন কাল্পনিক ভূত-প্রেত-দৈত্য বা দেবতার কারসাজি নয়। কোন কোন প্রাণী তার শরীরের এই জৈব আলোকে নিজের মস্তিকের বা স্নায়ুর ক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রণও করতে পারে।

এই ধরনের জৈব আলো-বিচ্ছুরণকারী প্রাণী বা উদ্ভিদকে নির্জন রাত্রে জঙ্গলে, পুকুরের জলে বা সমুদ্রে দেখলে এ ব্যাপারে অজ্ঞ মানুষের আতঙ্কিত হওয়াটাই স্বাভাবিক, বিশেষতঃ যখন ভূত-প্রেত ইত্যাদি সম্পর্কে একটি মিথ্যা বিশ্বাস আগে থেকেই মনের মধ্যে শিকড় গেড়ে বসে আছে।)

ডঃ কোভুরের হস্তীরূপ প্রেতাত্মা দর্শন—ডঃ কোভুর ও তাঁর স্ত্রী একবার ভূত দেখেছিলেন। তিনি তখন গালে শহরের রিচমন্ড কলেজে পড়ান। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে এ কলেজে তিনি যোগ দেন। পাহাড়ের ওপর কলেজটির বিশাল কম্পাউন্ড ছিল। এখানে একটি বিরাট বুনো আম গাছের কাছাকাছি জায়গাটি ভূতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। একবার এক ছাত্র শহর থেকে সন্ধ্যেবেলা ফিরছে। গাছটির কাছাকাছি আসতে সে দেখল আর একটি ছেলে তার সামনে দিয়ে যাচ্ছে। এমনিতেই তার গা ছমছম করেছিল, তাই সে ছেলেটির সঙ্গ নিল। কিন্তু একটু পরেই ছেলেটি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, তার জায়গায় দেখা দিল একটি কুকুর। আতঙ্কে মরিয়া হয়ে ছাত্রটি ছুটতে ছুটতে হস্টেলে এসে অজ্ঞান হয়ে গেল। আরেকবার কলেজ হস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীথুরাইরত্নম প্রায় মাঝ রাতে দু'জন ছাত্রের সঙ্গে ফিরছিলেন। গাছটির কাছকাছি আসতে শুনলেন ওপরে যেন কিসের আওয়াজ হল। ভয়ে ভয়ে ওপরে তাকিয়ে তাঁদের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল—গাছের ডালে মনুষ্যাকৃতি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কে যেন বসে আছে। সঙ্গে সঙ্গে ছুট লাগালেন তাঁরা—ছুটতে যাওয়ার মুখে আবার গাছটির একটি ফল এক ছাত্রের পিঠে সজোরে এসে লাগল। প্রেতাত্মা যে বাগে পেয়ে তাঁদের পালাতে দিতে চায় না—এ ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চিত হলেন। কোন রকমে প্রাণ নিয়ে তাঁরা পালিয়ে আসতে পেরেছিলেন সেবার। এই ধরনের আরো নানা গায়ে-কাঁটা দেওয়া গল্প ঐ ভুতুড়ে জায়গাটি ঘিরে চালু রয়েছে,—প্রেতাত্মারা কি করে, কিভাবে বিভিন্ন জীবজন্তুর আকার নিয়ে লোকেদের বিপদে ফেলে ইত্যাদি।

এক রাত্রে ডঃ কোভুর ও তাঁর স্ত্রী একটি অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন। এত রাত হয়ে গেছে দেখে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা ঐ ভুতুড়ে জায়গাটির জন্য একটা টর্চ দিতে চাইলেন। ডঃ কোভুর জানালেন, ঐ অস্তিত্বহীন ভূতপ্রেত সম্পর্কে তাঁদের কোন ভীতি নেই, তাই টর্চ না হলেও চলবে। তারপর বেরিয়ে, ঐ ভুতুড়ে গাছটির তলা দিয়ে যাওয়ার সময় ডঃ কোভুরের স্ত্রী বলছিলেন, "কোন ভীতু লোক এত রাত্রে এই গাছটির নীচ দিয়ে গেলে...।" কিন্তু তিনি তাঁর কথা শেষ করতে পারলেন না। ডঃ কোভুরকে জড়িয়ে ধরে গোঁ-গোঁ আওয়াজ করতে থাকলেন। কোন রকমে আঙ্গুল দিয়ে, সামনে দেখিয়ে ডঃ কোভুরকে বললেন "ঐ দেখ একটা হাতি"। ডঃ কোভুরও ঐদিকে তাকিয়ে দেখলেন সত্যিই একটা হাতি ওদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে এক ধরনের আওয়াজ করছে, অর্থাৎ প্রেতাত্মাটি যেন হাতির রূপ ধরে এসেছে। ডঃ কোভুরও একটু ভয় পেয়ে গেলেন, তবু একবার হাতিটির কাছে যেতে চাইলেন ভাল করে দেখার জন্য। কিন্তু তাঁর স্ত্রী তাঁকে জড়িয়ে ধরে একটুও নড়তে দিলেন না, বরং পালিয়ে যাওয়ার জন্য জেদ করতে থাকলেন। অগত্যা ডঃ কোভুর হাতিটির উদ্দেশ্যে জোরে চীৎকার করলেন, এতে হাতির আওয়াজ বন্ধ হল, সে জোরে তার একটা কান নাড়ল এবং একটু পরেই পাশে তার মাহুতকে দেখা গেল। এত রাত্রে হাতিকে এখানে আনার জন্য ডঃ কোভুর তাকে বকলেন। তখন লোকটি বলল, "হাতি কোথায়? এ তো ডাক্তারবাবুর গাড়ী, ডাক্তারবাবু এসেছেন প্রিন্সিপ্যালের কাছে। গাড়ীটা তো ওপরে ওঠান মুস্কিল, তাই এখানেই রাখা হয়েছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রমশঃ সব ব্যাপার পরিষ্কার হল। ডাক্তারের গাড়ীর এই ড্রাইভার অপেক্ষা করতে করতে গাড়ীর ভেতর নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ডঃ কোভুরের স্ত্রী যদিও অনেকটাই কুসংস্কারমুক্ত তবু অবচেতন মনে ভূত সম্পর্কে একটি ভীতি ছিলই—যা ছোটবেলায় বিচ্ছিন্নভাবে মনের মধ্যে ঢুকেছে। সব মিলিয়ে ভুতুড়ে গাছটির কাছে এসে অন্ধকারে গাড়ীটিকে দেখে হাতী বলে ভ্রান্ত অনুভূতি (iluusion) হয়েছে। তাঁর এই ভ্রান্ত ধারণা ও ভীতি ডঃ কোভুরের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে। ড্রাইভারের নাক ডাকাকে তাঁদের মনে হয়েছে হাতীর গর্জন। ডঃ কোভুরের চীৎকারে ড্রাইভারের ঘুম ভেঙ্গে নাক ডাকা বন্ধ হয়ে যায়—সে গাড়ীর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে। এটিকেই ডঃ কোভুর দের মনে হয়েছে হাতির কান নাড়া ও মাহুতের আবির্ভাব। ডঃ কোভুরের স্ত্রী যদি তাঁকে একবার ঐ 'হাতিটির' কাছে যেতে দিতেন, তবে সব রহস্যের সমাধান হয়ে যেত। তা না করে তাঁর অস্বাভাবিক ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া হয়েছে ডঃ কোভুরের ওপর। আর আদৌ যদি ডঃ কোভুর দাঁড়িয়ে পড়ে না চেঁচাতেন এবং সাধারণ ভীতু মানুষের মত ছুটে পালিয়ে আসতেন তবে চারদিকে এটিই সবাই জানত যে এক প্রেতাত্মা হাতির রূপ ধরে এসেছিল,—ভুতুড়ে গাছটিকে ঘিরে আরেকটি গল্প যোগ হত। আগেও তাই-ই ঘটেছে। প্রথমোক্ত যে ছেলেটি এক ছেলেকে একটি কুকুরে পরিণত হতে দেখেছে, তারও ভ্রান্ত অনুভূতি (visual illusion) হয়েছে। মনের মধ্যে প্রচন্ড ভয়ে সে আন্তরিকভাবেই চাইছিল যদি একজন সঙ্গী পাওয়া যায়। ঐ সময় একটি কুকুরকে দেখেই তার মনে হয়েছে সঙ্গী ছেলে। একটু পরেই তার ভুল ভেঙ্গেছে—কিন্তু সে এটিকে ভুল বলে উপলব্ধি করেনি, তার মনে হয়েছে ছেলেটি কুকুরে রূপান্তরিত হয়ে গেল। শ্রীথুরাইরত্নম ও তাঁর দুই সঙ্গী ছেলে গাছের ডালে যা দেখেছিল তা যথাসম্ভব ছিল একটি বাঁদর। কিন্তু ভয়ে তা আর যাচাই করেননি তাঁরা। ওঁদের ছুটতে দেখে বাঁদরটি একটি ফল পেড়ে ছুঁড়েছে—একে মনে হয়েছে ভূতের আক্রমণ।*

---

* এইভাবে নানা কারণে 'ভূত-প্রেত-দত্যি-দানোর' মতিভ্রান্ত দর্শন পাওয়া যায়। প্রায় কোনক্ষেত্রেই ভীতু মানুষ ব্যাপারটিকে যাচাই করে দেখে না। ফলে দিনের পর দিন এদের অস্তিত্ব সম্পর্কে দৃঢ়বিশ্বাস মনে জন্মে যায়। বিশ্বাসটি এতই বদ্ধমূল হয় যে সেখানে কোন বুদ্ধি-যুক্তির স্থান থাকে না। তাই নিজের ভ্রান্ত বিশ্বাসের স্বপক্ষে এ ধরনের যুক্তিও দেখান হয় যে, "এই ঘটনাটির পেছনে হয়তো কোন প্রেতাত্মা নেই, কিন্তু আরো বহু ঘটনা অমুকের ক্ষেত্রে ঘটেছে যেগুলির পেছনে কোন বাস্তব কারণ পাওয়া যায় নি; অতএব ওগুলির পেছনে ভূত-প্রেতই রয়েছে।" অলৌকিকত্ব, ঈশ্বর ইত্যাদির স্বপক্ষেও একই যুক্তি হাজির করা হয়; প্রকৃতপক্ষে অব্যাখ্যাত ঐসব ঘটনাকে আদৌ তলিয়ে অনুসন্ধানই হয়তো করা হয়নি অথবা আংশিক অনুসন্ধানে, আপাত-ভাবে কোন বাস্তব কারণ পাওয়া যায় নি। ডঃ কোভুর বা তাঁর মত কয়েকজনের পক্ষে সারাজীবন ধরে চেষ্টা করলেও অতীত ও বর্তমানের প্রচারিত এ ধরনের হাজার হাজার তথাকথিত ঘটনার সবকটির স্বরূপ উদ্ঘাটন বাস্তবতঃই সম্ভব নয়। এর জন্য বহু সংখ্যক মানুষের সচেতন প্রচেষ্টা প্রয়োজন—যা একটি সামাজিক আন্দোলনের পর্যায়ে পড়বে। জলকে পরীক্ষা করে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়ে তৈরী বলে প্রমাণ করা গেছে, তাই পৃথিবীর বা বিশ্বব্রহ্মান্ডের কোথাও কোন পদার্থকে জল বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূতের উৎপাত

১৯৬৫ সালের ২৫শে এপ্রিল কলম্বোর একটি মারকেনটাইল ফার্মের অফিসার শ্রী সিন্নাতাম্পি ডঃ কোভুরের সঙ্গে দেখা করে জানালেন যে, জাফনায় ভদ্রলোকের বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে। দিনে-রাতে যখন তখন রহস্যজনকভাবে বাড়ীতে ঢিল পড়ছে, ভাতের হাঁড়িতে ধুলো-ময়লা পড়ছে, হঠাৎ হঠাৎ খালি বোতল আর টিন মাটিতে আছড়ে পড়ছে ইত্যাদি। বহু গুণিন আর ওঝাকে ডাকা হয়েছে। তারা বহু যাগ-যজ্ঞ-পূজা-স্বস্ত্যয়ন করেছে—কয়েক শত টাকা খরচ হয়েছে, কিন্তু ভূতের উৎপাত কমেনি। এমনকি ঐ সব অনুষ্ঠানের সময়ও গুণিন-ওঝার গায়ে ঢিল পড়েছে। ওরা প্রতিবারেই এক গাদা টাকা নিয়ে আর টাকা খরচ করিয়ে বলেছে, আর উৎপাত হবে না। সবই ভুল। একই ভাবে চলেছে ভূতের ঢিল ফেলা আর অন্যান্য উপদ্রব। বরং বেড়েছে। শুরু হয়েছে জিনিসপত্র হারানো। শ্রী সিন্নাতাম্পির বাবা, থানাপতি পিল্লাই-এর নকল দাঁত হারিয়ে গেছে। ঘরের চাবি, টুথপেস্ট, ওষুধের কৌটো হারিয়েছে। ওষুধের কৌটোটি অবশ্য পরে একটি বাক্সের নীচে লুকনো অবস্থায় পাওয়া গেছে।

ডঃ কোভুর শ্রী সিন্নাতাম্পিকে বোঝালেন যে, ঢিল ছোঁড়া, ময়লা ফেলা বা জিনিস লুকনোর জন্য কাউকে তো কাজ করতে হচ্ছে—এর জন্য চাই হাত, এই হাত চালানর জন্য শক্তি, ও এই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার মত মস্তিষ্ক ইত্যাদিও থাকা দরকার। অশরীরী কোন কিছুর পক্ষে তাই একাজ করা অসম্ভব। অবশ্যই এসব কাজ করছে একজন মানুষ। আর সবচেয়ে বড় কথা, অশরীরী কোন প্রেতাত্মার অস্তিত্বই থাকা সম্ভব নয়। ডঃ কোভুর বললেন, অবশ্যই বাড়ীর কেউ গোপনে এসব কাজ করছে—হয় কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে অথবা মানসিক রোগবশতঃ। তাকে খুঁজে বের করলেই সব রহস্যের সমাধান হবে। শ্রীসিন্নাতাম্পি খুশি হয়ে বাড়ী গেলেন। কিন্তু কয়েকদিন পরেই হতাশ হয়ে ফিরে এসে জানালেন যে, বহু চেষ্টা করেও তাঁরা কাউকে ধরতে পারেন নি—নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন অতৃপ্ত আত্মা, অশরীরী অশুভ শক্তি রয়েছে। সব শুনে ডঃ কোভুর সস্ত্রীক জাফনায় শ্রীসিন্নাতাম্পির বাড়ীতে গেলেন। বাড়ীতে ছিলেন শ্রীসিন্নাতাম্পির বাবা শ্রীথানাপতিপিল্লাই, মা শ্রীমতী

প্রমাণ করলেই সেটি যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়ে তৈরী তা স্বতঃসিদ্ধ—এর জন্য পৃথিবীর বা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব কটি জলের নমুনাকে ধরে ধরে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হয় না। একইভাবে আত্মা, প্রেতাত্মা বা পরমাত্মা বলে কিছু নেই, অলৌকিক-অবাস্তব-অতিপ্রাকৃতিক বলে কিছু ঘটতে পারে না—এটি যখন প্রমাণিত এবং এধরনের বহু ঘটনায় যখন সুনিশ্চিতভাবে এটি দেখা গেছে, তখন ঐ ধরনের যে কোন ঘটনা বা চিন্তার পেছনেও যে আত্মা-প্রেতাত্মা-পরমাত্মা-অবাস্তব-অলৌকিক-অতিপ্রাকৃতিক বলে কিছু থাকতে পারে না তা স্বতঃসিদ্ধ, এবং 'তথাকথিত ও আপাত রহস্যময় কিছুর পিছনে বাস্তব কারণ আছেই—হয়তো তা আপাতত জানা যাচ্ছে না'—এই চিন্তাই যুক্তিবাদী, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর লক্ষণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোন্নাম্মা, বোন শ্রীমতী পাকিয়াম ও এঁর তিন মেয়ে—দেবনায়কী (১৩ বছর), সুকির্ত্তম (৮ বছর) ও সেবামালা (৪ বছর)। ডঃ কোভুর ও তাঁর স্ত্রী সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বললেন।

জানা গেল ১৯৬৫ সালেরই জানুয়ারীর শেষের দিকে শ্রীথানাপতিপিল্লাই-এর ডানপায়ের হাঁটু ও গোড়ালিতে প্রচন্ড ব্যথা হয়েছিল। মালিশ-ওষুধ ব্যবহার করেও বিশেষ ফল হল না। হপ্তাদুয়েক পরে আবার পোন্নাম্মার সাংঘাতিক পেটের গন্ডগোল দেখা দিল। এর আগে এরকমভাবে রোগ বাড়ীতে হয় নি। তাই শ্রী থানাপতিপিল্লাই ভাবলেন, শুধু ওষুধে কাজ হবে না, সঙ্গে একজন গুণিন বা ওঝার শরণ নিতে হবে। পাশের গ্রামে একজন জেলে ছিল, ও ওঝাগিরি জানত। তিনি ঐ জেলে-কাম-ওঝার কাছে গেলেন—পানপাতায় মুড়ে দশ টাকা ওকে দিতে হল। ও মন্ত্রপূত আয়নায় (অঞ্জনম্) দেখে জানাল যে, লক্ষ্মী নামে ওঁদেরই কোনও আত্মীয়া বদমায়েসি করে মন্ত্র পড়ে দিয়েছে, তাই এত সব কান্ড। উল্টো মন্ত্র পড়ে ঐ মন্ত্রকে কাটান যায় তবে তার জন্য ১৫০ টাকা দিতে হবে। ফ্রেবুয়ারীর শেষের দিকে এই মন্ত্র কাটানর অনুষ্ঠান হয়। এই ১৫০ টাকা ছাড়াও আরো বহু দামী জিনিসই লাগল—মোট খরচ হল ২৫০ টাকা। এরপর শ্রীথানাপতিপিল্লাই-এর ব্যথা একটু কমলেও পোন্নাম্মার অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হতে লাগল। উপরন্তু জিনিসপত্র হারান শুরু হল। তাই ধারণা হল কোন প্রেতাত্মা বাড়ীতে উৎপাত করছে। তার প্রমাণও পাওয়া গেল। মার্চ মাসের শুরু থেকে বাড়ীর ছাদে, আনাচে কানাচে ছোটবড় ঢিল পড়া শুরু হল। ঢিলগুলো পড়ত সকাল ৯টা অব্দি ও বেলা দু'টোর পর থেকে রাত ৯টা অব্দি।

এই অবস্থায় শ্রী শিবপেরুমন নামে এক বিখ্যাত গুণিনকে আনানো হল। ইনি একটি ছোট রেল স্টেশনের স্টেশনমাস্টার ছিলেন—অবসর সময়ে ঐ সব কাজ করতেন। শিবপেরুমন অঞ্জনম্ দেখে জানালেন, থানাপতিপিল্লাই-এর বাড়ীর বাগানে একজন শত্রুস্থানীয় ব্যক্তি একটি শক্তিশালী মন্ত্রপূত জিনিস পুঁতে রেখেছে—এর ফলেই একটি অশুভ আত্মা আবির্ভূত হয়ে উৎপাত ঘটাচ্ছে। তিনি এর ব্যবস্থা করবেন, কিন্তু তাঁর ফি জানা গেল ১০০০ টাকা। এই বিপুল অংক শুনে তো থানাপতিপিল্লাই-এর চক্ষু চড়ক গাছ! কিন্তু শিবপেরুমন জানালেন যে তিনি অন্যদের মত বুজরুক নন—তাই তাঁর ফি এত বেশী। তিনি আরো জানালেন, কিছুদিন আগে একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আরেকজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মন্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন—শিবপেরুমন এই মন্ত্র কাটানোর ব্যবস্থা করেন, এতে সন্তুষ্ট হয়ে শেষোক্ত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তাঁকে ৫০০০ টাকা দিয়েছিলেন। যাই হোক দরদাম করে ঠিক হল কাজ সফল হলে ৫০০ টাকা দেওয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে ২৫০ টাকা দেওয়া হল অগ্রিম।

ঐদিনই রাত দশটার সময় শিবপেরুমন বাড়ীর বারান্দায় তাঁর কাজকর্ম শুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেন। এসব শেষ হলে, মাঝরাতে বাগানে গিয়ে মাপজোকের পর একটি স্থান ঠিক করে থানাপতিপিল্লাই ও জামাই পোন্নাম্পালান-কে বললেন জায়গাটি খুঁড়তে। চারফুটের মত খোঁড়ার পর শিবপেরুমন জানালেন, এবার তাঁকেই উলঙ্গ হয়ে একা এই গর্তের ধারে বিশেষ পূজা করতে হবে। তাই সবাইকে সরিয়ে দিয়ে তিনি উলঙ্গ হয়ে মন্ত্র পড়তে পড়তে গর্তটি আরো খুঁড়তে লাগলেন—অবশেষে একসময় তিনি গর্তের ভেতর থেকে একটি পাকান তাম্রপত্র বের করলেন, ওর গায়ে দুর্বোধ্য কি সব লেখা ছিল।

থানাপতিপিল্লাই ও সিন্নাতাম্পি দু'জনেই পরে স্বীকার করেছিলেন যে, ঐ তাম্রপত্র বেশ চকচকে ছিল এবং তাঁদের সন্দেহ হয়েছিল যে, শিবপেরুমন নিজেই ওটি ওখানে ফেলে দিয়ে ভান করেছিলেন যেন ওটা আগেই ওখানে পোঁতা ছিল ও তিনি খুঁজে বের করলেন!

যাই হোক, এসবের পর শিবপেরুমন জামাকাপড় পরে নিয়ে জানিয়েছিলেন যে, আর কোন গন্ডগোল হবে না। কিন্তু বাড়ীর লোকেদের আদৌ তা বিশ্বাস হয়নি। তাঁরা বললেন যে, আরো দু'একদিন পরে যদি দেখা যায় আর কোন ভূতের উৎপাত হচ্ছে না, তবে বাকী ২৫০ টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু সবাইকে নিরাশ করে পরের দিনই আবার ঢিল পড়তে লাগল। থানাপতিপিল্লাই শিবপেরুমনের কাছে গিয়ে সব ব্যাপার জানালেন। কিন্তু শিবপেরুমন আবার থানাপতিপিল্লাই-এর বাড়ী এসে নতুন করে পুজো করতে রাজী হলেন না। স্টেশনে প্রচুর কাজ! বাকী ২৫০ টাকাও তিনি আর চাননি।

এদিকে অবস্থা ক্রমশঃ ঘোরালো হতে লাগল। রান্না করা খাবারে নোংরা-ধুলোবালি এমন কি পায়খানা পর্যন্ত পড়তে লাগল। একবার বাড়ীর একজন অতিথির দামী কাগজপত্রশুদ্ধ ব্যাগ একেবারেই হারিয়ে গেল। টাকা হারাতে লাগল।

এরপর বাড়ীর জামাই অর্থাৎ শ্রীমতী পাকিয়ামের স্বামী শ্রীপোন্নাম্পালানের চেষ্টায় জা এলা নামক স্থানের এক বিখ্যাত গুণিন ও তার দলবলকে এক রবিবার নিয়ে আসা হল। দেবনায়কীকে বাজারে পাঠান হল সকলের খাবার আনতে। কিন্তু খাবার-ভর্তি ঝুড়ি বাড়ি নিয়ে এসে ঢাকনা খুলেই দেবনায়কী কেঁদে ফেলল—কে যেন খাবারের ওপর বালি ঢেলে দিয়েছে। আবার ওকে পাঠান হল—আবারও একই ঘটনা ঘটল। (অর্থাৎ যারা ভূত তাড়াতে এসেছে তাদের ওপর রেগে ঐ প্রেতাত্মাটি যেন তাদের খাবার নষ্ট করে দিচ্ছে।)

সারাদিন ধরে পুজোর বিপুল আয়োজন চলল। রাত ৯টার সময় পুজো শুরু হল, পুজো শেষ হবে দু'টো মুরগী বলি দিয়ে। কিন্তু বাইরে বাঁধা মুরগী দু'টো আনতে গিয়ে দেখা গেল কে যেন একটা মুরগী খুলে দিয়েছে। ফলে বাকী একটিকেই বলি দিতে হল। এসময় হঠাৎ ওদের ওপর ঢিল পড়তে লাগল। (এও যেন, শেষ মুহূর্তে প্রেতাত্মার আপ্রাণ চেষ্টা তার বিরুদ্ধে করা পুজোকে পন্ড করার জন্য।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুণিন ও তার দলবলও ভয় পেয়ে গেল। তারা জানল—এ খুব শক্তিশালী এক প্রেতাত্মার কাজ। গুণিনদের ১০০ টাকা দিয়ে বিদায় করা হল।

দু'দিন পরে দেবনায়কীর বাঁদিকের স্তনে প্রচন্ড ব্যথা শুরু হল। ওর মা দেখলেন ওর স্তনবৃন্তে ফোঁড়া হয়েছে। বাড়ীর সকলে এটিকেও ভূতের কান্ড বলেই ধরে নিলেন ও প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেলেন। ঠিক করা হল পয়েন্ট পেড্রোতে সেল্‌বা সন্নিধি মন্দিরে মুরুগাঁ দেবতার কাছে পুজো দেওয়া হবে। ওখানে সবাই ৪দিন ছিলেন। প্রথম তিনদিন কোন ঝামেলা হয়নি, ৪র্থ দিনে তাঁদের ঘরে ঢিল পড়তে লাগল। (অর্থাৎ প্রেতাত্মাটি এখানেও তাঁদের পিছু নিয়েছে!) ইতিমধ্যে শ্রী সিন্নাতাম্পি ডঃ কোভুরের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর আসার কথা জানিয়ে টেলিগ্রাম করেছিলেন। ১৩ই মে সকালে সবাই বাড়ী ফিরে এলেন।

ডঃ কোভুররা সকলের সঙ্গে কথা বললেন। পাকিয়ামের সঙ্গে কথা বলার সময় ডঃ কোভুর শুনলেন শ্রীথানাপতিপিল্লাই বাইরে কাকে যেন বকছেন। বাইরে বেরিয়ে জানা গেল রাজলক্ষ্মী নামে তাঁদের এক প্রতিবেশী মহিলা খোঁজ দিতে এসেছিলেন, নতুন আর কাকে আনা হল তা জানতে। তাঁকেই বকা হচ্ছে। প্রথম গুণিন লক্ষ্মী নামে একজনের নাম করেছিল। রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে নামের মিল থাকায় তাঁরা ওঁকেই সবকিছুর মূল হিসেবে সন্দেহ করেছিলেন। তাই এই রাগ। (অর্থাৎ রাজলক্ষ্মী যেহেতু মন্ত্র পড়ে বিদেহী প্রেতাত্মা আনিয়ে উৎপাত ঘটাচ্ছে তাই সে যেন খোঁজ নিতে এসেছে তার মন্ত্র কে কাটাবে তা জানতে।)

কিশোরী দেবনায়কীর সঙ্গে কথা বলার সময় ডঃ কোভুর একটু কৌশল করলেন। তিনি জানালেন যে, বাড়ীতে এসব কান্ড কে করছে তা ডঃ কোভুর জানেন ইত্যাদি। ডঃ কোভুরের কথার ভঙ্গীতে ভুলে দেবনায়কী ধীরে ধীরে জানাল গত কয়েক মাস ধরে কিভাবে সে এতসব কান্ড করেছে। জানা গেল ঘরের চাবি ও টুথপেস্ট সে পাশের ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। টাকার নোট রেখেছে ছোট একটা নারকেল গাছের মধ্যে, অতিথির ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিসপত্র বাড়ীর পেছনে লাগোয়া ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছে। ঢিল ছোঁড়া, খাবারে নোংরা ফেলা, মুরগী খুলে দেওয়া ইত্যাদি সব ঘটনা যে তারই কীর্তি একথা সে স্বীকার করল। তবে দাদুর নকল দাঁতের ব্যাপারে সে কিছু জানে না। দেবনায়কী কথা দিল সব কিছু সে ফিরিয়ে দেবে এবং আর কিছু করবে না। এর বিনিময়ে ডঃ কোভুরও কথা দিলেন ওর কথা আর কাউকে বলবেন না।

সবশেষে বাড়ীর সকলের সামনে ডঃ কোভুর তাঁর বক্তব্য রাখলেন—"এই বাড়ী কখনোই কোন মন্ত্র বা বদ অশরীরী আত্মার কবলে পড়েনি। শিবপরুমন, ঐ জেলে ও শেষের ঐ গুণিনরা—সকলেই বুজরুক। টাকা নেওয়ার জন্য ওরা আপনাদের ঠকিয়েছে। এই পৃথিবীতে কারোরই এমন কোন অতি-প্রাকৃতিক ক্ষমতা নেই যে, সে রহস্যময় ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পারে। এরকম কেউ থাকলে সে-ই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হত পৃথিবীর সবচেয়ে ধনীলোক—আপনাদের কাছ থেকে সামান্য কিছু অর্থ পাওয়ার জন্য তাদের লালায়িত হওয়ার কোন প্রয়োজন হত না।* লাইট রীডিং, অঞ্জনামেলিয়া (যেমন নখদর্পণ), কুলোপড়া, প্রেতবিদ্যা ইত্যাদি সবকিছুই মিথ্যে। কেবলমাত্র নির্বোধরাই এসব বিশ্বাস করে।"

ডঃ কোভুর আরো বললেন, "এ বাড়ীতে আর কোন অসুবিধে হবে না। নকল দাঁত ছাড়া সবগুলিই আপনারা ফিরে পাবেন। নকল দাঁতটি যথাসম্ভব কাক নিয়ে গেছে। থানাপতিপিল্লাই-এর গাঁটে ব্যথা, পোন্নাম্মার পেট খারাপ আর দেবনায়কীর ফোঁড়া সবই স্বাভাবিকভাবে ঘটা রোগ। শারীরিক বা মানসিক কোন রোগ প্রেতাত্মা ঘটায়—এটি ভাবাটা নির্বোধের লক্ষণ। আদিম মানুষের মধ্যে এ ধরনের নির্বোধ বিশ্বাস ছিল এবং উপযুক্ত, চিকিৎসার পরিবর্তে তারা ঝাড়ফুঁকের আশ্রয় নিত। আধুনিক সমাজ চিকিৎসা-বিদ্যা ও বিজ্ঞানের গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আমাদের মত অনুন্নত দেশেই ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি এখনো টিকে আছে। এই সব ওঝা-গুণিনদের আমাদের হাসপাতালে ডাক্তার হিসেবে চাকরি দেওয়া হয় না, কারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা দেখেছেন যে, তাদের চিকিৎসা-পদ্ধতিতে সত্যতা ও বৈজ্ঞানিক মূল্য আদৌ নেই। ভবিষ্যতে এ ধরনের ওঝা-গুণিনদের পেছনে আপনারা পাইপয়সাও খরচ করবেন না।"

ডাঃ কোভুররা কলম্বো ফিরে এলেন। হপ্তাখানেক পরে শ্রীসিন্নাতাম্পি ফোন করে জানালেন ভূতের উৎপাত বন্ধ হয়ে গেছে—ডঃ কোভুররা আসার পরের দিনই বাড়ীর বসার ঘরের ওপর সব হারানো জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। এমন কি অতিথির ঐ ব্যাগটিও এবং অবশ্যই ঐ নকল দাঁতটি ছাড়া।

কিন্তু সপ্তাহ পরেই আবার ফোন এল। জানা গেল আবার ভূতের উৎপাত শুরু হয়েছে। ডঃ কোভুর বুঝতে পারলেন তাঁর অনুপস্থিতিতে দেবনায়কী তার প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করেছে। তিনি শ্রীসিন্নাতাম্পিকে বাড়ীতে ডেকে সব ব্যাপারটা বললেন। তিনি তো ভাগ্নীর ওপর রেগে আগুন! কিন্তু ডাঃ কোভুর তাঁকে বোঝালেন এতে ফল ভাল হবে না। বরং দেবনায়কীর মানসিক চিকিৎসা করান উচিত।

দেবনায়কীকে ডঃ কোভুরের বাড়ীতে নিয়ে আসা হল। তাঁকে দেখেই মেয়েটি কাঁদতে শুরু করল। আর কখনো ঐ ধরনের কাজ সে করবে না বলল এবং সকলের সামনে তার দোষ সে স্বীকার করল। ডঃ কোভুর তার সম্মোহন চিকিৎসা করলেন

* জ্যোতিষবিদ্যা বা কোন অলৌকিক ক্ষমতা—যারই সাহায্যে হোক না কেন কারোর যদি ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা থাকত, তবে লটারীতে কোন্ টিকিট উঠবে, রেসে কোন্ ঘোড়া জিতবে ইত্যাদি আগে থেকে জেনে নিয়ে সে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করতে পারত। তার জন্য খদ্দের বা ভক্তদের কাছ থেকে ফি বা প্রণামীর জন্য লালায়িত হতে হত না। এদেরই কেউ হয়তো বলবে, 'অর্থ উপার্জনের জন্য এইসব অলৌকিক শক্তি ইত্যাদিকে কাজে লাগানো উচিত নয়।' অথচ ভক্ত বা সাধারণ লোকেদের কাছ থেকে অর্থ নিতে এদের বাধে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং বাড়ীর সবাইকে জানালেন, ওর প্রতি উপযুক্ত স্নেহ ও যথেষ্ট নজর দিতে।

সাতমাস পরে ডিসেম্বরে খবর পাওয়া গেল, আর কোন ঝামেলা হয়নি। দেবনায়কীও খুব ভাল হয়েছে, পরীক্ষায় ভাল ফল করেছে।

এইভাবে বাড়ীতে ভূতের নানা উপদ্রবের কথা প্রায়ই শোনা যায়—সাধারণতঃ গ্রামের দিকে ও অশিক্ষিত বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবারেই এধরনের ঘটনা বেশী ঘটে। সব ক্ষেত্রেই প্রকৃতপক্ষে পেছেনে থাকে কোন মানুষেরই কারসাজি, যেমন এখানে দেবনায়কী! এদের বলা হয় poltergeist,*-সবার অলক্ষ্যে, কৌশলে এরা কাজ করে।

স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন জাগতে পারে—সকলের চোখে ধুলো দিয়ে কি করে এরা কাজ করে? এর কারণ, প্রেতাত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে বাড়ীর লোকদের দৃঢ়মূল বিশ্বাস তাঁদের সাধারণ বুদ্ধিকেও আচ্ছন্ন করে রাখে। সিন্নাতাম্পিকে বলা সত্ত্বেও তিনি ধরতে পারেননি, কিন্তু ডঃ কোভুর এ সম্পর্কে সুনিশ্চিত ছিলেন যে, কোন একজন মানুষ অবশ্যই এসবের পেছনে রয়েছে। তাই তিনি চোখ-কান খোলা রেখেই অনুসন্ধান করেছিলেন। এছাড়া, দেবনায়কী নিজের আনা খাবারে বালি দেখে কাঁদতে আরম্ভ করেছে—এরজন্য তাকেই সন্দেহ করার ব্যাপারটা মাথায় আসে না। কিন্তু অভিজ্ঞ ডঃ কোভুর দেবনায়কীর মুখ-চোখ দেখে তার মানসিক অস্থিরতা ধরে ফেলেন। ওর সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ দৃঢ়মূল হয়েছিল যখন তিনি জানতে পারেন যে, দেবনায়কী যখন স্কুলে যায়, সেই সময়টা ছাড়া অর্থাৎ সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টোর মধ্যে ছাড়া, বাকী সময়ে ঢিল পড়ে। এছাড়া দেবনায়কী একা যখন খাবার এনেছিল তখন খাবারে বালি পড়েছে। আর, বাড়ীর সবাই সামনাসামনি কিছু ঘটতে দেখেনি—সবই ঘটেছে পাশ থেকে অথবা পরে এসে দেখা গেছে কেউ বালি-ময়লা ফেলেছে, জিনিস হারিয়েছে ইত্যাদি। তারপর দেবনায়কীর সব কীর্তি জেনে ফেলার ভান করে দেবনায়কীকে ব্যাপারটা বললে (suggestion) ভয়েই সে সব স্বীকার করে ফেলল।

দেবনায়কীর মত poltergeist- -রা বিভিন্নভাবে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে, কখনো বা অবদমিত হতাশা, ক্রোধ ইত্যাদির বশে এ ধরনের কাজ করে—কখনো বা সজ্ঞানে ইচ্ছে করে, কখনো বা অবচেতন মন থেকে, মানসিক অস্বাভাবিকত্বের জন্য। দেবনায়কী বাড়ির প্রথম বাচ্চা ছিল, তাই ৫ বছর ধরে সকলের প্রচন্ড আদর যত্ন পেয়েছে। কিন্তু এই সময় তার পরের বোন হওয়ার পর ধীরে ধীরে সে বুঝল তার আদর যত্নে ভাঁটা পড়েছে—এসেছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী। সবাই নতুন বাচ্চাকে নিয়ে

---

* প্রকৃতপক্ষে poltergeist কথাটির অর্থ 'গন্ডগোলকারী ভূত'। গ্রীক শব্দ poltern এর অর্থ গন্ডগোল করা এবং geist কথাটির অর্থ ভূত। ভূতপ্রেত যেহেতু অস্তিত্বহীন, তাই ঐ কাল্পনিক ভূতের কাজগুলি আসলে যে ব্যক্তি করছে তাকেই সাধারণভবে poltergeist বলা হচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যস্ত। তার মনের মধ্যে ছোট বোনের প্রতি ঈর্ষার সঙ্গে বাড়ীর বড়দের প্রতি ধীরে ধীরে ক্ষোভ জন্মাল। যৌবনোন্মেষের বয়সে (যখন দ্রুত নানা শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে) সে দেখল দাদু-দিদার শরীর খারাপের জন্য এক প্রেতাত্মাকে দায়ী করা হল—ছোটবেলা থেকে এসব কুসংস্কার তার মনের মধ্যেও ঢোকান ছিল। সব মিলিয়ে তার ক্ষোভ ও ঈর্ষার মানসিকতা (jealousy complex) রূপ পেল লুকিয়ে নানা কান্ডকারখানা করে বড়দের উত্যক্ত করার মধ্য দিয়ে। বাড়ীর লোক বা ওঝা-গুণিন কেউ এ ব্যাপারে সামান্যতম সচেতনও ছিলেন না। তাই দেবনায়কী কৌশলে সতর্কতার সঙ্গে সবার চোখে ধুলো দিয়ে তার কাজ করে গেছে। ডঃ কোভুরের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েও, তিনি দূরে চলে যাওয়ার পর সে তার কাজ আবার শুরু করে, কারণ সে জানত তার ব্যাপারটা একমাত্র ডঃ কোভুরই জানেন। তাই তিনি সুদূর কলম্বোতে চলে যাওয়ার পর সে সাহস পেয়ে যায় ও তার কাজ শুরু করে—পেছনে ছিল অবচেতন মনে তখনো টিকে থাকা ক্ষোভ ও ঈর্ষা। শেষে দেবনায়কীকে সম্মোহিত করে তার অবচেতন মনে এ ধরনের কাজ না করার নির্দেশকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার পরই ডঃ কোভুরের পক্ষে সম্ভব হয়েছে তার কাজকর্ম অর্থাৎ 'ভূতের উৎপাত' বন্ধ করা।

[**কালিন্দীর ভূত**— ১৯৮১ সালে মেদিনীপুরের একটি গ্রাম কালিন্দীতে এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটে। স্থানীয় একটি স্কুলের বিজ্ঞানশিক্ষক শ্রীবেণীমাধব মঙ্গল-এর বাড়ীতে জুন মাস নাগাদ 'ভূতের উৎপাত' শুরু হয়। এক শনিবার সন্ধ্যেবেলা (মঙ্গলবার, শনিবার, অমাবস্যার দিন ইত্যাদিকে ভূত-প্রেতের কাজকর্মের উপযুক্ত দিন বলে সংস্কার রয়েছে) ঘরের টালির ছাদে ঢিল পড়ল। দিন সাতেক পরে আর এক শনিবার সন্ধ্যেবেলা বাড়ীর রাঁধুনি মহিলা রান্না করছেন। এমন সময় দেওয়ালের ওপার থেকে মাটির ঢেলা পড়ল কড়াই-এর ওপর। পরের মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলা হাট থেকে ফিরে বেণীবাবু বাজারপত্র বারান্দায় নামাচ্ছেন—এমন সময় এক ঢেলা কাদা কে যেন সামনের দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে দিল। বাড়ীতে ১০-১২ বছরের ছেলে ছিল সন্তোষ—বেণীবাবুর ভাইপো। বেণীবাবু ওকে বললেন সন্ধ্যেবেলা ঘরের পেছনে ঢেঁকিশালে লুকিয়ে থাকতে এবং কেউ একাজ করছে কিনা দেখতে। ঐ অবস্থাতেই রান্নাঘরে ভাতের হাঁড়িতে ঢিল পড়ল। সন্তোষ জানাল দু'টি ছেলে যেন ঢিল ছুঁড়ে দিয়ে পালাল। "ঐ পালাল, ধর ধর"—ওর চীৎকারে সবাই টর্চ নিয়ে এদিক ওদিক খুঁজতে থাকল। কিন্তু কাউকেই পাওয়া গেল না।

পরের সন্ধ্যেতে ৮-১০ জন লাঠিসোটা নিয়ে পাহারা দিল। এই সময়েই গোয়ালের পাশে রাখা ইঁটের পাঁজা থেকে কে যেন বড় একটা ইঁট রান্নাঘরে ছুঁড়ল। পাহারাদারদের একজন উঠেছিল পাশের তেঁতুলগাছে। ও জানাল অন্ধকারে, ঢিল ছুঁড়ে কে যেন মাঠের দিকে গেল। সবাই চলল ওদিকে। সন্তোষ মাঠ থেকে পায়খানা করে ফিরছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(ও পাহারাদারদের মধ্যে ছিল না)। সবাইকে দেখে ও হঠাৎই পড়ে গেল। জানাল দু'জন অদৃশ্য লোক যেন তাকে মারছে। ভয় পেয়ে সবাই ওকে তুলে বাড়ী নিয়ে এল।

তখন বৃষ্টির সময়। পুরো মরশুমের চাষের কাজ চলছে। সবাই ব্যস্ত। একদিন একটি বড় ইঁট সোজা টালির ছাদ ভেঙ্গে ভেতরে পড়ল। তখনি বেণীমাধববাবুর মাথায় চিন্তা এল,—এইভাবে একটা বড় ইঁট ফেলা মানুষের কর্ম নয়, এ নিশ্চয়ই কোন অপদেবতার কাজ। পরের দিনও প্রচণ্ড বৃষ্টির পর দুপুরেই আবার ঢিল পড়ল। বাড়ীর রাঁধুনির সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঐ বিধবা মহিলা বেণীবাবুকে জানালেন যে, তাঁর মৃতস্বামী তাঁকে কারোর বাড়িতে ঝি-গিরি বা রাঁধুনিগিরি করতে বারণ করে গিয়েছিলেন মৃত্যুর আগে। একথা বলতে বলতেই আবার ঢিল-পড়ল। এর ফলে এই সব কাণ্ডকারখানার পেছনে এক অশরীরী প্রেতাত্মার ব্যাপারে বেণীমাধববাবু সুনিশ্চিত হলেন। বিধবা রাঁধুনি বাড়ী চলে গেলেন। দু'দিন আর কোন ঝামেলা হল না। সবাই ভাবলেন রাঁধুনিটির কথাই ঠিক।

কিন্তু না! একদিন বেণীবাবুর স্ত্রী রান্না করছেন—একটা ঢিল ছুটে এল সোজা তাঁরই দিকে লক্ষ্য করে। ভদ্রমহিলা ভয়ে উঠে গেলেন। শুধু ঢিল নয়—পরে দেখা গেল রান্না করা ভাতের হাঁড়ি কে যেন উপুড় করে দিয়েছে। কাঠের একটা পিঁড়ি কে যেন মাটির বড় জালার উপর ছুঁড়ে মারল। জালা ভেঙ্গে গেল।

এই দুরাত্মা ভূতকে তাড়ানোর জন্য বেণীবাবু প্রতিবেশী এক গুণিণের সঙ্গে কথা বললেন। ও জানাল, এ তার একার কর্ম নয়— ওর গুরুদেবকেও আনতে হবে, তার জন্য ১০০ টাকা চাই। বেণীবাবু রাজী হলেন না। পাশাপাশি আরো বেশ কয়েকজন গুণিন ছিলো—তারা কিন্তু সাহসই করল না। তখন বেণীবাবু গেলেন দেপাল নামে একটি গ্রামের নামকরা এক গুণিনের কাছে। তিনি কাঁঠাল পাতার ওপর তেল দিয়ে কি সব দেখলেন (ডঃ কোভুর বর্ণিত অঞ্জনামেলিয়ার মত)। তারপর ফুল ও ওষুধ দিয়ে বললেন বাড়ীর উনুনের ধারে পুঁতে ফেলতে। কিছু মাদুলিও দিলেন। দু'দিন পরে নিজেই গিয়ে সব ব্যবস্থা করবেন জানালেন—তবে এর জন্য ২০০ টাকা লাগবে। বেণীবাবু অগ্রিম ২৫ টাকা দিয়ে এলেন।

বাড়ী ফিরে রাত্রে আর কেউ বাড়ীতে থাকতে সাহস পেলেন না। সকলে পাশের বাড়ীতে শুলেন। ঘরে শুধু সন্তোষ একা একটা বিছানায় শুল—এদিক ওদিক আরো দু'চারটি ছেলে পাহারায় থাকল। কিন্তু মাঝরাতে এরা শুনল বাড়ীর ছাদে কে যেন হাঁটছে। বেণীবাবু সব ছেলেকে দেপালের গুণিনের দেওয়া মাদুলি পরালেন। ঐ রাত্রে আর কিছু হল না।

কিন্তু মাদুলি পরে থাকা অবস্থাতেই সন্তোষকে এক সন্ধ্যেবেলা সাপে কামড়াল। ওর চিৎকারে ছুটে এসে বেণীবাবু টর্চ নিয়ে এদিক ওদিক খুঁজেও সাপ দেখতে পেলো না। প্রতিবেশী ঐ গুণিন মাদুলি খুলে নিয়ে মন্ত্র পড়ে সন্তোষকে ভাল করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর মাদুলি পরার একটু পরেই সন্তোষ বলল পেট ব্যথা করছে। মাদুলি খুলে ফেলতে ওর পেট ব্যথাও কমে গেল।

পরদিন সকাল দশটা নাগাদ কে যেন জলভরা একটি কলসী কাৎ করে পাশে রাখা গ্লাস দিয়ে জল খেল। একা সন্তোষই ব্যাপারটা দেখেছে। সবাইকে সন্ত্রস্ত করে দিয়ে ও জানাল, যে জল খেল ওর কোন মাথা নেই অর্থাৎ কবন্ধ।

দু' একদিনের মধ্যে দেপালের ঐ গুণিন চারজনকে সঙ্গে নিয়ে হাজির। প্রচুর উৎসাহী দর্শকদের মধ্যে সে তার কাজ শুরু করল। রাত ১১ টা থেকে পুজো শুরু হল, মদ ছড়িয়ে, মুরগী বলি দিয়ে পুজো শেষ হল ভোরের দিকে। কিন্তু সকালে, গুণিন থাকাকালীনই ঘরের টালির ছাদে আবার ঢিল পড়ল। গুণিনের এত সব কান্ডে কিছুই যে হয়নি তা বোঝা গেল। কেউ কেউ বললে গুণিনদের দ্বারা হবে না। শীতলা মায়ের পূজা দিতে হবে। তা-ও দেওয়া হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। একজন গুণিন বেণীবাবুর স্ত্রীর নখে নখদর্পণ করলো। ভদ্রমহিলা জানালেন, তিনি তাঁর নখের মধ্যে বেণীবাবুর মৃতা বৌদি ও আরো কয়েকজন মৃতব্যক্তির ছায়া দেখতে পাচ্ছেন। সবার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল এই সব প্রেতাত্মাই উৎপাত ঘটাচ্ছে। গুণিন তার পদ্ধতিতে এদের 'বন্ধন' করলো। সেদিন সব উপদ্রব বন্ধ। বাড়ীতে রান্নাও হল নির্বিঘ্নে। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে বেণীবাবুর জ্বর হল। বেণীবাবুর বাচ্চা ছেলের মাথায় আঘাত লেগে রক্তপাত হল। সবাই বুঝল, প্রেতাত্মাগুলি আবার উৎপাত শুরু করেছে। কিন্তু বেশী উৎপাত যেন সন্তোষের ওপর। ওর ওপর মারধর হত। ওর বই হারাতে লাগল। বাড়ীর টর্চ ইত্যাদিও হারাল। সন্তোষই রাত্রে স্বপ্নে দেখত কে যেন তাকে বলে দিচ্ছে ওগুলি কোথায় আছে। ঐখানে খুঁজলে ঠিকই জিনিসগুলো পাওয়া যেত।

ইতিমধ্যে মহকুমা শহর কাঁথির কাছাকাছি এক গ্রামে 'বিখ্যাত' তান্ত্রিক শ্রীগোস্বামীর নাম শুনলেন বেণীবাবু। বেণীবাবুর শ্বশুরমশাই শ্রীগোস্বামীর কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বললেন। ১০০ গ্রাম সন্দেশের পেঁড়া ও কামাক্ষ্যাদেবীর পুজোর ফুল দিয়ে শ্রী গোস্বামী বললেন, সন্তোষকে চায়ের সঙ্গে খাওয়াতে। তিনি জানালেন, এ সব অপদেবতার কাজ—সন্তোষকে মাধ্যম করে সব কাজ করছে। কালীমায়ের পুজো করে,—ঘরের চার কোণে চারটি লোহার পেরেক পুঁতে (লোহাকে ভূত বা অপদেবতারা নাকি ভয় পায়!) ঘরের মধ্যে লঙ্কা পোড়ানোর নির্দেশ দিলেন (যেন লংকার ঝাঁঝে অপদেবতা পালিয়ে যাবে অর্থাৎ তারও ঘ্রাণশক্তি আছে)। একটি শিকড় দিয়ে বল্লেন, সন্তোষকে এটি পরিয়ে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দিতে। তাই করা হল। বেণীবাবুর শ্বশুর বাড়ীতে ওকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু ও যেতে না যেতেই ওখানে ভূতের উৎপাত শুরু করল, কিন্তু বাড়ীতে বন্ধ হয়ে গেল। তাই বাধ্য ওকে ফিরিয়ে আনতে হল। তারপর ওখানে উৎপাত বন্ধ হল, কিন্তু বাড়ীতে আবার কিছু ঘটনা ঘটতে শুরু করল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাড়াতাড়ি পূজার ব্যবস্থা করা হল। শ্রীগোস্বামী নিজের বাড়ীতে বসেই পুজো করলেন, এর খরচের জন্য ২৩০ টাকা দিতে হল। চাল ভর্তি একটি ঘট নিয়ে শ্রীগোস্বামী বললেন পুকুরে পুঁতে রাখতে। সন্তোষকে আগে যে শিকড় দেওয়া হয়েছিল, একদিন দেখা গেল কে যেন তা কেটে দিয়েছে। শ্রীগোস্বামী আবার শিকড় দিলেন। তিনি জানালেন, সন্তোষের জীবন বিপন্ন। তাকে বাঁচাতে হলে আরো ১০০টাকা লাগবে এবং অন্যান্য সকলের জন্য লাগবে আরো ২০০ টাকা। বেণীবাবু সঙ্গে সঙ্গে সব টাকা দিয়ে দিলেন। শ্রীগোস্বামী বেণীবাবুকে কামাক্ষ্যাদেবীর একটি ঘট দিয়েছিলেন। এটিকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হল এবং প্রতি মঙ্গলবার, শনিবার ও পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণ ঠাকুরের পুজো দেওয়া হতে লাগল। আর তাঁর নির্দেশে সন্তোষকে পাঠিয়ে দেওয়া হল অনেক দূরে, উড়িষ্যায়। এরপর থেকে বেণীবাবুর বাড়ীতে সব অপদেবতার উৎপাত বন্ধ।

একটু সর্তক হয়ে সব ঘটনার বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে ডঃ কোভুরের বলা দেবনায়কীর মত এখানকার নায়কও সন্তোষই—কোন অপদেবতা নয়। বাড়ীর বড়দের শাসনে উত্যক্ত হয়ে, পড়াশুনোর চাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অথবা কোন মানসিক রোগবশতঃ সন্তোষই সচেতনভাবে অথবা অসচেতনভাবে (অর্থাৎ দ্বৈত ব্যক্তিত্ব বা dual personality--র প্রভাবে) সে এসব কাজ করেছে। সে সেখানেই গেছে সেখানে 'ভুতুড়ে' কাণ্ডকারখানা হয়েছে—শুধুমাত্র এই ব্যাপারটিই এটিকে প্রমাণ করতে যথেষ্ট। এছাড়া কবন্ধকে জল খেতে দেখা, অশরীরী শক্তির হাতে মার খাওয়া, স্বপ্নে হারান জিনিস খুঁজে পাওয়া ইত্যাদি ওর পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। কবন্ধ ইত্যাদির ব্যাপারগুলো সম্পর্কে হয় ও ইচ্ছে করে মিথ্যা কথা বলেছে অথবা তার মতিভ্রম (hallucination) হয়েছে। দেবনায়কীর মত জিনিসপত্র সন্তোষই লুকিয়ে রেখেছিল, পরে ভান করেছে যেন স্বপ্নে সেগুলির হদিশ পেল। অথবা এ সব যদি তার অবচেতন মনের কাজ হয়ে থাকে, তবে রাত্রে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখা পাওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। বড়দের শাসন, পড়াশুনার চাপ ইত্যাদি থেকে দূরে উড়িষ্যায় চলে যাওয়ার পর ঐসব বন্ধ হয়েছে। যদি উড়িষ্যাতেও সে-এই সব করে যেতে থাকে, তবে বুঝতে হবে সে মানসিকভাবেই অসুস্থ। তার উপযুক্ত চিকিৎসা করান উচিৎ—অন্যথায় ভবিষ্যতে সে স্থায়ী মানসিক রোগীতে পরিণত হবে। এই ধরনের নানা মানসিক রোগকেই সাধারণ মানুষ ও তান্ত্রিক, গুণিন ইত্যাদিরা ভূতের বা দেবতার ভর বলে মনে করে এবং রোগীর অবস্থা জটিলতর করে তোলে।

কাঁথির 'তান্ত্রিক' শ্রীগোস্বামী ঠিকই বুঝেছিলেন সন্তোষই ঐ সব কাজ করছে।কিন্তু হয় ইচ্ছে করে কিছু টাকা হাতিয়ে নেওয়ার জন্য অথবা অপদেবতা সম্পর্কিত নিজের কুসংস্কারের বশে ব্যাপারটাকে, সন্তোষের উপর অপদেবতার ভর বলে অভিহিত করেছেন এবং অনাবশ্যক পূজা, মাদুলি, শিকড় ইত্যাদির ব্যবস্থা করে বেশ কিছু টাকা উপার্জন করেছেন। ভিত্তিহীন (যদিও পুরোপুরি ভিত্তিহীন নয়, কারণ অন্ধবিশ্বাসী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ীর লোকের মনে এসবগুলিই একটি আস্থা জাগাতে ও অর্থব্যয়ের জন্য উৎসাহ দিতে সাহায্য করে) এগুলি না করেই যদি সন্তোষকে দূরে পাঠান হত, অথবা আরো সঠিকভাবে ডঃ কোভুরের মতো সন্তোষের সমস্যাগুলি জেনে তার মানসিক চিকিৎসা করা হত, তাহলেও সন্তোষ ঐসব কাজ বন্ধ করত—বন্ধ হত 'অপদেবতা'র উৎপাত।

শ্রীলংকার পূর্বোক্ত ঘটনা ও মেদিনীপুরের এই ঘটনার মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। এই ধরনের ঘটনা এখনো ঘটে চলেছে—সঠিক বিশ্লেষণের অভাবে কু-সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা ব্যাপকভাবে টিকে রয়েছে। একে সম্বল করে গুণিন-তান্ত্রিকরা সরল বিশ্বাসী মানুষদের ঠকিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছে এবং সৃষ্টি হচ্ছে নানা ধরনের মানসিক অসুস্থতা।]

ভূতের উৎপাত না যৌন ঈর্ষা—১৯৫৬ সালে শ্রীলংকার মুটওয়ালে নামে একটি জায়গায় শ্রী জেভিয়ারের বাড়িতেও ভূতের ঢিল পড়া শুরু হলো। বাড়ীতে থাকতেন শ্রী জেভিয়ার ও তাঁর স্ত্রী, তাঁদের ২৩ বছর বয়স্কা সন্তান সম্ভবা বড় মেয়ে, ১৭ বছর বয়স্কা ছোট মেয়ে রোজ ও ৫ বছরের ছেলে। বড় মেয়ের স্বামী শ্রী উইলসন শনি-রবিবার ছুটির দিনগুলিতে শ্বশুরবাড়িতে এসে থাকতেন।

বড় মেয়ের বিয়ের কয়েকমাস পর থেকেই ঢিল পড়া শুরু হয়। বড় মেয়ে ও তাঁর স্বামী যে ঘরে শুতেন ঐ ঘরেই প্রথমে ঢিল পড়ে,—সকালে সন্ধ্যায়, মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। শনি রবিবার দুপুরের দিকেও ঢিল পড়ত। ভয় পেয়ে বাড়ীর লোক এক গুণিনের সাহায্য নিলেন। সে ৪০ টাকা পারিশ্রমিক নিয়ে মন্ত্র পড়ে দিল। কিন্তু ফল কিছুই হল না। এরপর খ্রীস্টান জেভিয়াররা গীর্জায় প্রার্থনা করেন, ও গীর্জার যাজক বা বিশপকে ডাকেন। ইনি সেন্ট অ্যান্টনির ছবি একটি ঘরে টাঙ্গিয়ে ঐ ঘরে প্রতিদিন রাত্রে প্রার্থনা করার পর বড়মেয়ে-জামাইকে শুতে বললেন। কিন্তু তাতেও কিছু হল না। এবার বহু দূরের এক তান্ত্রিক গোছের ব্যক্তিকে ডাকা হল। তিনি যাগযজ্ঞের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু খ্রীস্টান পরিবারে অ-খ্রীস্টান সুলভ আচার অনুষ্ঠানে আপত্তি উঠলে, তিনি নিজের বাড়ীতে বসেই যজ্ঞাদির ব্যবস্থা করেন। অবশেষে জানান, 'বেশ কয়েক বছর আগে ঐ বাড়ীতে এক গর্ভবতী মুসলিম রমণীকে তার স্বামী হত্যা করে। এই রমণীর প্রেতাত্মাই ঈর্ষা ও ক্রোধবশে বড় মেয়েকে উত্যক্ত করছে; ও নাকি সন্তান-সম্ভবা বড় মেয়েকে মেরে ফেলবে বলে ভয় দেখিয়েছে। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একটি গর্ভবতী ছাগলকে বলি দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট হতে রাজী করান গেছে।' এই তান্ত্রিক নিলেন ৪০০ টাকারও বেশী। এছাড়া চড়া দামে একটি গর্ভবতী ছাগল কিনে বলি দেওয়া হল এবং তান্ত্রিকটি জানাল বাড়ির পাশের একটি গাছের মগডাল নাড়িয়ে দিয়ে প্রেতাত্মাটি তার অন্তর্ধানের কথা জানিয়ে গেল। কিন্তু না, এত সবের পরেও ঢিল পড়া বন্ধ হল না। বাড়ির জামাই শ্রী উইলসনের একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফটো রহস্যজনক ভাবে হারিয়ে গেল। শ্রী জেভিয়ারের মুখের চামড়ায় হঠাৎ লাল লাল দাগ দেখা দিল, গায়ে আঁচড়ের চিহ্ন। এ সবই যে ঐ প্রেতাত্মার কাজ এতে কোন সন্দেহ নেই। এরপর বাড়ীর মেয়েটিও নিজের ঘরের এক কোণে সন্ধ্যাবেলা লাল শাড়ী পরা এক মুসলিম মেয়ের আবছা মূর্তি দেখতে পেল।

শেষ পর্যন্ত শ্রী জেভিয়ার সমস্ত কিছু বলে ডঃ কোভুরকে অনুরোধ করলেন ব্যাপারটির অনুসন্ধান করতে। ডঃ কোভুর ও তাঁর স্ত্রী খুঁটিয়ে সব ব্যাপার অনুসন্ধান করলেন এবং সকলের সঙ্গে বিস্তারিত কথা বললেন। অবশেষে তাঁরা নিশ্চিত হলেন যে, ১৭ বছরের মেয়ে রোজ poltergiest হিসেবে ঢিল ছুঁড়ছে। ও যখন স্কুলে যায়, ঐ দুপুরের সময় ছাড়া বাকী সময় ঢিল পড়ত। শনি রবিবার ওর স্কুল ছুটি থাকে, তাই ঐদিন দুপুরেও ঢিল পড়ত। ডঃ কোভুর রোজকে গভীরভাবে সম্মোহিত করলেন। সম্মোহিত অবস্থায় সে সব স্বীকার করল—কি ভাবে বাড়ীর বাগান থেকে ঢিল কুড়িয়ে আনত আর ঘরের দেওয়ালের ওপরের ফাঁক দিয়ে কৌশল করে ছুঁড়ত। উইলসনের ছবিও ও-ই চুরি করেছিল। রোজ তার দিদির প্রতি এক ধরনের যৌন ঈর্ষায় ভুগত। নিজের মধ্যে ছিল অবদমিত যৌন আবেগ। বিয়ের পর তার দিদি পাশের ঘরে শুয়ে যৌন তৃপ্তি উপভোগ করছে—এটি তার অবচেতন মনে দিদির প্রতি ঈর্ষার জন্ম দেয়—এবং অবচেতনভাবেই সে উইলসনের সঙ্গ কামনা করে। এরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে ছবি চুরির করার মধ্যে। এছাড়া পড়াশুনায় ও ছিল দুর্বল। বাড়িতে বা স্কুলে সব জায়গাতেই ওর কদর খুব একটা ছিল না। এই হীনমন্যতার সঙ্গে ঈর্ষা মিশে এইভাবে সবাইকে উত্যক্ত করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছিল এবং এটি তাকে এক ধরনের তৃপ্তি ও সুখ (sadism) দিত।

তান্ত্রিকের বলার পর সকলেরই মনে মুসলিম রমণী সম্পর্কে একটি ভ্রান্তবিশ্বাস আরোপিত হয়। এরই ফলে মেয়ে বা বাচ্চারাই শুধু মুসলিম প্রেতাত্মা দেখার মতিভ্রম (hallucination)-এর সম্মুখীন হয়েছে। শ্রী জেভিয়ারের চামড়ার রোগ স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছে; গায়ের আঁচড় হয়তো ঘুমের ঘোরে করা। রোজ যদি মনোমত পুরুষসঙ্গী পেয়ে তৃপ্ত হত তবে সে একাজ করত না। ডঃ কোভুর তাকে সম্মোহিত করে, এ ধরনের কাজ আর না করার নির্দেশ দেন। এর পরে সে আর কিছু করেও নি। যদি করতও, তবে মিছামিছি ওঝা-গুণিন-তান্ত্রিক না ডেকে, তার উপযুক্ত বিয়ে দিলেই সমস্যার সমাধান হত।

ভূতের বিয়ে—অন্য ধরনের ঈর্ষার বশে প্রায় একই ধরনের কাজ করেছিল আরেকটি মেয়ে। ১৯৬৩ সালে দেহিওউইটা নামে আরেক জায়গায় শ্রী এইচ. সি. মিথ্রুহামির বাড়িতে সাংঘাতিক ধরনের ভূতের উৎপাত শুরু হয়। এ ভূত শুধু বাড়ির সর্বত্র ঢিলই ছুঁড়ত না, বাসনকোসনও হাওয়ায় উড়িয়ে দিত, মাটিতে আছড়ে ভেঙে ফেলত। দেওয়ালে ঝোলান বাঁধান ছবি মেঝেতে পড়ে চুরমার হয়েছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুছিয়ে রাখা কাপড় চোপড় হারিয়ে গেছে। একবার বাড়ির সকলেরই একসঙ্গে এমন সাংঘাতিক পেটের অসুখ হল যে, প্রতিবেশীরা শুদ্ধ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। ফলে পূজা-আচ্চা-যাগযজ্ঞ-পাঁঠাবলি ইত্যাদি করা হল। এ সবের পরে সকলের পায়খানা আস্তে-আস্তে কমলেও ঢিল পড়া ইত্যাদি ঠিকই থাকল। এলো ওঝা-গুণিন। আর এসব করে মিথ্রুহামি প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে 'সিলুমিনা' পত্রিকায় চিঠি দিয়ে তিনি ডঃ কোভুরের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। একদল সাংবাদিককে নিয়ে ডঃ কোভুর সস্ত্রীক গেলেন দেহিওউইটা।

[এই যাওয়ার পথে একটা ঘটনা ঘটে। পথে একসময় খাড়া পাহাড়ের ওপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে যেতে হয় আর তার আগে স্থানীয় একটি মন্দিরে পুজো দিয়ে পাহাড়ে ওঠার প্রথা চালু রয়েছে। গাড়ীর ড্রাইভার জানাল, পুজো না দিয়ে পাহাড়ে উঠলে অমঙ্গল হবে। ডঃ কোভুর তাকে বললেন, ভাল করে পুজো দিয়ে আসতে। সঙ্গের সাংবাদিকরা বিস্মিত হয়ে সংস্কারমুক্ত ডঃ কোভুরের ওই ধরনের নির্দেশের কারণ জানতে চাইলেন। ডঃ কোভুর জানালেন যে, ড্রাইভারের মনে বদ্ধমূল কুসংস্কার রয়েছে। তাই পুজো না দিয়ে গেলে সব সময়েই ওর মনের মধ্যে একটা ভয় খচখচ করতে থাকবে। এর ফলে গাড়ী চালাতে চালাতে দুর্ঘটনা ঘটা বিচিত্র নয়। তাই নিজেদের নিরাপত্তার জন্যই বাধ্য হয়ে তাঁকে এই নির্দেশ দিতে হল ও ড্রাইভারের কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিতে হল তার সাহস অক্ষুন্ন রাখার জন্য।

একইভাবে অনেক সময়ই দৈনন্দিন জীবনে এধরনের কুসংস্কারকে কৌশলগত কারণে প্রশ্রয় দিতে হয়। আপনি যদি কুসংস্কারমুক্ত হন, কিন্তু আপনার ভাই যদি সরস্বতী দেবীর উপর পরিপূর্ণ আস্থা বজায় রাখে তবে ভিন্ন সময়ে এব্যাপারে তার সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। কিন্তু পরীক্ষার ঠিক আগে তাকে যদি সরস্বতীর পুজো না করতে দিয়ে পরীক্ষা দিতে পাঠান হয়, তবে তার মানসিক সাহস বিঘ্নিত হয়েই সে পরীক্ষা খারাপ দিতে পারে এবং এর জন্য ঐ পুজো না দিয়ে যাওয়ার ফলে দেবী সরস্বতীর অসন্তুষ্টিকেই ও সঙ্গে আপনাকেও দায়ী করবে। একইভাবে আপনার মায়ের মধ্যে যদি শ্রাদ্ধ ইত্যাদির প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা থাকে তবে পিতৃবিয়োগের পর আপনি এসবের অসারতা উপলব্ধি করে, বাবার প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা বজায় রেখেই, শ্রাদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত নিলেও সেটি আপনার মায়ের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে তা তাঁর মনের ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে পারে এবং নানা সাংসারিক অশান্তিরও সৃষ্টি করবে। এর সমাধানের জন্য আগে থেকেই ধীরে ধীরে পরিবারের সবাইকে বৈজ্ঞানিক সত্য জানানোর প্রচেষ্টা নেওয়া উচিত।]

পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের পর ডঃ কোভুররা জানতে পারলেন যে, এই সব উৎপাতের পেছনে কাল্পনিক কোন প্রেতাত্মা নয়, রয়েছে ভদ্রলোকের ১৮ বছর বয়স্কা মেয়ে করুণাবতী—সে-ই এক্ষেত্রে poltergiest. মেয়েটি ছিল একটু বোকা ধরনের—এর জন্য বাড়ির সকলের কাছেই ও হেনস্তা হত। অন্য দিকে তার দিদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাকরি করত—ফলে কদর ছিল বেশী। এর ফলে করুণাবতী একদিকে যেমন বাড়ীর লোকদের উপর ক্ষুব্ধ ছিল অন্যদিকে দিদিকে ঈর্ষা করত। ধীরে ধীরে এসব কিছু এক সময় তার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে এবং সে সবাইকে নানাভাবে উত্যক্ত করতে শুরু করে। অনুসন্ধানে জানা গেল, বাড়িতে ছিল এক প্যাকেট এপসম সল্ট (ম্যাগনেসিয়াম সালফেট), পরে এটি নিখোঁজ হয়। করুণাবতী এক সময় তরকারির কড়াইতে পুরো প্যাকেটটা খালি করে দিয়েছে। এর ফলে বাড়ির সকলে তো বটেই, সে নিজেও সাংঘাতিক পায়খানা করতে শুরু করে। যাগযজ্ঞের পরে পায়খানা বন্ধ হওয়াটা কাকতালীয় ব্যাপার ছাড়া কিছুই নয়। আসলে এসবে দু'একদিন কেটে গেছে, আর পায়খানা হতে হতে পেট থেকে সবটুকু এপসম সল্ট বেরিয়ে যাওয়ার পর আপনা থেকেই পায়খানা বন্ধ হয়েছে।

ডঃ কোভুরের নির্দেশে করুণাবতীর বিয়ের ব্যবস্থা করা হল। তারপরেই সব উৎপাত বন্ধ। ঘটনাচক্রে শেষবারে ভূত তাড়াতে আসা ওঝাদের দলের একটি ছেলের সঙ্গে করুণাবতীর বিয়ে হল। ২৪ বছর বয়স্ক এই যুবকটি করুণাবতীর প্রেমে পড়ে এবং অবশেষে বিয়েটি সম্পন্ন হয়। এইভাবে 'ভূতের ওঝা' 'ভূত তাড়ানো মন্ত্র' পড়ে নয়, বিয়ের মন্ত্র পড়ে ও 'ভৌতিক কাণ্ড' ঘটানো মেয়েকে বিয়ে করেই ভূতের উৎপাত বন্ধ করল।

প্রেতাত্মার প্রেম নিবেদন—সিংহলের পাদুকা অঞ্চলের শ্রীরণসিংহী দম্পতির সুন্দরী ষোড়শী মেয়ে লতা ছিল তাঁদের গর্ব। কি পড়াশুনায়, কি খেলাধূলায় ঐ অঞ্চলে সে ছিল সেরা। স্কুল ছিল তার খুব প্রিয় জায়গা। রূপে গুণে অনন্যা এই লতা স্কুলের সর্বশেষ পরীক্ষা হওয়ার পর কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ল। কোন কিছুতেই উৎসাহ নেই, সব সময় মুষড়ে থাকে। কয়েক দিন পরে আবিষ্কার করা গেল, দু'দিন অন্তরই সে ফ্রক পাল্টাচ্ছে। পরীক্ষা করে দেখা গেল তার ফ্রকের বিভিন্ন জায়গায় ছেঁড়া অথবা কাঁচি দিয়ে কাটা— বিশেষ করে বুকের কাছে ও কোমরের সামনের অংশ গুলি। এই বিশ্রী জায়গায় কাটা হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই ঐ ফ্রক আর পরা মুশকিল। এক আধবার নয়, দিনের পর দিন তা হতে থাকল। এক সময় তার সব ফ্রক ফুরিয়ে গেল ; আর লতাকে ঐ ছেঁড়া-কাটা ফ্রক পরে বাড়ীতেই বন্দী হয়ে থাকতে হল, কারণ এমন সব জায়গায় ফ্রকগুলি কেটেছে যে তা প'রে বেরুন যায় না আবার এমনভাবে কাটা যে রিপু করাও সম্ভব হয় না ; ছাড়া একটা ফ্রককে কতবারই বা রিপু করা যায় ?

রণসিংহীরা সন্দেহ করলেন এ নিশ্চয়ই কোন অসভ্য প্রেতাত্মার কাজ। গুণিন-তান্ত্রিক ডাকা হল, শতশত টাকা খরচ হল—কিন্তু সবই ভস্মে ঘি ঢালা। ফ্রক ছিঁড়তে তো লাগলোই, একদিন ভোরে লতা উঠে কাঁদতে কাঁদতে বললো তার এত সাধের বিরাট কুচকুচে কাল কোঁকড়ানো চুল কে যেন কাঁচি দিয়ে কাঁধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে কেটে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, তার শরীরের নানা জায়গায় বিশেষ করে বুকে, ঊরুতে আঁচড়ানো দাগ। দুঃখে হতাশায় সে নখ কাটা, স্নান করা ইত্যাদিও প্রায় বন্ধ করে দিল। লতা জানাল একটি প্রেতাত্মা রাত্রে এসে তাকে কামড়ায়, আঁচড়ায়, তাকে টেনে বাইরে নিয়ে যেতে চায়, সে না যেতে চাইলে ধস্তাধস্তি করে, আবার অন্য সময় তাকে আদর করে, নানা উপহার দেয়। আত্মীয়দের পরামর্শে এক বিখ্যাত পুরোহিত তথা গুণিনকে ডাকা হয়। পুরোহিতমশাই পুজো করে মন্ত্রপূত সুতো বেঁধে দিলেন এবং 'বিষ্ণুরাজ তৈল' নামে একটি পবিত্র তেলের কয়েকফোঁটা দিয়ে একটি মাদুলিও পরালেন। এরপর দু'দিন লতার ওপর কোন প্রেতাত্মার আক্রমণ হয়নি। কিন্তু তৃতীয় দিন থেকেই আবার পুরোদমে শুরু হল।

এরপর রণসিংহীরা তাঁদের এক আত্মীয়ের পরামর্শে ডঃ কোভুরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ডঃ কোভুর সস্ত্রীক তাঁদের বাড়ীতে যান। তাঁরা লতাকে পরীক্ষা করলেন। প্রেমিক প্রেতাত্মা তার প্রেম নিবেদন আরো সাংঘাতিকভাবে শুরু করেছে। দেখা গেল লতার বুকের বাঁদিকে একাধিক আঁচড়ের দাগ। ডান হাতের সামনে বগলের ইঞ্চি চারেক নীচে কামড়ের দগদগে একটি দাগও রয়েছে, এই দাগে দেখা গেল এক জায়গায় দুটি দাঁতের মাঝে ফাঁক রয়েছে।

প্রায় এক ঘণ্টা লতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল, যে প্রেতাত্মাটি তার কাছে আসে সে একজন বলিষ্ঠ পুরুষ। সে আদর করে চুমু খেয়ে লতার ঘুম ভাঙায়। তাকে উপহার দেয়। তারপর বাড়ীর বাইরে রাখা গাড়ীতে তাকে নিয়ে যেতে চায়, সে না যেতে চাইলে ঐ প্রেতাত্মাটি তাকে জোর করে। এই ধস্তাধস্তির সময়ই তাঁর ফ্রক ছিঁড়ে যায়, কখনো বা ঐ পুরুষটি ফ্রক কেটেও দেয়, একবার চুলও কেটে দিয়েছে। মাঝে মাঝে সে লতাকে কোলে তুলে নেয়, তার বড় বড় নখ দিয়ে আঁচড়ায়, কামড়ায় ইত্যাদি। আরো জানা গেল, ঐ পুরুষটি দেখতে লায়োনেল-এর মত। লায়োনেল পাশের একটি ছেলেদের স্কুলের ফুটবল টিমের ক্যাপটেন ছিল। মাস তিনেক আগে ছেলেটি একটি দুর্ঘটনায় মারা যায়। লতারা যখন নেটবল খেলতো, ও এসে তাদের উৎসাহ দিত। লতার ভাই ছিল না। সমবয়সী একমাত্র যে তরুণের সঙ্গে লতার আলাপ ছিল সে ছিল এই লায়োনেল। বলতে বলতে লতার দু'চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল।

এরপর ডঃ কোভুররা লতাকে মৃদু সম্মোহন করে দ্রুত প্রশ্ন ছুঁড়তে লাগলেন। ধীরে ধীরে লতা জানাল সে নিজেই তার ফ্রক কেটেছে, ছিঁড়েছে, এমন কি মাঝে মাঝে পুড়িয়েও দিয়েছে। নিজের চুলও ওই কেটেছে। শরীরে আঁচড় ও কামড়ের দাগ ওর নিজেরই। এটি আরো সুনিশ্চিত হল যখন পরীক্ষা করে দেখা গেল, লতার দুটি দাঁতের মাঝে এক জায়গায় বেশ ফাঁক আছে এবং ওর নিজের ডান হাতের কামড়ের সঙ্গে এটি পুরোপুরি মিলে যায়।

প্রকৃতপক্ষে লতার যৌন হতাশাই তাকে মানসিক রোগ সিজোফ্রেনিয়ার শিকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছে। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের অধিকারিণী লতার যৌন আবেগ স্বাভাবিকভাবেই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বাড়ীতে কোন সমবয়সী ভাই না থাকায় বা বন্ধু না থাকায় এবং রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে হওয়ার জন্য কোন সমবয়সী পুরুষের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় ছিল না, যেটি অনেক সময় পরোক্ষভাবে অবচেতন মনে এক ধরনের যৌনতৃপ্তি এনে দেয়। বলিষ্ঠ লায়োনেলই একমাত্র তরুণ যার সঙ্গে তার আলাপ হয়, যে ছিল তার গুণমুগ্ধ। এর মৃত্যু তাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। পরীক্ষার ব্যস্ততায় সে প্রথম কয়েকটি দিন এটি ভুলে থাকে। কিন্তু পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর, যখন তার কোন কাজ নেই, তখন লায়োনেল-এর চিন্তা ক্রমশঃ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। হতাশা ও গভীর দুঃখ ধীরে ধীরে তার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করতে থাকে। এর থেকেই সে তার যৌন আবেগকে নিজের অবচেতন মনের থেকে তৃপ্ত করতে থাকে—কিন্তু মনে করে যেন আদর করা, উপহার দেওয়া, আঁচড়ানো কামড়ানো ইত্যাদি লায়োনেল-এর করা। 'লায়োনেলের কোলে নেওয়া' আসলে লতার মতিভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। ফ্রকের বিশেষ স্থান ছিঁড়ে বা কেটে দেওয়া, চুল কেটে ফেলা ইত্যাদি তার যৌন তৃপ্তি লাভের অস্বাভাবিক ইচ্ছা মাত্র—তার প্রিয় পুরুষের সামনে নিজের শরীর প্রদর্শন করা (exhibitionism) বা আকর্ষণীয়ভাবে তার সামনে উপস্থিত হওয়ার কামনা।

ডঃ কোভুররা লতার মা-বাবাকে বললেন উপযুক্ত পাত্র দেখে লতার বিয়ে দিতে—তবে কোন খেলোয়াড়, বলিষ্ঠ ছেলের সঙ্গে বিয়ে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শ্রীরণসিংহীরা তাই করলেন। ক্রমে লতা দুই বাচ্চার মা হল এবং একজন সুখী গৃহিণী।

চোর ভূত—শ্রীমিহ্‌রা নামে সিংহল প্রবাসী এক পাকিস্তানী ব্যবসায়ীর বাড়ীতে ১৯৬৫ সালে ভৌতিকভাবে টাকা চুরি যেতে থাকে। আলমারির ভেতর ৩০০০ টাকা ছিল, হঠাৎ একদিন দেখা গেল ওর মধ্যে ৩০০ টাকা নেই। পরপর এরকম ঘটতে থাকলে তিনি একজন গুণিন-এর সাহায্য নিলেন। গুণিন তার অনুষ্ঠানাদি করে জানাল শ্রীমিহ্‌রার প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীরা তাঁর পেছনে এক ভাড়া করা প্রেতাত্মাকে লাগিয়েছে। শ্রীমিহ্‌রার হাতে একটি মন্ত্রপূত সুতো বেঁধে দিয়ে বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে। তিনমাস ঠিকই ছিল। কিন্তু এরপর আবার একবার ২০০ টাকা চুরি হল। কয়েকদিন পরে স্ত্রী জানালেন প্রায় ৩০০০ টাকা দামের গয়না পাওয়া যাচ্ছে না।

এরপর আরেক গুণিন এল। সে জানাল, প্রেতাত্মার ব্যাপার ঠিকই—তবে ভাড়া করা নয়। তাঁদেরই এক শ্রদ্ধেয় আত্মীয়, জীবিত অবস্থায় তিনি তাঁর প্রাপ্য টাকা পয়সা পাননি, তাই মৃত্যুর পরে এর শোধ নিচ্ছেন। গুণিনের নির্দেশে যজ্ঞ ও পূজাদির বিপুল আয়োজন করা হল এবং বাড়ীর একটি নির্জন ঘরে ঐ মৃত আত্মীয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্তুষ্টিবিধানের জন্য প্রতিদিন খাবার-দাবার দেওয়া হতে থাকল। তবে শ্রীমিহ্রার ভয় হল যদি সত্যিই ভাড়া করা ভূত হয় তবে তাকে খাবার-দাবার দিয়ে পোষা হচ্ছে না তো ? তাঁর ভয় 'সত্যি' প্রমাণিত হয় কয়েকদিন পরেই—শ্রীমতী মিহ্রার ফিট হতে শুরু করল। শুধু তাই নয়, ঘরের আশে-পাশে হাড়, চুল, চুন, পয়সা, পোড়া সিগারেটের খালি বাক্স ইত্যাদি মাঝে মাঝে পাওয়া যেতে লাগল কয়েকদিন অন্তর অন্তর। এবং ঘরে ঝোলান শ্রীমিহ্রার জামার পকেটে তাঁকে উদ্দেশ্য করে প্রেমপত্রও পাওয়া যেতে লাগল কয়েকদিন অন্তর অন্তর। এগুলির বক্তব্য মোটামুটি এইরকম—"প্রিয়তম মিহ্রা, ভয় পেয়ো না..আমি তোমার কিছু ক্ষতি করব না। ১৪ই জুন তারিখটি ভুলো না। তুমি অবশ্যই প্রতি রাত্রে আসবে। তোমার স্ত্রীকে এসব কথা বোলে না। আমরা এরোপ্লেনে যেতে পারি। প্রিয়তম, আমার চুম্বন নিও....গতকাল রাত্রে এসেছিলে বলে আমি খুব সুখী হয়েছি..চিঠিতে তোমার নাম লিখো না...তোমার গান আমার ভাল লাগে..কাল রাত্রে আসবে...মিহ্রা ও সারী।" প্রতি চিঠিতেই "১৪ই জুন" আর "মিহ্রা ও সারী" কথাগুলো ছিল।

প্রথমে এধরনের প্রেমপত্র পেয়ে ভাল লাগলেও ভয় হল আরো বেশী। কিন্তু মৃত ঐ আত্মীয়টি ছিলেন পুরুষ—মৃত্যুর পরে কি তবে তার লিঙ্গ পরিবর্তন ঘটল, নাকি প্রতিদিন ভালমন্দ খেতে পেয়ে শ্রীমিহ্রাকে খুব ভালবেসে ফেলেছেন! কিন্তু সবচেয়ে খারাপ সম্ভাবনা হচ্ছে, ব্যবসায়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা হয়তো এ এক নতুন কায়দা দিল।

এরপরও গুণিন এল। সে তার পূজাদি করে বলল, কয়েকদিনের মধ্যে বাড়ীর একজন একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখবে—এই স্বপ্নেই সব রহস্যের সমাধান হবে। কিন্তু দেখতে দেখতে তিনমাস কেটে গেল, কেউ আর ওরকম উল্লেখযোগ্য কোন স্বপ্ন দেখে না। অবশেষে চতুর্থ মাসে শ্রীমিহ্রার শাশুড়ী একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন—দুটি গুণ্ডা মত লোক ও একটি বাচ্চা যেন তাঁদের বাড়ীতে ঢুকতে চাইছে, শ্রীমিহ্রা তাদের বাধা দিলে তুমুল হাতাহাতি বেধে গেল, এই সময় ভদ্রমহিলা শ্রীমিহ্রাকে বলেন সরে আসতে— 'ঢুকুক ওরা বাড়ীর ভেতর, যা নেবে নিক'।

ঐ গুণিনকে ডাকা হল। ও এর থেকে বিশেষ কিছু সমাধানের পথ খুঁজে পেল না। তবু কিছু টাকা পয়সা নিয়ে যাগযজ্ঞ করল। তারপর কেটে পড়ল।

অবস্থা কিন্তু আরো খারাপ হলো। শ্রীমিহ্রা ওঝা-গুণিনদের উপর বিশ্বাস হারিয়ে একজন আলোক-বিশ্লেষক (Light-reader)-এর সাহায্য নিলেন। সে তার অনুষ্ঠানাদি করে একটি নির্জন অন্ধকার ঘরে একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে দিল। তার নির্দেশে শ্রীমতী মিহ্রার ১২ বছরের বোন একদৃষ্টিতে ঐ আলোর দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটি বলল, দু'টি শিখা দেখা গেলে তাকে যেন জানান হয়। —বেশ অনেকক্ষণ ঐভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মেয়েটি এক সময় জানাল দু'টি শিখা দেখা যাচ্ছে। তাকে আরো কিছুক্ষণ ঐভাবে তাকাতে বলা হল—এক সময় সে জানাল অসংখ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিখা সে দেখতে পাচ্ছে। লোকটি বলল, "এবার তোমার মৃত ঠাকুরদার মুখ তুমি ঐখানে দেখতে পাবে।" মেয়েটি আরো কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর একসময় ফিসফিস করে জানালো, "ঐ যে উনি। ঐ যে উনি।" এবার লোকটি তাকে বলল, তাঁর কাছ থেকে এসব গণ্ডগোলের মূলে কে তা জেনে নিতে। কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি বলল, দুটি গুণ্ডা ও বাচ্চা ছেলে। লোকটি জানাল ঐ গুণ্ডা দু'টিই ভাড়া করা প্রেতাত্মা—সব গণ্ডগোলের মূলে। এদের তাড়ানোর জন্য খুব শক্তিশালী পূজার ব্যবস্থা করতে হবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীমিহ্‌রা প্রচুর অর্থব্যয় করে এই পূজার ব্যবস্থা করলেন। ঐদিনই তিনি হিসেবে করে দেখলেন ইতিমধ্যে দেড় বছর কেটে গেছে এবং ওঝা-গুণিনদের পেছনে তাঁর খরচ হয়েছে ১৫,০০০ টাকা।

পরের দিন, ২৫শে নভেম্বর, ১৯৬৬। শ্রীমিহ্‌রা কাজে বেরিয়ে গেছেন। তাঁর স্ত্রী বাথরুম থেকে শোয়ার ঘরে এলেন আলমারি থেকে একটা কাপড় নিতে। কিন্তু আলমারির দিকে তাকাতেই তাঁর রক্ত হিম হয়ে গেল। স্টীলের আলমারির তলা থেকে প্রেতাত্মার লিকলিকে আঙ্গুলের মত গাঢ় ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। তাঁর চীৎকারে সবাই ছুটে এসে আলমারি খুলে দেখল, সত্যিই ভেতরে আগুন। বেনারসী, কাঞ্চীপূরম, নাইলন—সমস্ত দামী শাড়ী-কাপড়চোপড় পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।

সবাই বুঝল, যে ভূত এতদিন চুরি করেছে সে এবার বদমায়েসিও শুরু করল! এই সময় শ্রীমিহ্‌রার কাকা পুরো ব্যাপারটায় হস্তক্ষেপ করলেন। নির্বোধের মত ফালতু এতগুলো টাকা, সময় ও শ্রম ব্যয় করার জন্য তিনি শ্রীমিহ্‌রাকে বকলেন। এবং তিনিই ডঃ কোভুরের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিলেন।

অবশেষে ডঃ কোভুর শ্রীমিহ্‌রার বাড়ীতে এলেন। ডঃ কোভুর বাড়ীর সকলের সঙ্গে আলাদা-আলাদা কথা বললেন এবং ঐ প্রেমপত্রগুলো থেকে কিছু বাছাই করা শব্দ নিয়ে কয়েকটি বাক্য সবাইকে দিয়ে লেখালেন। এবং অদ্ভুতভাবে একজনের হাতের লেখার সঙ্গে প্রেমপত্রের লেখা মিলে গেল। শুধু তাই নয় একটি বিশেষ বানানের ভুল একাধিক প্রেমপত্রে ছিল—ডঃ কোভুর এই বানানটিও সবাইকে দিয়ে কৌশলে লিখিয়েছিলেন;—এই ব্যক্তি ঐ বানানটিও এইরকম ভুল করে লিখেছিলেন। আর, এ ব্যক্তি অন্য কেউ নয়—শ্রীমতী মিহ্‌রা। ডঃ কোভুর শ্রীমিহ্‌রা ও তাঁর কাকাকে আলাদাভাবে ডেকে জানালেন, এসব ঘটনার মূলে রয়েছেন শ্রীমিহ্‌রার সুন্দরী স্ত্রী-ই। শুনে ভদ্রলোক প্রথমে ঘাবড়ে গেলেও পরে ডঃ কোভুরের উপর ক্ষেপে গেলেন। তাঁর কাকা হস্তক্ষেপ না করলে ব্যাপারটা হয়তো আরো গড়াত। তিনি বললেন, "দেড় বছর ধরে বেশ কয়েকজন বুজরুক অশিক্ষিত ওঝা-গুণিনের কথা বিশ্বাস করে ১৫,০০০ টাকা খরচ করতে পারলে, আর শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক-এর যুক্তিটা নিতে পারছ না? শেষ অব্দি দেখ কি হয়।"

ডঃ কোভুরের নির্দেশে ভদ্রমহিলাকে ডঃ কোভুরের বাড়ীতে নিয়ে আসা হল। ডঃ কোভুর ও তাঁর স্ত্রী ভদ্রমহিলাকে সম্মোহিত করলেন। সম্মোহিত অবস্থায় শ্রীমতী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিহ্‌রা একে একে স্বীকার করলেন, টাকা তিনিই সরিয়েছেন, হাড়, চুল-চিঠি ও পোড়া সিগারেট বাক্স ইত্যাদি তিনিই ফেলেছিলেন, আলমারির ভেতর জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ফেলাও তাঁরই কাজ ইত্যাদি।

ব্যাপক অনুসন্ধানে জানা গেল, শ্রীমিহ্‌রা তাঁর শাশুড়ী-শ্যালক-শালিকাদের ভরণ-পোষণ করতেন না,—অথচ তাঁদের আর্থিক অবস্থাও ভাল ছিল না; ধনী গৃহিণী শ্রীমতী মিহ্‌রা দীর্ঘদিন ধরে তাঁর মা- ভাই- বোনের দুরবস্থার সমাধান করার কথা ভাবতে ভাবতে অবচেতন মনে নিজেই স্বামীরই রাখা টাকা সরান শুরু করেন। কিন্তু এটি তাঁর মনের মধ্যে তীব্র অপরাধবোধ সৃষ্টি করে। এই তীব্র মানসিক দ্বন্দ্বই পরিণতি লাভ করে ঘন ঘন ফিট হওয়ার মধ্যে। অন্যদিকে স্বামীর টাকা চুরি করা ও তাঁকে দুশ্চিন্তার মধ্যে রাখার অপরাধবোধ থেকে কিছুটা মুক্তিলাভের চেষ্টায় তাঁর অবচেতন মন স্বামীর উপর অসচ্চরিত্রতা আরোপ করল 'সারী' নামে মেয়ের সঙ্গে তারঁ অবৈধ সম্পর্ককে আরোপিত করে। এই সারী ছিল সুন্দরী ভারতীয় এক নর্তকী। শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠান করতে এসে শ্রীমিহ্‌রার বাড়ীতে ছিলেন এবং ১৪ই জুন তারিখেই তিনি প্লেনে করে ভারতে ফিরে যান। তাই তাঁরই লেখা 'প্রেমপত্রে' '১৪ই জুন' তারিখটি বারবার এসেছে। অন্যদিকে বিভক্ত অবচেতন মনের ক্রিয়ায় স্বামীর উপর ক্রোধে হাড়-গোড় ফেলেছেন, জিনিসপত্র পুড়িয়েছেন ইত্যাদি। এইরকম কত বিচিত্রভাবে জটিল মনের জটিলতর ও অস্বাভাবিক ক্রিয়ায় অসচেতন ও অবচেতনভাবে নানা কাজ করা হয়। আপাত ব্যাখ্যার অতীত এইসব কাজকেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পরে সুস্থ অবস্থায় এবং আশপাশের অন্যান্যরাও ভৌতিক বা দৈব ব্যাপার বলে মনে করেন। বৈজ্ঞানিকভাবে করা মানসিক বিশ্লেষণ ছাড়া অনেকক্ষেত্রেই এগুলির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়।

আরো কিছু অদ্ভুত মন— বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা, অনুভূতির প্রভাবে কত অদ্ভুত ধরনের মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তার আর একটি উদাহরণও ডঃ কোভুর দিয়েছেন। মাতৃহারা এক তরুণ শিক্ষক, শ্রীসালগাডো তাঁর সুন্দরী ছাত্রী প্রেমাকে বিয়ে করেছিলেন। স্বামী-স্ত্রীর আপাত ও বাহ্যিক সম্পর্ক খুবই ভাল ছিল। কিন্তু বিয়ের কয়েক বছর পরেও তাঁদের কোন ছেলেপুলে হয়নি।

মেয়েটির বাবা একটি গণৎকারের সাহায্য নিলেন। সে গণনা করে জানাল ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসের মধ্যে তার একটি মেয়ে হবে। কিন্তু না, নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও তাদের কোন বাচ্চা হল না। এরপর এক মহিলা গুণিনের সাহায্য নেওয়া হল। সে বলল তাদের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মন্ত্র পড়ে দিয়েছে— তাই বাচ্চা হচ্ছে না। অনেক টাকা খরচ করিয়ে, ৩৩০ টাকা 'ফি' নিয়ে, সে যজ্ঞাদি করল এবং বাড়ীর বাগান থেকে একটি তামার পাত্র খুঁজে বের করল—এর ভেতর হাড়, চুল, পয়সা ইত্যাদি ছিল। এরপর সে জানাল এবার মন্ত্রের গুণ কেটে গেছে, এক বছরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যেই বাচ্চা হবে। কিন্তু না, এর পরেও বাচ্চা হয়নি। ঐ সময় একদিন প্রেমার এক মাসিমা তাকে উপদেশ দিলেন কোন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখাতে। অপ্রত্যাশিতভাবে এর উত্তরে প্রেমা বলল, "স্বামীর সাহায্য না থাকলে ডাক্তার কি করবে?" জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল, কয়েক বছর বিয়ে হলেও তাদের মধ্যে কোন যৌন-সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। প্রেমার মা-বাবা এই অদ্ভুত সংবাদে বিভ্রান্ত হয়ে আত্মীয়দের পরামর্শ নিলেন। তাদের পরামর্শে এক বিখ্যাত সাধুর পরামর্শ নেওয়া হল। সে ৫০ টাকা নিয়ে একফোঁটা তেল দিল—এই তেল একটি মাদুলিতে পুরে গলায় পরতে হবে, এর ফলেই তার স্বামী তার প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ করবে। তবে সাধুটি এটিও বলে দিল, এ খুব শক্তিশালী তেল—তাই এই মাদুলি পরে স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের সামনে যাওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু না এতেও প্রেমার স্বামীর ব্যবহারে কোন পরিবর্তন এল না—সে প্রেমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে, ভালবাসে, কিন্তু যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে না।

এই সময় ডঃ কোভুরের সঙ্গে প্রেমার বাবা যোগযোগ করেন। ডঃ কোভুর বিস্তারিত অনুসন্ধানে জানলেন, প্রেমার স্বামী ছিলেন ক্যাণ্ডির ধনী উকিল শ্রী ও শ্রীমতী হেনরি সালগাডোর একমাত্র সন্তান। তিনি জন্মাবার দু'বছরের মধ্যে তাঁর বাবা মারা যান। এরপর তাঁর মা তাঁকে পরম যত্নে মানুষ করেন। সব সময় আঁকড়ে রাখতেন। কারোর সঙ্গে প্রায় মিশতে দিতেন না এবং স্কুলে যাওয়া ছাড়া প্রায় বেরুতেই দিতেন না। অনেক বড় হয়ে গেলেও ছেলেকে নিজের কাছেই শোয়াতেন এবং বিশেষ করে যৌন ব্যাপারে কোন ধারণা যাতে তার মনে না ঢোকে তার জন্য বিশেষ সতর্ক ছিলেন। গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর শ্রীসালাগাডো চাকুরিতে ঢুকে মাইনের পাই-পয়সা মাকে দিয়ে দিতেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন হার্ট অ্যাটাকে ভদ্রমহিলা মারা যান। প্রিয়তমা মায়ের এই মৃত্যু তাঁকে গভীরভাবে আঘাত করে। মায়ের প্রতিটি স্মৃতি, কথাবার্তা, আচার-আচরণ তাঁর মনে ভাসতে থাকে। যার মধ্যেই মায়ের সঙ্গে কিছু মিল পেতেন তাকেই তার ভাল লাগত। প্রেমার সঙ্গে মায়ের কিছু মিল থাকায় তাকেও তাঁর ভাল লাগে! কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর যৌন সম্পর্কের ব্যাপারটিই ছিল তাঁর অজ্ঞাত অথবা সামান্য ধারণা থাকলেও, যেহেতু প্রেমাকে তিনি মাতৃজ্ঞান করতেন, তাই মায়ের সঙ্গে যেভাবে শুতেন, প্রেমার সঙ্গেও সেইভাবে শুতেন—সেখানে যৌন সম্পর্কেও কোন সম্ভাবনাই তাঁর মাথায় আসেনি। কিন্তু মাইনের পাই-পয়সা স্ত্রী প্রেমার হাতেই দিতেন, তাকে খুব ভালও বাসতেন। প্রেমাও তার স্বামীকে খুব ভালবাসত—কিন্তু নারীসুলভ লজ্জাবশে কোনদিন যৌন ব্যাপারে আগবাড়িয়ে স্বামীকে কিছু বলেনি, স্বামীর সঙ্গে যৌন মিলনের স্বপ্ন সে রাতে দেখত এবং এইভাবেই কিছুটা যৌনতৃপ্তি পেত।

ডঃ কোভুর প্রেমা ও তার স্বামীর সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলে পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। তিনি প্রেমাকে বোঝালেন যে, ক্ষুধাতৃষ্ণার মত যৌনতাও প্রাণীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি স্বাভাবিক চাহিদা। ক্ষুধা কমে যাওয়া যেমন একটা রোগ, যৌন ইচ্ছা না থাকাও তেমনি এক ধরনের রোগই। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষ অনেক উন্নত বলে সে তার সমাজ-বিকাশের সঙ্গে তাল রেখে নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ককে সুশৃঙ্খল ও সুন্দর রাখার জন্য বিয়ে ও অন্যান্য-ধরনের সামাজিক নিয়ম-কানুনের প্রবর্তন করেছে। বর্তমান মানুষ বিয়ের মাধ্যমে সামাজিক অনুমোদন পেয়ে তার বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে যৌন মিলনে রত হয় এবং মানব প্রজাতিকে টিঁকিয়ে রাখে। তাই প্রেমার স্বামীর এই অস্বাভাবিক আচরণ তার একটি রোগই—এটি তার মানসিক রোগ, তার মায়ের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। তিনি প্রেমাকে নিজের মায়ের মত ভালবাসেন, স্ত্রীর মত নয়, তাই এই গণ্ডগোল। এক্ষেত্রে স্বামীর এই ভ্রান্ত ধারণাকে কাটানর জন্য প্রেমাকে উদ্যোগী হতে হবে—তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, সে তার স্বামীর 'মা' নয়—প্রিয়তমা স্ত্রী ও যৌন সঙ্গিনী। তাই লজ্জা ত্যাগ করে যৌন ব্যাপারে তাকেই উদ্যোগী হতে হবে। এক্ষেত্রে এটি স্বামীর মানসিক চিকিৎসারই একটি অঙ্গ—কোন বিকৃতি নয়, এবং সামাজিক নিয়ম-কানুন ও স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের বিরোধীও নয়। তাই এর জন্য অপরাধবোধ বা অহেতুক লজ্জা করার কোন কারণ নেই। না করলে বরং নিজের প্রতি, স্বামীর প্রতি, সমাজের প্রতি অন্যায় করা হবে।

ডঃ কোভুর আরেক দম্পতির উদাহরণ দিয়েছেন। এক্ষেত্রেও ভদ্রলোক তাঁর বিধবা ধনী মায়ের দ্বারা এতই প্রভাবিত ছিলেন যে, বিয়ের পরও তিনি তাঁর মায়ের কাছে শুতেন—সুন্দরী নব বিবাহিতা তরুণী স্ত্রী শুতেন আলাদা। একসময় মেয়েটি পাগল হয়ে যায়।

এইভাবে কত বিচিত্র মানসিকতা কত বিচিত্র অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করে। সাধু-সন্ন্যাসী, গণৎকার, গুণিনরা এগুলোকে ভূতের ভর, দেবতার অভিশাপ, পূর্বজন্মের কর্মফল, মন্ত্রের প্রভাব, অলৌকিক শক্তির নির্দেশ ইত্যাদি বলে ব্যাপারকে আরো জটিল করে তোলে। প্রেমার ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে ডঃ কোভুর পুরো ব্যাপারটির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছেন। তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর নির্দেশ পালন করে প্রেমা ও সালগাডো সুখী দম্পতি হয়ে উঠেছে, একটি শিশুপুত্রের জন্ম দিয়েছে।

কিন্তু আরো কত অসহায় মানুষ এই ধরনের নানা কুসংস্কার ও ভ্রান্ত মানসিকতার শিকার। তাদের সুখী করতেই ডঃ কোভুরদের এই একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা।

ভূতের ভর

দেবতার ভরের মত ভূতের ভরও ভূত-প্রেতের জন্য ঘটে না—এর একটিই কারণ—দেবতার মত ভূতেরও কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। দুটিই মানসিক রোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(hysteria)-র প্রকাশ মাত্র। রোগটি সাধারণতঃ তরুণ-তরুণীদের মধ্যে বিশেষত তরুণীদের মধ্যে, বেশী দেখা যায়। এবং যে কোন বয়সেও দেখা দিতে পারে। গ্রীক শব্দ hystera-র অর্থ জরায়ু। প্রাচীনকালে গ্রীকেরা মনে করতো জরায়ু ক্ষেপে গেলে রোগটি দেখা দেয়, তাই এই নাম। তবে বর্তমানে এটি সুনিশ্চিত যে জরায়ুর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই এবং পুরুষদের মধ্যেও এ রোগ দেখা দিতে পারে। অবদমিত কোন ইচ্ছা বা অতৃপ্তি, হতাশা, ভয়াবহ বা অস্বস্তিকর কোন স্মৃতি, প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে পলায়নী মনোবৃত্তি ইত্যাদি নানা কারণে অবচেতন মনের ইচ্ছাতেই রোগী বা রোগিনী হিস্টেরিয়ার লক্ষণগুলি নিজেই করে (অর্থাৎ খিঁচুনি হওয়া, প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, উল্টোপাল্টা বহু বিচিত্র ধরনের কথাবার্তা বলা, এমনকি প্যারালিসিস, কানে না শোনা, চোখে না দেখতে পাওয়া ইত্যাদি)—এই অবস্থায় বহু পুরনো কোন স্মৃতির উন্মেষ ও নিজের কিছু কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভ্রান্ত বিশ্বাস ব্যাপারটিকে আরো জটিল ও রহস্যময় করে তুলতে পারে। রোগী নিজেই এসব করলেও অনেক ক্ষেত্রেই সে আদৌ এসব সম্পর্কে সচেতন নয়। সম্মোহিত করেও এধরনের লক্ষণগুলির প্রকাশ ঘটান যায়, আবার সম্মোহনের সাহায্যে রোগটিকে দূরও করা যায়।

প্রেমিক ভূতের ভর—অবসারপ্রাপ্ত জনৈক অফিসারের স্ত্রী সেন্ট জুড (St. Jude)-এর প্রেতাত্মার দ্বারা 'গর্ভবতী' হয়ে পড়েছিলেন। ১৯৬৭ সালের ২৬শে নভেম্বর ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ডঃ কোভুরের কাছে আসেন। ভদ্রলোকের প্রথমা স্ত্রী ও ঐ পক্ষের একমাত্র শিশুটি মারা যাওয়ার পর তিনি অল্পবয়সী এই মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। এই পক্ষে তাঁদের তিন বছর ও ১১ মাস বয়সের দুটি বাচ্চাও রয়েছে। রিটায়ার্ড হওয়ার পর হাতে খুব একটা কাজ থাকত না। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী মিলে ঘরে প্ল্যানচেটের আসর বস্যাতেন। ভদ্রলোক ডঃ কোভুরকে জানালেন যে, এই আসরে সিংহলের প্রাক্তন প্রধান-মন্ত্রী শ্রী এস. ডব্লু. আর. ডি. বন্দরনায়েক থেকে শুরু করে বহু বিখ্যাত ব্যক্তির আত্মার, এমনকি দেবতা বিষ্ণু, কাতারাগামা প্রমুখেরও আবির্ভাব ঘটেছে। সর্বশেষ যে আত্মাটি এসেছিল সেটি ছিল সেন্ট-জুড এর। সেন্ট জুড জানিয়েছিল যে, পাশের একটি গীর্জায় পরদিন সকালে গেলে ঐ গীর্জায় তারই মূর্তির পায়ের কাছে ভদ্রমহিলার জন্য একটি সোনার আংটি রাখা থাকবে। পরের দিন তাঁরা দুজনেই যথানির্দিষ্ট স্থানে গেলেন, কিন্তু আংটি পাওয়া গেল না। পরের প্ল্যানচেটে সেন্ট জুড জানাল যে, স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে গেলে আংটি পাওয়া যাবে না। পরের দিন ভদ্রমহিলা নিজের ভাইকে নিয়ে গীর্জায় গেলেন; কিন্তু না, এবারে ও কোন আংটি নেই। ভদ্রমহিলা নাছোড়বান্দার মত ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে থাকলেন আংটির জন্য। অবশেষে তাঁকে জোর করে বাড়ী ফিরিয়ে আনতে হল। বাড়ী ফিরেই তিনি অস্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করলেন, কান্নাকাটি, চেঁচামেচি—আর সঙ্গে যোগ হল, নিজের গর্ভবতী অবস্থা সম্পর্কে প্রচার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় বাচ্চাটি হওয়ার পর তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক যৌন সম্পর্কটি আর ছিল না—ভদ্রলোক ঠাকুর দেবতার ধ্যানে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন। কিন্তু ভদ্রমহিলা জোর দিয়ে বলতে লাগলেন যে, তাঁর পেটে ৯ মাসের বাচ্চা রয়েছে।

বহু ওঝা-গুণিন দেখান হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। কেউ বলে 'কালুকুমারী' নামে এক অপদেবীর কাজ এটা, কেউ বলল 'কালুদোদল' নামে একটি বিষ ভদ্রমহিলাকে খাওয়ান হয়েছে। রোমান ক্যাথলিক এক পাদ্রী বললেন—এ শয়তানের ভর। তিনি 'পবিত্র জল' ছিটিয়ে দিলেন। না, ভদ্রমহিলার অস্বাভাবিকত্ব কমল না।

ডঃ কোভুর ভদ্রমহিলাকে একান্তে মৃদু সম্মোহন করে বক্তব্য শুনলেন। জানা গেল, ভদ্রমহিলা একা একবার প্ল্যানচেটে বসেছিলেন—তখন সেন্ট জুড তাঁকে বলেছিলেন যে, আগের জন্মে সেন্ট জুড ছিলেন তাঁর স্বামী, পরের জন্মেও তিনি তাঁর স্বামী হতে চান। এরপর থেকে সেন্ট জুড প্রায়ই নাকি আসা শুরু করেন। ভদ্রমহিলার স্বামী বাড়ীতে না থাকলে, তিনি রান্নাঘরে ঢুকে ভদ্রমহিলাকে টেনে বাথরুমে নিয়ে যেতেন, সেখানে জড়িয়ে ধরে প্রেম নিবেদন করতেন, কখনো বা রাত্রে একসঙ্গে শুতেন—কাপড় খুলে দিয়ে ক্রুশ এঁকে দিতেন। ভদ্রমহিলা বুকের পোশাক সরিয়ে ক্রুশ-এর আকারে একটি আঁচড়ের দাগও দেখালেন। এসব বলে ভদ্র মহিলা কাঁদতে শুরু করলেন। কান্নার কারণ জিগ্যেস করলে তিনি জানালেন—তাঁর পেটে সেন্ট জুডের বাচ্চা রয়েছে, তাঁর স্বামী এ বাচ্চাটির বাবা নয় ; এই অবৈধ সন্তানকে জন্ম দেওয়ার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল।

এরপর ডঃ কোভুর প্রকৃত ব্যাপারটি ভদ্রমহিলার স্বামীকে বুঝিয়ে বললেন। কম বয়সের জন্য ভদ্রমহিলার যৌন আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বয়স্ক স্বামী দ্বিতীয় সন্তান জন্মানর পর যৌনস স্পর্ক না রাখায় এবং ধ্যান করে সময় কাটাতে থাকায়, তাঁর এই স্বাভাবিক যৌন আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থাকে। ভদ্র ও রুচিশীল হওয়ার জন্য বিকৃত বা অবৈধ উপায়ে ভদ্রমহিলা তাঁর এই আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করেন নি। কিন্তু অবদমিত ইচ্ছা থেকে মানসিক অস্বাভাবিকত্ব শুরু হয়েছে। ভূত-প্রেত দেব-দেবীতে আজন্মের অন্ধ বিশ্বাস থাকায়, প্ল্যানচেটে প্রকৃতপক্ষে তিনিই অবচেতন মনের ক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রেতাত্মার আবির্ভাবের ভান করেছেন। এক সময় সেন্ট জুড-এর সুন্দর, বলিষ্ঠ মূর্তিকে মনে মনে গ্রহণ করেছেন নিজের যৌন সঙ্গী হিসেবে। আঁচড়ের দাগ ইত্যাদি অবচেতনভাবে তাঁর নিজেরই করা। সেন্ট জুড-এর প্রেম নিবেদন, টাকা-আংটি উপহার দেওয়া ইত্যাদি প্রকৃত পক্ষে তাঁর নিজের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন।

ডঃ কোভুর ভদ্রলোককে অভিযুক্ত করলেন এবং উপদেশ দিলেন, ধ্যান না করে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিবার পরিকল্পনার ব্যবস্থা নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে। আর ভদ্রমহিলাকে গভীরভাবে সম্মোহিত করে বললেন যে, সেন্ট জুড এসেছেন, তিনি তাঁর বাচ্চাকে নিয়ে চলে যাচ্ছেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর কোনদিন নিজে আসবেন না, বরং ভদ্রমহিলার স্বামীর মাধ্যমে তার সঙ্গে মিলিত হবেন। এরপর থেকে ভদ্রমহিলা আর 'গর্ভবতী' থাকেন নি। ভূত- প্রেত সম্পর্কে মিথ্যা বিশ্বাসের সঙ্গে অবদমিত আকাঙ্ক্ষা থেকে সৃষ্ট হিস্টেরিয়া ও তার ফলে মিথ্যা গর্ভাবস্থা (চিকিৎসা বিজ্ঞানে এ ধরনের ঘটনা pseudo-cyesis নামে পরিচিত) এইভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সারান সম্ভব হল।

জ্যান্ত মানুষের ভূত—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ঘটনা এটি। সিংহলের সালে জেলায় আকসিমানা অঞ্চলের লীলাবতী নামে একটি মাতৃহীন মেয়ের সঙ্গে তার বাবার মুদীর দোকানের কর্মচারী, সোমপাল নামে একটি ছেলের বিয়ে হয়। বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই ছেলেটি যুদ্ধে চলে যায়। প্রথম প্রথম সে বৌকে ঘনঘন চিঠি দিত। ঐ চিঠিগুলো নিয়েই লীলাবতী মধুর স্বপ্ন দেখে সময় কাটাত। ওর বাবা সকালে কাজে বেরিয়ে যেত, ফিরত বেশ রাতে। লেব্বে নামে এক ফেরিওয়ালা ও তার সাগরেদ শরথ লীলাবতীর কাছে প্রায়ই আসত জিনিসপত্র বিক্রি করতে এবং কিনতেও—কারণ লীলাবতী অলসভাবে বসে না থেকে টুকিটাকি এটা ওটা বানিয়ে বিক্রি করত।

এদিকে যত দিন যায় লীলাবতীর স্বামী সোমপাল-এর চিঠিও কমে আসতে থাকে। এক সময় তা পুরোপুরি বন্ধই হয়ে যায়, লীলাবতী লেখাপড়া প্রায় জানত না। ওর হয়ে শরথ সোমপালের কাছে চিঠি লিখে দিত এবং লীলাবতীকে সান্ত্বনা দিত। স্বামীর দর্শন দূরের কথা, চিঠিটুকুও বন্ধ হয়ে যেতে লীলাবতী প্রচন্ড ভেঙ্গে পড়ে—এ সময় শরথই তার বাড়ীতে বহুক্ষণ থেকে তার কষ্ট ভুলিয়ে রাখত এবং ওর বাবা রাত্রে ফিরে আসার আগে চলে যেত। সম্পূর্ণ যোগাযোগহীন সোমপালকে ভুলে যেতে আর বেশী সময় লাগল না। শরথই তখন লীলাবতীর আনন্দ ও ভরসা। কিন্তু তাদের মেলামেশার ফলশ্রুতিতে লীলাবতী যখন গর্ভবতী হয়ে পড়ল এবং ক্রমশঃই তা স্পষ্ট হতে থাকল, তখন শরথের আসাও কমতে কমতে বন্ধ হয়ে গেল। ১৯৬৪ সালের আগস্ট মাসে লীলাবতীর ফুটফুটে একটি বাচ্চা হল। গভীর স্নেহে লীলাবতী তাকে মানুষ করতে থাকল। কিন্তু কয়েক মাস পরেই একদিন লীলাবতীর নামে সৈন্য বিভাগ থেকে একটি টেলিগ্রাম এল—তারা জানিয়েছে লীলাবতীর স্বামী, সোমপাল যুদ্ধরত অবস্থায় মারা গেছে।

ঐ দিনই বিকালে লীলাবতীর ফিট হ'ল—হাত পা শক্ত হয়ে গেল চোখ দুটো ঘুরছে আর পুরুষালি গলায় চেঁচিয়ে বলল,-"আমি তোমায় উচিত শিক্ষা দেব, তুমি আমার বৌ-কে ঠকিয়েছ। আমি তোমাকে ও তোমার বাচ্চাকে খুন করব। আমি মানুষের রক্ত দেখেছি। অনেক মানুষকে গুলি করে মেরেছি। শরথ ও তার বাচ্চাকে না মেরে আমি যাব না।" তারপর লীলাবতী মাটিতে আছড়ে পড়ল এবং প্রায় ১৫ মিনিট মড়ার মত পড়ে রইল। শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব প্রতিবেশী এসেছিল। তারা সবাই বুঝল, এ লীলাবতীর মৃত স্বামী সোমপালের প্রেতাত্মা—লীলাবতীর ওপর ভর করেছে। এরপর প্রতিদিন রাত্রে, যখন লীলাবতীর বাবা বাড়ী ফিরত, তখনই লীলাবতীর ভর হতে থাকল এবং ঐ সময় সে বাচ্চাটিকে মেরে ফেলতে চাইত। ফলে রাত্তিরে বাচ্চাটি তার দাদুর কাছেই শুত। দিনের বেলা যখন বাড়ীতে অন্য কেউ থাকত না তখন তার ভর হত না, তাই কোন ভয় ছিল না।

উত্তরোত্তর ঘটনাটি ঘটতে থাকায় গুণিন-তান্ত্রিকদের ডাকা হল। রাত্রে ভূত তাড়ানোর যজ্ঞের সময়ই লীলাবতীর ভর হল সকলের সামনে। সে নাচতে নাচতে পুরুষ-কণ্ঠে গুণিনের প্রশ্নের উত্তরে জানাল—"আমি সোমপাল। জাহাজে করে সালেতে এসেছি। আমি আমার বৌ-কে দেখতে এসেছি। শরথ আমার বৌকে ঠকিয়েছে। তার বাচ্চাকে আমার বৌ-এর কাছে আমি রাখতে দেব না। শরথ আর তার বাচ্চাকে আমি মেরে ফেলতে চাই। যদি দুটো প্রাণ তোমরা বলি দাও তবেই আমি চলে যাব। বাগানের ঐ বড় গাছটিতে আমি থাকছি। যখন চলে যাব তখন গাছটির ডাল নাড়িয়ে দিয়ে যাব।" (এইভাবে অন্যের গলা অনুকরণ করে বিকৃত স্বরে কথা বলাকে glossolalia বলা যায়।)

এই বলে লীলাবতী মাটিতে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল। দু'টি মুরগী বলি দেওয়া হল। গুণিন ঐ গাছটির নীচে দাঁড়িয়ে ওপরে তাকিয়ে বলল,'ঐ একটি ডাল নড়ে উঠল', অর্থাৎ প্রেতাত্মাটি চলে গেল—অবশ্য অন্য কেউ ব্যাপারটি দেখতে পেল না। (আসলে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ধাপ্পা।) গুণিন আরো জানাল, সোমপালের মৃতদেহটি যুদ্ধক্ষেত্রে ভাল করে সৎকার না হওয়ার ফলেই এসব বিপত্তি। এরপর হপ্তা দুয়েক লীলাবতী ভাল ছিল। (এটি সম্ভব হয়েছে গুণিনের এতসব কান্ড লীলাবতীর মনে একটি সম্মোহনী প্রভাব ফেলার জন্য।) কিন্তু একদিন ঐ গাছের একটি ফল ভুল করে খেয়ে ফেলার পর লীলাবতীর আবার ভর হতে শুরু করল। (যেহেতু ঐ গাছ সোমপালের প্রেতাত্মার আস্তানা ছিল, তাই ভুল করে গাছের ফল খেয়ে ফেলার পরই লীলাবতীর মনে হয়েছে ঐ ফলের মধ্য দিয়ে প্রেতাত্মা বুঝি তার শরীরে আবার ঢুকে গেল।)

এই সময় লীলাবতীর বাবা ডঃ কোভুরের কাছে যান। ডঃ কোভুর তাঁকে বোঝালেন যে, আত্মা বা প্রেতাত্মা বলে সত্যিকারের কিছুই নেই। অন্য অনেকের মত লীলাবতীও ছোটবেলা থেকেই ভূত-প্রেতের ওপর অন্ধবিশ্বাস নিয়ে বড় হয়েছে। তাই সোমপালের মৃত্যুর পর তার প্রেতাত্মার প্রতি ভয় ও অবৈধ সন্তানের জন্য অপরাধবোধ—দু'টি মিশে তার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়েছে। দূরদেশে জ্যান্ত সোমপালের চেয়ে মৃত সোমপালের প্রেতাত্মাকে তার ভয় বেশী—কারণ তার বিশ্বাস প্রেতাত্মা সর্বত্রগামী ও সর্বশক্তিমান। লীলাবতীকে যত বেশী সম্ভব একা একা রাখার জন্য ডঃ কোভুর তার বাবাকে নির্দেশ দিলেন। কারণ এই ধরনের রোগী (hysteria -র রোগী) অন্যদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপস্থিতিতেই নানারকম অস্বাভাবিক আচরণ করে, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে রোগের লক্ষণগুলো তার 'লোক দেখানো', মাত্র, যদিও সচেতনভাবে নয়, অবচেতন মনের থেকেকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে একাজ করে। লীলাবতীও তাই করত, তার বাবা রাত্রে বাড়ী ফিরলেই তার ভর হত অর্থাৎ hysteria-র লক্ষণ প্রকাশ পেত।

[এখানেই মৃগী (epilepcy) রোগীদের 'ফিট'-এর সঙ্গে hysteria রোগীদের 'ফিট'-এর তফাত। মৃগীর ক্ষেত্রে কাছে কেউ থাকুক বা না থাকুক ফিট, খিঁচুনি ইত্যাদি হতে পারে। এইজন্য এই সব রোগীদের বিপজ্জনক কাজ করতে বারণ করা হয় যেমন ড্রাইভারি, জলে ও আগুনের সামনে বা চলন্ত যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ ইত্যাদি। নির্জন পুকুরে স্নান করতে করতেও মৃগীর ফিট হতে পারে। তখন রোগীর মৃতদেহকে কাদায় মাথা গোঁজা অবস্থায় পাওয়া যেতে পারে। একে অনেকে ভাবে ভূতের ঘাড় মটকানো বলে।]

ডঃ কোভুরের নির্দেশ পালন করার ফলে অর্থাৎ তাকে একা রেখে, ক্রমশঃ তার ফিট কমে এল। কিন্তু আসল ঘটনা ঘটল আরো কয়েক মাস পরে। আচমকা জ্যান্ত সোমপাল বাড়ী এসে হাজির। আসলে হয়েছিল কি যুদ্ধে আরো কয়েকজনের সঙ্গে সোমপাল বন্দী হয়ে চালান হয়ে যায়। কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা গুলিয়ে ফেলে ও তার হদিস না পেয়ে তাকে মৃত বলে ধরে নেয় এবং ঐভাবে টেলিগ্রাম করে। এখন ছাড়া পেয়ে সে ফিরে এসেছে।

অর্থাৎ এদ্দিন জ্যান্ত সোমপালের "প্রেতাত্মা" লীলাবতীর ওপর ভর করেছিল —ব্যাপারটি এমনই হাস্যকর। (এরপর অবশ্য সোমপাল শরথের বাচ্চাকে কি করেছিল তা জানা যায় নি।)

আর এক প্রেমিক ভূত—১৯৬২ সালে সিংহলের বুলাথসিন্হলা থানার বোথিয়ালা গ্রামে এক বাড়ীতে ভূতের উৎপাত হয়। ডঃ কোভুর এর বিস্তারিত রিপোর্ট খবরের কাগজে পড়েন। জানা যায়, ভূতটি নাকি অদ্ভুতভাবে কোথা থেকে দুস্প্রাপ্য খাবার জোগাড় করে দিত, থালায় ভাত বেড়ে দিত; কেউ কোথাও নেই অথচ কে যেন খাবার খেয়ে নিত ইত্যাদি। রাত্রে নাকি আচমকা দরজা খুলে যেত, ঘুমন্ত লোককে ঠেলে ফেলে দিত এবং আরো অনেক কিছু। বাড়ীর ষোল বছরের মেয়েটির প্রতি ভূতটির আগ্রহ ছিল বেশি। তার বালিশের নীচে, জামাকাপড়ের ফাঁকে দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে প্রেমপত্র লিখে রেখে দিত। খবরের কাগজে এধরনের ভৌতিক চিঠির একটি নমুনাও ছাপা হয়েছিল। খবরের কাগজের সংবাদদাতা আরো জানিয়েছেন, ১৯৬২ সালের ৩১ শে মে, তিনি যখন সরেজমিনে দেখার জন্য বাড়ীটিতে যান, তখন তাঁরই গায়ে কোথা থেকে রহস্যজনকভাবে নারকেল কাঠির ঝাঁটা কে যেন ছুঁড়ে মেরেছিল, দলা পাকান চিঠি তাঁর পিঠে পড়েছিল ইত্যাদি। বহু ওঝা-গুনিন দিয়ে ভূত তাড়ানর ব্যবস্থা করেও কোন ফল হয় নি—মাঝখান থেকে ১৫০০-এরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশী টাকা খরচ হয়ে গেছে।

স্বাভাবিকভাবে এ খবর পড়ে চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। ডঃ কোভুরও পড়লেন। কিন্তু তিনি আর সকলের মত, ভূতের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে শিহরিত হয়ে চুপ করে গেলেন না। তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে খবরের কাগজের ঐ রিপোর্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঐ বাড়ীতে গেলেন। খুঁটিনাটি সব ব্যাপারই পরীক্ষা করলেন। বিস্ময়করভাবে জানা গেল অদৃশ্য কেউ ভাত বেড়ে দিল বা খেয়ে নিল ইত্যাদি ঘটনা বাড়ীর কেউই নিজেই চোখে দেখেনি, অধিকাংশই লোকমুখে প্রচার; কোন কোনটি বাড়ীর গিন্নীর মনে হয়েছে মাত্র। বাড়ীর ষোল বছরের মেয়েকে দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে (ভৌতিক অক্ষর?) লেখা 'প্রেমপত্র'-গুলিরই বাস্তব অস্তিত্ব ছিল। তিনি ঐ চিঠিগুলি জোগাড় করলেন এবং আলাদা-আলাদাভাবে বাড়ীর সকলের হাতের লেখা নিলেন। বাড়ীর একজন বয়স্ক ব্যক্তির হাতের লেখার সঙ্গে চিঠিগুলির লেখা পুরোপুরি মিলে গেল। কিন্তু ঐ ব্যক্তিটি আসলে ছিল নিরক্ষর; তাই তাকে সন্দেহ করার কোন প্রশ্নই ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এক্ষেত্রে সে হিংহলী বর্ণমালার অক্ষর অনুকরণ করেছে মাত্র (একে বলা xenoglossy), -তাই হয়েছে দুর্বোধ্য। ডঃ কোভুর এই ব্যক্তিটিকে আলাদাভাবে ডেকে ধমকে দিলেন—সে সব স্বীকার করল এবং আর এ ধরনের কাজ করবে না প্রতিশ্রুতি দিল। ডঃ কোভুরও তার কথা কাউকে জানালেন না— কারণ এতে তার ওপর নির্যাতনের সম্ভাবনা ছিল। এরপর থেকে ভৌতিক প্রেমপত্র বন্ধ হল।

কিন্তু কয়েকদিন পরেই বাড়ীর লোকে ডঃ কোভুরকে খবর দিল, বাড়ীর বয়স্কা একজন মহিলার উপর ভূতের ভর হয়েছে—ফিট হচ্ছে, দুর্বোধ্য কথাবার্তা বলছে ইত্যাদি। ডঃ কোভুর তখন বাধ্য হয়ে সব খুলে বলেন, বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বল্লেন—কিভাবে একজন মানুষই অসুস্থভাবে এসব কাজ করেছিল এবং প্রকৃতপক্ষে কোন ভূত বা প্রেতের বাস্তব অস্তিত্ব আদৌ নেই। এরপর থেকে ঐ বয়স্কা মহিলার উপর থেকে 'ভূতের ভর' চলে গেল।

আসলে এই ভদ্রমহিলার মধ্যেও ছোটবেলা থেকে ভূত-প্রেতের অস্তিত্ব সম্পর্কে বদ্ধমূল একটি ধারণা গড়ে উঠেছিল। গ্রামের দিকে ওঝা-গুণিনরা কারোর ভূত তাড়ায় নানাবিধ জটিল মন্ত্র পড়ে, পূজা-যাগ যজ্ঞ করে, এবং গাছের ওপর, জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে বা আকাশে ভূতটিকে পাঠিয়ে দিয়ে। ডঃ কোভুর এ ধরনের কিছুই করেননি—শুধু কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছেন মাত্র। তাই তথাকথিত ভূতের উৎপাত বন্ধ হলেও,ঐ মহিলার অবচেতন মনে ভূত যে সত্যিই চলে গেছে—এ বিশ্বাস জন্মায়নি। ফলতঃ তার মনে হয়েছে ভূতটি এখনো কোথাও ঘাপটি মেরে রয়েছে। এই ভীতিই তার মধ্যে মানসিক রোগ (hysteria) -র সৃষ্টি করেছে—লুকিয়ে থাকা ভূতটি তার ওপর ভর করেছে বলে ভ্রান্ত ধারণা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্কুল পাঠ্য ও ভূতের ভর—কেরালা র‍্যাশন্যালিস্ট অ্যাসোসিশানের সভাপতি ও 'যুক্তিবাদী' পত্রিকার সম্পাদক, মনস্তত্ত্ববিদ শ্রী এম. সি. জোসেফ ছিলেন ডঃ কোভুরের বন্ধু। তিনি একটি ভূতের ভরের ব্যাপারে অনুসন্ধান করেছিলেন। ১৯৬০ সালে এক স্কুলের সংস্কৃত পণ্ডিতের ১২ বছরের মেয়ে রাজলক্ষ্মীর উপর ভূতের ভর হয়েছিল। বিকেল ঠিক ৫ টার সময় সে হঠাৎ প্রচণ্ড ভয় পেয়ে চীৎকার করতে শুরু করত, কারোর উত্তরে কিছুই বলত না। একসময়ে ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়ত। ডাক্তার দেখান হল। পরপর তিনজন ডাক্তার এক মাসেরও বেশী চিকিৎসা করেও কিছু করতে পারলেন না। শেষে তাঁরা ত্রিবান্দ্রামের এক মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে বললেন। কিন্তু কয়েকজন আত্মীয়ের পরামর্শে আর মিছিমিছি ডাক্তারের কাছে গিয়ে সময় নষ্ট না করে এক জ্যোতিষীর পরামর্শ নেওয়া হল। সে হিজিবিজি গণনা করে জানাল, রাজলক্ষ্মীর ওপর তার ঠাকুমার প্রেতাত্মার ভর হয়েছে। ঘটনা শুরুর আগের দিনই ১৯৬০ সালের ১লা নভেম্বর রাজলক্ষ্মীর ঠাকুমা মারা যান। তাঁকে যেখানে কবর দেওয়া হয়েছে, ঐ জায়গার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নাকি তাঁর প্রেতাত্মা রাজলক্ষ্মীর উপর ভর করেছে।

[এইভাবে শ্মশান বা কবরখানার পাশ দিয়ে গেলে, ঐ অঞ্চলের আশেপাশে 'ঘোরাঘুরি করা প্রেতাত্মারা' কারোর ওপর ভর করতে পারে—এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে বিশেষভাবে অনেক গ্রামাঞ্চলে এধরনের প্রথা চালু আছে যে, যাদের নিয়মিত এ সব জায়গার পাশ দিয়ে যেতে হয় তাদের প্রেতাত্মা-বিরোধী মাদুলি পরান হয়। বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিক্ষণের মেয়েদের ক্ষেত্রে এটি করা হয়—যাদের হেঁটে স্কুলে যেতে হয় এবং রাস্তায় হয়তো শ্মশান বা কবরখানা পড়ে। যেহেতু এই বয়সের মেয়েদের hysteria বেশী হয় এবং hysteria -কে ভূতের ভর হিসেবেই ভাবা হয়, তাই ধারণা করা হয় ঐ যাতায়াতের পথেই প্রেতাত্মা ভর করেছে। সংশ্লিষ্ট মেয়ের বদ্ধমূল কুসংস্কার ও শ্মশান-কবরখানার প্রতি ভীতিও তার মধ্যে hysteria সৃষ্টিকে ত্বরান্বিত করে।]

জ্যোতিষী উপদেশ দিল এই ভূত তাড়ানোর জন্য এক গুণিনের সাহায্য নিতে। তা করাও হল—কিন্তু ফল কিছুই হল না। এরপর তাকে এক কবিরাজ দেখান হচ্ছিল—কিন্তু এতেও বিশেষ কিছু হচ্ছিল না ; মাঝখান থেকে পড়াশুনায় ভাল হওয়া সত্ত্বেও স্কুলে রাজলক্ষ্মীর একবছর নষ্ট হল।

এই সময়ে শ্রীজোসেফের সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর বাবার আলাপ হয়। শ্রীজোসেফ তাঁকে বলেন— এটি এক ধরনের হিস্টেরিয়া এবং তিনি নিজে পুরো ব্যাপারটি পরীক্ষা করবেন। তিনি রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে কথা বল্লেন। জানা গেল, সন্ধ্যের পর রাজলক্ষ্মীর মনে হয়, সে ওপরে উঠে যাচ্ছে, তাকে ঘিরে রয়েছে নিকষ কালো অন্ধকার। এতেই সে ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। কথা বলতে বলতেই সে চেঁচিয়ে উঠল,'ঐ যে, ভাই আমাকে ভয় দেখাচ্ছে।' শ্রীজোসেফ দেখলেন, ভাই-এর হাতে একটি বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়েছে। ওতে যে ছবিটা খোলা রয়েছে সেটি হচ্ছে যমরাজার ছবি,—তিনি তাঁর বাহন মহিষের ওপর বসে আর নীচে লেখা “যম সত্যবানকে বেঁধে যমলোকে নিয়ে যেতে চাইছেন”।

রাজলক্ষ্মীরা ছিল সাতভাই, একবোন। ফলে তার আদর ছিল খুব , বিশেষ করে তার ঠাকুরমা তাকে প্রচন্ড স্নেহ করতেন, সে-ও ঠাকুমাকে খুব ভালবাসত। যেদিন ঠাকুমা মারা যান ঐদিন বিকেলে ৫টা নাগাদ তাঁর অন্তিম অবস্থার সৃষ্টি হয়। কেউ মারা গেলে, তাঁর বিছানাপত্র অশুচি হয়ে যায় বলে বিশ্বাস আছে—তাই সেগুলিকেও মৃতদেহের সঙ্গে পুড়িয়ে ফেলতে হয় বা ফেলে দিতে হয়। দামী বিছানাপত্র এইভাবে নষ্ট না করার উদ্দেশ্যে, অনেক সময় মুমূর্ষু রোগীকে বিছানা থেকে নামিয়ে মেঝেতে মাদুর ইত্যাদির ওপর শোয়ান হয়। রাজলক্ষ্মীর অতিপ্রিয় ঠাকুরমার ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছিল—তিনি যখন মৃত্যুর সঙ্গে শেষ যুদ্ধ করছেন তখন বাড়ীর লোকেরা তাঁকে বিছানা থেকে নামিয়ে মেঝেতে শুইয়ে দেয়। তার একটু পরেই তিনি মারা যান। ব্যাপারটি রাজলক্ষ্মীর মনে প্রচন্ড আঘাত করে। সে খুব কান্নাকাটি করতে থাকে। ওর কাকিমা ওকে সান্ত্বনা দেন যে, ঠাকুমাকে যম নিয়ে গেলেন—সেই অন্ধকার যমলোকে। নানা গল্পে, স্কুলের বইতে যম বা এই ধরনের দেবতা-অপদেবতার কথা, সব বাচ্চাই পড়ে। রাজলক্ষ্মীরও স্কুলের একটি বইতে যমরাজের গল্প ছিল—সাবিত্রী-সত্যবানের গল্পটির সঙ্গে যমরাজের ভীষণাকৃতি ছবিও ছিল। সেই থেকে যম ও যমলোক সম্পর্কে তার মনে একটি ভয়াবহ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে। অতিপ্রিয় ঠাকুমাকে এই যম নিয়ে গেছে—এ ধারণার পর তারও মনে হয়েছে, ওকেও যম ঐ অন্ধকারে যমলোকে ধরে নিয়ে যাবে। উপর উঠে যাওয়ার অনুভূতি ও অন্ধকার দৃশ্য দেখা (hallucination) এই থেকেই হয়েছে।

শ্রীজোসেফ তাকে বোঝালেন, যম বা এই ধরনের দেবতা-ভূত-প্রেত ইত্যাদির বাস্তব কোন অস্তিত্ব নেই—এরা কাল্পনিক চরিত্র মাত্র। যেমন ধরা যাক, স্কুলের বইতে পড়ান হয় নেকড়ে বাঘ ও ভেড়ার ছানার গল্প। আসলে কোন জন্তু কথা বলতে না পারলেও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপিত করার জন্য কল্পনা করা হয় তারা যেন কথা বলছে এবং এইভাবে লোকশিক্ষার জন্য তাদের প্রতীকী করে বলা হয় কিভাবে ধূর্ত লোকেরা যে কোন মিথ্যা ওজর দেখিয়ে নির্দোষ ব্যক্তিদের ক্ষতি করে। একইভাবে যম ইত্যাদির বাস্তব অস্তিত্ব না থাকলেও তাদের কল্পনা করা হয় লোকশিক্ষার জন্য, সামাজিক প্রয়োজনে বা নানা প্রতীক হিসেবে এবং এটিই একসময় কুসংস্কারে পরিণত হয়েছে।

বুদ্ধিমতী রাজলক্ষ্মীর পুরো ব্যাপারটি বুঝতে পারল। তারপর সাবিত্রী-সত্যবান-যমের ছবিওয়ালা স্কুলের বইটা খুলে বল্ল,“ এদ্দিন আমার ধারণা ছিল এগুলো সব সত্যি ঘটনা। মনে হয় আর আমি ভয় পাব না।” এবং সত্যিই এরপর রাজলক্ষ্মী আর কোন অস্বাভাবিক আচরণ করেনি। বিকাল ৫টায় ঠাকুমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্যু হয়েছে—তাই এতদিন তার ধারণা ছিল ঐ সময়ই যমরাজার আবির্ভাবের সময়। ঠাকুমার প্রেতাত্মা চলে গিয়ে নয়, যম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা চলে গিয়েই তার হিস্টেরিয়া রোগীর মত আচার-আচরণ দূর হল।

ডঃ কোভুর মন্তব্য করেছেন, "যে সব শিশু বাঁ হাতে কাজ করার প্রবণতা নিয়ে জন্মায়, তাদের মা-বাবা যখন জোর করে তাকে ডান হাতে কাজ করাতে চায়, তখন যেমন ঐ শিশুরা কৃত্রিমভাবে তোৎলা হয়ে পড়ে, তেমনি এই সব স্কুল পাঠ্য বই দৈত্য-দেবতা-ভূত-প্রেত সম্পর্কে মিথ্যা কাল্পনিক গল্প শুনিয়ে ও দোষ করলে এরা শাস্তি দেবে—এ ধরনের ভয় দেখিয়ে শিশুদের মনে কৃত্রিমভাবে এসব সম্পর্কে মিথ্যা বিশ্বাস ও ভীতি আরোপিত করে। মানসিক হাসপাতালের রোগীদের পরিসংখ্যান থেকে এটি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ধর্মের নাম করে ছোটবেলায় যে কৃত্রিম ভয় তাদের মধ্যে ঢোকান হয়েছে অধিকাংশ মানসিক রোগী তারই শিকার।"

[হিস্টেরিয়া বা তথাকথিত ভূতের ভরের কয়েকটি উদাহরণ অধ্যাপক গিরীন্দ্র বসু তাঁর 'স্বপ্ন' বইতে বর্ণনা করেছেন। তিনি নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেছেন, "নিতান্ত শৈশবাবস্থায় অনেক ঘটনা স্মৃতি হইতে একেবারে মুছিয়া গেলেও মনের অজ্ঞাত প্রদেশে তাহাদের অবস্থিতি অসম্ভব নহে...। এক হিস্টিরিয়াগ্রস্ত স্ত্রীলোক ফিটের সময় বিশুদ্ধ হিব্রু অনর্গল উচ্চারণ করিত অথচ সুস্থ অবস্থায় তাহার হিব্রু ভাষা জ্ঞানের কোন লক্ষণ কখনও দেখা যায় নাই। অতএব ঘটনাটি 'ভূতাবেশ' বলিয়া অনেকে মনে করিলেন। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গেল শৈশবে স্ত্রীলোকটি এক পাদ্রীর ঘরে প্রতিপালিত হয়। পাদ্রী প্রত্যহ প্রাতে উচ্চৈঃস্বরে হিব্রুভাষায় বাইবেল পাঠ করিতেন। স্ত্রীলোকটির সেই শৈশবস্মৃতি মন হইতে একেবারে নির্বাসিত হয় নাই। সুস্থ অবস্থায় তাহার স্মৃতির পরিচয় পাওয়া যাইত না, মূর্চ্ছার সময় প্রকাশিত হইত।

"একবার আমি এক 'ভূতে পাওয়া' রোগিণীর চিকিৎসা করিতে যাই। মেয়েটি অল্পবয়স্কা, ফিটের সময় 'বক্তার' হইত। বক্তার মুখে সে বলিতে লাগিল —তাহার নাম অমুক, তাহার গ্রাম অমুক, ইত্যাদি; স্বামীর সহিত কলহের ফলে সে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করে, এই রোগিণীকে অশুচি অবস্থায় পাইয়া তাহার উপর ভর করিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় রোগিণীর পিতা Postal Guide দেখিয়া সেই গ্রামের সন্ধান করেন এবং তথাকার পোস্ট মাষ্টারকে লিখিয়া সংবাদ পান যে চার পাঁচ বৎসর পূর্বে সেই গ্রামে সত্য সত্যই ঐ নামের এক স্ত্রীলোক স্বামীর সহিত ঝগড়া করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। রোগিণীকে সুস্থ অবস্থায় প্রশ্ন করিয়াও কিছুতেই ধরিতে পারি নাই। সত্যি কথা বলিতে কি অনেকদিন পর্যন্ত আমি এই ব্যাপারে প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারি নাই। হঠাৎ একদিন রোগিনীর ফিটের সময় উপস্থিত হই। ফিট না ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেছিলাম। ঘরের দেওয়াল আলমারীর একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে 'বঙ্গবাসী'র কতকগুলি পুরাতন সংখ্যা ছিল। সময় কাটাইবার জন্য সেগুলি উল্টাইতেছি; এমন সময় রোগিণীর মুখে শোনা সেই গ্রামটির উল্লেখ দৈবাৎ দেখিয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইলাম। পাঠ করিয়া দেখি, 'বঙ্গবাসী'র সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে অমুক নাম্নী স্ত্রীলোক স্বামীর সহিত কলহ করিয়া আত্মঘাতিনী হইয়াছেন। এইটুকু পড়িবামাত্র সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগিণী কোন না কোন সময় এই সংবাদ পাঠ করিয়াছে আর অজ্ঞাতসারে ঘটনাটি তাহার মনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ফিটের সময় কল্পনায় সে নিজেকে ঐ আত্মঘাতিনীর প্রেতাত্মা দ্বারা অভিভূত মনে করে। ফিট ছাড়িয়া গেলে রোগিণীকে 'বঙ্গবাসী' খানি দেখাইলাম। তাহার পর আর কখনও তাহার ফিট হয় নাই। দৈবক্রমে কাগজখানি হস্তগত হইয়াছিল বলিয়াই প্রকৃত রহস্য প্রকাশ পাইল। নতুবা অন্য কোন প্রকারে ঘটনার সঠিক তথ্য নিঃসৃত হইত কিনা সন্দেহ।"

এইভাবে পৃথিবীর নানা প্রান্তেই এধরনের বহু বিচিত্র 'ভুতুড়ে' ঘটনা ঘটে যার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে অস্তিত্বহীন ভূতপ্রেতজাতীয় কোনকিছুই এদের সঙ্গে যুক্ত নেই। প্রথমোক্ত মহিলার মত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত (?) একটি ভাষায় কথা বললে অনেকক্ষেত্রেই এগুলির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হয় না—ফলে ভূত বা ঈশ্বরের মহিমা বাড়ে।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলা যায়। স্নায়ুর ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও অভিজ্ঞতাকে প্রতিফলিত ক'রে, মানুষের যে মন, চিন্তা, স্মৃতি ইত্যাদি ব্যাপার গড়ে উঠেছে তার সম্পর্কে বহু তথ্য ধীরে ধীরে জানা যাচ্ছে—আর বহুকিছু এখনো জানা যায় নি। সম্মোহিত, নিদ্রিত, বা হিস্টেরিয়াগ্রস্ত অবস্থায় বহু পুরনো স্মৃতির আবির্ভাব ঘটতে পারে যা অধ্যাপক বসু প্রথম রোগিনীর ক্ষেত্রে বলেছেন। স্বপ্নেও এই ধরনের ঘটনা ঘটে। একইভাবে কেউ যদি দীর্ঘ অনুশীলনের মাধ্যমে (যেমন ধ্যান, তপস্যা ইত্যাদি জাতীয় মনঃসংযোগের পদ্ধতি) নিজের মস্তিষ্কের ক্রিয়াকে বাইরের উত্তেজনা থেকে মুক্ত করে নিয়ে আত্মসম্মোহিত বা প্রায় নিদ্রিত অবস্থার সৃষ্টি করতে পারেন, তবে বহু আগেকার কোন স্মৃতি, যা অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা যায় না, সেগুলিকে উদ্ধার করা সম্ভব হতে পারে। আগেকার দিনের মুনিঋষিরা এই কাজই করতেন নির্জন জঙ্গলের ভেতর বা পাহাড়ের উপর বসে। এটিকেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ, দৈবী বা অলৌকিক ক্ষমতা ইত্যাদি বলে ধারণা হয়েছে। আসলে এটি প্রাণায়াম, যোগ ইত্যাদির মতনই একটি পদ্ধতি এবং এর মধ্যে অলৌকিকত্বের ব্যাপার কিছুই নেই—যা আছে তা নিজস্ব শারীরিক দক্ষতারই একটি প্রকাশ।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একাদশ পরিচ্ছেদ

সাম্প্রদায়িকতা—একটি তৈরী করা সমস্যা

ধর্ম, ভাষা, জাতীয়তা, বর্ণ, পেশা, সম্পদ ইত্যাদি অনুসারে পৃথিবীতে বিভিন্ন ভেদাভেদ তথা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রয়েছে এবং একই ধরনের সম্প্রদায়, বা ভাগের মধ্যেও উপবিভাগ রয়েছে। ভাষা, ধর্ম, জাতীয়তা বা বর্ণভেদ নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর তথা সম্প্রদায়ের মধ্যে মাঝে মাঝে এমনই অসুস্থ বিরোধ বাধে যে, মানুষ যে 'জন্তু' নয় ও পৃথিবীর সব মানুষই যে বিবর্তনের চূড়ান্ত পর্যায়ে একই গোত্রের প্রাণী (Homo sapien) তা যেন ভুলে যেতে হয়।

এই সব ভেদাভেদ কিন্তু কৃত্রিম—তৈরী করা। পৃথিবীতে বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর চেহারা, ভাষা, আচার-ব্যবহার, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদির বৈচিত্র্য এসেছে। এগুলি ঈশ্বর নির্দেশিত, চিরন্তন কোন ব্যাপার নয়। এগুলিকে অনুসরণ করার ফলে নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষ বংশপরম্পরায় তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বংশধরদের শেখায়। একটি শিশু যখন জন্মায় তখন সে কোন ভাষা শিখে বা কোন ধর্মমতে বিশ্বাস নিয়ে, সে কোন্‌জাতের বা কোন্ দেশের নাগরিক তা জেনে বা সে কোন্ পেশা গ্রহণ করবে তা ঠিক করে নিয়ে জন্মায় না। কিন্তু সে যতই বড় হতে থাকে, ততই তার মধ্যে তার বাবা-মা নিজেদের ধর্মবিশ্বাসকে চাপিয়ে দিতে থাকেন, বাবা-মা-প্রতিবেশীদের ভাষা অনুকরণ করে সে বিশেষ ভাষা অর্থাৎ ভাবপ্রকাশের উপায় শেখে, অমুক ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্য তার দেশ—এই ধরনের জাতীয়তাবোধ জন্ম নেয়, উচুঁজাত বা ধনী হলে তার মধ্যে নীচুজাত বা গরীবদের প্রতি উন্নাসিকতা ঢোকান হয়, সামাজিক প্রতিযোগিতায় উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্ম নেয় ইত্যাদি।

কোন হাসপাতালের প্রসূতিবিভাগে যদি একজন হিন্দু ও একজন মুসলিম রমণী পাশাপাশি দুটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন, এবং নার্সের অসাবধানতায় যদি দুটি বাচ্চা পাল্টাপাল্টি হয়ে যায়, তবে পরবর্তীকালে হিন্দু শিশুটি মুসলিম ঘরে মুসলিম হিসেবে ও মুসলিম শিশুটি হিন্দু ঘরে হিন্দু হিসেবে বড় হবে। অর্থাৎ হিন্দু হয়েও একজন কোরান পড়বে, উর্দু বা আরবী ভাষা শিখবে ও মুসলিম আচার-ব্যবহার আয়ত্ত করবে ; অন্যদিকে আরেকজন মুসলিম হলেও বেদ-উপনিষদকে একান্ত অনুসরণীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে করবে, ভাষাও হবে ঐরকম,—দুজন বিয়েও করবে প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী তরুণীকে ইত্যাদি। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার মত ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের শিকার যদি ওরা হয় তবে, হিন্দু বাবা-মায়ের সন্তানটি মুসলিম ধর্ম রক্ষার নাম করে মুসলিম বাবা-মায়ের সন্তান কিন্তু হিন্দু বলে পরিচিত, যুবকটিতে হত্যা করতে পারে বা উল্টোটি হতে পারে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে তাদের আলাদাভাবে চেনার অন্য কোন উপায় নেই (যদি বংশগত বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ না পায়— যা সাধারণতঃ ঘটে না)। এক্ষেত্রে বাস্তব পরিবেশই মুখ্য। এই পরিবেশই কৃত্রিমভাবে একজনকে বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলিম বা খ্রীষ্টান হিসেবে তৈরী করে, বাংলাভাষী-তামিলভাষী-হিন্দীভাষী ইত্যাদি হিসেবে পরিচিত করে, ভারতীয়-চীনা-ইংরেজ বা আমেরিকান হিসেবে গড়ে তোলে ইত্যাদি। অর্থাৎ ধর্ম, ভাষা, জাতীয়তা ইত্যাদি কৃত্রিমভাবে আরোপিত ব্যাপার মাত্র। এই ধরনের ভেদাভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা টিকিয়ে রাখা মানবজাতি: সামগ্রিক অদূরদর্শী চিন্তার পরিচায়ক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স্বার্থান্বেষী মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির ষড়যন্ত্রের পরিচয়। দেশের তীব্র সমস্যার সময়, শাসকশ্রেণী ব্যাপক মানুষের বিক্ষোভ থেকে বাঁচার জন্য নানা কৌশলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অন্য দেশের সঙ্গে যুদ্ধ ইত্যাদি বাধিয়ে দেয়। এই ধরনের শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব যতদিন থাকবে ততদিন নানা ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও থাকবে—সমস্ত ধরনের সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ দূর করার চেষ্টা না করে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য শুধুমাত্র দুঃখ প্রকাশ করা বা তার নিন্দা করা নিছক কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ।

বিভিন্ন ধরনের সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ দূর করা, সময় সাপেক্ষ হলেও অসম্ভব নয়, কারণ কোনটিই অনড় অচল চিরন্তন নয়।

ভাষা অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করার অন্যতম মাধ্যম মাত্র। বিভিন্ন পরিবেশের প্রভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। বাস্তব যোগাযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণ যেমন ঘটছে, তেমনি ইচ্ছা করলে যে কেউ যত খুশি ভাষা শিখতে পারে বা মাতৃভাষাসহ কোন ভাষা পরিত্যাগ করতে পারে। নিজের সুবিধার জন্য ও কিছু আবেগের কারণে সবাই সাধারণতঃ তার ছোটবেলায় শেখা মাতৃভাষাকে অনুসরণ করে। আবার এই সুবিধের জন্যই সে এই ভাষা ভুলে গিয়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত করতে পারে। মাতৃভাষার প্রতি যেমন, তেমনি অন্য ভাষার প্রতিও যুক্তিহীন, অহেতুক উন্নাসিকতা বা মোহ পোষণ করাটা ঠিক নয়। পাশাপাশি 'এসপ্যারেন্টোর' মত কোন আন্তর্জাতিক ভাষা গড়ে তোলাটার কথাও মোহমুক্তভাবে বিবেচনা করা যায়।

বিশেষ সামাজিক-ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ নানা তথাকথিত ধর্মমতের ও ধর্মীয় অনুশাসনের সৃষ্টি করেছে এবং অনুসরণ করেছে। এগুলি কোন ঈশ্বর বা পরমাত্মার মুখনিঃসৃত বাণী যেমন নয়, তেমনি চিরন্তন ও স্থায়ী কোন ব্যাপার নয়। টাকার লোভে, বিয়ের সুবিধার জন্য, আদর্শগত বা ব্যক্তিগত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাল লাগা ইত্যাদি নানা কারণে যে কেউ বাবা-মায়ের ধর্মমত পতিবর্তন করে অন্য ধর্ম অবলম্বন করতে পারে,—করছেও। সময়ের সঙ্গে নানা ধর্মমতের খুঁটিনাটি অনেক কিছু পাল্টাচ্ছে। একই ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ধর্মীয় খুঁটিনাটির অনেককিছু বিভিন্নভাবে অনুসরণ করে থাকেন।

ধর্ম ও ভাষা বিশেষ কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যাপার হিসেবে ছেড়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রচারও রাখা উচিত। কারোর ওপর কোন ভাষা বা ধর্মকে (তথা সংস্কৃতি ও জাতীয়তাকে) চাপিয়ে দেওয়া যেমন অন্যায়, তেমনি শাসনযন্ত্রের মাধ্যমে এগুলিকে কেন্দ্র করে সঙ্কীর্ণ চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়াও উচিত নয়। কেউ তার নিজের সুবিধে অনুযায়ী যে কোন ভাষাকে মাধ্যম করতে পারে; এইভাবে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে সে বিশেষ কোন ধর্মমত অনুসরণ করতে পারে; রাতারাতি ও জোর করে মানুষের মধ্য থেকে বহু হাজার বছরের এ বিশ্বাস—ভ্রান্ত হলেও—দূর করা সম্ভব নয়। তাই সঠিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা তুলে ধরার কাজ দীর্ঘদিন ধরে বহুজনকে করে যেতে হবে, যাতে জনগণ ভালমন্দ বিচার করার, গ্রহণবর্জন করার বিজ্ঞান-সম্মত চেতনা অর্জন করতে পারেন। পাশাপাশি নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস স্বাধীনভাবে অনুসরণ করার সুযোগও রাখতে হবে।

ধর্ম ও ভাষার মত জাতীয়তাও কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট। গোষ্ঠীপতির প্রয়োজনে, অথবা নির্দিষ্ট অঞ্চলের মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাষা ও সংস্কৃতিকে অনুসরণ করা কোন একটি গোষ্ঠীর সদস্যদের স্বার্থ ও সম্পত্তি রক্ষার প্রয়োজনে বিশেষ ভৌগোলিক সীমা নির্দিষ্ট হয়েছে। পৃথিবীর মাটিতে বিশেষ দেশের সীমানা হিসেবে চিরন্তন কোন চিহ্ন দেওয়া নেই। এই সীমা মানুষেরই তৈরী করা। পেশাগত, রাজনৈতিক বা অন্যান্য নানা প্রয়োজনে যে কেউ তার মূল জাতীয়তা তথা 'মাতৃভূমি' ছেড়ে অন্য দেশের নাগরিক হতে পারে। সাধারণতঃ শাসকশ্রেণীর প্রয়োজনেই বিশেষ জাতীয় পরিসীমা টিকিয়ে রাখা হয়। পাশাপাশি এটিও সত্যি যে, একটি নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে বসবাসকারী নাগরিকরা এই পরিমন্ডলে থাকাটাই সুবিধাজনক মনে করেন। তাই এই পরিবেশ থেকেও জোর করে তাদের আলাদা করা বা অন্য দেশের সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দেওয়া অমানবিক। তবু প্রকৃতপক্ষে, একটি গ্রাম, জেলা, রাজ্য বা রাষ্ট্র নয়, এই সমগ্র পৃথিবীই প্রতিটি মানুষের মাতৃভূমি বা 'দেশ', কারণ এই পৃথিবীতেই সমস্ত মানুষ শারীরিকভাবে ও এই শরীরের গুণাবলীর দিক দিয়ে মূলগতভাবে একই রকমের; পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের স্বার্থ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বর্তমান ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে, বিভিন্ন জাতিসত্তার সঠিক বিকাশ ও তাকে বৈজ্ঞানিক সমাজ চেতনার সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন এবং এই ভাবেই এই ধরনের জাতীয়তাবাদী ভেদাভেদগুলি এক সময় দূর হয়ে, মানবতাবাদী আন্তর্জাতিকতাবোধ গড়ে উঠতে পারে, যা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির নয়, ব্যাপক জনগণের স্বার্থরক্ষা করবে। তবে এই ধরনের ভেদাভেদ দূর হওয়ার প্রাধানতম শর্ত, অর্থনৈতিক আধিপত্য ও বৈষম্য দূর করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গায়ের রং-এর সাদা-কালো ভেদাভেদও তথাকথিত ঈশ্বরের অভিপ্রায় কিছু নয়। এটিও পরিবেশের ওপর নির্ভর করে। মেলানিন নামক রাসায়নিক পদার্থ চামড়ার কালো রঙের জন্য দায়ী। পৃথিবীর নিরক্ষরেখার কাছাকাছি উষ্ণ অঞ্চলে সূর্যালোকের বিশেষ প্রাচুর্য এই মেলানিন তৈরীতে সাহায্য করে— তাই সেখানকার মানুষের গায়ের রঙ শীতপ্রধান অঞ্চলের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কালো হয়। গায়ের রঙের কারণে কাউকে ছোট করা বা সম্মান করা নিতান্তই অমানবিক ও বালখিল্যসুলভ অজ্ঞতার লক্ষণ। সকলেই মানুষ এবং গায়ের রঙ তার নিজের তৈরী করা নয়—এটিই সত্যি। কেউ ইচ্ছে করলে তার বংশধরদের গায়ের রং পাল্টাতেও পারে। ভিন্ন জায়গায় বসবাস করে ও ভিন্ন গাত্রবর্ণের কাউকে বিয়ে করে এটি সম্ভব। বর্ণবিদ্বেষ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অবৈজ্ঞানিক ও সংকীর্ণ মানসিকতার প্রকাশ। এই মানবিকতা অর্থনৈতিক আধিপত্যবাদের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত।

পেশাগত বিভেদও চিরন্তন কিছু নয়। হিন্দুসমাজে আগে (অন্ততঃ ঋগ্‌বেদের আমলে) বর্ণাশ্রম ভাগ ছিল না।* পরে এধরনের ভেদাভেদের উদ্দেশ্য ছিল সমাজে একটি শৃঙ্খলা বজায় রাখা, কিন্তু তা স্বার্থপুষ্ট করেছে মূলতঃ উচ্চবর্ণের তথা উন্নত পেশার সুবিধাভোগী শ্রেণীর। বর্তমানে প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করা ও নিজের শক্তিকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞান অনেক উন্নত হয়েছে এবং হচ্ছে। তাই পেশাগত বিভেদকে চিরন্তন বলে গণ্য করাটাও সংকীর্ণতা। যেহেতু কারোর পূর্ব-পুরুষেরা জেলে, তাঁতী, কুমোর ইত্যাদির কাজ করতেন তাই কেউ এখন এসব কাজ না করলেও তাকে এইভাবে পরিচিত করাটা যুক্তিহীন। যে কেউই ইচ্ছে করলে তার পূর্বপুরুষের পেশাকে ছেড়ে সুবিধাজনক পেশা গ্রহণ করতে পারে। একইভাবে উঁচুজাত-নীচুজাত, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ইত্যাদি ভেদাভেদ যে ঘৃণ্য অমানবিক ব্যাপার তা সুস্থ মস্তিষ্ক যে কোন ব্যক্তিই অনুভব করেন। অথচ তথাকথিত উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরা এ সব ভেদাভেদ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্যই এখনো অনুসরণ করে ও তার ওপর জাতীয় ঐতিহ্য, ধর্ম ইত্যাদির রঙ চড়ায়। আর মুখে না বল্লেও প্রচ্ছন্নভাবে এগুলিকে প্রশ্রয়ও দেওয়া হয়। অস্পৃশ্যদের করুণা করা বা কিছু সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়—এগুলি তাদের সাময়িক কিছু সুবিধা দেয় নিঃসন্দেহে, কিন্তু সামাজিক ও আইনগত আমূল পরিবর্তন না ঘটিয়ে ও শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থা টিকিয়ে রেখে তাদের করুণা প্রদর্শন করার কাজ প্রকৃত অর্থে এই ধরনের সংকীর্ণ ভেদাভেদকেই টিকিয়ে রাখে এবং তাদের মধ্যে সুবিধাবাদী মানসিকতার সৃষ্টি করে। এছাড়া ব্রাহ্মণ সমাবেশ, হিন্দু সম্মেলন, মুসলিমদের রাজনৈতিক দল ইত্যাদি জাতীয় সাম্প্রদায়িকতাভিত্তিক সংগঠিত নিন্দার্হ প্রয়াস এই ধরনের ভেদাভেদকে স্থায়ী করে রাখার চেষ্টা করে।

---

* 'হিন্দু' কথাটি অনেকের মতে বিদেশীদের দেওয়া এবং 'সিন্ধুনদী' কথা থেকে এসেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন শিশু যখন জন্মায় তখন সে সঙ্গে কোন অর্থসম্পদ নিয়ে জন্মায় না। পরবর্তীকালে সমাজ ব্যবস্থার জন্যই একজন বিপুল অর্থসম্পদের মালিক হয়—আরেকজন দরিদ্র অবস্থায় জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণীবিভাজনের উপর ভিত্তি করে বর্তমানে যে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত, তার সুযোগ নিয়ে কিছু মানুষ শঠতা, বদমায়েসি ইত্যাদি ধরনের নানা কৌশল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রয়োগ করে ও বিপুল অর্থসম্পদের মালিক হয়ে ওঠে। এই ধরনের কাউকে অনেক সময় আপাতদৃষ্টিতে সৎ, ধর্মপ্রাণ ইত্যাদি মনে হলেও, প্রকৃত অর্থে ব্যাপক-সংখ্যক মানুষকে পরোক্ষ ও সূক্ষ্মভাবে প্রতারিত না করে তার পক্ষে অন্য অনেকের চেয়ে অধিকতর অর্থ উপার্জন করা সম্ভব নয়। এসব ক্ষেত্রে কারোর ব্যক্তিগত মেধা ও বুদ্ধি একটি নিরীহ ভূমিকা নেয় বলে মনে হয়, যেমন উদ্যোগ ও 'প্রতিভাবলে' একজন দরিদ্র অবস্থা থেকে ধনী ব্যবসায়ী হয়ে উঠল। প্রকৃতপক্ষে এইসব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি অসুস্থ সমাজব্যবস্থারই বিভিন্ন সুযোগ গ্রহণ করে। এ ছাড়া এই মেধা, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদিও মূলতঃ সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশ-নির্ভর—তথাকথিত কোন ঈশ্বরের দান বা পূর্বজন্মের কর্মফল নয়। উপযুক্ত পুষ্টি, পরিবেশ ইত্যাদি তাঁর বাহ্যিক শর্ত; অন্যদিকে বংশগতভাবে মস্তিষ্কের উন্নত গঠন অভ্যন্তরীণ শর্ত। বাহ্যিক শর্ত এই অভ্যন্তরীণ শর্তকে পরিপুষ্ট ও বিকশিত করে। এরই ফলে অশিক্ষিত, দরিদ্র পরিবারে উন্নত মেধার ছেলেমেয়েদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে ধনী পরিবারের চেয়ে কম (যদিও কিছু ব্যতিক্রম আছে যা বিশেষ শর্তাধীনে ঘটে) এবং এ ব্যাপারটি প্রায় সময়ই ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। বাহ্যিক শর্তের পরিবর্তন অর্থাৎ সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন এই অবস্থাকে গুণগতভাবে পরিবর্তিত করতে পারে।

উঁচুজাত-নীচুজাত ইত্যাদি ভাগের মত, ধনী-গরীব ছোটলোক-বড়লোক ভাগও মূল সামাজিক কারণ এড়িয়ে গিয়ে করা হয়ে থাকে। এই কারণে ধনীদের বা তথাকথিত ভদ্রলোকদের সম্মানসম্ভ্রম দেওয়া হয়। সমাজের প্রায় সব স্তরেই এটি করা হয়ে থাকে। ব্যাপারটি এমনই ভয়াবহ অবস্থায় টিকে আছে যে ছোটদের স্কুলেও এই সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ বজায় আছে। উঁচুজাত-নীচুজাত, হিন্দু-মুসলিম ইত্যাদি ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা স্কুলের বা স্কুলে আলাদা বসার ব্যবস্থা এখনো আছে। ধনী পরিবারের ছেলে-মেয়েরা গরীবদের তুলনায় অধিকাংশ শিক্ষকদের কাছ থেকে মর্যাদাও বেশী পায়। শহরের 'ইংলিশ মিডিয়াম' বা অভিজাত স্কুলগুলিতে প্রকৃতপক্ষে ধনী পরিবারের ছেলেমেয়েরাই যায় বা যেতে পারে—সমগ্র ব্যবস্থাটা এমনই। এর ফলেও ধারাবাহিকভাবে অসুস্থ প্রতিযোগিতা বজায় থাকে। এই অসুস্থতা এবং মূল সামাজিকব্যবস্থা টিকিয়ে রেখেই তথাকথিত প্রগতিবাদীরা আবার কাঠামোগত নানা ব্যাপার (যেমন মাতৃভাষা-বিদেশীভাষা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা স্কুল তৈরী, নানা ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি) নিয়ে বহুবিধ কর্মসূচী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও বিতর্কের অবতারণা করে এবং সাধারণ মানুষদের নিয়ে একদিকে যেমন গবেষণা চালায়, তেমনি মূল সমস্যা থেকে তাদের দৃষ্টিকে অন্যদিকে সরিয়েও রাখে।

একটি নবজাত শিশুর মস্তিষ্ক খালি মানিব্যাগের মত। ম্যানিব্যাগে যেমন পয়সা রাখা হবে প্রয়োজনে তেমন পয়সা বের করা যাবে। শিশুর মস্তিষ্কেও যেমন ধ্যান-ধারণা বিশ্বাস ও জ্ঞান ইত্যাদিকে ঢোকান হবে, পরবর্তী জীবনে নিজের কাজকর্মে সে তেমনিই সেগুলির প্রকাশ ঘটাবে। ম্যানিব্যাগে অচল পয়সা রাখলে কাজের সময় এই অচল পয়সাই বেরোবে। একইভাবে একটি শিশুর মনে এই অচল পয়সার মত নানা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণা ঢোকান হলে সেগুলিই সে তার কাজকর্মে প্রকাশ করবে। (অবশ্য শিশুর মস্তিষ্ক একটি মানিব্যাগের মত জড় বস্তু নয়। এর নিজস্ব যে গুণাবলী রয়েছে সেগুলি তার অর্জিত জ্ঞান ও বহিরাগত চিন্তাধারাগুলিকে প্রভাবিত করতে সক্ষম। তাই একই পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে অনেকে পরিবেশের পুরোপুরি শিকার হওয়াটা এড়াতে পারেন,—যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক চিন্তাসম্পন্ন হয়ে ওঠেন।) ভূত-প্রেত, দেবদেবী ভগবান, শয়তান-দেবদূত, মন্ত্র-পূজা, আশীর্বাদ-অভিশাপ, আত্মা-কর্মফল পুনর্জন্ম, জ্যোতিষবিদ্যা-হস্তরেখাবিদ্যা, ছোটলোক ভদ্রলোক উঁচুজাত-নীচুজাত, শুভ-অশুভ ইত্যাদি আরো বহু ক্ষতিকর ও মিথ্যা ধারণা তথা কুসংস্কারগুলি বড়রাই ছোটদের মধ্যে ঢোকায় অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে আরোপিত হয়। সমাজব্যবস্থা এর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

ডঃ কোভুরের মতে অসবর্ণ বিবাহের দ্বারা ২৫ কি ৫০ বছরের মধ্যে জাতীয় সংহতি সম্পন্ন করা সম্ভব। (অর্থাৎ যেমন, তথাকথিত ব্রাহ্মণ বা মুসলিম ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে তথাকথিত অব্রাহ্মণ বা হিন্দু মেয়ে বা ছেলের বিয়ে ইত্যাদি।*) ডঃ কোভুর মন্তব্য করেছেন, "প্রচলিত সামাজিক প্রথাগুলি থেকে কোন ধরনের বিচ্যুতি দেশের রক্ষণশীল, সংস্কারাবদ্ধ ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রবল বাধা পাবে। অত্যন্ত জরুরী এই ধরনের প্রগতিশীল পদক্ষেপ অবশ্যম্ভাবীরূপেই সেই সংকীর্ণ চিন্তাভাবনার লোকদের বিরোধিতার সম্মুখীন হবে। কিন্তু আশার কথা ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেকার বিবাহকে অন্ততঃ কয়েকজন ব্যক্তিও ভবিষ্যৎ জাতীয় সংহতির সহায়ক হিসেবে গণ্য করবেন। কোন দেশের প্রগতি ব্যাপক সংখ্যক অজ্ঞ মানুষের চেয়ে

* ঐ ব্যাপারটি ব্যাপকভাবে চালু না হলেও রামায়ণ-মহাভারত-বেদের যুগ থেকেই হিন্দু বা অন্যান্য অহিন্দুদের মধ্যে এ ধরনের বিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে হয়েছে। বাংলাদেশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ সমাজসংস্কারকদের উদ্যোগে বিধবা বিবাহের মত বলিষ্ঠ উদ্যোগ নেওয়ার কিছুদিন পরেই কেশবচন্দ্র সেন প্রথম অসবর্ণ বিধবা বিবাহের মত অত্যন্ত দুরূহ ও বলিষ্ঠ কাজটি সম্পন্ন করান বাংলা ১২৭১ সালের ১৯শে শ্রাবণ। কিন্তু এখনো এটি ব্যাপক সামাজিক স্বীকৃতি পায়নি—জড়বদ্ধ রক্ষণশীলতার শক্তিশালী প্রভাবের দিকটি এ থেকে কিছুটা বোঝা যাবে। এবং এটিও বোঝা যাবে যে, এ ধরনের কিছু কাজকর্ম বৈপ্লবিক উদাহরণ হিসাবে কাজ করলেও সমাজ কাঠামোর তথা ব্যাপক মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন না ঘটলে সেগুলি স্থায়ী সামাজিক প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের চিন্তার উপর বেশি নির্ভর করে। আমাদের সবার প্রথম ও শেষ পরিচয় হোক আমরা মানুষ (Homo sapien)।”

[ভিন্নতর সম্প্রদায়ের নরনারীর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিঃসন্দেহে একটি প্রগতিশীল পদক্ষেপ—কিন্তু শুধু এটিই ‘জাতীয় সংহতি’কে চূড়ান্ত দৃঢ়তা এনে দেবে না। ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক তথা সামাজিক, অর্থনৈতিক সব ধরনের বিভেদ ও বৈষম্যকে দূর না করতে পারলে সঠিক অর্থে সংহতিসাধন করা সম্ভব নয়। কারণ তথাকথিত ধর্মীয় চেতনা সামাজিক-প্রাকৃতিক প্রতিকূল শক্তির অন্যতম প্রতিফলন এবং মানুষ যতদিন না এই প্রতিকূল সামাজিক শক্তিকে দূর করতে ও প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তি সম্পর্কে অহেতুক ভীতি দূর না করতে পারবে ততদিন তার চেতনায় অতীন্দ্রিয়-অলৌকিক শক্তির প্রতি ভীতি ও নির্ভরতা এবং তাকে কেন্দ্র করে তথাকথিত ধর্ম চিন্তা ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ টিকে থাকবে। অন্যদিকে শুধু ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাই বিরোধের একমাত্র কারণ নয়— আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদাগত বৈষম্য ইত্যাদিও মানবজাতিতে ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে বাধা দেয়। এই বৈষম্য দূর না করলে, শ্রেণীর উচ্ছেদ না ঘটালে, মানবজাতির প্রকৃত সংহতি, প্রগতি ও অস্তিত্বের স্থায়িত্ব অর্জন করা যাবে না। এর জন্য ভিন্নতর ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নরনারীর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের মত কিছু কিছু প্রগতিশীল পদক্ষেপ সহ আরো বহু বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ নিতে হবে এবং এই কাজে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত শুধু নয়, বিপুল সংখ্যক সচেতন জনগণের যৌথ, আন্দোলনধর্মী প্রচেষ্টা দরকার—যা সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারে এবং সমস্ত ধরনের ভেদাভেদ দূর করে পৃথিবীর সব মানুষকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করবে।

অসম অর্থনৈতিক বিকাশ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কিভাবে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি করে সে সম্পর্কে Economic and Political Weekly পত্রিকায় (8.5.82) Victor S. D. Souza তাঁর Economy, Caste, Religion and Population Distribution : An Analysis of Communal Tension in Punjab শিরোনামার প্রবন্ধে একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য-নির্ভর আলোচনা করেছেন। শুধু পাঞ্জাবে নয়, ভারত বা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষেত্রেই ব্যাপারটি সত্যি।

প্রবন্ধটিতে মূলতঃ শিখ ও হিন্দুদের পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। দেখা গেছে সমগ্র পাঞ্জাবে হিন্দুর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৭.৫৪ ভাগ ও শিখেরা ৬০.২১ ভাগ। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা শতকরা ২৮.৫৬, শিখধর্মাবলম্বীরা শতকরা ৬৯.৩৭ এবং শহরাঞ্চলে যথাক্রমে ৬৬.৩৯ ও ৩০.৭৯। শহরাঞ্চল মূলতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থান ও গ্রামাঞ্চল কৃষির।

তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণের পর লেখক মন্তব্য করেছেন, “সাম্প্রতিককালে (পাঞ্জাবে) অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে দু’টি দিক বিপুলভাবে বিকশিত হয়েছে, সে দু’টি হল, কৃষি ও ব্যবসা— হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যাদের আধিপত্য রয়েছে তারা মূলতঃ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবসায় ও শিখদের মধ্যেকার ব্যক্তিরা কৃষিতে নিযুক্ত। শিখদের মধ্যে যারা ব্যবসায় নিযুক্ত তারা হিন্দুদের তুলনায় নিম্নতর মাত্রায় এ কাজ করে। অপরদিকে কৃষি ও ব্যবসা পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। কৃষির আধুনিকীকরণের ফলে এই সংযোগ দৃঢ়তর হয়েছে— এর ফলে গ্রামাঞ্চলের কৃষিজীবীদের লেনদেন মূলতঃ ঘটে শহরাঞ্চলের ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে। এই অবস্থার ফলে, দু'টি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রধান জাতগুলোর অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত ঘটে।...প্রকৃতপক্ষে, পাঞ্জাবের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধনী দরিদ্রের মধ্যেকার ফারাক ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। তবুও পাঞ্জাবের রাজনীতিতে শ্রেণীগত প্রভাবের চেয়ে ধর্মীয় প্রভাব প্রবল। এর কারণ রাজ্যের অর্থনীতির দু'টি প্রধান অংশে (কৃষি ও ব্যবসায়) দুই ভিন্নধর্মাবলম্বীরা (শিখ ও হিন্দু) আধিপত্য বিস্তার করেছে। এই দুই ধর্মাবলম্বীরা তাদের ধর্মীয় সংহতি রক্ষা করার নামে নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের ধনীরা নিজ সম্প্রদায়ের দরিদ্রদের দাবার ঘুঁটির মত ব্যবহার করে। এইভাবে পাঞ্জাবে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি শ্রেণী সংগ্রামকে ভোঁতা করছে। একটি অন্যায় সামাজিক গঠনকে না পরিবর্তিত করে অর্থনৈতিক উন্নতি এটিকে (সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে) মদত দিচ্ছে।..." পাঞ্জাবের সাম্প্রতিক হিংস্র ঘটনাবলীকে সতের বছর আগেকার এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বিচার করা যেতে পারে।}

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কুসংস্কার—প্রগতির অন্যতম অন্তরায়

১৯৬১ সালে ইংলণ্ডের সারে-তে World Union of Free Thinkers-এর ত্রিবার্ষিক সম্মেলন হয়েছিল। সিংহল র‍্যাশন্যালিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে ডঃ কোভুর এখানে আমন্ত্রিত হন। অন্যতম বক্তা ছিলেন গ্রেট ব্রিটেনের লোকসভার সদস্য, লেবার পার্টির লর্ড ফেনার ব্রকওয়ে। ইনি তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, প্রাচ্যের তথাকথিত উন্নতিশীল দেশগুলির "আধ্যাত্মিক চেতনা সম্পন্ন" জনগণের জন্য পাশ্চাত্যের "বস্তুতান্ত্রিক" ধনীদেশগুলির সাহায্য দেওয়া বন্ধ করা উচিত। তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে তিনি বলেন যে, প্রাচ্যের লোকেরা পরিশ্রম করে না, পুজো আচ্চা আর ঈশ্বরের আরাধনা করে অলসভাবে দিন কাটায় এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনকে উন্নত করার জন্য ঈশ্বর তথা অলৌকিক শক্তির উপর বেশী নির্ভর করে। ঈশ্বরই যদি একাজ করতে সক্ষম হবে, তবে কেন আর মিছামিছি পাশ্চাত্যের লোকেদের পরিশ্রমের ফসল প্রাচ্যের গরীব মানুষগুলোকে দেওয়া হবে ?

ব্যাপারটি একদিক থেকে সত্য। বিশেষতঃ প্রাচ্যের দেশগুলিতে ঈশ্বর তথা অলৌকিক শক্তির উপর নির্ভরতা যথেষ্ট বেশী। এটিকে প্রাচ্যের মহান ঐতিহ্য, প্রাচীন সংস্কৃতি ও দর্শন ইত্যাদি গালভরা নাম দেওয়া হয় ও অনুসরণ করা হয়। কিন্তু আবার ঐসব দেশেই পরস্পর-বিরোধী বিজ্ঞান-নির্ভর কাজও পাশাপাশি করা হয়। যেমন, ভারত শ্রীলংকার মত দেশগুলিতে অনাবৃষ্টি হলেই ব্যাপকভাবে বরুণ দেবতাসহ নানা দেব-দেবীর আরাধনা, যজ্ঞ ইত্যাদি শুরু হয়ে যায়। আদৌ এসবে কোন কাজ হবে কিনা সে চিন্তা মাথায় আসে না—নির্বোধের মত ব্যাপক সংখ্যক অজ্ঞ ব্যক্তি গম্ভীর ও কাতরভাবে প্রার্থনাদি জানায়। তথাকথিত উচ্চ-শিক্ষিতেরা, যেমন রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষাবিদ ইত্যাদিরাও এই ধরনের অর্থহীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনুষ্ঠানকে প্রশ্রয় দেন বা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেন। আবার অন্যদিকে কৃত্রিম বৃষ্টির জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণাও চালান হয়। যে সরকার শিক্ষাব্যবস্থা, প্রচারমাধ্যম, সরকারী কর্মসূচী, সদস্যদের দৈনন্দিন কাজকর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে নানা ধর্মসম্প্রদায় ও কুসংস্কাচ্ছন্ন মন্ত্রপূজা-যজ্ঞ, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বিরোধ, অবতার ইত্যাদিকে সমর্থন করছে—সেই সরকারই ধর্মীয় দাঙ্গা ইত্যাদির জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে, এবং শুধুমাত্র ঈশ্বরের ওপর নির্ভর না করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, অধিক শস্য ফলানো ইত্যাদির জন্য বাস্তব, বৈজ্ঞানিক কর্মসূচীও নেয়। ফুটবল, খেলার আগে গোলপোস্টের পুজো করার মত হাস্যকর কাজ যেমন করা হয়, তেমনি খেলার মান উন্নত করার জন্য খেলোয়াড়দের বৈজ্ঞানিকভাবে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। ঐশ্বরিক বা অলৌকিক শক্তির সাহায্যে যে উদ্দেশ্য সফল হবে না তা উপলব্ধি করেও নিছকই অন্ধবিশ্বাসের জন্য এবং মূলগতভাবে সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে কুসংস্কারকে আঁকড়ে রাখা হয়।

কিন্তু এই ধরনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস সমাজ প্রগতির পক্ষে ক্ষতিকর। প্রথমতঃ কুসংস্কারগুলির পেছনে যে শ্রম, অর্থ ও উদ্যোগ ব্যয় হয় (যেমন, পূজা-আচ্চা, শ্রাদ্ধ-শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, নামাজপড়া বা প্রার্থনা করা, কোরান পাঠ ইত্যাদি) তা সামাজিক প্রগতি ও উৎপাদনের পেছনে ব্যয় করলে স্বাভাবিকভাবেই সমগ্র মানবসমাজই উপকৃত হবে। তা না করে সব মিলিয়ে বিপুল পরিমাণ শক্তি অর্থহীন, উৎপাদনহীন কাজে নষ্ট হচ্ছে। অন্ধ-বিশ্বাসীকে কিছু মানসিক সাহস দেওয়া ছাড়া এই ধরনের কুসংস্কারের অন্য কোন বাস্তব ভূমিকা নেই। একইভাবে প্রাচীন উৎকৃষ্ট শিল্পের নিদর্শন হিসেবে কয়েকটি ছাড়া, পৃথিবীর সমস্ত মন্দির-মসজিদ-গীর্জা-প্যাগোডা ইত্যাদিতে যদি গৃহহীনদের থাকার ব্যবস্থা করা হয় বা অন্যকাজে লাগানো হয়, তবে তা গৃহসমস্যার আংশিক হলেও কিছুটা সমাধান করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, অলৌকিক বা ঐশ্বরিক শক্তিতে বিশ্বাস ও নির্ভরতা, বিপুল সংখ্যক মানুষকে উদ্যোগহীন, নিষ্ক্রিয় করে তোলে। সবই 'তাঁর ইচ্ছা' বা 'যাই করো না কেন, সবই পূর্ব-জন্মের কর্মফল' ইত্যাদি ধরনের হাজারো আগডুম-বাগডুম বিশ্বাস ব্যাপক মানুষকে তার জীবনকে উন্নততর করার সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে এবং দৈনন্দিন জীবনের সামাজিক নানা সমস্যার সমাধানের চাবিকাঠি যে জনগণেরই হাতে, সেই বোধটিকে আন্তরিকভাবে অনুধাবন করতে দেয় না। মনে হয়, এ-সবই ঈশ্বরসৃষ্ট। দারিদ্র্য, বৈষম্য, অস্বাস্থ্য, অকাল মৃত্যু ইত্যাদি সহ বন্যা, ঝড় বা ভূমিকম্পের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলি— এই সব কিছুকেই যে মানুষ সামাল দিতে সক্ষম তা বোঝা মুশকিল হয়। দারিদ্র্যই মানুষকে মহান করে তোলে, বা ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত কখনো সামান্য অর্থের জন্য লালায়িত হয় না* ইত্যাদি নানা ধরনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন

---

* যেমন বাঁকা ও রাকার গল্প। নারায়ণের এই দুই পরম ভক্ত অতি দরিদ্র অবস্থায় দিন কাটাতেন। নারদ ভগবানকে অনুরোধ করে বল্ল, ওঁরা এতবড় ভক্ত, কিন্তু ওঁদের কেন সুখে রাখা হয় না। নারায়ণ নারদকে কিছু স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বল্ল, বাঁকা-রাকার পথে ছড়িয়ে দিতে। কিন্তু বাঁকা-রাকা ওগুলি দেখেও ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করলেন। তাঁরা বল্লেন যে, এ কোন শয়তানের কাজ, অর্থ দিয়ে তাঁদের নারায়ণের একাগ্র আরাধনা থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করছে। পরে তাঁরা আরো একাগ্রভাবে অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটিয়ে নারায়ণ সেবা করতে লাগলেন। ভক্তের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশিত হল। বহু ধর্মে এই ধরনের অজস্র গল্প রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাস বিভিন্ন ধর্মপুস্তকের মাধ্যমে বহু যুগ ধরে জনগণের মধ্যে দৃঢ়মূল করে দেওয়া হয়। সাধারণ মানুষ তার দারিদ্র্যকে 'আশীর্বাদ' বা ' ভবিতব্য' বলে ধরে নিয়ে ঈশ্বরের আরাধনায় সময় কাটানোর মধ্যে শান্তি খোঁজা ও দুঃখ ভুলে থাকার চেষ্টা করে, অন্যদিকে রাজা পুরোহিত বা শাসকশ্রেণী দেবতার প্রতিভূ হিসেবে, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ শোষণের ফলে পাওয়া বিপুল সম্পদের মধ্যে ভোগবিলাসিতায় সময় কাটায়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলিও ঐশ্বরিক কোন ব্যাপার নয়—নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটে থাকে। এগুলি অনুধাবন করে আগে থেকে সতর্কতা নেওয়া, স্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থা, উপযুক্ত ত্রাণ ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে বাঁচান যায়। কিন্তু সরকার বা শাসকশ্রেণী ব্যর্থ হলে তাকে "ভগবানের মার" বলে চালিয়ে দেয়। ব্যাপক মানুষের মধ্যে ভগবান সম্পর্কিত কুসংস্কারের ফলে তারাও এ ধরনের ধোঁকার জন্য খুব একটা বিক্ষুব্ধ হয় না। ভ্রান্ত ও অবৈজ্ঞানিক মানসিকতা জনগণের হতাশা ও ক্ষোভকে নিষ্ক্রিয় ও বিপথগামী করে দিয়ে শাসক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করে। প্রাচীন রাজা পুরোহিতের প্রাধান্যের সময় থেকে এখনো একই ধারাবাহিকতা বজায় আছে—বিশেষতঃ অনুন্নত দেশগুতি। ফলতঃ এই জীবনের জন্য নয়, পরজন্মের জন্য বা পরলোকের উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করার প্রবণতা গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে নিষ্ক্রিয়তা, শাসক-শ্রেণীর চরিত্র ও শোষণ সম্পর্কে অসচেতনতা, নিজেদের সমস্যাবলীর স্থায়ী সমাধানের ক্ষেত্রে সঠিক দিশা না খোঁজার মানসিকতা ইত্যাদি জন্ম নেয়। ভারতবর্ষের মত দেশগুলির সাম্প্রতিক অনুন্নত অবস্থার অন্যতম কারণ হিসেবে এই ধরনের দীর্ঘস্থায়ী কুসংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক মানসিকতা একটি বড় ভূমিকা পালন করে।

তৃতীয়তঃ, এই ধরনের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতির পাশাপাশি নানা ধরনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস সমাজের মধ্যে নানা ধরনের ক্ষতিকর প্রবণতার সৃষ্টি করে। ঠাকুর পুজোর নাম করে চাঁদার জুলুম ও খুনোখুনি, ডাইনি সন্দেহে কোন মহিলাকে পিটিয়ে মারা,

---

ভক্ত এত কষ্ট করলেও নারায়ণ কিন্তু বৈকুণ্ঠে অঢেল সম্পদ, স্ফূর্তি, নাচগানের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। নারায়ণের পরিবর্তে রাজা বা পুরোহিত বা শাসকশ্রেণীকে এবং বাঁকা-রাকার পরিবর্তে হত দরিদ্র জনগণকে ধরলে এ ধরনের গল্পকথার হীন উদ্দেশ্যটি বোঝা যাবে এবং প্রকৃতপক্ষে এই উদ্দেশ্যেই এ ধরনের গল্পের সৃষ্টি। কিন্তু তাই বলে এই ধরনের সমস্ত লোকগাথাই সমাজের ও সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরোধী নয়। অনেকগুলিই লোকশিক্ষার মাধ্যমে নৈতিকতা বা মানবিকতার আদর্শকে তুলে ধরে। সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তাঁদের সচেতন করা ও নৈতিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়। যেমন সাক্ষীগোপালের গল্প। একজনকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রক্ষা না করা যে অমানবিক এবং এর জন্য অপেক্ষাকৃত গরীব ও নিম্নবর্ণের যুবকের সঙ্গেও কন্যার বিবাহ দেওয়া যে ন্যায় কাজ তা বোঝানর জন্য এ গল্পের সৃষ্টি—যদিও সঙ্গে সঙ্গে সরল বিশ্বাসী মানুষের আস্থা অর্জনের জন্য গোপালঠাকুর হেঁটে হেঁটে আসছে এবং ঘটনাচক্রে পাথর হয়ে গেল—এ ধরনের উদ্ভট ব্যাপারও মিশেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূতের ভর ভেবে অসুস্থ ব্যক্তির উপর শারীরিক অত্যাচার চালান* মানুষের সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাদের প্রতারিত করে অবতার ব্যবসা, বন্ধ্যা নারীকে সন্তান পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ঠাকুরের 'থানে' ধর্ষণ করা, তথাকথিত অস্পৃশ্যরা ছায়া মাড়ালে বা জল-জিনিসপত্র ছুঁয়ে ফেললে তাঁদের ওপর অত্যাচার করা, হরিজনদের পুড়িয়ে মারা, ইত্যাদি হাজারো অসুস্থ ব্যাপার দুষ্ট ক্ষতের মত সমাজের বুকে টিকে আছে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন নানা বিশ্বাসের কারণেই। এইগুলিও বিপুল শক্তি, সম্পদ ও উদ্যোগকে নষ্ট করছে—সর্বনাশ করছে অসংখ্য মানুষের।

এইভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কুসংস্কার বা ক্ষতিকর ও মিথ্যা ধারণাগুলি সমগ্র সমাজের বিশেষতঃ নিপীড়িত জনগণের সর্বনাশ করলেও এসবের উপর এই দরিদ্র নিপীড়িত মানুষই বেশী নির্ভর করেন। তার কারণ সামাজিক ও প্রাকৃতিক প্রতিকূল শক্তির কাছে এঁরাই বেশী অসহায়। তাই সর্বশক্তিমান কোন অলৌকিক শক্তির কাছে নালিশ জানিয়ে সাহস পাওয়ার মানসিকতা জন্ম নেয়। সমাজে অত্যাচারী কেউ যখন অন্যায়ভাবে প্রতারিত করে, তখন নিজেরা তাকে শাস্তি দিতে না পেরে, তাকে ভগবান ঠিক শাস্তি দেবেন বা পরলোকে সে শাস্তি পাবে ও নরক ভোগ করবে—এই মিথ্যা স্তোকবাক্যে সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করে। দারিদ্র্য, অপুষ্টি, সামাজিক বৈষম্য ইত্যাদির ফলে অকালমৃত্যু বা পারিবারিক দুর্দশাকে পূর্ব-জন্মের কর্মফল বা ভগবানের ইচ্ছা (যেমন, আয়ু ফুরিয়ে গেছে তাই ভগবান কোলে টেনে নিলেন ইত্যাদি)—এই ধরনের ধারণা করে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা চলে। তাই অসম্পূর্ণ জ্ঞান, অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও দুর্দশার সঙ্গে কুসংস্কার হাতে হাত মিলিয়ে টিকে থাকে।

সমস্যাবলীর স্বরূপ জানা ও তাকে দূর করার উপায় খোঁজা থেকে এই সব ভ্রান্তবিশ্বাস দূরে রাখে ঠিকই—কিন্তু অসহায় সান্ত্বনা দেয় বলে কুসংস্কারগুলি টিকে থাকে। অন্যদিকে বিত্তশালীদের মধ্যেও কিন্তু কুসংস্কারের প্রভাব কম নয়। তারও কারণ প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রতিকূল শক্তির প্রভাব। এই সমাজব্যবস্থায় অর্জিত সম্পদ ও স্বাচ্ছন্দ্যের স্থায়িত্ব নেই, সবসময়েই একটি অনিশ্চয়তা ও দোদুল্যমানতা কাজ করে। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা পুঁজিপতিদের পুঁজির স্থায়িত্ব ও ক্রমবর্ধমান অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করে না, বরং উল্টো কাজই করে। তাই একইভাবে এদের মধ্যেও একটি অতিপ্রাকৃতিক অলৌকিক শক্তির উপর নির্ভরতা বজায় থাকে। আধুনিক

* হিস্টিরিয়া বা কোন মানসিক রোগের রোগী বা রোগিণীকে ভূতের ভর হিসেবে ভাবা হয় এবং তার জন্য তাকে ঝাঁপাপেটা করা, গরম লোহা দিয়ে ছেঁকা দেওয়া, গায়ে পেরেক ফোটান ইত্যাদি শারীরিক অত্যাচার করা হয়। এই অমানুষিক পদ্ধতি কোন কোন সময় shock therapy -র মত কাজ করে ও বিরল ক্ষেত্রে রোগের উপশমও ঘটায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে shock therapy (যেমন ECT) প্রয়োগ করাই বাঞ্ছনীয়। এবং ঝাঁটাপেটা ইত্যাদি লাভের চেয়ে ক্ষতিই করে অনেক অনেক বেশী। (পাশাপাশি এটিও মনে রাখা দরকার shock therapy, যেমন, Electro Convulsive Therapy বা ECT, একটি অত্যন্ত ক্ষতিকর চিকিৎসা পদ্ধতি।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত গরীব চাষীর বৌ তার ছেলের অসুখ হলে, যে মানসিকতায় শীতলা-মায়ের থানে ঢেলা বাঁধে, সেই একই মানসিকতায় সর্বাধুনিক চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া কোটিপতি একই সঙ্গে তার গুরুর কাছে বা দেবতার কাছে বহু অর্থব্যয়ে প্রণামী বা পুজোও দেয়। বেকার যুবক চাকরির আশায় কালীমায়ের পুজো দেয়, তেমনি বিত্তশালী ব্যবসায়ী শেয়ারবাজার পড়ে গেলে গুরু বা জ্যোতিষীর কাছে ছোটে কিংবা সম্পদ ও পেশার দিক থেকে নিশ্চিন্ত বিশ্বনাথ ক্রিকেট খেলায় আরো সুনামের আশায় ও অন্ধ বিশ্বাসে সাঁইবাবার পাদবন্দনা করেন। বিজ্ঞানের অধ্যাপক মন্দিরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কপালে হাত ছোঁয়ান, লক্ষপতি ব্যবসায়ী গণেশ পুজো করেন ও লক্ষ টাকা ব্যয়ে মন্দির বানান। ব্যাপারটি এমনই সর্বব্যাপী এবং অর্থনীতি, সমাজনীতি, জাতীয় সংস্কৃতি ইত্যাদি সবকিছুর সঙ্গে এমনই জটিল ও সংপৃক্তভাবে যুক্ত যে, দীর্ঘস্থায়ী ও সুদীর্ঘ আলোচনা ছাড়া কুসংস্কারের স্বরূপ জানা ও প্রভাব দূর করা সম্ভব নয়। তাই যান্ত্রিকভাবে কুসংস্কারের শুধু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়াটা নেহাতই প্রাথমিক কাজ—তাকে সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা উচিত, একটির গুণগত আমূল পরিবর্তন অন্যটির পরিবর্তন ছাড়া সম্ভব নয়।

ডঃ কোভুর ফেনার ব্রকওয়েয় বক্তব্য সমর্থন ক'রে দারিদ্র্যের জন্য প্রাচ্যের অনুন্নত দেশগুলির কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যাপক মানুষকেই দোষী করেছেন। এটিও একপেশে চিন্তা। আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার মত পাশ্চাত্যের দরিদ্র দেশগুলির নিপীড়িত জনগণের মধ্যে কুসংস্কার রয়েছে বিপুল পরিমাণে এবং পাশ্চাত্যের ধনীদেশ-গুলির তথাকথিত অনেক শিক্ষিত ও ধনী মানুষেরাও এর শিকার। এর কারণ আগেই বলা হয়েছে। ভারতবর্ষ সহ প্রাচ্যের প্রাচীন সভ্যতা অতীতে যে ঐতিহ্যময় দর্শনের জন্ম দিয়েছে, সেই যুগের সীমাবদ্ধ জ্ঞান, ঐতিহাসিক পরিস্থিতি ও প্রভাবে সেই দর্শন একটি কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে প্রাচীন চিন্তাগুলি ভ্রান্ত হলেও বহু ক্ষেত্রেই যুক্তি ও বিজ্ঞানের স্থানও ছিল। বর্তমানে আমাদের উচিত, প্রাচীন ঐতিহ্য ও জ্ঞানকে কর্ষিত করে—বর্তমান জ্ঞানের আলোয় সেগুলির উৎকর্ষ সাধন করা এবং সেগুলির সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অবৈজ্ঞানিক দিকগুলিকে দ্বিধাহীনভাবে বিসর্জন দেওয়া। মানুষের সমাজ ও সভ্যতা তথা পৃথিবী ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তুই পরিবর্তনশীল। একইভাবে এসবের প্রতিফলনকারী দার্শনিক চিন্তাগুলিও পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন মানবসভ্যতার প্রয়োজনেই। পূর্বপুরুষদের প্রতি অন্ধ শ্রদ্ধায় তাঁদের মত গুহায় থাকা, অর্ধসিদ্ধ মাংস খাওয়া বা অর্ধোলঙ্গ থাকাকে যেমন কোন সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তি উচিত কাজ মনে করেন না, তেমনি জাতীয় ঐতিহ্য, প্রাচীন দর্শন ও সভ্যতার প্রতি অন্ধ মোহে, অপ্রাসঙ্গিক, অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর হলেও সেগুলিকে টিকিয়ে রাখা সুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ নয়। অতীতের জ্ঞানের গর্ভেই বর্তমান জ্ঞানের জন্ম। অতীতের সঠিক দিকগুলি নিয়ে ও ভ্রান্ত ধারণাকে বিসর্জন দিয়ে মানবিক ও বৈজ্ঞানিক দর্শনই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবজাতিকে প্রগতি এনে দেবে—এই দর্শনে যুক্তিবোধহীনতা ও কুসংস্কারের কোন স্থান নেই।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও দৈনন্দিন জীবন-যাপন প্রণালীর মধ্য দিয়ে মানুষ খুঁটিনাটি হাজারো আচার-আচরণ তথা সংস্কার ও সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে ও অনুসরণ করেছে। এর সবগুলিই যুক্তিহীন নয় যেমন শ্মশান থেকে ফিরলে নিমপাতা খাওয়ার সংস্কার। শ্মশানে নানা রোগে মারা যাওয়া মৃতদেহের সমাবেশের কারণে রোগজীবাণু বেশী থাকতে পারে। বিশ্বাস, নিম রোগজীবাণু ধ্বংস করতে পারে, তাই নিমপাতা খেলে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নত করা যায়। একইভাবে পায়খানায় কাপড় পাল্টে যাওয়ার সংস্কারের পেছনেও যুক্তি রয়েছে। কিছু কিছু আবার আগে হয়তো যুক্তিযুক্ত ছিল কিন্তু এখন তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। যেমন প্রাচীন ভারতে গরু অর্থনৈতিকভাবে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী ছিল—কি কৃষিকাজে, কি খাদ্য সরবরাহে। তাই তার সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনে গরুকে দেবতার আসনে বসান হল—তার হত্যা ও মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ হল (যদিও আগে গোমাংস আর্যদের একটি উত্তম খাদ্য ছিল—অতিথি এলে গোমাংসের ব্যবস্থা করা হত, তাই অতিথির অপর নাম গোঘ্ন)। কিন্তু গরু একটি জন্তুই ; অস্তিত্বহীন দেবতার সঙ্গে তুলনা করাটা আদিম অনেক বিশ্বাসের মত হাস্যকর। আর বর্তমানে কৃষিকাজের উন্নততর ব্যবস্থা, উন্নতজাতের গোরুর সংখ্যা বৃদ্ধি করার উপায়, কৃত্রিম দুধ তৈরী করা ইত্যাদি জানার ফলে গোরুকে দেবতার আসনে বসিয়ে সংরক্ষণ করার আর প্রয়োজন নেই। মানুষের বাস্তব প্রয়োজনেই এই ধরনের প্রাণীর সংরক্ষণ বা হত্যার ব্যবস্থা করা উচিত। গোমাংস এখন তথাকথিত বহু 'হিন্দু'ই নির্দ্বিধায় খান, যদিও বহুদিনের সংস্কারের ফলে তা সাধারণ সামাজিক স্বীকৃতি এখনো পায়নি। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেও সংস্কার বিভিন্ন রকম। হিন্দুদের খাওয়ার পদ্ধতি মুসলমানদের থেকে আলাদা, ইত্যাদি।

এই ধরনের অজস্র সংস্কারের বহু কিছুই একটি বিশেষ গোষ্ঠীর, বা সামগ্রিকভাবে মানবজাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের জন্য অপ্রয়োজনীয়, কার্যকরী ভূমিকাহীন এবং কখনো কখনো ক্ষতিকর হয়ে উঠেছে। সাধারণভাবে এগুলিকেই কুসংস্কার বলা যায়।

কুসংস্কার সৃষ্টির ও টিকে থাকার পেছনে অসম্পূর্ণ জ্ঞান ও সমাজব্যবস্থা দায়ী এবং কুসংস্কার সমাজ প্রগতির পক্ষে বাধাস্বরূপ ঠিকই—কিন্তু শুধু কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাসগুলিই প্রগতির একমাত্র বাধা নয়। সামাজিক বৈষম্য ও সমাজ ব্যবস্থা তথা সামন্ত্রতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রভাব ও শোষণ প্রধানতম কারণ ; এরা নিজেদের স্বার্থে জনগণকে সমাজ সচেতন হতে বাধা দেয়—এর অন্যতম উপায় হিসেবে তারা অবৈজ্ঞানিক মানসিকতাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। এই চিন্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রচারযন্ত্র, বইপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চার্চ-মসজিদ-মন্দির তৈরী করা, ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহিত করা ইত্যাদি নানা পদ্ধতিতে তারা এ কাজ করে থাকে।

ডঃ কোভুর শুধু প্রাচ্যের দেশগুলির জনগণকে কুসংস্কারের জন্য সমালোচনা করেছেন— কিন্তু পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিও পাশ্চাত্যের জনগণকে ব্যাপক শোষণ করে, অনেক সময়ই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণাকে মদৎ দেয়। এইসব সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে যান্ত্রিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ও পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বিজ্ঞানের চর্চা ও প্রয়োগ করা হয়। এরই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে ঐ সব দেশের বহু মানুষ একদিকে যেমন এই তথাকথিত বিজ্ঞানের যান্ত্রিকতায় অসুস্থ হয়ে অবৈজ্ঞানিক মানসিকতায় (যেমন ঈশ্বর আরাধনা, তুরীয় ধ্যান, ধর্মীয় গুরুর শিষ্য হয়ে যাওয়া, ন্যাড়া হয়ে খোলকর্তাল বাজিয়ে কৃষ্ণনাম প্রচার করা ইত্যাদি) আশ্রয় খোঁজে, তেমনি অন্যদিকে ঐ ধনী, বিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলির বহু মানুষও দারিদ্র্য, সামাজিক বৈষম্য ইত্যাদির শিকার। ঐসব পুঁজিবাদী দেশের পুঁজিপতিরা নিজেদের দেশের বাজারের বাইরে পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলির জনগণের মধ্যে বাজার খুঁজতে ও তাদের শোষণ করতে বাধ্য হয়,—মুমূর্ষু পুঁজিবাদকে জোর করে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টায় এবং পরিণত হয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে।

ডঃ কোভুরের উল্লেখ অনুযায়ী গ্রেট ব্রিটেনের লেবার পার্টির লর্ড ফেনার ব্রকওয়ে প্রাচ্যের কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অধ্যাত্মবাদী ও অলস জনগণকে সাহায্য না দেওয়ার প্রস্তাব দিলেও, সাহায্য দেওয়া কিন্তু বন্ধ হবে না—কারণ লর্ড ব্রকওয়েের নিজের দেশসহ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তাদের নিজেদের স্বার্থে ও অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টায় এ ব্যবসায়িক 'সাহায্য' চালিয়েই যাবে এবং এই ব্যবসার স্বার্থেই তারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টাও করবে। এছাড়া, প্রাচ্যের জনগণও পাশ্চাত্যের জনগণের তুলনায় কম পরিশ্রমী আদৌ নয়। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি তারাও খাটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এসব দেশের শ্রমিক বা কৃষকদের বেশীর ভাগ অংশ সীমাহীন দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হয় যার অন্যতম কারণ অনুন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা, জনগণের স্বার্থবিরোধী সমাজব্যবস্থা তথা সামাজিক বৈষম্যের পাশাপাশি পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী ঐসব তথাকথিত উন্নত দেশগুলিরই শোষণ।

ডঃ কোভুর কুসংস্কারের বিরোধিতা করেছেন সাহসের সঙ্গে, বিজ্ঞানমনস্কতাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন, কিন্তু তা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়নি। কুসংস্কার তথা অবৈজ্ঞানিক চিন্তা সৃষ্টির ও টিকে থাকার পেছনে সামাজিক অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক কারণকে বিশ্লেষণ না করে শুধুমাত্র কুসংস্কারাচ্ছন্ন অসহায় মানুষকে নিন্দা ক'রে ও আঘাত ক'রে যান্ত্রিকভাবে কিছু কিছু ভ্রান্ত-বিশ্বাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য করলে তা সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক পথ হবে না—চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সেটি একটি প্রাথমিক ধাপ মাত্র। কুসংস্কার একটি সামাজিক ব্যাধি—তাই সমাজ তথা অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত করেই তাকে দেখতে হবে। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে সংপৃক্তভাবে যুক্ত করেই করতে হবে—না হলে তার সার্থকতা ও সাফল্য নেই।

অন্যদিকে কোন সামাজিক আন্দোলনই যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা পরিচালিত না হলে সফল হতে পারে না। কুসংস্কার তথা অন্ধ-বিশ্বাস, অলৌকিকত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও তাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার কাজ এই মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এদিক থেকে এ ধরনের আন্দোলনের গুরুত্ব সর্বাধিক।

চার্বাক থেকে ডিরোজিও, জিওরদানো ব্রুনো থেকে আব্রাহাম থোম্মা কোভুর এবং সারা পৃথিবীতে আরো বহুজনই যুক্তিবাদী, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্বপক্ষে কাজ করেছেন। এ কাজে এঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর সীমাবদ্ধতা, যুগোপযোগী প্রভাব, তৎকালীন সীমাবদ্ধ জ্ঞান ইত্যাদি ছিল ঠিকই, কিন্তু এঁদের ধারাবাহিকতায় ভূত-ভগবান-শয়তান তথা সমস্ত অবাস্তব, অলৌকিক, অতিপ্রাকৃতিক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধ বিশ্বাসের অন্ধকার থেকে পৃথিবীর মানুষ বেরিয়ে আসবে আলোয়, পূর্বসূরীদের ত্রুটি ও অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে যুক্তিহীন গোঁড়ামি ও অসহায় ভ্রান্ত-বিশ্বাস দূর করে প্রকৃত অর্থে মানবতাবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে, নিজেকে মুক্ত করবে সামাজিক বিভেদ-বৈষম্য, শোষণ ও শৃঙ্খল থেকে, উন্নত করবে নিজেদের জীবনকে, সুনিশ্চিত করবে মানবজাতির অস্তিত্বকে।

অস্তিত্বহীন ভূত-প্রেত-মন্ত্রশক্তি-কে নয়, মানুষ ভয় করুক ও জয় করার চেষ্টা করুক প্রতিকূল প্রাকৃতিক ও সামাজিক শক্তিগুলিকে ; কাল্পনিক ভগবান-দেবদেবীকে নয়, মানুষ শ্রদ্ধা করুক ও ভালবাসুক মানুষকেই ; অবতার গুরুজী তথা অলৌকিক, অতীন্দ্রিয় শক্তির উপর নয়, মানুষ নির্ভর করুক নিজেরই শক্তি ও সামর্থ্যের উপর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট

১৯৯২ সালে বইটি প্রকাশের দশ বছর পূর্ণ হয়েছিল। বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর বিভিন্ন স্তরের পাঠক পাঠিকার কাছ থেকে অজস্র চিঠি এসেছে। এঁদের কেউ কেউ এ ধরনের বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছেন, কেউ বা গঠনমূলক সমালোচনা করেছেন, আবার কেউ কেউ তিক্তভাবে জানিয়েছেন তাঁদের বিরূপ মতামত। এ চিঠির অধিকাংশই এখন আর সংগ্রহে নেই। বইটি প্রকাশের দশম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে, সপ্তম সংস্করণে, যেগুলি আছে তাদের মধ্যে কয়েকটিকে বেছে তাদের অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হয়েছিল। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কিছু বক্তব্যও জানানো হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণে এবং এই দশম সংস্করণেও আরো কয়েকটি চিঠির কিছু অংশ প্রকাশ করা হল। এঁদের প্রায় সবাই-ই আমার অপরিচিত। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। অন্যান্য পাঠক বন্ধুদেরও তাঁদের সমালোচনা ও মতামত জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথাও জানানো দরকার ; চিঠির যে সব অংশ এখানে প্রকাশ করা হল সে বক্তব্য সম্পূর্ণতঃ পাঠকেরই— এবং সংবাদপত্রের সম্পাদকের ভাষায় বলা দরকার যে, ঐ সব মতামতের জন্য আমি দায়ী নই।—ভ.প্র.সা.

(১)

"বেশ কিছুদিন পূর্বে আপনার রচিত 'ভূত ভগবান শয়তান বনাম ডঃ কোভুর' বইখানি পড়লাম। আপনার লেখার সাথে আগেই পরিচিত ছিলাম, ওই বইটি পড়ে আবার নতুন করে ভাল লাগল। বইটি সুপাঠ্য।

তবে কিছু জায়গায় আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে। আপনি বলেছেন লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার দূরবর্তী গ্রহ-নক্ষত্রের কোন আকর্ষণ মানুষের উপর পড়ে না। তা ছাড়া হস্তরেখাচর্চ্চাও যে অতি ট্র্যাশ তাও বলেছেন। এখন আমার বক্তব্যটি শুনুন।

ধরুন, আপনি ট্রেনে করে চলেছেন। একস্থানে হঠাৎ ট্রেনটি থেমে গেল। আপনি ট্রেন থেকে নেমে দেখলেন, সামনে রেড সিগন্যাল দেওয়া আছে, অর্থাৎ ট্রেনটি যাবার অনুমতি নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রেড সিগন্যালের কোন্ প্রভাবটি আপনার উপর এসে পড়ল ? এটি পড়ল ট্রেনটির উপর, যার ফলে ট্রেনটির যাত্রা থেমে গেল।

আপনি যদি হাত জোড় করে রেড সিগ্ন্যালের সামনে প্রার্থনা করেন যে, দয়া করে গ্রীন হয়ে যাও— তাহলে কি ওটা গ্রীন হয়ে যেতে পারবে ? বলুন ?

ওটা হল একটি চিহ্ন বা সংকেত, যার দ্বারা আপনি বুঝলেন যে আপনার যাত্রা আপাতত স্থগিত।

গ্রহ-নক্ষত্রের ব্যাপারটিও ঠিক তাই। একটি observation- এর দ্বারা ভাগ্যের গতিপ্রকৃতির নিরূপণ করা সম্ভব হয়— কোনো আকর্ষণী শক্তির ব্যাপার এতে মোটেই নেই। ঠিক যেমনটি ধরুন probability- র ছক বা Monohybrid Cross- এর চার্ট। এটা একটা সম্ভাব্যতা।

হস্তরেখার ব্যাপারে কিছু বলার আগে একটি ঘটনার কথা শুনুন।

ইটালীর এক ডিউক তখনও কিরো হন নি। প্রচার পাবার আশায় গেছেন ইংল্যাণ্ডে। এক সংবাদপত্র দফ্তরে গিয়ে নিজের পরিচয় জানিয়ে প্রচারের কথা বললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্তৃপক্ষ আগে তাঁকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন বলে জানালেন। দু-তিনদিন পর, কর্তৃপক্ষ তাঁকে দুটো হাতের ছাপ (কাগজে) এনে দিয়ে বললেন, 'ভবিষ্যৎ বাণী করুন'।

কিরো interpretation দিতে গিয়ে প্রথম ছাপটি দেখে সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এটি একটি হত্যাকারীর হাত। একজনকে খুন করে নিজে সুই-সাইড করবে তিন দিনের মধ্যে।

দ্বিতীয়টি দেখে বললেন, এটি হ'ল রাজার হাতের ছাপ, সাত দিনের মধ্যেই ইনি সিংহাসন হারাবেন; পরবর্তী জীবন অতি দুর্বিষহ। বস্তুতঃ পক্ষে এগুলি ছিল, কিছুদিনের পুরোনো হাতের ছাপ— তিনি যা বলেছিলেন, তা সত্যিকারেই মিলে গিয়েছিল। এ ঘটনাটি আমার বানানো নয়, কিরোর জীবনীতেই পড়েছি।

বলুন, এটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

হস্তরেখার ব্যাপারে আপনি যাবতীয় প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। হাতের বিভিন্ন রেখার উৎপত্তির কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে আপনি মাতৃগর্ভে থাকাকালীন হাতের ভাঁজের কথা বলেছেন। এই ব্যাখ্যা থেকে প্রথমেই যে প্রশ্নটি উত্থিত হয় তা হ'ল, ঊর্দ্ধরেখা সমূহের উৎপত্তি কি? যেমন ভাগ্যরেখা, line of liver, Sun line, Venus line, Mercury line etc.

তাছাড়া ওই ব্যাখ্যা যদি মানতে হয়, তবে তো সকলেরই হাতের রেখা একই রকম হ'ত। তাতো হয় না!

আর হস্তরেখার ব্যাপারে interpretation দিতে গিয়ে হাতের রেখা সাত নম্বরে দেখা হয়। প্রথমে দেখা হয়, তালুর রঙ, এরপর তালু খসখসে না কোমল, তারপর আঙুল, নখ এবং নখের রঙ, বুড়ো আঙ্গুল, বুড়ো আঙ্গুল এবং বিভিন্ন আঙ্গুলের পর্ব; তালুর বিপরীত দিকের চুল আছে অথবা নেই; মাউন্ট (৮টি)। এরপর তো হস্তরেখার আগমন।

যেমন, আমি আপনার হস্তরেখা জানিনা, তবু বলছি, আপনার আঙ্গুলগুলি (এবং বিশেষভাবে অনামিকাটি) চৌকা প্রকৃতির, Sun mount, mount of Jupiter, mount of Saturn বেশ ভালো। হাতের তালু খসখসে এবং কোমলের মঝামাঝি, বুড়ো আঙ্গুলের প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্ব সমান, হাতের উল্টো পিঠে চুল নেই, হাতের রেখাগুলি স্পষ্ট ও লালচে রঙের, line of heart and line of head বেশ ভাল। Line of fate এবং line of Sun- ও ভাল হবার কথা।

মিলিয়ে দেখবেন।

আমি কিন্তু গোঁড়া কুসংস্কারবাদী নই, বস্তুতপক্ষে বিজ্ঞান মনস্ক। যেমন, প্ল্যানচেট, ভর ইত্যাদিতে মোটেই বিশ্বাস করি না। যেমন বিশ্বাস করি না, ভাগ্য পরিবর্ত্তনে পাথরের ভূমিকাকে।

বর্ত্তমানে আমি কেমিষ্ট্রীতে অনার্স নিয়ে স্নাতক অধ্যয়ন করছি। বিজ্ঞান পড়ি বলেই উল্টোপাল্টা যুক্তি দিয়ে কু-সংস্কারকে সু-সংস্কারে রূপান্তর করা পছন্দ করিনা।

আমাদের এখানে Rationalist Club আছে; আমি এর সদস্য।

আর একটি কথা। বরাহ-মিহির, খনা, সেন্ট জার্মেন, কিরো এরা সকলেই জিনিয়াস। প্রথম দু-জন তো রীতিমত বিজ্ঞানে আগ্রহী ছিলেন। এঁরা কিভাবে ভাগ্যচর্চাকে সমর্থন জানিয়ে গেছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি একজন অতি নগণ্য ব্যক্তি। আমার বর্ত্তমান বয়স মাত্র ১৮ বছর ২ মাস।

এই পত্র আপনাকে লিখলাম আমার মনের কিছু প্রশ্নের উত্তর পাবার আশায়। কোন যে -সে ব্যক্তিকে প্রশ্নগুলি না করে আপনার মত অগাধ পাণ্ডিত্য সম্পন্ন লোকের কাছেই এই প্রশ্নগুলি রাখলাম।"

—শ্রী সৌগত বাগচী, ধুবড়ী, আসাম (১৯৯১ সালে লেখা)

লেখকের উত্তর: Rationalist club- এর মত সংস্থাদির সদস্য হয়েও এমন পরস্পরবিরোধী ধারণার শিকার অনেকেই আছেন। যেমন ট্রেনের সিগন্যালের সঙ্গে সঙ্গে 'ভাগ্যের' গতিপ্রকৃতি নিরূপণ করার অতি সরলীকরণের ব্যাপারটা। শুধু সিগন্যাল কেন, প্রতিটি ভাষা, অক্ষর, শব্দ সহ বহু কিছু চিহ্ন বা সংকেতই মানুষ তৈরী করেছে। এগুলি বাস্তবত মানুষই নিয়ন্ত্রণ করে। ট্রেনের সিগন্যালও বাস্তব প্রয়োজনে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার মাধ্যমে ট্রেন-চালককে নির্দেশ দেয়। কিন্তু গ্রহনক্ষত্র তার নিজের নিয়মে অবস্থান পাল্টায়, মানুষ ঐ মত কিছু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে। দু'টি ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন। জ্যোতিষীরা আবার গ্রহাদির আকর্ষণী শক্তির কথাই বলে এবং সম্ভাব্যতার বৈজ্ঞানিক নিয়মাদির কথা কখনোই বলে না।

কিরোর জীবনীতে বর্ণিত নিজের অনুকূল ঐ সব তথাকথিত ঘটনাদির চূড়ান্ত অনুসন্ধান এখন করা দুরূহ। তবে শ্রীবাগচির চিঠি থেকে একটি ফাঁকি অন্তত স্পষ্ট। কিছুদিনের পুরনো ছাপ দেখেও কিরো কিন্তু তিনদিন বা সাতদিন পরে কি হবে তার কথা বলেছিলেন, অর্থাৎ ঘটনা যে আগেই ঘটে গেছে অন্তত ঐ টুকু তিনি বোঝেন নি। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি যে খোঁজ খবর নিয়ে ঐ সব তথাকথিত ভবিষ্যদ্বাণী করেননি তার প্রমাণও নেই। আর সবার উপরে এটিই সত্য যে, হাতের রেখা থেকে কয়েকদিন বা বছর পরে কি হবে তা আদৌ বোঝা সম্ভব নয়— তা প্রমাণিত। এ সম্পর্কে বইতেও বলা অছে।

ভাগ্যরেখা সহ বিভিন্ন রেখা যে আঙুলের নড়াচড়ার জন্য, গাঁটের অবস্থান অনুযায়ী সৃষ্টি— তা-ও প্রমাণিত, যেমন রেখা আছে হাঁটুর পেছনে বা কনুই-এর সামনেও। আর পৃথিবীর সবাই মানুষ হলেও মানুষে মানুষে মুখাবয়ব ইত্যাদির নানা সূক্ষ্ম তফাৎ যেমন আছে, তেমনি হাতের রেখা, চুলের সংখ্যা বা বিন্যাস ইত্যাদিতেও পার্থক্য আছে। এ ধরনের তফাতই বিভিন্ন মানুষের জীবনের বিভিন্নতার পরিচায়ক— এটি ভাবাটাও হাস্যকর।

দুঃখের বিষয়, আমার বুড়ো আঙুলের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব সমান নয়. হাতের পিঠে কম হলেও চুল আছে ইত্যাদি। অন্যান্যগুলিও কমবেশি সত্যি বা মিথ্যা, যা আরো অনেকের হাত না দেখেই বলা যায়।

'নিজেকে গোঁড়া কুসংস্কারবাদী নই' বলে অভিহিত করেও এ ধরনের নানা মিথ্যা বিশ্বাসকে অনেকেই প্রচার করেন।

বরাহমিহির ইত্যাদির উদাহরণও যথার্থ নয়। কারণ বহু মণীষীর পক্ষেই সময় ও স্থানের সীমাবদ্ধতার ঊর্দ্ধে ওঠা সম্ভব নয়— বাস্তব কারণেই। এর জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের দোষারোপ করাটাও যথার্থ নয়। তবে বরাহমিহির প্রসঙ্গে বলা যায়, উনি কিন্তু ওঁর পূর্বসূরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর্যভট্টের বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনাকে বিকৃত করেছেন— হয় অসচেতনভাবে, কিংবা তৎকালীন হিন্দু শাসক গোষ্ঠীর চাপে বা প্রভাবে। আর্যভট্ট জ্যোতিষবিদ্যাকে জ্যোর্তিবিদ্যার বিজ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করেছিলেন। অন্যদিকে বরাহমিহির তাদের সমান গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে প্রচার করেছেন।

আর সবশেষে এটা বলা দরকার যে, আমারও কোন অগাধ পাণ্ডিত্য আদৌ নেই। কিছু সত্য জানার চেষ্টা করে, তাকে সবার সামনে তুলে ধরার সামান্য কিছু চেষ্টা করেছি মাত্র। এবং অবশ্যই এক্ষেত্রে পারস্পরিক মতবিনিময়, সুস্থ বিতর্ক ইত্যাদি কাম্য।

(২)

"ভবানীপ্রসাদ সাহুর 'ভূত-ভগবান-শয়তান বনাম ডঃ কোভুর' বইটা পড়লাম। এ বিষয়ে আমার কিছু বলার আছে।.....

ভবানীবাবু শুধুমাত্র পৃথিবীকে নিয়েই ক্ষান্ত থাকতে চেয়েছেন। তাই মহাকাশ বিজ্ঞান তাঁর কাছে উদ্ভট এবং অকারণ অর্থব্যয় বলে মনে হয়েছে।

ভবানীবাবু বলেছেন পৃথিবীতে অভাবের কথা। তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন যে, মহাকাশ বিজ্ঞানে যত টাকা খরচ হয় তা এই অভাব পূরণে ব্যয় করা উচিত।

মহাকাশ বিজ্ঞানের এক কথায় জনক বলা চলে সেই অদ্ভুত মানুষ (এরিক ফন দ্যানিকেন) কেন আক্ষেপ করেন জানেন ?

সৈন্যদের পিছনে অর্থ ব্যয়ের জন্য। ভবানীবাবুও যদি একথা বলতেন তবে কথাটা মানার যোগ্য হয় বটে।

ভবানীবাবুর আর একটা কথা জানা উচিৎ যে, দেশে এই অভাব সাধারণত রাজনীতিকদের দ্বারাই সৃষ্টি হয়। ভবানীবাবুকে আমি অনুরোধ করবো এরিক ফন দ্যানিকেনের বইগুলি পড়ার জন্য এবং ছবি দেখার জন্য।

বুঝতে পারবেন এর জন্যে তাঁকে কত পুরাণ ও লৌকিক কাহিনী নাড়াচাড়া করতে হয়েছে এবং কত দুর্গম স্থানে গিয়ে ছবি তুলে আনতে হয়েছে।

..... মনে রাখতে হবে আদর্শ সুষ্ঠু সমাজই সব নয়, অজানাকেও জানতে হবে। অজানা বিশ্বের কোথায় কি আছে ভবানীবাবুর কি একবারও জানতে ইচ্ছে করে না ?

মহাকাশ বিজ্ঞানকে অবৈজ্ঞানিক আখ্যা দেওয়া মানে থুতু উপর দিকে ছিটানো।

আর কিছুই বলার নেই। আর একবার অনুরোধ করবো ভবানীবাবুকে দ্যানিকেনের বইগুলো পড়ার জন্য। সময় এসেছে অজানাকে জানার। তাই চুপ করে বসে বসে শুধু নিন্দা করলেই চলবে না। সমস্ত কিছুই জানতে হবে।......"

—অনূপ কুমার বিশ্বাস ; ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সদস্য, নদীয়া (১৯৮৯ সালে লেখা)

লেখকের উত্তর : অপবিজ্ঞান কিভাবে 'বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ' নিয়ে কাজ করা মানুষদেরও বিভ্রান্ত করে তার আরেকটি দুঃখজনক উদাহরণ এই চিঠি। দ্যেনিকেনের তত্ত্ব যে মূলত ভ্রান্ত ও অনুমানভিত্তিক তা প্রমাণিত হয়েছে। পেটার কাউফহোল্ড-এর মত তাঁর স্বদেশবাসীরা দ্যেনিকেন-বর্ণিত কিছু জায়গায় গিয়ে স্পষ্ট প্রমাণ করেছেন, দ্যেনিকেন ঐসব জায়গায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যানই নি। অ্যানষ্টি ফনকুওন দোনিকেনের তথাকথিত তত্ত্বের ফাঁকিগুলিকে যুক্তির সাহায্যে খণ্ডনও করেছেন। তাঁর বিভিন্ন বইতে পরস্পরবিরোধী কথাও আছে। তবে সবচেয়ে বড় কথা দোনিকেন প্রধানত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ও সস্তা আত্মপ্রচারের জন্য এমন চিত্তাকর্ষক চমকপ্রদ কথাবার্তা প্রচার করেছেন— একই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান, যুক্তি, জনগণ ইত্যাদির নাম করে আরো কেউ কেউ-ও তা করে থাকেন (এবং যেমন ঘটেছে বার্মুডা ট্রায়াঙ্গল, উড়ন্ত চাকি ইত্যাদির ক্ষেত্রেও) ; এই প্রবণতা মনসমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। দোনিকেন প্রসঙ্গে ব্যাপারটি সুনিশ্চিত এই কারণে যে, তাঁর কথাবার্তা মানুষকে তার সভ্যতার বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসকে, সভ্যতার বিকাশে তার শ্রম ও জ্ঞানের ভূমিকাকে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সংগ্রামকে অস্বীকার করতে শেখায় এবং পাঠকদের আচ্ছন্ন করে দেয় একটি অপার্থিব, অপ্রমাণিত মায়াময়তায়।

চিঠির অন্যান্য অংশ প্রসঙ্গে বলা যায়, মহাকাশবিজ্ঞানের চর্চাকে আমি কোথাও অবৈজ্ঞানিক বলি নি— অথচ শ্রী বিশ্বাস তা আমার কথা বলে উল্লেখ করে 'থুতু' পর্যন্ত গেছেন। তবে মহাকাশ সম্পর্কিত গবেষণা সম্পর্কে আমার মন্তব্যগুলি থেকে কিছু ভুল বোঝার সম্ভাবনা হয়তো আছে। অজানাকে জানা বা প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করা,-এসব সম্পর্কে আমার সামান্যতম আপত্তি নেই। তাই "মহাকাশ বিজ্ঞানের পাশাপাশি"- এভাবেই বইতে মন্তব্য আছে। শুধু একই বিশ্বের একই মনুষ্যজাতির মধ্যে গবেষণা বা বিজ্ঞানের প্রয়োগের মধ্যে চূড়ান্ত বৈষম্যকে তুলে ধরার জন্যই কথাগুলি বলা। অভাব রাজনীতিকরা সৃষ্টি যেমন করেন, তেমনি বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রেও সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ দেশ গুলির অর্থব্যয়ের একটা বড় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পৃথিবীতে আধিপত্য করা ও সামরিক প্রাধান্য বিস্তার। একটু পড়াশুনা- খোঁজখবর করলেই শ্রী বিশ্বাস তা বুঝতে পারবেন আশা করি।

(৩)

"..... আপনার 'ভূত-ভগবান-শয়তান বনাম ডঃ কোভুর', 'শরীর ঘিরে সংস্কার' 'ওষুধ খেয়ে অসুখ' এবং প্রবীর ঘোষ মহাশয়ের 'অলৌকিক নয় লৌকিক'— বিজ্ঞানভিত্তিক বইগুলি পড়ে বিশেষ উপকৃত হলাম। আমাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বর্তমান সমাজে এ ধরনের আরও কিছু বই-এর প্রয়োজনীয়তা অমি উপলব্ধি করি। যাই হোক বর্তমানে আমার একটি বিষয়ে কৌতূহল জন্মেছে।.........

বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেখা যায় যে, প্রধান ভক্তের (অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলার) ভর হয় এবং ঐ সময় সে যে কোনরকম প্রশ্নের যা হোক একটা উত্তর দেয়। অনেক শিক্ষিত (ডিগ্রিধারী) লোককেও দেখেছি ঐ সমস্ত লোকেদের দ্বারস্থ হতে। .... আমি মনে করি কোন একজন সুস্থ (সম্পূর্ণ অজ্ঞ) লোকের পক্ষে ঐ রকম মাথা চালনা করা এবং বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া (কোন কোন ক্ষেত্রে ঠিক) সম্ভব নয়।

সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে আরাধ্য দেবতার ভর হওয়াকে আমি মানসিক রোগীর লক্ষণ বলেই জেনেছি। এ ব্যাপারে আপনি বিজ্ঞান বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে ব্যাখ্যা করে জানালে চির কৃতজ্ঞ থাকব।......"

—শ্রী মানবেন্দ্র নায়েক, আলিগ্রাম, বর্ধমান (১৯৮৭ সালে লেখা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখকের উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তর উল্লেখিত বইগুলিতেই এদিক ওদিক দেওয়া আছে। মানসিক রোগী বা সচেতন ধূর্ত ছাড়া এমন তথাকথিত ভর কারোর হয় না। 'কোন কোন ক্ষেত্রে' উত্তর মেলার ক্ষেত্রেও কাকতলীয় ব্যাপার, কখনো আগে থেকে খোঁজ খবর নেওয়া, কখনো বা ধোঁয়াটে উত্তর দিয়ে প্রশ্নকর্তাকে নিজের মত করে মিলিয়ে নেওয়া— এসব ব্যাপার থাকে। কোনদিনও না শোনা, না জানা বা সম্পূর্ণ অজানা কোন ব্যাপারে কোন তথ্য দেওয়া কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। মুক্ত মনে সঠিকভাবে অনুসন্ধান করলে যে কেউই তা প্রমাণ করতে সক্ষম হবেন।

(৪)

"....... তোমার বইগুলো আমরা পড়ছি বা পড়েছি। ..... তোমার বইতে বিজ্ঞান ও সমাজ সচেতনতার যে বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে— তা আমাদের অল ইণ্ডিয়া সায়েন্স টীচার্স অ্যাসোসিয়েশানের সদস্য ও অন্যান্যদের যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। .... তোমার বক্তব্যের প্রাঞ্জলতা, সারবত্তা ও তথ্যনিষ্ঠা পাঠককে বৈজ্ঞানিক মনোভাব সম্পন্ন হতে অনুপ্রাণিত করবে। আগামী দিনের লোককে সমাজতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক মনোভাব সম্পন্ন হওয়ার কথা কেবলমাত্র স্লোগান বা জিগির তুলে প্রচার করলে কাজ বেশি হয় বলে আমার মনে হয় না। তাদের সামনে বাস্তব ঘটনা ও তথ্য উপস্থাপিত করলে তা তার মনকে নাড়া দেবে। প্রগতিশীল বিজ্ঞানকর্মীদের মনে তোমার লেখা সাড়া দিচ্ছে ও দেবে।

..... চেতনার স্তরে বিভ্রান্তি, অস্পষ্টতা ও অস্থিরতা থাকলে কর্মপ্রচেষ্টা ও তার পরিণতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। লেখার মাধ্যমে তোমার জেহাদ যথেষ্ট কার্যকরী হবে বলে আমার বিশ্বাস। তবে মনে হয়েছে, তোমার লেখা আরও অনুভূতিশীল— আরও বেশি মনস্তাত্ত্বিক, আরও বেশি ব্যঞ্জনাপূর্ণ (সাহিত্যধর্মী ?) হতে পারতো— বা হওয়ার সুযোগ ছিল। ..... বকধার্মিকদের আপাত নিরীহতার আড়ালে যে জঘন্যতা আছে—তাদের যে ব্যক্তিগত লাভের মোহ আছে, মানুষকে আফিম খাওয়ানোর চেষ্টার পেছনে যে বিভৎসতা আছে,—মানুষকে শোষণ করার মাধ্যমে যে তার বিলাসভোগ বা আনন্দের বাসনা আছে, তা আরও দরদী ভাষায় প্রকাশ করলে সাধারণ পাঠকের মনোজগতে অধিকতর স্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারতো। পক্ষান্তরে, সাধারণ মানুষ যে কতো দুঃখে— দিনদিন কত পরাজয়, উৎপীড়ন এবং অবমাননার মধ্যে পড়ে যুক্তি হারিয়ে ভগবান 'সৃষ্টি করে' ও আরাম বা স্বস্তি পেতে চায়, সেটা প্রকাশ ক'রে পাঠকের মনে একটি অনুভূতিময় বেদনা সৃষ্টি করার প্রয়াস করলে— তা তাদের মনের মধ্যে বেশি স্থায়ী পরিবর্তন আনতো।......"

—অধ্যাপক (ডঃ) সত্যেন্দ্রনাথ গিরি, কলকাতা— ২৬ (১৯৮৮ সালে লেখা)

(৫)

"আপনার রচিত বইগুলি যেমন 'ভূত ভগবান শয়তান বনাম ডঃ কোভুর', 'সুরা-শরীর সর্বনাশ', 'শরীর ঘিরে সংস্কার', 'ওষুধ খেয়ে অসুখ'— পড়ে এত অভিভূত এবং অনুপ্রাণিত হয়েছি যে, আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা নেই। বিজ্ঞানের যুগে বাস করেও যখন কোটি কোটি ভারতবাসীর মন কুসংস্কারের নাগপাশে বন্দী, তখনই আপনার যুক্তিবাদী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন সবার গলার উর্দ্ধে বুজরুকির মুখোশ খুলে দিয়েছে। এই সমাজ ব্যবস্থায় সংস্কারহীন মন নিয়ে আমি বারবার ঠোক্কর খাচ্ছি। অনেকের অপ্রিয়ও হয়ে গেছি।.....”

—ডাঃ নিমাই দালাল, অণ্ডাল, বর্ধমান (১৯৯১ সালে লেখা)

(৬)

“I am very sorry and astonished to go through the book named Ghost, God & Devil vs Dr Kobhur, author Mr. Bhabani Prasad Sahu.

The evil & uncultured ‘comments’ made by the author to the respected & sacrificing lives like Swami Avedananda, Swami Vivekananda etc. proves the insanity of the author, as well as ignorance, idiocy & foolishness.

Where science ends philosophy starts therefrom. He might have gone through only Marxism most probably. But this particular ‘ISM’ has not yet been implemented in any part of the world as it is completely unscientific.

The author should answer the following

(i) He has told ‘LIFE’ to be the effect of chemical reaction. I doubt regarding his education and knowledge on science. He does not know actually the meaning of science.

The almighty God is the Super Science. He can do anything & change anything if HE likes”— Reader, 28.11.85.

লেখকের বক্তব্য : ইংরেজিতে লেখা ঠিকানাহীন বেনামী চিঠিটি হুবহু প্রকাশ করা হল। যুক্তিহীন গালাগালি আর আবেগসর্বস্ব গোঁড়ামির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ এ ধরনের বক্তব্য। তবে অধিকাংশ ধর্মপ্রাণ বা ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তিই এভাবে সম্পূর্ণ যুক্তি-ও সৌজন্য-বিবর্জিত কথাবার্তা বলেন না। কিন্তু এঁদের পাশাপাশি এমন ‘ভক্ত’ও যথেষ্টই আছেন। এ নিয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন— যখন স্থিরভাবে ধরেই নেওয়া হয়েছে যে ঈশ্বরই Super Science. বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এমন ধ্রুবসত্য বা গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। আর নিছক মার্কসবাদ নয়— ভারতের ন্যায়, সাংখ্য, বৈশেষিক বা বৌদ্ধ-জৈন-চার্বাক দর্শন, কিংবা গ্রীকদর্শনের বস্তুবাদ বা সাম্প্রতিক ইউরোপের সন্দেহবাদ, ইতিবাদ ইত্যাদির মধ্যেও কিন্তু ঈশ্বর তথা অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়েছে বা তাতে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। এসব না জেনে নিছক হঠাৎ মার্কসবাদ নিয়ে মন্তব্য করার মধ্যেও পত্র লেখকের অজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়— যে অজ্ঞতাই এমন গোড়ামি বা অন্ধবিশ্বাসের জন্ম দেয়। এছাড়া বইতে কোথাও ব্যক্তিগত ভাবে কারোর বিরুদ্ধে তথ্যহীন, যুক্তিহীন গালাগালি আছে বলেও মনে হয় না।

(৭)

“...... আপনার লেখা ‘ভূত-ভগবান শয়তান বনাম ডঃ কোভুর’, ‘শরীর ঘিরে সংস্কার’, ‘অলৌকিকতা বনাম বিজ্ঞান’— নিঃসন্দেহে অন্ধবিশ্বাসের ভিতকে নড়াতে সমর্থ। উৎস মানুষ ও অন্যান্য আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান মনস্কতা বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।.....

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি একজন স্কুল মাস্টার ; আমি Class IX ও X -এর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রতি শনিবার ২-৩টা— এই এক ঘন্টা আপনার দু'খানা বই নিয়ে প্রায় একবছর ক্লাস করছি। ছাত্রছাত্রীরা এসব বিষয় জানতে ও বুঝতে বেশ কৌতূহলী। কিছু ছাত্রছাত্রীর মনে বিষয়গুলো এত বেশী দাগ কাটে যে, বাড়ীতে এবং স্কুলে শিক্ষকদের সঙ্গেও সংঘাত শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত একটি ছোট্ট ঘটনার কথা বলি—

কয়েকদিন পরে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে যাবে। চিরাচরিত রীতিতে শিবঠাকুরের মাথায় ডাব-দুধ, হরিমন্দিরে বাতাসা ভোগ ইত্যাদি ছিল বাধ্যকর। ছাত্রছাত্রীরা ঐসবে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে জোর সংঘাত লাগে শিক্ষকমশাইদের ২-৩ জনের সঙ্গে। শিক্ষকরা যেহেতু ক্ষমতায় আছেন, তাই অনেকেই তাঁদের আদেশ অনিচ্ছা সত্বেও মানতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু ২-৩টি ছাত্র আদৌ রাজী হয় নি।.....

যাত্রাকালে অমৃতযোগ, শুভদিনে যাত্রা— এসব নিয়েও শিক্ষক-ছাত্রদের মধ্যে মতানৈক্য ও আনুগত্যজনিত স্নেহবন্ধনের মধ্যে ফাটল দেখা দিয়েছে। এই গুরুতর ঘটনার মূল নিদান যে আমি— কতিপয় অভিভাবকও আমার উপরে পরোক্ষে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। অবশ্য এজন্য আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত হই নি।......"

—শ্রী ষড়ানন পণ্ডা, এরাল, মেদিনীপুর (১৯৯১ সালে লেখা)

(৮)

"ভূত ভগবান শয়তান বনাম ডঃ কোভুর', 'শরীর ঘিরে সংস্কার', 'ওষুধ খেয়ে অসুখ'....... আপনার তিনটি বই-ই কয়েকবছর আমার হাতে এসেছে। তিনখানি বই-ই সমাজের অশেষ উপকার সাধন করতে পারে। এই ধরনের বই-এর এত বেশি প্রয়োজন রয়েছে যে, তার পরিমাপ করা যায় না।

আপনি প্রচলিত কুসংস্কারগুলি কিভাবে গড়ে উঠেছে— তার যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিয়ে বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে আঘাত না করে— কুসংস্কারকে নিয়েই যুক্তি-নিষ্ঠ বক্তব্য উপস্থাপনা করেছেন। তাতে কুসংস্কারে আবদ্ধ মানুষ মুক্তির সন্ধান পাবে— কুসংস্কারকে টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হবে না। তাই বলি, আপনার লেখার পদ্ধতিটি ফলদায়ক ও উদ্দেশ্যানুগ।......"

— নির্মলেন্দু মহাপাত্র (প্রধানশিক্ষক), খাড়, মেদিনীপুর (১৯৮৭ সালে লেখা)

(৯)

"...... আপনার লিখিত 'ভূত-ভগবান-শয়তান বনাম ডঃ কোভুর' গ্রন্থটি খুব মনোযোগের সাথে পড়লাম। খুব ভাল লাগল। বইটির ব্যাপক প্রচার কামনা করি। আপনি ডঃ কোভুরের মত সত্যানুসন্ধানী ও বাস্তববাদী। সত্য কথা প্রকাশ ও প্রচার করার সৎসাহস আপনার আছে। তাই কয়েকটি প্রশ্ন আপনার কাছে রাখছি। আশা করি আপনার পরবর্তী গ্রন্থে উত্তরগুলি দেখতে পাব।

(১) আত্মার পুনর্জন্ম হয় কিনা ?

(২) হলে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই কি বালক ব্রহ্মচারীরূপে জন্ম নিয়েছে ?

(৩) জন্মসিদ্ধ বলতে কি বোঝায় ? আলু পটল সিদ্ধ হতেও গরম জল লাগে। উনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি মায়ের পেটে সিদ্ধ হয়েছেন, নাকি সব ধাপ্পাবাজি?

(৪) নেতাজীর নামাবলী গায়ে দিয়ে অজ্ঞ-মূর্খ-কুসংস্কারচ্ছন্ন হুজুকপ্রিয় দেশবাসীদের ঠকাচ্ছে কিনা!

(৫) দুই দুইটি তদন্ত কমিশন যা প্রমাণ করতে পারে নি ঐ ভণ্ড কি তা প্রমাণ করবে? নেতাজী আছেন?

(৬) ৬০ লক্ষ সৈন্য লাডাক সীমান্তে মোতায়েন। যখন ঐ ভণ্ড ব্রহ্মচারী নির্দ্দেশ দিবেন তখনই নেতাজী ভারত আক্রমণ করবেন? ভারতীয় গোয়েন্দা, CIA, K G B, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা বাহিনী নেতাজীর সংবাদ রাখে না? রাখে ঐ ভণ্ড ব্রহ্মচারী?

(৭) ৬০ লক্ষ সৈন্য কি চীনা সৈন্য? ভারত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে কি?

(৮) বেদ ভিত্তিক সাম্যবাদ আসলে কি কালমার্কস-এর সাম্যবাদ? নাকি ধাপ্পাবাদ?

(৯) যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই তা নিয়ে মাথা ঘামানর যেমন দরকার নেই, তেমনি যে দেশনেতার অস্তিত্ব, জীবিত কি মৃত কোন প্রমাণ নেই তাঁর নাম করে দেশবাসীদের নিতান্ত বিভ্রান্ত করার ষড়যন্ত্র করবার পথগুলি বন্ধ করবার চেষ্টা করুন।

আপনি সত্যানুরাগী, বাস্তববাদী। আপনি চেষ্টা করলে ঐ ভণ্ড, প্রতারক, ধাপ্পাবাজ, শয়তান বালক ব্রহ্মচারীর সব ধাপ্পাবাজী প্রকাশ করে দিতে পারেন। যেমন সাঁইবাবা, মহেশযোগী, অনুকূল ঠাকুর ও অন্যান্য সব ভণ্ডদের স্বরূপ প্রকাশ করেছেন।”........

—শ্রী কিশোরী দাস, জলপাইগুড়ি (১৯৮৫ সালে লেখা)

লেখকের উত্তর: আত্মা যে অস্তিত্বহীন তা বইতে স্পষ্টভাবে বলা আছে; যা নেই-ই তার পুনর্জন্ম হওয়া কিভাবে সম্ভব? আর যতদূর জানি, বালক ব্রহ্মচারী (বা তাঁর শিষ্যরা) নিজেকে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে যুক্ত হিসেবে বলেন— এ ব্যাপারে বংশতালিকাও প্রকাশ করেছেন, কিন্তু ঠিক তাঁর পুনর্জন্ম-এর রূপ হিসেবে নিজেকে মনে হয় বলেন না। ‘জন্মসিদ্ধ’ একটি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার প্রতীকী প্রকাশ; ব্যাপারটি কল্পনা হতে পারে, কিন্তু ‘সিদ্ধ’ কথাটি অক্ষরিক অর্থে ধরে এভাবে ভাষা প্রয়োগ বিজ্ঞানমনস্ক সমালোচকের নয়। বেদভিত্তিক সাম্যবাদ সোনার পাথরবাটির মত একটি জিনিস— এখন, আড়াই হাজার বছর পরে, ঐ সমাজ চালু করতে যাওয়া মানে সব কিছুকে এত হাজার বছর পিছিয়ে দেওয়া— যা বাস্তবত অসম্ভব। প্রকৃত অর্থে বেদে সাম্যও ছিল না। আদিবেদ ঋগ্বেদেও দাসদাসীর উল্লেখ আছে। অথর্ব বেদে চতুর্বর্ণের স্বীকৃতি শুরু হয় (যেমন, অথর্ববেদ, ১৯/৩২/৮)। অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই— অন্ধ অনুরাগী ছাড়া, অন্যরা তার উত্তর ইতিমধ্যে জানেন আশা করি।

(১০)

“...... ‘আপনার ভূত ভগবান শয়তান... ’ ‘শরীর ঘিরে সংস্কার’ আমার সত্যিই অসাধারণ ভাল লেগেছে। প্রথম বইখানা পড়ার পরেই বাস্তবিক পক্ষে আপনি আমার বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন। ভালবাসার মাত্রাটা এতই গভীর ছিল যে আমি এক রকম সিদ্ধান্তই করেছিলাম যে আপনার বাড়ীতেই চলে যাব।...... আপনার উপরোক্ত বই দুটো পড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ঘনিষ্ঠ মহল খুবই উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। আমি মাঝখানে টি.ভি.-তে ভূতের উপর একটা প্রোগ্রাম করলাম। বিভিন্ন রকম ভূতের অস্তিত্ব থেকে শুরু করে বারমুডা রহস্য পর্যন্ত উন্মোচিত করার চেষ্টা তাতে করেছি। অন্যদিকে অলৌকিকতার সঙ্গে শোষণ এবং নিপীড়িত জনগণের সম্পর্ক নির্ধারণ করার প্রয়াসও পেয়েছি। সব শেষে একে জোরালো করার জন্য এক লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জও করা হয়েছে। ......"

—শ্রী জুয়েল আইচ, ঢাকা, বাংলাদেশ (১৯৮৪ সালে লেখা)

(১১)

"…. আপনার 'ভূত-ভূগবান-শয়তান বনাম ডঃ কোভুর' বেশ কয়েকবার পড়েছি, অনেককে পড়িয়েছি। বাংলা কেন যে কোন ভাষায় এখন বই প্রকাশ হওয়া গর্বের ব্যাপার। আপনার অন্যান্য বইগুলোও অভিনিবেশের দাবী রাখে।...."

—শ্রী উত্তম মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা— ৫৬ (১৯৯০ সালে লেখা)

(১২)

"......'ভূত-ভগবান-শয়তান বনাম ডঃ কোভুর' বইখানি পড়ে আমি প্রায় নাস্তিক হতে চলেছি। কিন্তু উক্ত বইটিতে বারবারই ম্যাজিসিয়ানসুলভ হাত সাফাইয়ের উল্লেখ পাই। কিন্তু এমন কতকগুলি ম্যাজিক আমি দেখেছিলাম যা বিস্ময়ের ব্যাপার। তা হল—যেমন মানুষকে ছুরি মেরে হত্যা করে তার নাড়িভুঁড়ী বের করা থেকে লিঙ্গহরণ পর্যন্ত। তাও কি কোন মন্ত্রশক্তির ব্যাপার নয়? তাহলে তা কি? যদি উত্তর দিতে ভুলে যান, আমিও আপনাকে ঠকবাজ, বদমায়েস ব্যবসায়ী বলে উল্লেখ করব। আর সঠিক উত্তর দিলে শ্রদ্ধা করব এবং উত্তর না দিলে তা মিথ্যা মনে করব"।

—শ্রী পি. দেববর্মা, আগরতলা, ত্রিপুরা (১৯১১ সালে লেখা)

লেখকের উত্তর: মানুষকে ছুরি মেরে নাড়িভুড়ী বের করা (এবং আবার জ্যান্ত করে তোলা)—এসব ব্যাপার যে ম্যাজিক তাতে কোন সন্দেহ নেই। সৎ ম্যাজিসিয়ানরাও তাই-ই বলেন। অভিনয়, কৌশল, আলোর খেলা ইত্যাদির সাহায্যে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়ে যে এসব করা হয় এবং তা যে কোন অলৌকিক ক্ষমতা বা মন্ত্রশক্তির ক্ষমতা নয়, তা তাঁরা স্বীকার করেন। আপাতদৃষ্টিতে রহস্যময় এমন অনেক কাণ্ডই আমরা দেখি, এবং আসল রহস্য জানা না থাকায় অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়—এই না জানা থাকার ব্যাপারটি অলৌকিকত্ব ইত্যাদিতে বিশ্বাস সৃষ্টির অন্যতম শর্ত। (প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, চিঠিটি পেয়ে সভয়ে সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিয়েছিলাম— কে আর নিজেকে ঠকবাজ, বদমায়েস বলে উল্লেখিত হতে চায়!)

(১৩)

"..... আপনার লেখা 'ভূত-ভগবান-শয়তান বনাম ডঃ কোভুর' পড়লাম। একটি তথ্য বহুল বই পড়ে সত্যিই খুব ভালো লাগল। জানলাম কিভাবে কিছুসংখ্যক তথাকথিত গুরুরা ধর্মের নামে ফায়দা নিচ্ছেন। আবার দুঃখ পেলাম আপনার মত এক বিদগ্ধ ব্যক্তি কিভাবে শাশ্বত যোগসাধ্য ঈশ্বর-ধর্ম বিষয়ে বিরূপ আলোচনা করেছেন। আজকালকার দিনে প্রকৃত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্ঞানী লোকের সংখ্যা কম এবং তাদের জ্ঞানবৃদ্ধি করাবার লোকও কম। .....ঈশ্বর ধর্মকে জানতে গেলে প্রথমেই দরকার আত্মজ্ঞান, যার আজ খুবই অভাব। আত্মাকে মানুষ অজ্ঞানতাবশতঃ বিশেষ সত্ত্বা বলে মনে করে। .... সংক্ষেপে বলা যায় মনকে নিয়ন্ত্রণ করে বুদ্ধি আবার বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে আত্মা। তাই আত্মা অজ নিত্য শাশ্বত পরিণামশূন্য। যেমন শুভবুদ্ধির জন্মমৃত্যু নেই, মানুষের মারা যাবার সঙ্গে শুভবুদ্ধির যেমন মৃত্যু হয় না। তা বংশপরম্পরায় আবর্তিত হয়। গীতাতে এর সবিশেষ ব্যাখ্যা আছে। **আত্মার ওজন স্বরূপ ইত্যাদি জানতে যাওয়া অজ্ঞানীর কাজ।**

ধর্ম— যা ধারণ করে তাই ধর্ম। যখন আইন আদালত ছিল না, তখন ধর্ম সংসার সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করত। ধর্ম মানুষের সুন্দর জীবন যাপনের guide line; নিজে বাঁচ অপরকে বাঁচাও— এই এর মূল ধর্ম। অনেক স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি এর কিছু পরিবর্তন সাধন করে, কিছু যোগ করে তাকে 'ধর্ম' বলে চালাবার চেষ্টা করেছেন। তার জন্য ধর্মকে কোনমতেই দায়ী করা যায় না। দোষী তারা যারা একে দুষ্ট করেছে। Law is nothing but a common sense এবং এই law কে যদি কেউ নিজের স্বার্থের খাতিরে অপব্যবহার করে তো দোষ law- এর নয়, lawyer- এর। তাই বলে আমাদের কখনোই বলা উচিত হবে না যে law স্বার্থসিদ্ধির জন্য শাসকবর্গের অস্ত্র।

ঈশ্বর—আত্মা ও ধর্মের পরেই আসে ঈশ্বর। ইনি সাধ্য। কলমবাজী করে পাওয়া জিনিষ ইনি নন। যুক্তি-তর্কের অতীত। অনুভব করার জিনিষ। ঈশ্বরের প্রাণ আছে কিনা? এ প্রশ্ন অবান্তর। যার শক্তিতে বা অঙ্গুলী হেলনে দিনরাত্রি হচ্ছে তার স্বরূপ দেখা সাধনার বিষয়। সাধারণ অজ্ঞানী মানুষের কাছে যা hallucination. আমরা ক্ষুদ্রমতি, মহাশূন্যের কল্পনা যেমন আমাদের সাধ্য নয়। চিন্তা করতে গেলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে যায়। আমাদের ঠিকানা সৌরজগৎ অবধি.... এর পর নিয়ে চিন্তা করতে বৈজ্ঞানিকরা হিমসিম খাচ্ছেন। আমরা সাধারণ মানুষ এক অসীম অনন্তের চিন্তা করতে গিয়ে, জ্ঞানের ভাণ্ডারের ঘাটতি ঢাকতে স্থির শাশ্বতকে নেই বলে বর্ণনা করছি এবং অন্যকে বিভ্রান্ত করছি।..... বিজ্ঞানও স্বীকার করেন কর্ত্তা ছাড়া কর্ম হয় না। বেশী দূর যেতে হবে না। এই সৌরজগতের স্রষ্টা কে? কে এর পরিচালনা করেন? আমরা জানি কি? জানি না। কাজেই নেই বলাটাই সহজ। বৈজ্ঞানিক সংকেত পাঠিয়ে প্রাণের সন্ধান পাই নি, তাই ঈশ্বর নেই বলাটাই নিরাপদ। যাক কলেবর বৃদ্ধি করে নিজের অজ্ঞানতা প্রকাশ করতে চাই না।

নামজপ— দিশাহারা জীবনে মাদক দ্রব্য সেবন করে সমস্যা ভুলে থাকার চাইতে, কতকগুলি শব্দ, সুসংবদ্ধ ছন্দায়িতভাবে আবৃত্তি করা শ্রেয়কর। যাতে যার বিশ্বাস হয়। কিভাবে ভাবাবেশ আসলো, সমস্যা ভুলল সেটা বড় কথা। ... মনকে হাল্কা করার জন্য এই ভাবাবেশ। না হলে মানুষ পাগল হয়ে যেত। নদীর পার হওয়া আমার প্রয়োজন। মাঝিকে অশ্লীল ভাষায় ডাকার চাইতে, ভদ্র ভাষায় ডাকাই ভাল নয় কি? তাই 'বাবলা গাছে বাঘ দোলে' বলার চাইতে হরেকৃষ্ণ বলাটাই সুস্থ লোকের কাজ।

ধর্মহীন জীবন— ধর্মকে বাদ দিয়ে জীবন কল্পনা করা যায় না। মানবসমাজের উৎপত্তির কারণ ডারউইনের theory অনুসারে বংশরক্ষা। জর্জ বার্নাড শ'-এর ভাষায় বলতে হবে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Marriage means legal prostitution. ধর্মছাড়া marriage- কে ব্যাখ্যা করতে গেলে নারীর কি চরম অবমাননা হবে এবং তার ফল সহজেই অনুমেয়। সমাজ ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। আজকাল মানুষের ধর্ম-ঈশ্বর সম্বন্ধে অবিশ্বাস। এর উল্লেখ গীতাতেও আছে।

স্থানান্তরে গমন করে তবু মহাপুরুষের বাক্যে ফল পাওয়া যাবেই। বিশ্বাস করি বা না করি অবান্তর প্রশ্ন। যদি আমি বিশ্বাস করি আগামী কাল সূর্য উদিত হবে না, যতই যুক্তিতর্ক থাক সূর্য উঠবেই। আমাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাস-যুক্তিতর্কের জন্য ঈশ্বরের কাজ আটকে থাকে না। তিনি প্রমাণ করেন, তিনি আছেন, তিনি ছিলেন, তিনি থাকবেন—কারণ তিনি শাশ্বত, আত্মা (শুভবুদ্ধি) অজর নিত্য পরিণামহীন।

পরিশেষে আমার ঐকান্তিক আবেদন, আপনি প্রাজ্ঞ, সুলেখক— আপনি যত সময় ঈশ্বর নেই, প্রমাণ করার জন্য ব্যয় করেছেন, তার সিকিভাগ সময় 'তিনি আছেন' প্রমাণ করার চেষ্টা করুন। নিশ্চয়ই এর উত্তর পাবেন। ঈশ্বরহীন, ধর্মহীন সমাজ তো ধ্বংসের পূর্বাবস্থা। ঈশ্বরে বিশ্বাস করুন বা নাই করুন— তার পরিণাম কি আত্ম-জিজ্ঞাসা করুন, উত্তর পাবেন।

আমি অধম, জ্ঞানহীন। তাঁকে বর্ণনা করা বা আপনার মত প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে কোন বিষয় জানানো আমার ধৃষ্টতা। মহত্বের গুণ ক্ষমা, আপনি আমার অজানিত অপরাধ মার্জনা করবেন। ঈশ্বর-অবতার-মহাপুরুষ সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য শুনে আমার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেছে। তাই চিঠি লিখছি। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ, —দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহ— মানতে পারিনি। পরম কারুণিক নিশ্চয়ই আমাকে মার্জনা করবেন।"

—সুজিত কুমার ঘোষ, আগর পাড়া, ২৪ পরগনা (১৯৮৬ সালে লেখা)

লেখকের উত্তর : মূল্যবান চিঠি, হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য নিঃসন্দেহে।

সাধারণভাবে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের কাছ থেকেই এ ধরনের বক্তব্য আসে। তাঁদের সৎ ও সরল ধর্মবিশ্বাসের তাগিদ থেকে তাঁরা এমন যুক্তি ইত্যাদি দিয়ে থাকেন। সত্যি হোক, মিথ্যা হোক, যাঁরা তাঁদের দ্বিধাহীন বিশ্বাস মানুষের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করেন, তাঁরা অবশ্যই শ্রদ্ধেয়।

তবু পাশাপাশি সত্যকে জানাটা অন্যায় নয়। আত্মার যে ব্যাখ্যা সুজিতবাবু দিয়েছেন, তা অনেক বায়বীয় এবং আত্মাকে প্রকৃত অর্থে এ ভাবে বর্ণনা করা হয় না। শুভবুদ্ধি, ভালকাজ, সত্যজ্ঞান ইত্যাদির মতই আত্মা যদি কিছু একটা হয় তবে 'আত্মা' বলার দরকার কি? তাকে 'শুভবুদ্ধি' নামেই ডাকা উচিত,—আত্মা কথাটা বাতিল করে। স্বামী অভেদানন্দ-এর মত ব্যক্তিরা যাঁরা আত্মার ওজনের উল্লেখ করেন সুজিত বাবুর মতে তাঁরা 'অজ্ঞানী'। এবং এতে আমারও দ্বিমত নেই। আর আত্মা যদি শুভবুদ্ধি তথা বুদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী কিছু একটা হয়, তবে স্পষ্টতঃই পুনর্জন্ম তথা জন্মান্তরবাদ, কর্মফল, মৃত্যুর পর আত্মার শান্তি কামনা করে শ্রাদ্ধাদি, বর্ণভেদপ্রথাকে কর্মফল নির্ধারিত হিসেবে প্রচার করা ইত্যাদি অনেক কিছুই যে মিথ্যা, তা সুজিত বাবুর মত ব্যক্তিদের স্পষ্টভাবে ও জোরালোভাবে বলা দরকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে বাস্তবে মন-বুদ্ধি এসব নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের নার্ভতন্ত্র তথা শারীরিক অসংখ্য তড়িৎ রাসায়নিক ক্রিয়া বা তারই কাজের ফল আমাদের মন, চিন্তা, বুদ্ধি ইত্যাদি। তাই সুজিতবাবুর বক্তব্য শত শত বছর আগেকার মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, কল্পনাশ্রয়ী কথাবার্তার প্রতিফলন মাত্র।

ধর্ম, ধর্মীয় অনুশাসন, প্রাচীন ও আধুনিক সংবিধান, law ইত্যাদি যে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ও মানুষের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে, শ্রেণীভিত্তিক সমাজের শাসকশ্রেণীর স্বার্থবাহী—তাতে কোন ধরনের সন্দেহ অনেক ধর্মবিশ্বাসী ঐতিহাসিকরাও করেন না। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বা মনুসংহিতার অনেক কিছু ধর্মীয় রূপ পেয়েছে। এগুলি রাজা-পুরোহিত তথা শাসকশ্রেণীরই স্বার্থবাহী। অন্যদিকে যদি বলা হয়, এগুলি ধর্ম নয় বা ধর্মের অঙ্গ নয়, তবে বিভিন্ন ধর্মের কোন্ কোন্ অংশ আসলে ধর্ম আর কোন্‌টি আসলে ধর্ম নয়— তাও স্পষ্টভাবে বলা দরকার। বলা দরকার, 'সারা জগৎ মধুময় হোক', এটি হিন্দুধর্ম— কিন্তু মানুষকে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র হিসেবে ভাগ করা হিন্দুধর্ম নয়। বলা দরকার 'সর্বজীবে ঈশ্বর' এ কথাটিই হিন্দুধর্ম, কিন্তু কৌলিন্য প্রথা, গঙ্গাজল গায়ে ছিটিয়ে বা একবার হরিণাম জপ করে ধর্ষণকারী ব্যক্তিও অপরাধমুক্ত পাপমুক্ত হয়ে যাবে— এমন কথাবার্তা হিন্দুধর্ম বিরোধী। Law যে আদৌ common sense নয়, এবং তা সচেতন ব্যক্তিদের অনেক পরিশ্রমের ফসল তাতেও কোন সন্দেহ নেই। যাজ্ঞবল্ক্য বা মনু, পাল্কিওয়ালা বা আম্বেদকারের মত কয়েকজনই তা করেন— আপামর জনসাধারণ নয়। সবচেয়ে বড় কথা, এ সমস্ত ধর্ম মানুষই তৈরী করেছে তার নিজেরই জন্য। এবং বিভিন্ন সময়ে তার পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংযোজন, বিয়োজন হয়েছে আর হবেও। অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাওয়ায় অনেক ধর্ম এখন লুপ্ত, আবার সৃষ্টিও হয়েছে নতুন ধর্ম।

ঈশ্বরও যে মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের ফসল তা সুজিতবাবু পরোক্ষে স্বীকার করেছেন। কেউ যদি বলে 'আমি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে এটা জানি না, — বিজ্ঞানসম্মতভাবে জানার চেষ্টা' করছি আর অন্যদিকে কেউ যদি বলে, 'আমি জানি না, তবে মনে হচ্ছে একজন কেউ সৃষ্টি করেছে বা ঈশ্বরই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন'— তবে এদের মধ্যে কোন্‌টি সত্যের কাছাকাছি? মানুষের মস্তিষ্ক উন্নততম বলে তার কল্পনা করার ক্ষমতা সর্বাধিক— তাই ঈশ্বর জাতীয় কোনকিছুর কল্পনা করেছে সেই নিয়ানডার্থাল মানুষের আমলে— এখন থেকে প্রায় ৫০০০০ বছর আগে। কিন্তু বাঘ, সিংহ, বাঁদর, গরিলা— এরা ঈশ্বর কল্পনা করে নি, এবং তাদের এভাবে কোন ঈশ্বর না থাকার কারণে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে তা নয়। যা জানি না, তা এখনো অজ্ঞাত হিসেবে স্বীকার করাটাই কাম্য, কল্পিত কোন সিদ্ধান্ত নিলেও তা যে মিথ্যা বা মিথ্যা হতে পারে সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ে কোন পথিক আপনাকে বরানগর যাওয়ার রাস্তা কোনটা জিজ্ঞেস করলে, জানা না থাকলে তা স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া দরকার 'জানি না' এবং তা জানার চেষ্টা করার দরকার। কিন্তু বরানগর যাওয়ার একটা তো রাস্তা আছেই— অতএব নিজের কল্পিত যে কোন একটি পথ দেখিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথিককে 'সাহায্য' করাটা কি ঠিক? এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, পরিচালক ইত্যাদি হিসেবে কারোর অস্তিত্ব দ্বিধাহীন ভাবে প্রমাণিত হলে তা বিজ্ঞানমনস্করা অবশ্যই গ্রহণ করবেন। কারণ বিজ্ঞানমনস্কতার শর্তই এই—কোন জিনিষকে চিরসত্য, অপরিবর্তনীয় হিসেবে গ্রহণ করার গোঁড়ামি ও অন্ধবিশ্বাস না রাখা, বিজ্ঞানসম্মতভাবে কোন পুরনো তত্ত্ব বা তথ্য ভুল প্রমাণিত হলে তাকে 'ভুল' হিসেবে স্বীকার করা এবং নতুন কিছু সত্য হিসেবে প্রমাণিত হলে, তাকে দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ করা। অজ্ঞতাকে স্বীকার করাটা লজ্জার ও নিন্দার্হ নয়, এই অজ্ঞতার সমাধানের চেষ্টায় কোন যুক্তিযুক্ত কল্পনা ও অনুমান করার মধ্যেও লজ্জা বা নিন্দার কিছু নেই,—কিন্তু লজ্জার ও নিন্দার্হ হচ্ছে এই কল্পনা ও অনুমানকে 'কল্পনা ও অনুমান' হিসেবে স্বীকার না করে 'সত্য' হিসেবে গ্রহণ করা, প্রচার করা ও অন্যদের গ্রহণ করতে বাধ্য করা।

ড্রাগ খেয়ে সমস্যা ভোলার চাইতে নামজপ করে সমস্যা ভুলে থাকাটা তুলনামূলকভাবে বাঞ্ছনীয় হলেও মূলগত ভাবে দুটো একই। তথাকথিত ভাবাবেশ ইত্যাদির ফলে এই যে সমস্যা থেকে পলায়ন, তা কিন্তু সমস্যাকে বাড়ায় বই কমায় না এবং সাধারণ মানুষকে যারা শাসন করে তারা কিন্তু এভাবে মানুষকে নিষ্ক্রিয় ও সমস্যার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে অজ্ঞ করে রাখতেই চায়। আর এই উদ্দেশ্যেই এদের প্রচার। পাগল হয়ে যাওয়া আটকানোর জন্য মানসিক প্রশান্তি, নিরুদ্বিগ্ন সুনিশ্চিত জীবনই কাম্য— অশান্তি, অনিশ্চয়তা ও লাঞ্ছনা তথাকথিত নামজপে ভুলে থাকলেও সেগুলি দূর হয়ে গেল তাতো নয়। বরং বেড়েই চলে, —রোগের যন্ত্রণা ব্যথা কমানোর ওষুধ খেয়ে চেপে রেখে আসল রোগকে চিকিৎসা না করার মত সর্বনাশা এই মানসিকতা।

ধর্মহীন জীবন মানুষের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার আগের অবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন সুজিতবাবু। বুদ্ধ বা মহাবীর কিন্তু ঈশ্বর-বেদ-বর্ণাশ্রম তথা তখনকার প্রচলিত হিন্দুধর্ম অস্বীকার করেই তাঁদের মতাদর্শ প্রচার করেছিলেন ; হিন্দুদের কাছে তাঁরা ছিলেন নাস্তিক। হিন্দুদর্শনেরও সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক ইত্যাদির মধ্যে ঈশ্বর বিরোধী ও প্রচলিত ধর্মবিরোধী চিন্তা ছিল। এসবের কারণে মানবজাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত যে হয় নি তাতো আমরা দেখছিই।

সরকারী হিসেবেই বর্তমান পৃথিবীতে ১১০ কোটিরও বেশি মানুষ ঈশ্বর ও প্রচলিত ধর্মে বিশ্বাস করেন না। তাঁরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছেনও না, তাঁরা পৃথিবীবাসীর কাছে বিপদস্বরূপও নন। বরং তাঁরাই যথার্থভাবে প্রচলিত ধর্ম রক্ষার চাইতে মনুষ্যত্ব ও মানবিক মূল্যবোধ, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার— এসব রক্ষা করে মানবজাতিকে সুস্থ সুন্দর জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার কথা আন্তরিকভাবে বলেন। তাঁরা কল্পিত ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করার চেয়ে, মানুষকে শ্রদ্ধা করেন ও ভালোবাসেন। তাঁদের কাছে মনুষ্যত্বের ধর্মই প্রকৃত ধর্ম—ঈশ্বরকেন্দ্রিক হিন্দু-ইসলাম-খ্রীষ্ট ইত্যাদি নয়।

এবং মানুষের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার কারণ কখনোই ঈশ্বরে অবিশ্বাস বা ঈশ্বরকেন্দ্রিক ধর্মে অবিশ্বাস নয়। বরং এটি প্রমাণিত যে— ধর্মের প্রকৃত বক্তব্য যাই হোক না কেন— ধর্মকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ধর্মযুদ্ধ, ধর্মান্ধতা ইত্যাদি লক্ষ লক্ষ মানুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্যু ও লাঞ্ছনার কারণ হয়েছে। এবং সম্প্রতি মানবজাতির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে যুদ্ধবাজ, অস্ত্রধর, ক্ষমতালোভী দু'একটি দেশের মুষ্টিমেয় শাসকগোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। সুজিতবাবুর মত ব্যক্তিরা যখন বিশ্বাস করেন বা প্রচার করেন যে, মানুষের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার কারণ তথাকথিত ধর্মহীনতা, ঈশ্বরে অবিশ্বাস ইত্যাদি— তখন তাঁরা সচেতন বা অসচেতনভাবে, এই সাম্রাজ্যবাদী, যুদ্ধবাজ শাসক গোষ্ঠীকে তথা ধর্মান্ধ, গোঁড়া মৌলবাদীদের আসামীর কাঠগড়া থেকে নামিয়ে মুক্ত করে দেন। আর এভাবেই মানবজাতির স্বার্থবিরোধী এই সব শক্তিকে সাহায্য করেন। এরাও তাই চায় এবং চায় বলেই সুজিতবাবুর মত সরল ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে এমন সব ধারণা গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করে, তাঁদের মুখ থেকে ঐসব কথা বলায়।

সুজিতবাবু সর্বশেষে ঈশ্বরকে খোঁজার অনুরোধ জানালেও, তাঁর পরামর্শমত 'আত্মজিজ্ঞাসা' করে যা বুঝেছি, তাতে এটি স্পষ্ট যে, মানুষকে যদি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের জীবনকে সুস্থ ও সুন্দর করতে হয় এবং মানবজাতিকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে হয়— তবে তাকে ঈশ্বর ও ঈশ্বরকেন্দ্রিক ধর্মবিশ্বাসের গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হতেই হবে। কল্পনা ও পরিকল্পিত প্রচারের জাল ছিঁড়ে আন্তরিকভাবে জানতে হবে সত্যকে, ভালবাসতে হবে মানুষকে, রক্ষা করতে হবে নিজের মানবিকতা ও মানবিক মূল্যবোধকে, অর্জন করতে হবে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার অধিকারকে।

(১৪)

"আপনার 'ভূত-ভগবান-শয়তান বনাম ডঃ কোভুর' বইখানা এত দিনে পড়া শেষ করেছি। পড়ে আমি মুগ্ধ। এর বেশি আর কিছু বলার ভাষা নেই।

সব শেষে 'পরিশিষ্ট'-এ পাঠক বর্গের চিঠি ও উত্তরগুলিও পড়লাম। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মতামত জানাবার ক্ষমতাও নেই। তবে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় আবেগ ও অনুভূতিতে কিছু লিখবার লোভও সামলাতে পারলাম না। সুজিতবাবুর, চিঠিটির সঙ্গে আমার মতও সম্পূর্ণ মিলে গেছে। সেই সঙ্গে আপনার উত্তরও ভীষণ মনঃপূত আমার। আপনি একদিকে যেমন বলেছেন, মন বুদ্ধি এসব নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের নার্ভতন্ত্র তথা শারীরিক অসংখ্য তড়িৎ রাসায়নিক ক্রিয়া, অন্যদিকে উল্লেখ করেছেন 'হৃদয়' কথাটিরও ('মূল্যবান চিঠি, হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য নিঃসন্দেহে')। এই হৃদয়কেই আমরা অজ্ঞ মানুষেরা ভাবি ঈশ্বর। আপনি বলেছেন, 'মানুষ শ্রদ্ধা করুক ভালোবাসুক মানুষকেই, মানুষ নির্ভর করুক নিজেরই শক্তি ও সামর্থের উপর'।

সত্যি কথা বলতে কি মানুষ তো মানুষকেই ভালোবাসতে চায়, ভালোবাসা পেতে চায়। কিন্তু যখন মানুষের যোগ্যতার অভাবে হৃদয়হীনতার জন্য মানুষকে ভালোবাসতে পারে না, কেবল তখনি কাল্পনিক ভগবান ও দেবদেবীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এবং সেখানে গোপনে মনের কথা জানায় চোখের জল ফেলে। শক্তি ও সামর্থ তো সবার যথেষ্ট থাকে না।

আর একটা কথা আমার জানবার আছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর মৃত্যুর আগের দিন নিবেদিতাকে স্বহস্তে খাওয়ালেন ও নিজের হাতে জল ঢেলে হাত ধুয়ে পরিষ্কার করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিলেন। এবং তাঁর জীবনের বাকি কাজগুলির দায়িত্ব তাঁর হাতে তুলে দিয়ে দেহ রাখলেন। তার অর্থ উনি জানতেন, তাঁর সময় ফুরিয়ে এসেছে। এটা কি করে সম্ভব? স্বামীজির এই ইচ্ছামৃত্যুর বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা কি?"

— শ্রীমতী শিবানী কর্মকার, দুর্গাপুর, বর্ধমান (১৯৯৪ সালে লেখা)

লেখকের উত্তর: 'হৃদয়'-কে ভগবান বলাটা কখনোই প্রচলিত নয়। প্রায় কোন ঈশ্বর বিশ্বাসী ব্যক্তিই বলবেন না যে, বিপদে তিনি যখন বলেন, 'হে ঈশ্বর, রক্ষা কর', তখন আসলে তিনি বলেন, 'হে হৃদয়, রক্ষা কর!' 'হৃদয়' কথাটি শারীরবিজ্ঞান মতে 'heart' -এর সমার্থক হলেও, শব্দটির ভিন্নতর ব্যঞ্জনা রয়েছে, যা আমরা হামেশাই ব্যবহার করি।

মানুষ যে সমাজে নালিশ জানানোর মত, শ্রদ্ধা করার মত, ভালবাসার মত কাউকে না পেয়ে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, আদর্শ এক অলৌকিক চরিত্রকে আঁকড়ে রাখতে চায়, তাতে কোন দ্বিমত নেই। বইটিতে তার উল্লেখও আছে। মার্কস এই কারণেই বলেছেন,—হৃদয়হীন পৃথিবীতে ধর্ম মানুষের কাছে এক আশ্বাসদায়ী হৃদয়। কিন্তু তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে না এবং এমনভাবে সচেতন হয়েও সাধারণত কেউ ঈশ্বর কল্পনার সৃষ্টি করে না বা তাকে আঁকড়ে রাখে না।

অলৌকিক কোন উপায়ে নিজের মৃত্যুর সঠিক মুহূর্তটি কারোর পক্ষে আগে থেকে জানা সম্ভব নয়। বড়জোর যেটা হয়, ক্যান্সার বা অন্য কোন দুরারোগ্য রোগে ভুগে কিংবা নিজের অসুস্থতার মাত্রা আঁচ ক'রে—বাস্তব কারণেই, অনেকে অনুভব করতে পারেন যে, তাঁর মৃত্যুর আর বেশি দেরি নেই। স্বামী বিবেকানন্দ এভাবে কিছু আঁচ করতে পেরেছিলেন কিনা জানা নেই। তবে তা অসম্ভব নয়। নিজের ইচ্ছায় প্রাণত্যাগ করা তথা ইচ্ছা মৃত্যুও সম্ভব নয়। যা হতে পারে তা হল আত্মহত্যা। কিন্তু আত্মহত্যার কোন উপায় অবলম্বন না ক'রে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে নিজের ইচ্ছায় অলৌকিক উপায়ে নিজের মৃত্যু ঘটানো যায় না। তবে অতি বিরল ভাবে, কেউ নিজের তীব্র মানসিক আবেগে মারা যেতে পারেন—কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সক্রিয়ভাবে কাজ করে তাঁর মস্তিষ্ক।

(১৫)

"আপনার বইগুলি পড়ার সযোগ যুব বেছি (বেশি) হয় নাই। তবুও আপনার বই বলতে 'ভূত-ভগবান-শয়তান বনাম ডঃ কোভুর' পঢ়িতে (পড়িতে) পাই গত পাঁচ বছর আগে থেকে।-------

আমি ছোট বেলা থেকেই ভারতীয় সামাজিক অন্ধবিশ্বাস-কুসংস্কার, ধর্মীয় ভন্ডামির ও সাম্প্রদায়িকতার বিষয়ে চিন্তা করে আসছি। মানুষ মানুষের প্রতি ঘৃণাভাব, হিংসা ও অস্পৃশ্যতার ফাঁকটা কেন রাখে, ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে (সম্পর্কিত) কথায় আমাদের ভারতবর্ষের মানুষে চৈতন্য ও জড়বাদী বিভাজন রেখে জাতি উপজাতির এক একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছে তার জন্য আপনি ও ডঃ কোভুর বলার মত—এটা দেবতার দায়ি নয় বরং মানুষেই (ধর্মের যাজকেরা) দায়ি।------

এইগুলি (এইসব) সামাজিক মতানৈক্য দেখে আমি গত ১৯৮৩ সালে----অসমীয়া ও বড়ো ভাষার দু'টিতে (পত্রিকায়) 'ঈশ্বর নাই' বলে প্রবন্ধ লেখিয়া দিয়াছিলাম। (অসমীয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষার পত্রিকা 'রাজপথ' আর বড়ো ভাষার পত্রিকা 'গুমুর'।)

যখন আমার 'ঈশ্বর নাই' প্রবন্ধটি প্রকাশ পেল, তখন আমার শ্বশুরের ভাই (যারা খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত সেই ব্যক্তি) আমার ওপর গ্রাম্য পঞ্চায়েত বিচার ডেকেছিল। কিন্তু সেই বিচারে আমি নাস্তিক্যবাদের (স্বপক্ষে) প্রবল যুক্তি সহকারে ২২ পৃষ্ঠার উল্টো অভিযোগ দেই। সেইজন্য বিচারে কোন কিছুই, বিচারক বর্গই, মত দিতে পারিল না।

স্থানীয় আর একটি পত্রিকা 'অভিযাত্রী'-তে 'ইতিমধ্যে জোলোওার মেকুরী সাধু ধরা পরিছে', (অসমীয়া ভাষাই) ধর্মীয় গোরামী (গোঁড়ামী) ধূর্ত গুরুদের চরিত্র প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছিল। যার ফলে, পিয়লী নগর-শিবসাগরের নিবাসী, 'স্বর্গীর ইমদাদ ইয়াচিনের' সাথে অনেকবার বিতর্কমূলক কলম যুদ্ধ করিতে হয়েছে।

আমি বেঙ্গলী নয়, তাই বাংলা ভাষার বই পঢ়তে (পড়তে) পারিলেও ভালোভাবে লেখিতে পরি না। কারণ বাংলা ভাষার ব্যয়াকরণ জ্ঞান আমার নাই।------

আমার কোনো চাকরি নাই ও ব্যবসাও নাই। আমি সাধারণ কৃষক। আমার ঘরের অবস্থা খুবই সুবিধাজনক নয়। আপনি বোধ হয় জানেন— অরুণাচল প্রদেশের নিচে লক্ষীমপুর/ধেমাজির সামাজিক ব্যবস্থা আদিবাসীর মত (গ্রাম্য জীবন) খুব বেছি (বেশি) উন্নত নয়। সেই অনুন্নত সমাজের মানুষ হিচাবে (হিসাবে) আমার শিক্ষা, জ্ঞান, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা খুবই সীমিত।"

—মথুর বসুমতারী ; বেত বাড়ি কৌপাটানি, ধেমাজি, আসাম (১৯৯২ সালে লেখা)

(১৬)

"আমি বাংলাদেশ কৃষি কলেজ, ঢাকা-এর ৩য় বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষার একজন পরীক্ষার্থী----। এককালে বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির সাথে যুক্ত ছিলাম (মতাদর্শ কারণে পদত্যাগ করি)। কিন্তু এখনও মার্কসবাদে বিশ্বাসী। কয়েকদিন আগে ঢাকার নিউ মার্কেট থেকে আপনার লিখা 'ভূত-ভগবান-শয়তান বনাম ডঃ কোভুর' বইটি কিনে পড়লাম। খুব ভাল লাগল, মনে মনে এ ধরনের বই খুঁজছিলাম।----

আমি এদেশে আপনার মত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করার জন্য সংগঠন গড়ে তুলতে আগ্রহী। এ ব্যাপারে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?----

আপনার উপরি উল্লেখিত বইটিতে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে খুব কমই আলোচনা করা হয়েছে। কারণটি জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।----"

— বিক্রম চৌধুরী ; শেরে বাংলানগর, ঢাকা, বাংলাদেশ (১৯৯১ সালে লেখা)

লেখকের উত্তর: ইসলাম ধর্ম প্রসঙ্গে বইটিতে তুলনামূলক কম আলোচনা থাকার কারণ ডঃ কোভুর-ই এ প্রসঙ্গে প্রায় কোন আলোচনাই করেন নি। যেহেতু বইটি ডঃ কোভুরের বই দুটির উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে, তাই এ ব্যাপারটির প্রতিফলনও ঘটেছে। বইটিতে প্রসঙ্গক্রমে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যতটুকু আলোচনা করা হয়েছে, তার প্রায় সবটুকুই আমার সংযোজন। তবে জন্মসূত্রে অ-মুসলমান হওয়ার কারণে, এবং আরো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু বাস্তব দিক বিচার করে, এ ব্যাপারে আরো বেশি আলোচনা সংযুক্ত করা যায় নি।

বাংলাদেশেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করার জন্য সংগঠন গড়ে তোলার কাজ অত্যন্ত মূল্যবান ও প্রয়োজনীয়। তবে এ কাজ সংগঠিত করতে হবে, নিজেদের পরিবেশ-পরিস্থিতির বিচার করেই। এর জন্য অন্য 'দেশ' থেকে বিস্তারিত বিশেষ নির্দেশ বা পরামর্শ দেওয়া শোভনও নয়, কার্যকরীও নয়। শুধু এটুকু বলা যায় যে, সমমনস্ক আরো কিছুজনকে সংগ্রহ করতে হবে বা তাঁদের তৈরী করতে হবে, তারপর ঐক্যবদ্ধ সংগঠনের কাজ।

(১৭)

"----- HS পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে বই আনতে গিয়ে দোকানে হঠাৎ এ বইটি চোখে পড়ে এবং তখন বইটি বাড়ি এনে ভাল করে ডঃ কোভুরের নানান সত্য অভিজ্ঞতা ও সংগ্রামের কাহিনী পড়ি। এই বইটি আমার মনের এতদিনের চাপা সত্যকে উন্মুক্ত করেছে,-----। কিন্তু ডঃ কোভুরের সত্যতা বা অভিজ্ঞতার কাহিনী যে সত্য, তা লোককে কি করে বিশ্বাস করাব? অনেকে তো এই বইটাকে আপনার সাজানো গল্প বলছে। যারা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে অন্ধ তাদের কি করে বৈজ্ঞানিক যুক্তির দৃষ্টি দেব? এর উত্তরটি আপনি সরল ভাষায় আমাকে যদি জানান তবে জানব আপনি সত্যই একজন আদর্শ সমাজ চেতনাদর্শী, বিজ্ঞান মনোভাবদর্শী ও সত্য যুক্তিবাদী----।

আমার কয়েকটি প্রশ্ন—ডঃ কোভুরের ছেলে কি এখন বেঁচে আছেন? বেঁচে থাকলে তাঁর বাবার চ্যালেঞ্জটি বলবৎ রেখেছেন? তাঁর এখন বর্তমান ঠিকানাটি আপনি কি জানেন?

মানসিক রোগযুক্ত রোগীদের কিভাবে সম্মোহন করা হয় এটি বইতে লিখে দিলে হয়তো অনেকেই এই রোগ সহজে সারাতে পারতো।-----"

—মানস কুমার সাহা, নবদ্বীপ, নদীয়া (১৯৯০ সালে লেখা)

লেখকের উত্তর : ডঃ কোভুর যে সত্যি কথা বলেছেন তা এখন তো সরাসরি প্রমাণ করা মুস্কিল, যেমন সাধারণ মানুষের কাছে সরাসরি প্রমাণ করা মুস্কিল যে, প্লুটো গ্রহ আছে কিংবা পরমাণুতে প্রোটন-নিউট্রন-ইলেকট্রন আছে। একইভাবে একজন শুধু মুখে বলে অর্থাৎ অভিশাপ দিয়ে একজনকে ভস্ম করে দিলেন, কিংবা যীশুখ্রীষ্ট জলের উপর হেঁটে গেলেন ইত্যাদি জাতীয় প্রাচীন বর্ণনাও সত্য ছিল কিনা তা সরাসরি প্রমাণ করা মুস্কিল। কিন্তু যুক্তি নির্ভর প্রমাণ ও আলোচনার মধ্য দিয়ে কোন্‌টি সত্য আর কোন্‌টি মিথ্যা তা বোঝা ও বোঝানো যায়। প্লুটো বা পারমাণবিক কণিকার অস্তিত্ব সব মানুষকে সরাসরি দেখানো না গেলেও, যে কেউ তা একটু কাঠ-খড় পুড়িয়ে দেখে নিতে পারেন, এবং বহু বিজ্ঞানী তা দেখেছেনও। এদের স্বপক্ষে পরোক্ষ বৈজ্ঞানিক যুক্তিও আছে। তাই এদের সত্যি ধরা হয়। অন্যদিকে কোন চালাকি ছাড়া, মুখের কথায় আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া বা জলের উপর হাঁটার ব্যাপারগুলি কোনভাবেই প্রমাণ করা যায় নি। এদের স্বপক্ষে বিজ্ঞানসম্মত কোন যুক্তিও নেই। তাই এগুলিকে মিথ্যা বা কল্পনা হিসেবেই গণ্য করা হয়। এই ধরনের বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগ ও প্রমাণের মধ্য দিয়েই ক্রমশঃ সত্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৌঁছনর চেষ্টা করা হয়। ডঃ কোভুরের ঘটনাবলীকেও কেউ এভাবে ভিন্ন ক্ষেত্রে সত্যি বলেই দেখে নিতে পারেন এবং বাস্তবত তা অনেকে আগেও পেরেছেন ও এখনো পারছেন। তাই সেগুলি তাঁর বা আমার সাজানো ব্যাপার বলে সন্দেহটা ধোপে টেকে না। যাই হোক বইতেই এ প্রসঙ্গে নানা যুক্তি ও প্রমাণ দেওয়া আছে।

ডঃ কোভুরের ছেলেকে ভারতীয় ফরাসী দূতাবাসের মাধ্যমে চিঠি পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু প্রাপকের অভাবে সে চিঠি ফেরৎ এসেছে। তাই বর্তমানে তিনি বেঁচে আছেন কিনা, থাকলে কোথায় আছেন—তা জানা নেই। তবে এ বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর, পশ্চিমবাংলায় ও বাংলাদেশে, ডঃ কোভুরের মত কেউ কেউ 'চ্যালেঞ্জ' রেখেছেন। কেউ ইচ্ছে করলে ঐ সব 'চ্যালেঞ্জ'-এ সাড়া দিয়ে দেখতে পারেন।

সম্মোহনবিদ্যা শেখানোর ব্যাপারটা বইটির আওতার মধ্যে ছিল না। তাই এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানানো হয় নি। আর এটি শুধু কয়েক পৃষ্ঠার কৌশল পড়ে শেখাও মুস্কিল। 'যুক্তিবাদী' নাম নিয়ে এখন কেউ কেউ এ নিয়ে ব্যবসা করলেও জানা গেছে তাঁরাও আদৌ ব্যাপারটা জানেন না এবং লোক ঠকাচ্ছেন। সম্মোহনবিদ্যা ও সম্মোহন চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ মনোবিদচিকিৎসকের আওতার মধ্যে পড়ে। তবে কেউ উপযুক্ত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ নিয়ে এবং অভ্যাসের পর তা শিখতে পারেন। প্রসঙ্গত, পেশাগতভাবে চিকিৎসক হলেও, ব্যক্তিগতভাবে আমিও সম্মোহনচিকিৎসা জানি না।

সব শেষে এটি বলা দরকার যে, মানুষকে বিজ্ঞানচেতনায় শিক্ষিত করতে হলে মানুষের মধ্যেই সম্পৃক্তভাবে মিশে থেকে আগে নিজেকে যতদূর সম্ভব প্রস্তুত করতে হবে ; ধৈর্যের সঙ্গে, দীর্ঘকাল ধরে আরো অনেককে সাথী করে—মানুষের আস্থা অর্জন করতে হবে এবং যুক্তি-প্রমাণ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতে হবে। অহেতুক গালাগালি করে, সরলবিশ্বাসী সাধারণ মানুষকে আঘাত করে, অধৈর্য হয়ে বা রেগে গিয়ে, উদ্ধত উন্নাসিক ও সবজান্তা মনোভাব নিয়ে—এ কাজ করা যায় না। আরো বড় কথা—বিশেষ পরিস্থিতিতে কর্মপদ্ধতি ঠিক করতে হবে ।নজেদেরই,— কারোর চাপিয়ে দেওয়া বাঁধাধরা শর্তে এ কাজ করা মুস্কিল।

(১৮)

"এটি এক পূর্বপরিচয়হীন অপ্রসিদ্ধনামবিশিষ্ট ভিনদেশী ব্যক্তির কাচনকী। বিরাট ব্যক্তিদের নিকট মাঝেমধ্যে উটকো কাগাবগাদের চিঠিপত্র এসে পড়ে। অতিব্যস্ত ও অতিবিজ্ঞ ব্যক্তিরা ওসব না খুলেই ওয়েস্টপ্যাপার বাসকেটে ফেলে দিয়ে থাকেন।

বিরাশি সালের শেষের দিক কি তিরাশি সালের প্রথম দিক থেকে আপনার চিন্তাগর্ভ লেখার সঙ্গে জানপহচান, নৈকট্য ও অন্তরঙ্গতা। আপনার বহুল পরিচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রথমে যেটি পড়ি তা হচ্ছে 'ভূত-ভগবান-শয়তান বনাম ড: কোভুর'। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে ফেলিনি সত্য, কিন্তু দিন দশেকের মধ্যে পড়তে শুরু করি এবং পড়ে যারপরনেই অভিভূত হই। আপনার 'ওষুধ খেয়ে অসুখ' ভাল হয়েছে; আপনার 'শরীর ঘিরে সংস্কার' আমাকে মুগ্ধ করেছে। 'অধার্মিকের ধর্ম-কথা' চমৎকার। 'ধর্মের উৎস সন্ধানে নিয়ানডারথাল থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাস্তিক' অসফল হয়নি। 'মানব সন্তান ঈশ্বর ও অন্যান্য প্রসঙ্গ,' 'অলৌকিকতা বনাম বিজ্ঞান', 'দুই বাংলা : হায় ধর্ম!' প্রভৃতি মূল্যবান গ্রন্থ পড়েছি। 'সংস্কার-কুসংস্কার' কিনেছি, হারিয়ে গেছে। আর কেনা হয়নি, কাজেই পড়া হয়নি।' 'দুই বাংলার কুসংস্কার বিরোধী বিজ্ঞানচিন্তা, বেশ প্রশংসাযোগ্য। আপনার গুণগ্রাহী না হয়ে উপায় ছিল না। গুণাকর গুণানুরাগ সৃষ্টি করবে, চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করবে এটিই বিধির বিধান, প্রেরিত নিয়ম-রীতি। চৈতি বাসন্তী শুভেচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেই বর্ষশুরুর নৈদাঘী বৈশাখী শুভেচ্ছা! আপনার সহধর্মিণী, সহকর্মী ও সহমর্মী বেগম আরতী চট্টোপাধ্যায়ের জন্যও রইল নববর্ষের অন্তরউষ্ণ শুভাশংসা।

আপনাকে লিখবার ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল বেশ কয়েকবার। কিন্তু ঠিক ঠিক ঠিকানা জানা না থাকায় লিখা হয়ে ওঠেনি। এতদিন অপেক্ষা করেও যখন জানা হয়নি তখন আরেকবার চেষ্টা করা যথান্যায় বলে মনে করি।

আপনার অসাধারণ মূল্যবান গ্রন্থাবলী পাঠ করে মনে হয়েছে আপনার সঙ্গে আমার চিন্তার যথেষ্ট মিল রয়েছে। অবশ্য গরমিল ও অমিল রয়েছে কোনও কোনও ক্ষেত্রে — তবে উদ্দেশ্য আমাদের তেমন ভিন্ন নয়। তাই আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় থাকা দরকার, যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন, মত বিনিময় অপরিহরণীয়। এ বক্তব্য অবশ্য আমার পক্ষের বক্তব্য। আপনার মত, বিশ্বাস ও বক্তব্য অনুরূপ বা অন্যরূপ হতে পারে। যদি ভিন্নরূপ হয় কিংবা বিপরীতরূপ হয় তাহলে আমার পত্র আপনার বৈরক্ত্য উৎপাদন করবে এবং সময় নষ্ট করবে। আমি কেবল ক্ষমা চাইতে পারি। আর বলতে পারি, Let us agree to disagree!"

— শফিকুর রহমান, ঢাকা — ১২১৯, বাংলাদেশ (এপ্রিল, ১৯৯৭-এ লেখা)

১৯

"আপনার লেখা ভূত-ভগবান-শয়তান-বনাম-ড:-কভুর বইটি পড়লাম। একটি তথ্য বহুল বই পড়ে সত্যিই খুব ভাল লাগলো। বইটি লেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। বইটি পড়ে জানলাম কিভাবে কিছু সংখ্যক স্বার্থসন্ধানী সাধু শুধুমাত্র ধর্মের নামে নির্বোধ, দরিদ্র, অসহায় মানুষদের দিনের পর দিন ঠকাচ্ছে। আমি কোনও দিনই ঈশ্বর ভূত শয়তান এ সব বিশ্বাস করতাম না। এখন আপনার লেখা আমার বিশ্বাসকে আরও মজবুত করলো। অন্যান্য যা কিছু আপনি লিখেছেন সব সত্যি কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই মানতে পারলাম না যে পৃথিবীতে জ্যোতিষ বলে কিছু নেই। হস্ত রেখার ব্যাপারে আপনি যাবতীয় প্রশ্ন তুলেছেন। শ্রী সৌগত বাগচী, ধুবড়ী আসাম থেকে ১৯৯১ সালে আপনাকে চিঠিতে ঠিক এই ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলে। প্রশ্নটি ছিল আপনি মাতৃগর্ভে থাকাকালীন হাতের ভাঁজের কথা বলেছেন। এই ব্যাখ্যা থেকে প্রথমেই যে প্রশ্নটি ওঠে সেটা হল তাহলে ঊর্ধরেখা সমূহের উৎপত্তি কী যেমন Fate line, line of liver, sunline venus

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

line, Mercury line etc. উত্তরে আপনি লিখেছেন যে আঙুলের নাড়াচাড়ার জন্য, গাঁটের অবস্থান অনুযায়ী সৃষ্টি এটা। বিজ্ঞান সম্মতভাবে প্রমাণিত। এখন আমার প্রশ্ন সবার হাতে কেন ভাগ্য রেখা রবি রেখা দেখা যায় না। তারা কী আঙুল নাড়াচাড়া করেনা। আর যদি আঙুল নাড়াচাড়ার জন্য এটা হয়ে থাকে তাহলে যাদের মনিবন্ধ থেকে ভাগ্যরেখা দেখা যায় সেক্ষেত্রে কী আঙুলই দায়ী। যাদের হাতে ভাগ্য রেখা নেই এবং তারা যদি অনবরত আঙুল নাড়ে তাহলে কী ভাগ্য রেখা উঠে যাবে। আমার মতে ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল। জ্যোতীষ যদি গাঁজাখুড়ি ব্যাপার হতো তাহলে লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষ একে বিশ্বাস করে কেন? নিশ্চয় কারো না কারো কিছু না কিছু ভবিষ্যত্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই কী কাকতালীয় ব্যাপার ঘটেছে। আসলে যে মানতে চায়না তাকে বোঝানোর চেষ্টা করা বৃথা। যে সব ছেলেরা পড়াশোনা করতে চায়না তাদেরকে যেমন জোর করে পড়ান যায় না ঠিক সেরকম। দুটো হাতের ছাপ দেখে ছেলে না মেয়ে মৃত না জীবিত। এই চ্যালেঞ্জ এর কথা বইতে লেখা আছে। উত্তরে আমি বলবো যেমন জানার কোনও শেষ নাই, তেমনই জ্যোতিষের অনেক তথ্য আমরা জানিনা। তাছাড়া এ বিদ্যা সম্পর্কে কতটুকুই বা আমরা জানি। এগুলি মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করে দীর্ঘ সময় ব্যায় করে আবিষ্কার করতে হবে। আমি আপনাকে অনুরোধ করবো আপনি মনীষি কিরোর লেখা জ্যোতীষ গ্রন্থগুলো পড়ুন এবং নিজের হস্তরেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। দেখবেন অনেক কিছুই সত্য হবে। এবং আপনি মানতে বাধ্য হবেন যে জ্যোতীষের অস্তিত্ব আছে। হ্যাঁ এটা একটা ভাল চেষ্টা যে মানুষকে কুসংস্কার মুক্ত করা। কিন্তু তাই বলে জোতীষশাস্ত্র গাঁজাখুরি বলাটা হাস্যকর। আমি জ্যোতীষে বিশ্বাসী এবং আমি নিজে হস্তরেখা বিচার করি। (কোনও পারিশ্রমিক নিওনা, এটা আমার শখ)

আমি আপনাকে জানাতে চাই, কি ভাবে জ্যোতীষির ভবিষ্যত বাণী আমার জীবনে সত্য হয়েছিল।

১. একজন নামকরা জ্যোতীষি আমার বাবাকে বলেছিলো আপনার মামলা মোকদ্দমা আসছে। সে সময় বাড়িতে একটা ঝামেলা চলছিল। আমরা ভাবছিলাম ঐ জন্যই বোধ হয় জ্যোতিষী আন্দাজে বললো। ঠিক করলাম আমরা কেসে যাব না এবং এটা মিথ্যা প্রমাণ করবো। কিন্তু তা স্বত্তেও আমাদের বিপক্ষের কাছ থেকে মোকদ্দমার নোটিস আসে। এবং বর্তমানে কেসটা চলছে।

২. আমি বলেছিলাম দিদির বিয়ে অভিবাবকদের অনিচ্ছার বিরুদ্ধে হবে। সেটা সত্যি হয়।

৩. উচ্চ মাধ্যমিকের পর আমার পড়াশোনা হবেনা— এই ভবিষ্যত বাণীও সত্যি হয়।

এমনি আরও অনেক ভবিষ্যত্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়। সবগুলি লিখলাম না। তাহলে চিঠি অনেক দীর্ঘ হবে। আপনি হয়তো ভাবছেন আমি নিজের মনগড়া কিছু ঘটনা লিখলাম। কিন্তু মহাশয় আপনি বিশ্বাস করুন আমি সব সত্য কথা লিখলাম। এক কণাও বাড়িয়ে বলছিনা। এগুলিকে আপনি কি বলবেন কাকতালীয় ব্যাপার। বিজ্ঞান যেমন সমস্ত কিছু জয় করতে পারেনি তেমনই জোতীষ বিদ্যার সাহায্যে এ মুহূর্তে সবকিছু বলা সম্ভব নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়তো অদুর ভবিষ্যতে জোতিষের আরও উন্নত কোনও দিক খুলে যাবে যার সাহায্যে মানুষের ভবিষ্যত সমন্ধে সব prediction নির্ভুল ভাবে বলা যাবে। সেদিন বিজ্ঞানও জ্যোতীষ শাস্ত্রের অস্তিত্বকে স্বীকার করবে। আমি আপনাকে অনুরোধ করবো আপনি জ্যোতীষের বই পড়ুন এবং আমার কথা মিলিয়ে দেখুন। সৌগত বাগচী আপনার হস্তরেখা সম্বন্ধে যে ভবিষ্যত বাণী করেছিল আপনার ক্ষেত্রে তার অনেক কিছুই মিলে গেছিল। তাই আপনি লিখেছেন — অন্যান্য গুলিও কমবেশি সত্য বা মিথ্যে যা আরও অনেকের হাত না দেখেই বলা যায়। এক্ষেত্রে অ: .নিও জানেন, উনি ঠিক ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন। যেহেতু আপনি বইটি লিখে ফেলেছেন এবং এখন যদি আপনি সৌগত বাগচির চিঠি সমর্থন করেন তাহলে আপনি হেরে যাচ্ছেন। তাই চালাকির সঙ্গে আপনি ব্যাপারটিকে এড়িয়ে গেছেন। আপনার চালাকি কিন্তু সকলেই ধরে ফেলেছে এবং আপনি জিতেও হেরে গেছেন। ধন্যবাদান্তে—”

—শ্রী রাহুল দেবনাথ, আসানসোল, বর্ধমান (নভেম্বর, ১৯৯৮ সালে লেখা)

(পত্রলেখকের সব বানান ঠিক করা হয় নি)

লেখকের উত্তর : শ্রী দেবনাথ অন্য কুসংস্কার সম্পর্কে নিজের ‘মোহমুক্তির’ কথা বললেও জ্যোতিষবিদ্যা সম্পর্কে যে দুর্বলতা পোষণ করেন তা বোঝা যাচ্ছে। জ্যোতিষবিদ্যা কেন অপবিজ্ঞান ও মিথ্যা আগে বহুবারই বলা হয়েছে। পুনরুক্তি করে উত্তর দীর্ঘায়িত না করাটাই ভাল। কয়েকটি ভবিষ্যদবাণীর ‘সঠিকতা’ জ্যোতিষবিদ্যার যাথার্থ্য প্রমাণও করে না। একইভাবে আন্দাজে বলা বা সাংবাদিকদের করা ‘ভবিষ্যদবাণীও’ অনেক সত্যি হয়। পত্রলেখক যেহেতু সরাসরি আক্রমণ করেছেন, তাই এটি জানানর প্রয়োজন যে ব্যক্তিগতভাবে আমিও কিরোর হস্তরেখা সংক্রান্ত বই পড়েছি এবং অন্যান্য কিছু লেখকেরও। তার মধ্যে নিছক এই ধরনের কিছু ‘উদাহরণ’ ছাড়া জ্যোতিষবিদ্যার বৈজ্ঞানিক ভিত্তির সম্পর্কে কিছুই পাই নি। এত সব কিছুর আগে কিরোর বই পড়ে আমিও এক সময় জ্যোতিষচর্চা করেছিলাম। আমার বেশ ‘কিছু কথা’ মিলেও গিয়েছিল। এ ব্যাপারে আমার ‘আস্তিক-নাস্তিক’ বইটিতে কিছু আলোচনা করেছি। শ্রী দেবনাথ বা অন্যান্য জ্যোতিষীর মত আমারও কিছু কথা ‘মেলার’ মধ্য দিয়ে যে জ্যোতিষবিদ্যার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না — তাও আলোচিত হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~